

ଅବକେର ବର୍ଣ୍ଣାବୃତ୍ତକମିକ ସୂଚୀ ।

ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ।

ଆ

ଆଜମୀର	ଶ୍ରୀନରାୟଣ ମିତ୍ର	...	୩୦୭
ଆଦ୍ୟାମାଳ (କବିତା)	ଶ୍ରୀବିଭୂତିଭୂଷଣ ମହାମହାର	...	୨୫୧
ଆଗାଧାର	ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମା ...	...	୨୧୭
ଆମାର ମହାମା (ମଞ୍ଚ)	ଶ୍ରୀଧରମୋହନ ମିତ୍ର ଏମ୍. ଏ,	...	୩୧୨
ଆମାଳ୍ୟ ଅହୋର	ଶ୍ରୀନେତ୍ରମୋହନ ନାରାୟଣ ସୋମ	...	୨୧୫

ଉ

ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ (ମଞ୍ଚ)	ସମ୍ପାଦକ	...	୨୫୯

ଊ

ଊଷା (କବିତା)	ଶ୍ରୀନରାୟଣମୋହନ ସୋମ ବି, ଏ,	...	୧୧୭

କ

କୀର୍ତ୍ତୀପୁତ୍ର	ଶ୍ରୀନେତ୍ରମୋହନ ମିତ୍ର ...	୧୭୫, ୨୫୨, ୩୫୦	
କୁମାର ନାରାୟଣ ମଞ୍ଚ (ମଞ୍ଚ)	ସମ୍ପାଦକ	...	୩୭୯

ଖ

ଖଣ୍ଡଗିରି	ସମ୍ପାଦକ	...	୧୫୧

ଗ

ଗଙ୍ଗାବନ୍ଧୁ (କବିତା)	ଶ୍ରୀନେତ୍ରମୋହନ ସୋମ	...	୩୩୩
ଗାନ୍ଧୀପରିଚୟ	...	...	୫୧୮

ଚ

ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ବନ୍ଧୁ	ଶ୍ରୀଧରମୋହନ ମିତ୍ର ଏମ୍. ଏ	...	୩୫୧
ଚିତ୍ରୋତ୍ସବ	ଶ୍ରୀନରାୟଣମୋହନ ସୁଧୋପାଧ୍ୟାୟ ଏମ୍. ଏ	...	୫୫
ଚିତ୍ରକର (ମଞ୍ଚ)	ସମ୍ପାଦକ	...	୧

জ			
জিজ্ঞাসা (কবিতা)	সম্পাদক ...	...	৩১০
জ্ঞানালোক (কবিতা)	শ্রীমতীজ্ঞানানন্দ চট্টোপাধ্যায়	...	৩৬৮
চ			
ঢাকা	শ্রীশশিভবর্ণ মুখোপাধ্যায়	...	৩২৫
ন			
নদীয়া জিলায় সিদ্ধযোগী	শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় ...	৩৫৩, ৩৯০	
নববর্ষ (কবিতা)	শ্রীব্রজীমোহন ঘোষ বি, এ,	...	১৯
নিবন্ধাবলী (কবিতা)	শ্রীকামিনী রায় ...	...	৩৯৫
নিরানন্দ যাত্রা (গল্প)	সম্পাদক ...	...	৭৩
নৃতন (কবিতা)	ঐ ...	...	৪২৫
প			
পাখানের কথা	শ্রীরাখালদাসবন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ,	৯০, ১৫৫, ২৮৯, ৩৯৬,	
প্রজ্ঞাপারমিতা	শ্রীদীনেন্দ্রচন্দ্র মেন বি এ,	...	১৮৮
প্রজ্ঞাপারমিতা কি ?	শ্রীবিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ	...	২৮৩
প্রভীক্ষা (কবিতা)	শ্রীব্রজীমোহন ঘোষ বি, এ	...	২৮৭
প্রভাতে (কবিতা)	সম্পাদক ...	...	৭১
প্রয়াণ (কবিতা)	শ্রীব্রজীমোহন ঘোষ বি, এ	...	৩৬০
ব			
বঙ্গলক্ষী	শ্রীযোগেশ্বর চট্টোপাধ্যায়	...	৩৮০
বঙ্গীয় নদনদীর জীবনসংগ্রাম	শ্রীকালীকুমার দত্ত বি, এ	...	৪৯
বর্ষা (কবিতা)	সম্পাদক ...	...	১৬৩
বাজীরাও ওমস্তানী	শ্রীমথুরানন্দ গণেশ দেউস্বর	...	২১
বিচ্ছিন্ন (কবিতা)	শ্রীমতী দেবীরাণী ঘোষ	...	৪৩২
বিদায় চুপন (গল্প)	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র ...	...	৩৩৪
বিদ্যুৎ (গল্প)	সম্পাদক ...	...	১৪৫
বিরহে (কবিতা)	শ্রীগিরিশানন্দ মুখোপাধ্যায়	...	২৮১
বিশুদ্ধ ভাষার অভাব	শ্রীনিহারচন্দ্র ভট্টাচার্য এম, এ,	...	২২৬

	সম্পাদক	...	...	১২৬
দিনা (কবিতা)	সম্পাদক	...	...	১৯৯
	ড			
ভারতী (কবিতা)	শ্রীলালগোপালমল্লিক	...	...	২১৩
ভারতীয় অন্নগানী	শ্রীকালীন্দ্রানন্দ দত্ত বি, এ.	...	...	২০১
	ম			
মিলন (কবিতা)	শ্রীবিজ্ঞানানন্দ মুখোপাধ্যায়	...	...	৮৩
মৃত্যু-মিলন (উপন্যাস)	সম্পাদক ৩৪, ১০১, ১৭৯, ২৬০, ২৯৭, ৪২৭			
	ম			
যমুনা-বক্ষে (কবিতা)	শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম	...	...	৩৭৯
যেও একবার (কবিতা)	সম্পাদক	...	...	২৪৫
	ম			
রজনীকান্ত সেন (কবিতা)	সম্পাদক	...	...	৪১৭
সামান্যী সভাভা .	শ্রীকেশবচন্দ্রনাথ মজুমদার	...	...	৩৮৬
সাতীয়া প্রাণের বীজ .	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যালয়সংগ্রহ	...	...	২৪৬
	ম			
শব্দ (কবিতা)	শ্রীমণীন্দ্রনাথ ঘোষ বি, এ	...	...	৪০৪
শিবধর্ম .	শ্রীমণিভূষণ মুখোপাধ্যায়	...	...	১০০
	ম			
সমরদেবগন	শ্রীদেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	...	...	১৬৪
সুসাগোচনা	৩২, ১১৭, ১৯২, ২৬৫, ৩৩৯, ৪০৬			
সার্থকতা (কবিতা)	শ্রীমতী দেবীরাণী ঘোষ	...	...	২৯৬
মিফিলাটা মণ্ডেশের বয়স	শ্রীমণীন্দ্রনাথ গণেশ দেউড়ার	...	...	২৩২
মিষ্টান্ন (কবিতা)	সম্পাদক	...	...	১৯১
মুখশয্যা (কবিতা)	শ্রীমণিভূষণ মজুমদার,	...	...	৩০৬
সোণাবিবি	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ গুপ্ত	...	...	৮৫
সংগ্রহ	৫৪, ১২৯, ২০৫, ২৭১, ৩৪৫, ৪১০			

লেখকগণের নামানুক্রমিক সূচী ।

প্রথম খণ্ড ।

ক

শ্রীকালী কুমার দত্ত বি, এ,	বঙ্গীয় নদনদীব জীবন সংগ্রাম...	৪৯
	ভারতীয় আত্মজীবনী ...	২০১
শ্রীকালিদাস রায়	নিরবচ্ছিন্নতা (কবিতা) ...	৩৯৫
শ্রীকেশবনাথ মজুমদার	রামায়ণী সভ্যতা ✓ ...	৩৮৬

খ

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম, এ,	আশাব সমাধি (গল্প) ...	৩১২
	চন্দ্রনাথ বসু ...	৩৬১

গ

শ্রীগিরিজানাথ যুগোপাধ্যায়	মিলন (কবিতা) ...	৮৩
	বিরহে (কবিতা) ...	২৮১

দ

শ্রীদীনেন্দ্র কুমার রায়	নদীয়া জিলার সিন্ধুযোগী ৩৫৩ ও ৩৯০	
শ্রীদীনেশ চন্দ্র সেন বি, এ,	প্রজ্ঞাপারমিতা	... ১৮৮
শ্রীমতী দেবী রাণী ঘোষ	সার্থকতা (কবিতা)	... ২৯৬
	বিচ্ছেদ (কবিতা)	... ৪৩২
শ্রীদেবেন্দ্র নারায়ণ ঘোষ	আসামে অহোম ✓	... ২১৪
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র	বিদায় চন্দন ...	... ৩৩৪
শ্রীদেবেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ	সমরবেগম ...	... ১৬৪

ন

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ঘব	রাষ্ট্রীয় ভ্রাম্যমাণ বীর ...	২৩৬
শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম	গঙ্গা নদে (কবিতা) ...	৩১৩
	যুগনাবদে (কবিতা) ...	৩৯৭
শ্রীনিবাস চন্দ্র ভট্টাচার্য এম, এ,	বিশুদ্ধ জলের অভাব ...	২২৬

ব			
শ্রীবিনোদ বিহারী বিদ্যাবিনোদ	প্রজ্ঞাপারমিতা কি ৭	...	২৮৩
শ্রীবিভূতি ভূষণ মজুমদার	আত্মপ্রকাশ (কবিতা)	...	২৪১
	পুথ শাখা ...	...	৩০৬
ঘ			
শ্রীযোগেন্দ্র নাথ শুক্ল	সোণাবিবি ...	...	৮৫
শ্রীযোগেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	বজ্রলক্ষী ...	...	৩৮০
শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	জ্ঞানালোক (কবিতা)	...	৩৬৮
র			
শ্রীরমণীমোহন ঘোষ বি, এ,	নববর্ষ (কবিতা)	...	১৯,
	উষা (কবিতা)	...	১১৬,
	প্রতীক্ষা (কবিতা)	...	২৮৭
	প্রয়াণ (কবিতা)	...	৩৬০,
	শ্রবণ (কবিতা)	...	৪০৪
শ্রীরাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ,	পাখানের কথা ৯০, ১৫৫, ২৮৯, ৩৯৬		
শ্রীস্বামীনাথ শুক্ল	আখ্যানবর্ষ ✓	...	২১৭
ল			
শ্রীলালগোপাল মল্লিক	ভারতী (কবিতা)	...	৩১৩
শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়	শিখরী ✓	...	১০
	ঢাকা ...	...	৩২৫
শ			
শ্রীশরৎকান্ত মিত্র	আজমীর ...	...	৩০৭
স			
শ্রীসখারামগণেশ দেউকর	বাম্পীর ও মস্তানি	...	২১
	মিরিমাতা গণেশের বাস	...	২৩২
শ্রীসতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	চিতোর ...	...	৪৪
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মিত্র	কীটগুস্তব ...	১৭৫, ২৪২, ৩৩০	
সম্পাদক	রজনী কান্ত সেন কবিতা	...	৪১৭
	উত্তরাধিকারী (গল্প)	...	২৪৯

মৃত্যু-মিলন (উপন্যাস) ৩৪, ১০১, ১৭৯,

২৬০, ২৯৭ ও ৪২৭

কুশার রাজারগড়	...	৩৬৯
খড়্গগিরি	...	১৪১
জিজ্ঞাসা (কবিতা)	...	৩১০
চিহ্নকর (গল্প)	...	১
নির্যাদেশ যাত্রা (গল্প)	...	৭৩
নূতন (কবিতা)	...	৪২৫
প্রভাতে (কবিতা)	...	৭১
বর্ষা (কবিতা)	...	১৬৩
বিদূষী (গল্প)	...	১৪৫
বুদ্ধাশ্রি	...	১২৬
ব্রজাঙ্গনা	...	১৯৯
সিন্দূরলে	...	১৯১
যেও একবার	...	২২৫

চিত্রসূচী ।

প্রজ্ঞাপারমিতা



আমরা চাঁর বন্ধ মুর্শিদাবাদে গিয়াছিলাম। তথায় বহরমপুরে বাস-
বন্ধুর গৃহে কয়দিন প্রচুর আনন্দে ও আদরে সময় কাটাইয়া আমরা বাঙ্গালার
মুগলমান-শাসনের গ্রন্থান দেখিয়া বেড়াইলাম। এই মুর্শিদাবাদেই বাঙ্গালার
ইংরাজের প্রথম সমৃদ্ধিসংক্রান্ত। তখনও এ দেশে ইংরাজ বণিকমাত্র।
তখনও রেশমের কুঠীর দপ্তরখানায় মণ্ডপত্নীবিয়োগবিধুর হেষ্টিংসের কলনায়
বাঙ্গালার রাজ্য-স্থাপনের কথা উদ্ভিত হয় নাই। মুর্শিদাবাদের কুঠীর
সম্মুখে সমানিক্ষেত্রে তাহার পত্নী ও ছহিতা সমাহিতা। তখন মুর্শিদাবাদের
প্রাসাদে মিরাসদৌলার বিলাসস্রোতঃ শতমুখে প্রবাহিত হইতেছে; বাঙ্গালার
ঘরে ঘরে সে কথা প্রবাদের মত প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে। তখন
জগৎশেঠের ঐশ্বর্যের কথা সমস্ত ভারতে রাষ্ট্র। তাহার পর বিষম বিপদে
সবই পরিবর্তিত হইয়া গেল। মুর্শিদাবাদে মুগলমানের গৌরবরবি অন্তর্মিত,
—বুটিশ-শাসন সমুদ্ভিত।

আমরা কয়দিন সত্তর দেখিলাম। তাহার পর আরও দুই চার দিন
পাকিস্তানের অল্প বন্ধুর মানিক অধুরোধ এড়াইয়া গৃহান্তিমুখগামী হইলাম।
বন্ধু বহরমপুর হইতে নবাবের প্রাসাদ পর্য্যন্ত সঙ্গে আসিয়া প্রাসাদ দেখাইয়া
গৃহে ফিরিলেন।

সন্ধ্যার সময় আমরা গজাতটে আসিয়া উপনীত হইলাম; তাহার পর
নদী পার হইয়া পর পানে রেলওয়ে স্টেশনে আসিলাম। তখনও গাড়ী
আসিতে বিলম্ব আছে। আমরা চেয়ার লইয়া প্যাটফর্মে বসিলাম।

চন্দোদয় হইল। সম্মুখে বালুকায় গঠিত উচ্চ তটের নিম্নে টেকের মন্ড-
গতি গঙ্গা বাহিয়া যাইতেছে। বামে দৈন্যগগনপটে দৈন্য মন্দিরের চূড়া

চিত্রিতবৎ দেখাইতেছে । অদূরে কোথায় আগকুঞ্জে এখন ও মুকুল আছে, বাতাসে গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে । আমি বলিলাম, “কি সুন্দর রানি ।”

বলিয়াছি, আমরা চা’র বন্ধু মুর্শিদাবাদে গিয়াছিলাম । আমি ব্যবসাদার, একজন উকীল, একজন চিত্রকর, আর একজন কবি ।

কবির বন্ধু দ্বিজেনচন্দ্র চিত্রকর বন্ধুকে বলিলেন, “তুমিই ধন্য । আমরা যাহা অল্পভব মাত্র, করিতে পারি যাহা জীবনের সুখ-স্বপ্নের মধ্যে পরিণত হইয়া যায়, যাহা ধরি ধরি করিয়া ধরিতে পারি না—তোমরা তাহাকে চিত্র-পটে স্থায়িত্ব দান করিতে পার ।”

আমি শুনিতে লাগিলাম । সেই শুভ্রজ্যোৎস্নাপুলকিত যামিনী, সেই আশ্রয়কুলগন্ধামোদিত—জাহ্নবীতরঙ্গসঙ্গীতল সমীরণ বুঝি এই সব বন্ধুর কবিতারোগের মাত্রা বাড়াইয়া তুলিয়াছিল । তিনি চিত্রকর বন্ধুকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, — “আর তোমরাই প্রকৃত সুখী । তোমরা যে স্থানেই যাও, সেই স্থানেই প্রকৃতির শত সৌন্দর্য লইয়া সব ভুলিয়া যাও । তোমাদের রচনা ভাষার কারাগারে বদ্ধ রহে না ; সকলেই তাহার সৌন্দর্য উপভোগ করিতে সমর্থ ।—”

বন্ধু বলিয়া যাইতেছিলেন । কিন্তু উকীল বন্ধু চুরুট টানিতে টানিতেই বলিলেন,—“কিন্তু চিত্রকরের কি কোন ছুঃখই নাই ?”

আমি বলিলাম, “ছুঃখটা কি ?”

“মানস প্রতিমা যখন কিছুতেই চিত্রপটে ফুটিয়া উঠে না ? কাব্য ছাড়িয়া আমি একটা সত্য ঘটনা বিবৃত করি । শুনিবে ?”

আমরা সাগ্রহে বলিলাম, “শুনিব ।”

“আমি ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথমে আলিপুরে ওকালতী করিতে আরম্ভ করি । কেন আলিপুর ছাড়িয়া হাইকোর্টে আসিয়াছিলাম, তাহাই তোমাদিগকে বলিব ।”

২

আমরা শুনিতে লাগিলাম । বন্ধু বলিলেন :—

“আমি ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আলিপুরে নাম লিখাইলাম । কিন্তু প্রথম দিন উকীলদিগের বসিবার ঘরে প্রবেশ করিয়াই আমার আশা সম্বন্ধে আমার ভ্রম অপনীত হইল । সে ঘর মক্ষিকাপূর্ণ মধুচক্রের মত ; তেমনই গুঞ্জন-মুখর, তেমনই পূর্ণ, বরং তাহাতে স্থানাভাব লক্ষিত হইল ।

এই অরণ্যে আমি নবাগত, কি উপায়ে আপনার অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিব—
আপনার স্থান করিয়া লইব? জীবন-সংগ্রামে অগ্নী হইবার আশা ত্যাগ
করিলাম; কিন্তু শ্রান্ত দেহের শেষ শক্তি পর্য্যন্ত ব্যয় করিয়া বাচিব কি
উপায়ে? হায় হৃদিশা! হায় হৃদ্দিন!

“এমনই হৃদিশায় কয় মাস কাটিল। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিতাম,
‘একরূপ হইতেছে। নিরাশ হইবার কারণ নাই।’ কিন্তু এই মিথ্যায়
অপরকে প্রতারণা করিলে ও আপনাকে প্রতারণা করিব কেমন করিয়া?
অবস্থা এমনই শোচনীয় যে, উপার্জিত টাকায় গাড়ীভাড়াও কুলাইত না।

“তৃতীয় মাসের শেষে একটি অসাধারণ মোকদ্দমা উপস্থিত হইল। এক-
জন চিত্রকর চৌর্য্যাপরাধে বিচারার্থ আদালতে আনীত হইল। ঘটনাটি
কিছু নূতন ধরণের। চিত্রকর যুবক একখানি চিত্র অঙ্কিত করিয়া
প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত করিয়াছিল। চিত্রখানি মনোরম;—শকুন্তলা আম্রবৃক্ষে
ভর দিয়া শ্রান্ত ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। চিত্রখানি বিশেষ প্রশংসিত হয়।
একজন গোপীনাথ ধনী সে চিত্রখানি ক্রয় করেন। তাহার পর সেই ধনীর
গৃহেই কক্ষে সেই চিত্রখানি বিলম্বিত ছিল, নিম্নেই সেই কক্ষে চিত্রকর
যুবককে পাওয়া যায়।

“গৃহে সকলে যখন নিজালাভের জন্য শয্যায় আলয় লইয়াছে, ধানগামা
বৈঠকখানায় আলোক নিবাইয়া গিয়াছে, তখন বৈঠকখানায় একটি আলোক
প্রজ্জ্বলিত হইল দেখিয়া একজন জাগ্রত ভৃত্য বিস্মিত হয়। তাহার পর সে
আর কয়েকজন ভৃত্যকে জাগাইয়া বৈঠকখানায় যাইয়া দেখে, চিত্রকর যুবক
যেন কিসের সন্ধান করিতেছে। সে কেন গোপনে তথায় আসিয়াছিল
তাহার কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারে নাই। সরকার যখন চোর
বলিয়া তাহাকে পুলিশে দেয় সে তখনও কোন আপত্তি করে নাই।
তাহার মুখে বাক্যশৃঙ্খলি হয় নাই। সে নতমস্তকে সব অপমান সহিয়াছে;
মুখ ভুলিতে পারে নাই।

“আমি চিত্র প্রদর্শনীতে সে চিত্রখানি দেখিয়াছিলাম, দেখিয়া মুগ্ধ
হইয়াছিলাম। কিন্তু চিত্রখানি অনেক দামে বিক্রয়, তাই কিনিতে পারি
নাই। আমি চিত্রকর যুবককে আনাইয়া আমার পরলোকগত পিতৃদেবের
প্রতিকৃতি অঙ্কিত করাইয়া লইয়াছিলাম। সে চিত্র তোমরা দেখিয়াছ।”

কবি বন্ধু বলিলেন, “সে চিত্র ত অতি সুন্দর।”

বন্ধু বলিলেন, “হাঁ। সে চিত্র সেই চিত্রকরের অঙ্কিত। সেই উপলক্ষে আমার সহিত তাহার পরিচয়। আমি তাহার ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছিলাম। সে ভদ্রবংশজাত; স্বয়ং অতি ভদ্র। তাহার চৌর্য্যাপবাদ আমার নিকট একান্ত অসম্ভব বোধ হইল। বিশেষ ঘটনার কথা অবগত হইয়া আমার মনে হইল, ইহার মধ্যে কোন রহস্য নিহিত আছে। আমি সে রহস্য উদ্ঘাটন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলাম। অপরাধীর পক্ষে কোন উকীল ছিল না; আমি তাহার পক্ষ অবলম্বন করিলাম।

৩

“আমি চিত্রকরের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। আমাকে দেখিয়া সে লজ্জায় মুখ তুলিতে পারিল না। তাহার ডাব দেখিয়া আমি প্রথমে কিছু বিব্রত হইয়া পড়িলাম। তাহার পর আমি বলিলাম, আমি তাহার পক্ষ অবলম্বন করিয়া মোকদ্দমা চালাইতে চাহি।

“‘ওনিয়া চিত্রকর’ বলিল, তাহা একান্ত অনাবশ্যক; তাহাকে বাচাইবার চেষ্টা করা নিম্প্রয়োজন।

“তাহার পর আমি যখন বলিলাম, তাহার চৌর্য্যাপবাদ আমি বিশ্বাস করি না; তাই স্বতঃপ্রসূত হইয়া মোকদ্দমায় তাহার পক্ষ অবলম্বন করিতে চাহি, তখন কৃতজ্ঞতায় তাহার দুই নয়নে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। বহুক্ষণ কাঁদিয়া সে প্রকৃতিস্থ হইল। তখন আমি ক্রমে-ক্রমে তাহার নিকট প্রকৃত ঘটনা অবগত হইলাম।

“শকুন্তলার চিত্রখানি অঙ্কনের পূর্বে সে কিছুদিন কোন কার্য্যে-হস্তক্ষেপ করিতে পারে নাই। ঐ চিত্রের কল্পনা তাহাকে বিভোর করিয়া রাখিয়াছিল। সে কতবার সেই মানস-সুন্দরীকে কত ভাবে কল্পনা করিয়াছে। শেষে সে স্থির করিল, পাণ্ডুপত্রোদরপিনক কুসুমের যত বদলবসনারূতা শকুন্তলার এই চিত্রটি অঙ্কিত করিবে। স্থির করিবার পর সে যেন পাগল হইয়া উঠিল। হৃদয়ে অশ্রু চিন্তা নাই—নয়নে নিজা নাই।

“তিন রাত্রি অনিদ্রায় কাটিল। মুকুল যখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার আবরণ আর তাহাকে আবদ্ধ রাখিতে পারে না; সে সে বক্ষন বিচ্ছিন্ন করিয়া ফুটিয়া উঠে। তাহার কল্পনা যখন সম্পূর্ণ হইয়া উঠিল তখন সে যেন বলে আশ্রয়প্রকাশের চেষ্টা করিতে লাগিল। তৃতীয় রাত্রিতে সে কেবল

দিবালোক-বিকাশের স্রষ্টা অপেক্ষা করিতে লাগিল। রাত্রি যেন একান্ত দীর্ঘ, কিছুতেই শেষ হয় না।

“শেষে রাত্রি পোহাইল, দিবালোক ফুটিতে না ফুটিতে চিত্রকর বাতায়ন মুক্ত করিয়া দিল—চিত্রাঙ্কনে প্রবৃত্ত হইল।

“তখন কত আশা,—কত আশঙ্কা! সে মৌন্দর্য্য-কল্পনা কি চিত্রে ফুটিবে? সে বাহ্যজ্ঞানশাল্য হইয়া চিত্রে অঙ্কিত করিতে লাগিল। সে আহা-নিদ্রাও বিস্মৃত হইত। সংসারে জননী ব্যতীত তাহার আর কেহ ছিলেন না। যা যখন কার্য্যবশতঃ তাহাকে ডাকিতেন, তখন তাঁহার কণ্ঠস্বরে সে চমকিয়া উঠিত। সে এমনই তদগতচিত্ত।

“তাহার পর যখন তুলিকার রেখাপাতে, কল্পনা সফলতা লাভ করিতে লাগিল—তাহার মানস-সুন্দরীর মূর্ত্তি হৃদয়পট হইতে চিত্রপটে প্রতিফলিত হইতে লাগিল, তখন কি আনন্দ! সে আনন্দ প্রকাশের ভাষা নাই। তাহার তুলিকাগে মানস প্রতিমা যেন সজীব হইয়া ফুটিতে লাগিল। অনিন্দ্যসুন্দর রমণী-মূর্ত্তি—যেন তাহার দিকে চাহিয়া আছে; যেন সেই কুসুমকোমল-রক্ত ওষ্ঠাধরে বাক্য সুরিত হইতেছে—সে তাহা শুনিতে পাইবে। তাহার চিত্র সম্পূর্ণ হইল।

৪

“অপরের চিত্রাধিনোদনকল্পে আপনার নৈপুণ্য-প্রদর্শনই শিল্প। চিত্রকর যখন চিত্রে অঙ্কিত করে—ডাক্তর যখন মূর্ত্তি গঠিত করে তখন সে যে ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া রচনা করিয়াছে সেই ভাবে সেই রচনা বুঝিবার মত দর্শকের কল্পনা না করিয়া থাকিতে পারে না। সেই কল্পিত দর্শক-সমাজের প্রশংসা তাহাকে উৎসাহিত করে। সেই দর্শক-সমাজের কল্পনা ব্যতীত শিল্পী কার্য্য করিতে পারে না। চিত্রকর যুবক যখন আপনার রচিত সেই সুন্দরীর চিত্রায় তন্ময়, তখন শিল্পপ্রদর্শনী মুক্ত হইল। চিত্রকর চিত্রখানি প্রদর্শনীতে দিল।

“তখন তাহার চিত্রে বিক্রয়ের ইচ্ছা ছিল না। তাহার চিত্র বিশেষ প্রশংসিত হইল। সেই প্রশংসার কারণে শিল্পীর হৃদয়ে আনন্দশতদল বিকশিত হইয়া উঠিল। তাহার সেই মানস-প্রতিমা—সেই কত সুদীর্ঘ দিন—কত নিদ্রাহীন নিশার কল্পনার ফল—সর্ব্বজনের প্রশংসা লাভ করিয়াছে—তাহার খ্যাতি যুগে যুগে। ইহার অপেক্ষা অর্থ আর কি আছে?

“এই সময় একটি ঘটনা ঘটিল ; শিল্পীর বিধবা জননী পীড়িতা হইলেন । তিনি প্রথমে সে দিকে মনোযোগ দিলেন না ; ফলে পীড়া দেখিতে দেখিতে বাড়িয়া উঠিল । শিল্পীর চিন্তার অবধি রহিল না । সে তাহার চিকিৎসায় আপনার ক্ষমতার অধিকও করিতে লাগিল । মানুষ প্রাণের টানে সব করিতে পারে,—সব করিয়া থাকে ।

“শকুন্তলার চিত্র অঙ্কন আরম্ভ করিবার প্রায় দুই মাস পূর্ব পর্য্যন্ত শিল্পী সেই চিত্রের কল্পনাতেই বিভোর ছিল, অল্প কোন কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারে নাই । ফলে সামান্য সঞ্চয় নিঃশেষিত হইয়াছিল । এখন জননীর চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহ করা হুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইল । সম্বল কেবল সেই চিত্র । এই সময় অভিজ্ঞদিগের নিকট সেই চিত্রের অসাধারণ প্রশংসা শুনিয়া এক জন ধনী তাহা ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হইলেন । তিনি শিল্পের বিশেষ কিছু বুঝিতেন না, কেবল মার্জিতরুচি, শিল্পবিষয়ে বোদ্ধা বলিয়া পরিচিত হইবার প্রলোভনে চিত্রখানি কিনিতে উচ্চত হইলেন । তিনি চিত্রখানির জ্ঞান যে মূল্য দিতে সম্মত হইলেন তাহাতে সে অবস্থার দরিদ্র চিত্রকরের পক্ষে চিত্র বিক্রয় না করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল ।

“সে চিত্রখানি বিক্রয় করিল । তাহার হৃদয়ে যেন তীক্ষ্ণ ছুরিকার আঘাত অনুভূত হইল । কিন্তু উপায় নাই । সে চিত্র বিক্রয় করিল,—বিক্রয় করিয়া কাঁদিল । তাহার জননী পুত্রের অবস্থা দেখিয়া কারণ অনুসন্ধান করিলেন ; কারণ জ্ঞানিয়া বলিলেন, ‘তবে চিত্রখানি বিক্রয় করিলি কেন ? বিক্রয় করিয়া কাঁচ নাই ; চিত্রখানি ফিরাইয়া আন ।’ চিত্রকর রোগ-কাতরা জননীকে চিত্রখানি বিক্রয়ের প্রকৃত কারণ বলিতে পারিল না । তাহার কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল । সে উঠিয়া কক্ষান্তরে গেল—কাঁদিয়া মনের গুরু ভার হৃদয়ের দুর্ভিসহ যাতনা কিছু প্রশমিত করিল ।

“এই ভাবে কয়মাস কাটিল । লক্ষ অর্থ ফুরাইয়া আসিল । এই সময় সে জননীর চিকিৎসার জন্য অর্থসংগ্রহচেষ্টায় আমার পিতার প্রতিমূর্তি অঙ্কিত করিয়াছিল । সে এত অল্প দিনে সে প্রতিমূর্তি অঙ্কিত করিয়াছিল যে, শুনিলে বিস্মিত হইতে হয় । সেই পারিশ্রমিকে জননীর চিকিৎসা চলিতে লাগিল । চিত্রকর স্নায়ু অক্লান্ত যত্নে জননীর সেবা করিতে লাগিল । কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না ; সে জননীকে বাঁচাইতে পারিল না ।

৫

“জননীৰ মৃত্যুতে চিত্রকর অগতঃ অন্ধকার দেখিল। সংসারের কার্যে সে যেমন অনাভিজ্ঞ তেমনই অপারগ। দারুণ শোক ও পদে পদে অশ্রুবিধা ভোগ করিয়া সে বিব্রত হইয়া পড়িল।

“শোকের প্রথম বেগ প্রশমিত হইলে সে আবার চিত্রাকর্ষনের চেষ্টা করিল; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারিল না। চিত্র অঙ্কিত করিতে বসিলেই সেই মানস-প্রতিমার কথা মনে পড়িত; চক্ষু অন্ধপূর্ণ হইয়া আসিত; অঙ্গুলি হইতে তুলিকা পড়িয়া যাইত।

“এই অবস্থায় কয় দিন গেল তাহার পর সে সেই চিত্র আবার অঙ্কিত করিতে বসিল। হায় ছরাশা! সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। হৃদয়ে কোন ভাব - কোন চিন্তা একবার যেরূপে ফুটিয়া উঠে, আর কখন সেই রূপে প্রত্যাবর্তন করে না। তাহার পরিবর্তন অনিবার্য। এতদ্বারা যদি হারাইয়া যায় তবে প্রত্ন-কার যত চেষ্টাই করুন না—আর ঠিক সেই এতদ্বারা রচনা করিতে পারেন না। চিত্রকর একখানি অঙ্কিত চিত্রের প্রতিলিপি অঙ্কনের চেষ্টা করিলে প্রতিলিপিতে কিছু কিছু পরিবর্তন অবশ্যস্বাবী। এতদ্বারা বারের চেষ্টা ভিন্ন ফল প্রসব করে।

“চিত্রকর যে চিত্র অঙ্কিত করিল তাহা স্মরণ হইতে পারে, কিন্তু পূর্বের সে চিত্র নহে। আমি সে চিত্র দেখিতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু দেখিতে পাই নাই। মানস-সুন্দরী যে চিত্র সে একবার চিত্রপটে প্রতিফলিত করিয়া-ছিলাম তাহার নিকট এ চিত্র যান বোধ হওয়ায় শিল্পী শেষ চিত্রখানি নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল।

“সে চিত্র নষ্ট করিলার পর চিত্রকর একান্ত অস্থির হইয়া উঠিল। সে আর একবার প্রথম চিত্রখানি দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। এক দিন নিশীথে অনিদ্রাকাতর চিত্রকরের হৃদয়ে সেই ব্যাকুলতা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। সেই উজ্জল নয়ন, সেই কোমল গুষ্ঠাধর, সেই বিশাল কুণ্ডল তাহার সেই মানস-সুন্দরী যেন সত্যসত্যই তাহাকে আহ্বান করিতে লাগিল। সে আহ্বানে সে স্থির থাকিতে পারিলে কি ?

“শেষে তাহার পক্ষে সে ব্যাকুলতা নিবারণ করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। সে প্রবল ইচ্ছার গতিরোধ করিতে পারিল না।

“যে ঘনো তাহার চিত্রপট জয় করিয়াছিলেন চিত্রকর স্বয়ং যাইয়া তাঁহার কক্ষে কোন স্থানে ছবিখানি টাঙ্গাইলে উপযুক্ত আলোকপাতে চিত্র স্মরণ

দেখাইবে তাহা বুনিয়া ছবি টাঙ্গাইয়া দিয়া আসিয়াছিল। সেই নিম্নীণে সে আপনার বিজন গৃহ ত্যাগ করিয়া সেই ধনীর গৃহে গেল। তখনও সিংহদ্বার মুক্ত,—দ্বাররক্ষক কার্য্যাস্তরে কোথায় গিয়াছে। চিত্রকর গৃহে প্রবেশ করিল। কোন্ কক্ষে চিত্র ছিল চিত্রকর তাহা জানিত—পথও জানিত। সে সেই পথে অগ্রসর হইল। সকলেই শ্রুত, গৃহে কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইল না। চিত্রকর দ্বিতলে গেল। সোপানের উপর বৈঠকপানাদয়ের দ্বার ভ্রমণ ছিল। সে কক্ষে প্রবেশ করিল।

“চিত্রকরের সঙ্গে দেশলাই ছিল। একটি কাঠি জ্বালিয়া সে একটি গ্যাসদীপ প্রজ্জ্বলিত করিল। কিন্তু সে দিক হইতে চিত্রপটে যথোপযুক্ত আলোকপাত হয় না দেখিয়া সে কোন্ দীপটি জ্বালিবে তাহাই দেখিতেছিল, এমন সময় ভূত্যগণ আসিয়া তাহাকে বৃত্ত করিল।

“চিত্রকর লজ্জায় যেন মরিয়া গেল। বাসনার যে প্রবল উত্তেজনায় সে এ কার্য্য করিয়াছিল তাহাতে অতর্কিত আঘাত লাগিল। সে কি করিয়াছে। এখন সে কি বলিয়া আপনার কার্য্যের সমর্থন করিবে? সে সত্য কথা বলিলে কে বিশ্বাস করিবে? তাহার সেই চিন্তা—সেই ব্যাকুলতা সে সব অপরে বুঝিবে কি? তাহার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে জিজ্ঞাসিত হইয়া আপনার কার্য্যের সমর্থনে কোন কথাই বলিল না। সে চোর বলিয়া ধৃত হইল। সে বিচারালয়েও আত্মপক্ষসমর্থনের কোন চেষ্টা করে নাই—করিতে ইচ্ছুকও ছিল না।

৬

“আমি চিত্রকরের কথা শুনিলাম; তাহাকে সাধুনা দিলাম—আশা দিলাম, তাহাতে মুক্ত করিব। তখন আমি সংসারজারামণ্ডিত—আমার যুবক-হৃদয়ে ভাবের প্রাবল্য; আমি তখনও সহানুভূতি সঞ্চিত করিতে শিখি নাই। আমি চিত্রকরের দুঃখে একান্ত দুঃখিত হইলাম। বিজ্ঞালয়ে ইচ্ছাশক্তি কর্তৃক মানবের কার্য্য নিয়ন্ত্রিত হইবার কথা পাঠ করিয়াছিলাম; তাহার অতি উজ্জল দৃষ্টান্ত দেখিলাম।

“যথাকালে মোকদ্দমা উঠিল। চিত্রকর কাঠগড়ায়; কয়দিনে কি পরিবর্তন। দেখিয়া আমার ভয় হইল। সে একবারও মুখ তুলিল না। সে যেন কি ভাবিতেছিল—কোন দিকে কিছু লক্ষ্য করিতেছিল না।

“আমি ইচ্ছাশক্তি কর্তৃক চিত্রকরের কার্য্য নিয়ন্ত্রিত হইবার কথা বলিয়া

তাহার দৃষ্টান্ত দিতে লাগিলাম ; সাগ্রে তাহাকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। আমি যে জয়ী হইব তাহাতে আমার সন্দেহ মাত্র ছিল না। আমার বক্তৃতার মধ্যভাগে অপর পক্ষের বৃদ্ধ উকীল উঠিলেন, হাসিয়া—বিজ্ঞপব্যক্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিলেন, বিচারককে বলিলেন, ‘আমার এই বন্ধু অতি অল্পদিন বিজ্ঞানায় ছাড়িয়াছেন। তিনি যে বিজ্ঞানয়ে নাই। আদালতে উপস্থিত একথা তাঁহাকে শ্রবণ করাইয়া দিতে হইতেছে। দর্শনশাস্ত্রের কথা বাদ দিয়া আইনের কোন কথা থাকিলে তিনি তাহাই বলুন।’

“তিনি উপবেশন করিলেন। তখন আমি নূতন ব্রতী। তাঁহার এই আচরণ নিতান্ত নিষ্ঠুর বলিয়া বোধ হইল। আমি বক্তৃতার মধ্যভাগে একপ বাধাপ্রাপ্তির আশঙ্কা করি নাই ; ততমত বোধ করিলাম। সমস্ত আদালতে হাস্যধ্বনি শুনা গেল। আমি লজ্জায়—ক্রোধে অধীর হইয়া পড়িলাম।

“যে বিচারকের নিকট মোকদ্দমার বিচার হইতেছিল, তিনি বৃদ্ধ ; বয়সের নিয়মে তাঁহার নির্দ্ধারিত কার্যকাল শেষ হইয়া গিয়াছিল, সরকারের অন্তর্গত তিনি তখনও চাকরী করিতেছিলেন। দৃষ্ট লোকে বলাবলি করিত, চাকরী আরম্ভকালেও তিনি বয়স কম লিখাইয়াছিলেন। এই সুদীর্ঘকাল অপরাধীদিগের সহিত ব্যবহারের ফলে আপনার গৃহিনী ব্যতীত অপরের সাধুতায় তাঁহার বিশ্বাস বিলুপ্ত হইয়াছিল। ইহার উপর আবার তিনি অত্যন্ত শাস্তিদানপ্রিয় ছিলেন। তিনি আমার কোন কথায় কর্ণপাত করা আবশ্যক মনে করিলেন না ; চিত্রকরকে এক পক্ষের জন্ত কারাগারে পাঠাইলেন। চিত্রকর আর ফিরিয়া আইসে নাই।

* * * * *

“এদিকে সেই মোকদ্দমা হইতে আদালতে সকলে আমাকে বিজ্ঞপ করিয়া ‘অধ্যাপক’ বলিতে লাগিল। মক্কেল পণ্ডিত উকীল চাহে না, যে উকীল যে উপায়েই হউক জয়ী হইতে পারেন তাঁহারই সন্ধান করে—তাঁহার অবলম্বিত উপায়ের বিষয় বিচার করে না। কায়েই তাহারা আর ‘অধ্যাপককে’ মোকদ্দমা দিত না। এই ত অবস্থা। তাহার উপর বিজ্ঞপ। অগত্যা আমি জালিপুর ত্যাগ করিয়া হাইকোর্টে আসি।”

আমি বলিলাম, “তোমার কপাল খুলিল। তোমার পক্ষে সেই হইতেই সৌভাগ্যের আরম্ভ হইল।”

আমরা সকলেই হাসিলাম।

ক্রীহেমেন্সপ্রসাদ ঘোষ।

শিখ ধর্ম ।

মিঃ ম্যাকালিফ ইতঃপূর্বে ভারতের একজন লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ সিভিলিয়ান ছিলেন । ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন । কার্য্যক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া মিঃ ম্যাকালিফ সাহিত্য-চর্চায় নিরত রহিয়াছেন । সম্প্রতি তিনি শিখরাজ্যবর্গের অর্থসহায়তায় শিখধর্ম নামক একখানি গ্রন্থ প্রণীত করিয়াছেন । গ্রন্থখানি পুস্তক ; উহা ছয় খণ্ডে সমাপ্ত । ইংলণ্ডীয় বিদগমগুলীর পরামর্শে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস ইহা প্রকাশিত করিয়া ইংরেজী সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন । গ্রন্থের ভাষা সরল, সুন্দর ও ওজস্বিনী ; শিখধর্মের অভ্যুদয়, বিকাশ ও পরিণতি সম্পর্কে অনেক কথাই এই গ্রন্থে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে । শিখগুরুদিগের জীবনকথা ও উপদেশমালা এই গ্রন্থে সমস্তে সঙ্কলিত হইয়াছে । এতদিন শিখধর্মসম্বন্ধে অনেক তথ্য ইংরেজীভাষাভাষী জনসাধারণের নিকট নিভৃত গুহায় নিহিত ছিল, মিঃ ম্যাকালিফের যত্নের ও অধ্যবসায়ের ফলে আজ তাহা দীপ্ত দিবালোকে নীত হইয়াছে ।

পূর্বতন গ্রন্থকার ।

মিঃ ম্যাকালিফের পূর্বে অন্য কোনও যুরোপীয় গ্রন্থকারই ইংরেজী ভাষায় শিখধর্মসম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য গ্রন্থ লিখিয়া যাইবেন নাই । মিঃ কানিংহাম শিখদিগের ইতিহাস লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে শিখজাতির ইতিহাসই বিরত আছে, শিখ ধর্মের বিবৃতি নাই । শিখজাতির ইতিহাস সম্বন্ধে আরও কয়েক খানি সুন্দর গ্রন্থ আছে, কিন্তু শিখ ধর্মের বিস্তৃত বিবরণসম্বলিত বিশ্বাসযোগ্য গ্রন্থ ইংরেজী ভাষায় এই নূতন । ইতঃপূর্বে ডাক্তার ট্রাম্প (Trumpp) নামক জর্মনক জর্মণ মিশনারী শিখধর্ম সম্বন্ধে একখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন । কিন্তু ঐ পুস্তক নানাক্রমে ভ্রমভ্রমে পূর্ণ ছিল । অধ্যাপক মোক্ষমূলার বলিয়াছেন, “ডাক্তার ট্রাম্পের অনুবাদ আদৌ বিশ্বাসযোগ্য হয় নাই ।” ডাক্তার ট্রাম্পের অনুবাদসম্বন্ধে যে খটনা শুনা যায়, তাহা হইতে এই অনুমান সহজ হইয়া পড়ে । ইনি ইতিয়া অফিস কর্তৃক ‘আদি গ্রন্থ’ অনুদিত করিতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন । তিনি যখন শিখ ধর্মের কেন্দ্রস্থান অমৃতসরে আগমন করিয়াছিলেন, তখন তথা-

কার রাজপুরুষগণ তাঁহাকে এই কার্যে বিশেষ সহায়তা করিতে চাহেন । রাজপুরুষগণেরই চেষ্টায় অনেক শিখ ধর্মযাজক ইহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন । সকলে তাঁহার সমক্ষে সমবেত হইলে তিনি তাঁহাদিগকে বলেন, “আমি তোমাদিগের অপেক্ষা সংস্কৃত সাহিত্যে অধিক অভিজ্ঞ ; সুতরাং তোমাদিগের অপেক্ষা আমি ‘গ্রন্থ সাহেব’ অধিক বুঝি ।” এই কথা বলিয়া তিনি পকেট হইতে চুরুটের বাগ টানিয়া বাহির করিলেন এবং তাঁহাদের সম্মুখেই ধূমপান করিতে লাগিলেন । চুরুটের ধূমে তাঁহার সম্মুখে সংস্থাপিত ‘গ্রন্থ সাহেব’ আবৃত হইয়া গেলেন । শিখগণ ‘আদি গ্রন্থ’কে অত্যন্ত সম্মান এবং গুরুত্ব দিয়া ভক্তি করিয়া থাকেন । তাঁহারা ঐ ধর্ম গ্রন্থকে ‘শ্রী আদি গ্রন্থ সাহেব’ বলিয়া থাকেন । শিখেরা তাম্রকূটের ধূমকে অত্যন্ত অপবিত্র বলিয়া মনে করেন । শিখ জ্ঞানিগণের সম্মুখে অজ্ঞানাক্র ডাক্তার ট্রাম্প কর্তৃক ‘গ্রন্থ-সাহেব’ অপবিত্র ধূমে পরিবৃত হইলেন দেখিয়া তাঁহারা ক্ষোভে ও রোষে সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন । তাহার পর আর তাঁহারা ডাক্তারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন নাই । অগত্যা ডাক্তার ট্রাম্প শিখ জ্ঞানিগণের সাহায্যলাভে বঞ্চিত হইয়া ‘আদি-গ্রন্থ’ খানি লইয়া জর্মনীর মিউনিক শহরে গমন করেন । ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ‘আদি-গ্রন্থের’ অনুবাদ প্রকাশিত করিয়াছিলেন ; কিন্তু তিনি সমগ্র ‘আদি-গ্রন্থের’ অনুবাদ করেন নাই । তাঁহার অনুবাদে সমগ্র ‘আদি গ্রন্থের’ আট ভাগের এক ভাগ অনূদিত হইয়াছিল কি না সন্দেহ । তিনি অল্প আদি-গ্রন্থের অনেকস্থলে ভাষ্য গ্রহণ করিতে পারেন নাই । ইহার উপর ইংরেজী ভাষাতেও তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল না । তিনি খৃষ্টধর্মের প্রচারক ছিলেন ; সুতরাং অল্প ধর্মবক্তৃগণের উপর তাঁহার স্বাভাবিক ঘৃণা ছিল । চূড়ান্ত বিষয়, এই গ্রন্থে তিনি তাঁহার সেই স্বাভাবিক বিদ্বেষ পরিফুট হইতে দিয়াছিলেন । একপ ক্ষেত্রে তাঁহার প্রণীত শিখধর্মসম্পর্কিত গ্রন্থ যে ভ্রম-প্রমাদে পূর্ণ হইবে তাহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি আছে ? ডাক্তার ট্রাম্পের এই অপূর্ব গ্রন্থ ভিন্ন শিখধর্ম সম্বন্ধে ইতঃপূর্বে যুরোপীয় ভাষায় অল্প কোনও পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই । অতএব মিষ্টার ম্যাকলিফই যুরোপীয় ভাষায় শিখ ধর্মের প্রথম বিশ্বাসযোগ্য গ্রন্থকার,—একথা নির্দিষ্টবাদে বলা যাইতে পারে ।

বিষয় বিন্যাস ।

মিঃ ম্যাকালিফ কি ভাবে তাঁহার গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়গুলি বিস্তৃত করিয়াছেন, আমরা মর্ক্সপ্রথমে তাহার পরিচয় প্রদান করিলাম । তিনি এই ছয় খণ্ডে বিভক্ত পুস্তকের প্রথম পাঁচ খণ্ডে দশ জন শিখগুরুর জীবন-বৃত্ত ও উপদেশমালা প্রদান করিয়াছেন । সকল শিখ গুরুর উপদেশ লিখিত ও রক্ষিত হয় নাই । সুতরাং যাঁহাদের লিখিত উপদেশ বর্ত্তমান আছে, জীবন-বৃত্তের সহিত কেবল তাঁহাদের উপদেশ এই গ্রন্থে অনূদিত হইয়াছে । যাঁহাদের লিখিত উপদেশ নাই, তাঁহাদের কেবল জীবনকথাই প্রদত্ত হইয়াছে । ষষ্ঠ খণ্ডে “ভাগত” দিগের জীবন কথা ও উপদেশ আছে । ভক্ত এই কথা হইতে “ভগত” বা “ভাগত” এই কথার উৎপত্তি হইয়াছে । ভক্ত কথা হইতে “ভকত” কথার উৎপত্তি । কালক্রমে স্থানবিশেষে ক স্থানে গ উচ্চারিত হয় । ইহা হইতেই “ভগত” বা “ভাগত” কথা উৎপন্ন হইয়াছে । গুরু নানকের আবির্ভাবের পূর্বে ভারতে যে সমস্ত একেশ্বরবাদী ধর্ম-সংস্কারক আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহারাি শিখগণ কর্তৃক “ভাগত” নামে অভিহিত । জয়দেব, নামদেব, রামানন্দ, কবীর ও সেখ ফরিদই ভাগতগণের মধ্যে বিলক্ষণ যশস্বী । অত্যাশ্চর্য ভাগতের জীবন-কাহিনীর সহিত ইঁহাদের জীবন-কাহিনীও আলোচ্য পুস্তকের ষষ্ঠ খণ্ডে বিস্তৃত হইয়াছে । ইঁহাদের উপদেশমালা আংশিকভাবে গুরু নানক সাহেবের চিন্তাশ্রোতঃ একেশ্বরবাদের দিকে প্রধাবিত করিয়া দিয়াছিল একথা অনায়াসেই বলা যাইতে পারে ।

প্রথম গুরু ।

মিঃ ম্যাকালিফ লিখিয়াছেন যে, পঞ্চনদ প্রদেশের লাহৌরের সমিহিত তালওয়ান্দী গ্রামে ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে শিখ জাতির আদি গুরু মনসী ও মহাপ্রাণ নানক সাহেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । এ সম্বন্ধে একটু মতভেদও দৃষ্ট হয় । কেহ কেহ বলেন, তালওয়ান্দী গ্রামে গুরু নানকের পিতৃদেব বাস করিতেন বটে, কিন্তু তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়া কনকজ গ্রামে তাঁহার মাতামহের গৃহেই পুত করিয়াছিলেন । বঙ্গদেশের স্থায় পঞ্চনদ প্রদেশেও সাধারণতঃ কন্যা প্রথম গর্ভবতী হইলেই পিতৃগৃহে নীতা হইয়া থাকেন । এ সম্বন্ধে প্রমাণ অত্যন্ত বিসংবাদী । কিন্তু নানক এই নামই যেন তাঁহার মাতামহগৃহে ভূমিষ্ঠ হওয়ার প্রমাণপ্রদান করিতেছে । যে সকল বালক মাতামহগৃহে ভূমিষ্ঠ

হয়, ঐ অঞ্চলে সেই সকল বালকের নাম সাধারণতঃ নানক রাখা হইয়া থাকে। ঐ অঞ্চলে মাতামহ ও মাতামহীকে “নান্কে” বলা হয়। তদনুসারে মাতামহগৃহে জাত বালকের নাম সচরাচর নানক ও বালিকার নাম নানকী রাখা হইয়া থাকে। সাধারণ লোকের মধ্যে এই দুই নাম বিলক্ষণ প্রচলিত। যাহা হউক, বর্তমান প্রবন্ধে আমরা গুরু নানকের জন্মগ্রাম লইয়া বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করি না। সমস্ত পঞ্চনদ ভূমি যাহার পদরেণুতে পুত হইয়াছে, সেই মহাত্মার জন্মগ্রাম যে স্থানেই হউক না কেন, তিনি সমগ্র পঞ্চনদেরই তুল্য গৌরবের ধন। মহাজীবনের বাস্তবস্থার অনেক ঘটনা অলৌকিক, অসামান্য ও অনৈসর্গিক ব্যাপারের সহিত বিজড়িত। বুদ্ধদেব ও চৈতন্যদেবের জীবনেও এমন অনেক লোকাতীত ব্যাপারের বর্ণনা পাওয়া যায়। মিঃ ম্যাকালিফ গুরু নানকের জীবনের অনেক অলৌকিক-বিজড়িত ঘটনা গ্রন্থে বর্ণিত করিয়াছেন। বাল্যকালেই নানক অসাধারণ প্রজ্ঞাশালী করিয়াছিলেন। আমরা এখানে তাঁহার সেই অমাসুখী প্রজ্ঞার কথা আলোচনা করিব না। তবে তাঁহার জীবন কথায় যে অলৌকিকতা আছে, তাহার দুই একটি পাঠককে উপহার দিব। নানক বাল্যকালে একদা নিদায়ে এক বৃক্ষচ্ছায়ায় নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ক্রমে দিনমণি পশ্চিমাকাশে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, বৃক্ষচ্ছায়া সকল পূর্বদিকে ছেলিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু যে বৃক্ষচ্ছায়ায় মহাত্মা নানক নিদ্রিত ছিলেন, সে বৃক্ষের ছায়া নিশ্চলভাবে থাকিয়া তাঁহাকে প্রথর দিবাফল-ফল হইতে রক্ষা করিতে লাগিল। আর একদিন নানক একস্থানে অকস্মাৎ নিজামগ হইয়া পড়িয়াছিলেন। ক্রমে রৌদ্র অত্যন্ত তীব্র হইয়া উঠে। পাছে নিদ্রিত মহাত্মার নিজাভঙ্গ হয়, এই জন্তই এক ফণী ফণা ধরিয়া রৌদ্র হইতে তাঁহার মস্তক রক্ষা করিতে লাগিল। নয় বৎসর বয়ঃক্রম কালে এক ব্রাহ্মণ নানককে উপনীত করিতে আসিয়াছিলেন। নানক তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, “ভগবানের নামোচ্চারণই যজ্ঞোপবীত, আমি অথ উপবীত লইতে চাহি না”। নানক সৰ্ব্বদা এইরূপ নানা কথা মিষ্টার ম্যাকালিফ তাঁহার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

ধর্মমত।

সপ্তদশ শতাব্দীতে গুরু নানক পঞ্চনদ প্রদেশে একেশ্বরবাদ প্রচার করেন। তিনি বেদ, পুরাণ বা কোরাণের প্রামাণিকতা স্বীকার করিতেন

না। তিনি বলিতেন, হিন্দু ও মুসলমানে কোনও পার্থক্যই নাই ; ভগবানের উপাসনা করিতে সকলেরই সমান অধিকার আছে। তিনি জাতিভেদ, প্রতিমাপূজা, তীর্থযাত্রা, সহমরণ, এবং অবরোধ-প্রথার ঘোর বিরোধী ছিলেন। হিন্দু দেবদেবীর উপর তাঁহার কিছুমাত্র বিশ্বাস ছিল না। তিনি ব্রাহ্মণের প্রাধান্য স্বীকার করিতেন না। মাংসাহার তাঁহার অমুজ্জাত। কিন্তু তিনি কর্মফলে ঘোর বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বলিতেন যে, পূর্ণাঙ্গের কৃতকর্মের ফলে জীব ইহজন্মে সুখ ও দুঃখ ভোগ করে। তিনি সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। তাঁহার বেশভূষা কতকটা হিন্দুর ও কতকটা মুসলমানের বেশভূষার মধ্য ছিল। তিনি মস্তকে মুসলমানদিগের মত টুপি পরিধান করিতেন এবং তাহার উপর অস্থির মালা জড়াইয়া রাখিতেন ; আবার হিন্দুর মত কপালে হিন্দুরের ফোঁটা কাটিতেন। তাঁহার ঐকান্তিকতা, সরলতা, নিরপেক্ষতা, সত্যপ্রিয়তা, সাধুতা ও ভক্তিপ্রবণতায় সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। তাঁহার নিকট রাজার ও ভিখারীর সমান সম্মান ছিল। শুনা যায়, বাবর সৈখান্দীপুর নামক একটি নগর ধ্বংস করিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি নানকের পুতচরিত্রকথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, “এ নগরে এমন এক জন ধার্মিক লোক আছেন জানিতে পারিলে আমি কখনই তাহা ধ্বংস করিতাম না।”

অভিব্যক্তি ।

পঞ্চমদ প্রদেশে কি প্রকারে এই অভিনব ধর্মমতের অভিব্যক্তি হইল তাহার আলোচনা করা আবশ্যিক। অকস্মাৎ কোথাও কোনও মতেরই বিকাশ হয় না। অল্পে অল্পে আভ্যন্তরীণ ও পরিপার্শ্বিক কারণে সর্বত্রই লোকমতের বিকাশ হইয়া থাকে। যে মনসী মহাত্মার মনে সেই লোকমত সর্বত্রই প্রতিবিম্বিত হয়। সমুদ্রত গিরিশৃঙ্গে ভাস্কর-কিরণের মত যাহার মানস পটে প্রথমেই লোকমতের আলোকরশ্মি প্রতিফলিত হয়—অর্থাৎ যিনি নানাকারণসমুদ্ভূত লোকমতের অগ্রদূতরূপে জনসমাজে আবির্ভূত হইয়া থাকেন,—সেই সমুদ্রতমনা মহাজনই ভগবানের অবতার বলিয়া সম্মানিত ও সম্পূজিত হইয়া থাকেন। নানক শিখ ধর্মের প্রবর্তয়িতা। তাঁহারই সমুদ্রত মানস-পটে প্রথমে শিখ ধর্মের আলোকরশ্মি

প্রতিফলিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার আবির্ভাবের পূর্বে পঞ্চনদ প্রদেশের জনসমাজের মধ্যে এই মত বিক্ষিপ্ত ও খণ্ডিত ভাবে ক্রমশঃ প্রকাশ পাইতেছিল। তিনি সেই বিক্ষিপ্ত, খণ্ডিত মতকে সংগৃহীত, পূর্ণ, ও পদ্ধতিবদ্ধ করিয়া তাহাকে একটি অখণ্ড, পূর্ণ, ও শৃঙ্খলাযুক্ত ধর্মমতে পরিণত করিয়া জনসমাজে প্রচারিত করিয়াছিলেন। তাঁহার আবির্ভাবের পূর্বে এই ধর্মমত অসম্পূর্ণ ও ছিন্ন ভিন্ন ভাবে পঞ্চনদের জনসমাজে কিরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

পঞ্চনদ প্রদেশই ভারতীয় ধর্মমতের আদি স্থান। এই স্থানই অতি প্রাচীন কালে ব্রহ্মাবর্ত ও কুরুবর্ষ নামে অভিহিত ছিল। এই স্থানেই প্রথমে আর্য্যগণের বেদগানে ও যজুধুমে আকাশমণ্ডল প্রতিধ্বনিত ও পূত হইয়াছিল। বৈদান্তিক ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম এই স্থানে আবির্ভূত না হইলেও এই স্থানে অনেক দিন স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছিল। বৈদান্তিক ধর্ম বৈদিক ধর্মেরই অঙ্গীভূত। বেদান্ত বেদের উপনিষদ ভাগের দার্শনিক বিচারমাত্র। সুতরাং পঞ্চনদ প্রদেশ বৈদান্তিক ধর্মের ক্ষেত্র ইহা অকুণ্ঠ কণ্ঠে বলা যাইতে পারে। বৌদ্ধ ধর্ম কোটকদেশে প্রথমে আবির্ভূত হইলেও ভারতের অজ্ঞাত স্থান অপেক্ষা পঞ্চনদ প্রদেশেই বহুদিন স্থায়ী হইয়াছিল। বর্তমান সময় পর্য্যন্ত পঞ্চনদ প্রদেশে বহুসংখ্যক বৌদ্ধ-স্তূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাতেই বুঝা যায় যে, এক সময় তথায় বৌদ্ধধর্ম বিশেষরূপে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার পর খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে যখন শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ভারতে বর্ণাশ্রম ধর্মের বিজয়পতাকা উড্ডীন করেন, তখন তাঁহার তরঙ্গের কলোলা ও জয়নিবাদের কোলাহল সূত্র পঞ্চনদ প্রদেশ পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল। তাহার কিছুদিন পরেই সেই বেগবান তরঙ্গ পঞ্চনদতটে প্রবল বেগে অভিঘাত করিতে থাকে। সেই তরঙ্গাভিঘাতে পঞ্চনদের বৌদ্ধধর্ম শিথিলমূল হইয়া পরে প্রায় বিলুপ্ত হইয়া যায়। এই সময় ১০০১ অব্দে গজনীর মামুদ আফগান রাজ্যের মধ্য দিয়া পঞ্চনদ প্রদেশে উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি কিছুদিন ত্রিংশতবর্ষকাল পঞ্চনদ প্রদেশকে উৎপীড়িত ও পয়ুদস্ত করিয়া পরিশেষে লাহোরে একজন শাসনকর্তা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে পঞ্চনদভূমি মুসলমান রাজ্যে পরিণত হয়। এই সময় ও ইহার অব্যবহিত পরে যে সমস্ত মুসলমান পঞ্চনদ প্রদেশে আসিয়া বাস করেন তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই পারসিক

জাতীয় ছিলেন। তাঁহারা মুসলমান ধর্মাবলম্বী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের ধর্মমতের সহিত সুফি ধর্ম ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত ছিল। এই সুফি ধর্মের সহিত বৈদান্তিক ধর্মের অনেকটা মৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। জেতা মুসলমানদিগের নিকট হইতে পঞ্চনদ প্রদেশবাসীরা অজ্ঞাতে এই সুফি ধর্মমত-বিজড়িত মুসলমান ধর্মের মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। ফলে বৈদান্তিক দিগের মায়াবাদ, বৌদ্ধদিগের নিক্কায়বাদ ও সাম্যবাদ বা তুল্যাদিকারবাদ, হিন্দুদিগের কৰ্মফলবাদ, শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদ, মুসলমানদিগের একেশ্বরবাদ, সুফি ধর্মের অজ্ঞেয়তাবাদ ও প্রহেলিকাবাদ একে একে পঞ্চনদ প্রদেশবাসী হিন্দুদিগের মনে গভীর চিহ্ন অঙ্কিত করিয়াছিল। ইহার পর পঞ্চনদ প্রদেশে যে সমস্ত লোকমত আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহাতেই ঐ সকল মতের অল্পবিস্তর ছায়াপাত দৃষ্ট হয়। ইহা ভিন্ন রামানুজের ও রামানন্দের ধর্মমতও পরে পঞ্চনদ প্রদেশে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। তাঁহাদের ধর্মমতেও পূর্বগামী ধর্মমতের কিঞ্চিৎ ছায়াপাত দৃষ্ট হয়। পঞ্চনদ অঞ্চলের ভাগত গোরক্ষনাথের ও কবীরের প্রতিষ্ঠিত মতে ঐ সকল ধর্মমতের গাঢ় ছায়া পড়িয়াছিল। কবীর রামের উপাসক ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি মূর্তি-পূজার প্রতিকূল ও মানস পূজার অশুকুল মত প্রচারিত করিয়াছিলেন। বৌদ্ধদিগের নিক্কায়বাদ ও সাম্যবাদ তাঁহার প্রচারিত ধর্মমতে স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছিল। বর্ণাশ্রমীরা যেরূপ জাতি ও গুণভেদে অধিকারভেদ নির্দিষ্ট করেন, কবীর তাহা করেন নাই; তাঁহার মতে ঈশ্বরোপাসনায় জাতিভেদ বা অধিকারভেদ নাই। ইনি বেদাদি গ্রন্থের আশ্রয়চরিত্র স্বীকার করিতেন না। কোরাণকেও ইনি প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিতেন না। হিন্দু ও মুসলমান সকলেই ইহার দৃষ্টিতে সমান ছিল; ইনি সকলকেই সমানভাবে উপদেশ দিতেন। ইনি ও ইহার পূর্ববর্তী ভাগতগণ বিক্ষিপ্ত ও খণ্ডিত ভাবে যে মত প্রচারিত করিয়াছিলেন, গুরু নানক তাহাই একত্রিত, প্রস্তুত, মার্জিত ও পূর্ণাঙ্গ করিয়া,—যাহার অভাব ছিল তাহার গঠন করিয়া,—যাহা অপরিষ্কৃত ছিল তাহা পরিষ্কৃত করিয়া, যাহা আপাততঃ দৃষ্টিতে পরস্পরের বিরোধী বলিয়া মনে হইত তাহার সামঞ্জস্য করিয়া এই অভিনব শিখধর্ম প্রবর্তিত করেন। ইহাতেই তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা ও অমানুষিক কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে।

ঈশ্বর সর্বদে, সর্বক্ষেত্রে বিরাজমান রহিয়াছেন, মানুষের আত্মা

জগদীশ্বরেরই অংশমাত্র, মানুষ যখন বুঝিতে পারে যে, আমিই সেই জগদীশ্বর (সোহহং) তখনই সে নিকাগ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ইহাই শিখধর্মের মূলমন্ত্র। মায়াকর্তৃক উপহৃত হইলে জীবের পাপসঞ্চার হয়, আত্মজ্ঞান লাভ করিলে মায়ার বন্ধন কাটিয়া যায়, ইহাই শিখধর্মের প্রধান উপদেশ। এই ধর্ম-মতে হিন্দু, মুসলমান, বৈষ্ণব, বৌদ্ধে ভেদ নাই; সকলেই সমান। স্মৃতরাং শিখ ধর্ম লোকমত ও লোকমর্যাদার পোষক। ভগবানের নাম জপ করিলে মানুষ মায়ার বন্ধন কাটাইতে পারে ও আত্মজ্ঞানলাভের পথে অগ্রসর হয়, সেই জন্ত সর্বদা ভগবানের নাম জপ করা আবশ্যিক। হিন্দুই হউন, আর মুসলমানই হউন, দীনদুঃখীই হউন, আর রাজামহারাজই হউন, সকলেই পরমাত্মার অংশ, স্মৃতরাং সকলেই সমান। কেবল মায়ার বশে মানুষ ভ্রান্ত হইয়া ছোটবড়, উচ্চনীচ প্রভৃতির কল্পনা করিয়া থাকে। শিখধর্মের এই সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব বৌদ্ধ ধর্ম হইতে গৃহীত। গুরু নানক এই মতকে পরিপুষ্ট ও সর্বদা সুন্দর করিয়া তুলেন।

অন্যান্য গুরু।

১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে গুরু নানকের তিরোভাব হয়। মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার ভক্ত ভৃত্যকেই শিখদিগের গুরুজে নিয়োগ করিয়া যানেন। ইনি গুরু অঙ্গদ নামে খ্যাত। গুরু অঙ্গদের পর গুরু অমর দাস ও গুরু রামদাস। গুরু রামদাস মগন্দ নিয়োগপ্রথা প্রবর্তিত করেন। শিখধর্মের প্রচারও ভক্ত শিখদিগের নিকট হইতে অর্গসংগ্রহ করিয়া গুরুর নিকট প্রেরণ করাই ইহাদের কার্য নির্দিষ্ট হয়। শেষে মগন্দগণ অভ্যস্ত অসামু হইয়া উঠেন, সেই জন্ত পরে শিখ-দিগের দশম গুরু গোবিন্দ সিংহ তাঁহাদিগকে বিভাঙিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। গুরু রামদাসই আকবরের নিকট হইতে ভূমি উপহার পাইয়াছিলেন এবং সেই ভূমির উপর বিখ্যাত অমৃতসর খনিত করিতে আরম্ভ করেন। ইহারই পুত্র ও উত্তরাধিকারী গুরু অর্জুন এই সরোবর-খননকার্য শেষ করেন। গুরু অর্জুনই শিখ-গুরুগণের উক্তি ও “ভাগত” গণের উক্তি সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করিয়া উহা ‘আদিগ্রন্থ’ নামে প্রকাশিত করেন। এই ‘আদি গ্রন্থই’ শিখগণের ধর্মগ্রন্থ। শিখগণ এই গ্রন্থকে গুরুর তায় ভক্তি ও পূজা করিয়া থাকেন। ইহাতে সাত জন গুরুরপ্রণীত গাথা লিপিবদ্ধ আছে। বলা বাহুল্য, গুরু অর্জুনের পরবর্তী গুরুগণের উক্তিও এই গ্রন্থে পরে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

অর্জুনের পর পাঁচ জন গুরু শিখদিগের ধর্মকার্যে নেতৃত্ব করিয়া যানেন।

পরিবর্তন ।

ষষ্ঠ হইতে নবম গুরুব সময়ে মুসলমানদিগের সহিত শিখদিগের যোঁর বিরোধ বাধিয়া উঠে । ষষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দ মশজরক্ষিপরিবেষ্টিত হইয়া থাকিতেন । যাহা হউক, মুসলমানদিগের সহিত সংঘর্ষে ও মুসলমানদিগের উৎপীড়নে শিখজাতির সাক্ষর্য্যজনীন ভ্রাতৃত্বাব একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে । নবম গুরু টেগ বাহাদুরই আরম্ভজীবের সময়ে ভারতে যুরোপীয়গণের অধিকার-কথা ভবিষ্যৎবাণী করিয়া যায়েন । এই টেগ বাহাদুরের পুত্র গুরু গোবিন্দ সিংহ শিখজাতির ইতিহাসে নূতন যুগের প্রবর্তনা করিয়া গিয়াছেন । ইনি শিখদিগকে সামরিক জাতিতে পরিণত করিয়া যায়েন । ইনি শিখদিগের মধ্য হইতে খালসা (বিশুদ্ধ) নাম দিয়া একদল সেনা গঠিত করেন । ইহার পূর্বে শিখধর্ম্মগ্রহণকালে সকলকে শিখগুরুর পাদোদক পান করিতে হইত ; গুরু গোবিন্দ সিংহ এ ব্যবস্থা পরিবর্তিত করিয়া তাহার স্থানে “পছল” প্রথা প্রবর্তিত করেন । সে প্রথা এইরূপ ; গুরু তাঁহার পাঁচজন ভক্ত ও বিশ্বস্ত অমুচরকে পাশাপাশি উপবেশন করান । তাহার পর কিয়ৎপরিমাণে শোধিত চিনি বা গুড় এক পাত্রস্থ জলে নিষ্ক্ষেপ করা হয় । ঐ জল একখানি তরবারি দ্বারা আলোড়িত করিয়া ভগবানের নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক উতার কিঞ্চিৎ পান করা হয় এবং কিঞ্চিৎ মস্তকে ও গাত্রে ছিটাইয়া দেওয়া হয় । এই মস্তপূত জল পান করিলেই শিখধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণ হয় । ইনি শিখদিগকে ককরাদি পাঁচটি জব্য সর্ব্বদা সঙ্গে রাখিতে বলিয়া যায়েন । সেই পাঁচটি ককরাদি পদার্থ ;—(১) কেশ ; শিখগণ দীর্ঘ কেশ রাখিয়া থাকেন । (২) কুজা বা কঁকুই ; চিরুণী, শিখগণ মস্তকে চিরুণী রাখিয়া থাকেন ; (৩) রুপাণ ; (৪) কাছ ; এবং (৫) কড়া বা লোহবলয় । অঙ্গশিক্ষাই শিখদিগের গুরু-উপদিষ্ট ধর্ম্ম । যে সকল শিখ গুরুগোবিন্দের মতে এই সকল অমুষ্ঠান করেন, তাঁহারা সিংহ নামে অভিহিত । ইহাদের আর একটি নাম “খালসা” । যাহারা গুরুগোবিন্দের সমস্ত আদেশ পালন পূর্ব্বক সামরিক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন না, সেই সকল শিখ সহিষ্ণুদারী নামে অভিহিত ।

গুরুগোবিন্দ সিংহ ‘দশওয়েন পাদশাহী’ নামক আর এক খানি শিখ-ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন করেন । গুরুগোবিন্দ মৃত্যুকালে বলিয়া যায়েন যে, আর

কোনও ব্যক্তি শিখগণের গুরুরূপে বৃত্ত হইবেন না । ‘আদিগ্রন্থ’ ও ‘দশওয়েন পাদশাহী’ গ্রন্থই শিখদিগের গুরুস্থানীয় হইবে । তদবধি শিখগণ ‘আদি-গ্রন্থ’কে গুরুরূপে সন্মান করেন ।

সহিষ্ণুদাতী শিখগণ প্রধানতঃ কৃষিজীবী । ইহাঙ্গা ইদানীং কয়েকটি বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন । তামাক, ভাঙ্গ, মদ্য প্রভৃতি মাদক জব্যের সেবা শিখধর্মের নিষিদ্ধ । ইহাদের জাতকর্ম, বিবাহ ও অস্ত্রোষ্টি ক্রিয়াদির সময় ‘আদিগ্রন্থ’ ও ‘দশওয়েন পাদশাহী’ হইতে শ্লোক, বচন ও উক্তি পাঠিত হয় । ইহা ভিন্ন ইহাদের অস্ত্র মঙ্গল নাই । মস্তক অনাবৃত রাখা ইহাদের মতে পাপজনক । ইহাদের চিত্তাভঙ্গ্য অমৃতসর বা তৎসম্মিহিত যে কোন স্থানে প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকে । রাজভক্তি ইহাদের ধর্মের দৃঢ় অনুশাসন ।

ইদানীং শিখগণ হিন্দুধর্মের দিকে আকৃষ্ট হইতেছেন । এখন অনেকেই শিখধর্মকে হিন্দুধর্মের অঙ্গ বলিয়া বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন ।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় ।

নববর্ষ ।

—১৩৮—

এস এস, নূতন বর্ষ ।

স্নিগ্ধ, শান্ত, অনাবিল, বহে মন্দ উষানিল,

পুষ্পবনে জাগায়ে হরষ ;

অঙ্ককার যবনিকা অস্তহিত, চিত্তে লিখা—

পূর্বাকাশে কনক তপন ;

নূতন আলোকে পাখী, কলকণ্ঠে ‘উঠি’ ডাকি’,

করিছে তোমার আবাহন ।

এস এস নূতন বরষ ।

নবীন মুকুল রাঞ্জি, হের ফুটিয়াছে আঁখি,
জন্মি' তব তরুণ পরশ ।

ব্যথিত-তাপিত যা'র, আঁখি ঝরে অনিবার,
তা'রে তুমি দিবে কি মাল্যনা ।

ব্যর্থ যা'র মর্জমাধ, অদৃষ্টের মনে বাদ,
তুমি তা'র পূরা'বে কামনা ?

এস এস, হে বর্ষ নূতন ।

অতীত কালিমা মুছি, দাও আজি দিব্য শুচি —
অকলঙ্ক নূতন জীবন ।

বিফল সাধনা যত, 'বুক ভাঙ্গা ব্যথা কত —
কাদিব না সে সকল স্মরি' ;

আজি হ'তে প্রতি দিন, চলিব বিরামহীন,
অনন্ত কর্তব্য পথ ধরি' ।

এস এস, হে বর্ষ নূতন ।

কোন্ সে অজ্ঞাত দেশে, ছিলে তুমি কোন্ বেষে,
কোন্ ভাবে হেথা আগমন ?—

নাইবা জানিলু কভু ; হে নব আতিথি, তব
করি তোমা সাদরে বন্দন ।

যাহা দিবে—সুখ হ'ক, কিছা শুধু দুঃখ, শোক,
নতশিরে করিব গ্রহণ ।

শ্রীরমণীমোহন খোষ ।

বাজী রাও ও মস্তানী।

(বাজী রাওয়ের কলঙ্কমোচন ।)

১৭২৯ খৃষ্টাব্দে মহারাজ-রাজমন্ত্রী মহাবীর বাজী রাও, দিল্লীখবরের প্রতিনিধি মহম্মদ খান বঙ্গের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া বুন্দেলখণ্ডের বিপন্ন বৃদ্ধ রাজা ছত্রসালকে স্বরাজ্যোদ্ধার-কার্যে সহায়তা করেন। বৃদ্ধ রাজা মোগলের কবল হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া বাজী রাওকে নানা ধনরত্ন দানে পুরস্কৃত ও পরিভূষ্ট করিতে যত্নবীল হইলেন। সেই সময় তিনি মস্তানী নামী একটি সুন্দরী যুবতীকেও বাজী রাওয়ের করে সমর্পন করিয়াছিলেন। এই যুবতী ছত্রসালের মস্তানী নামী কোন মুসলমান রক্ষিতার গর্ভজাত কন্যা। বাজী রাওয়ের রূপ ও গুণের প্রতি কন্যার পক্ষপাত দেখিয়াই হউক, অথবা তাঁহাকেই উপযুক্ত পাত্র ভাবিয়া হউক, ছত্রসাল এই কন্যাকে বাজী রাওয়ের হস্তে সমর্পন করেন। বুন্দেলখণ্ডের তওয়ারিখ নামক উর্দু ইতিহাস গ্রন্থে লিখিত আছে, জিতেন্দ্রিয় বাজী রাও বৃদ্ধ রাজার অনুরোধ লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া অনিচ্ছা-সত্ত্বেও মস্তানীকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে তিনি এই নৃত্য-গীত-বাঁজ-কুশলা যুবতীর গুণে একপক্ষ মুগ্ধ হইলেন যে, তৎক্ষণাৎ রাজকার্যেও তাঁহার ব্যাঘাত ঘটতে লাগিল। তিনি এক মুহূর্তের মতও তাঁহাকে দৃষ্টির অন্তরালে রাখিতে পারিতেন না। তখন তাঁহার পুত্র বালাজী বাজী রাও ও ভ্রাতা চিমাজী আগ্রা কোশলে মস্তানীকে বন্দী করিয়া বাজী রাওয়ের নিকট হইতে দূরে রাখিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু মস্তানী পলায়ন-পূর্বক বাজী রাওয়ের সহিত পুনরায় মিলিত হয়। কথিত আছে, এই সকল ঘটনায় মহারাজ শাহ অতীব অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার ভয় প্রদর্শন করায় ও তাঁহার ভ্রাতা চিমাজী সন্ন্যাস-গ্রহণপূর্বক সংসার পরিত্যাগ করিতে উদ্বৃত্ত হওয়ায় বাজীরাওয়ের কিঞ্চিৎ চৈতন্যোদয় হইয়াছিল।

এই ঘটনার বর্ণনা এসঙ্গে মিষ্টার কিংকেড বিগত ১৯০৯ সালের আগষ্ট মাসের 'হিন্দুস্থান রিভিউ' পত্র An Indian Pampaduor—Mastani ইতি শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়া যোঁর অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন ও বাজী রাওয়ের চরিত্রে অতি গুরুতর মিথ্যা কলঙ্কের আরোপ করিয়াছেন।

এই প্রবন্ধে তিনি প্রথমতঃ মস্তানীকে ক্রাঙ্গ দেশের পাঙ্গাছরের সহিত তুলিত করিয়াছেন ; দ্বিতীয়তঃ বাজী রাওয়ের পুত্র বালাজী বাজী রাওয়ের প্রতি তাহার অবৈধ প্রণয়ের সন্দেহ করিয়া তাহার চরিত্রে দোষারোপ করিয়াছেন ; তৃতীয়তঃ মস্তানীর সাহচর্য্যে বাজী রাও সুরাপান করিতে শিখিয়াছিলেন বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ; এবং চতুর্থতঃ অনুমান করিয়াছেন যে, অতিরিক্ত পানদোষই বাজী রাওয়ের অকাল মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল । (১) শেষোক্ত অনুমান যে নিরবচ্ছিন্ন কল্পনা-প্রসূত, তাহা বলাই বাহুল্য । তাহার প্রথম সিদ্ধান্তটিও ভিত্তিহীন । কারণ, ক্রাঙ্গের মাদাম পাঙ্গাছর যেমন প্রকাণ্ড পণ্য বীথিকার রূপজীবিনী ছিল, মস্তানী কখনই সেরূপ ছিল না । সে রূপজীবিনীর কল্পা ছিল কিন্তু তাহার জননী রাজা ছত্র-মালের অন্তঃপুরে প্রবেশ-লাভ করায় মস্তানীর পক্ষে জননীর ঘনিষ্ঠ বৃত্তি অবলম্বনের সুযোগ বা প্রয়োজন কখনও উপস্থিত হয় নাই । তাহার “অপা-দোষ” থাকিলেও সে কখনও দিচারিণী ছিল না, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে । সে বালাজীবাজী রাওয়ের জননীর সপত্নী ছিল ও সকলের নিষেধ অবজ্ঞা করিয়া মধ্য মধ্য সুরাপান করিত বলিয়া তরুণ-বয়স্ক বালাজী বাজী রাও তাহার প্রতি বিদ্রোহ প্রকাশ করিতেন । পরে তাহার গুরুজনেরা মস্তানীকে বন্দী করিয়া বাজী রাওয়ের নিকট হইতে দূরে রাখিবার যত্ন করিতেছেন দেখিয়া ও বিদ্রোহের পরিণাম হিতকর হইবে না ভাবিয়া বালাজী-বাজী রাও মস্তানীর প্রতি কপট স্বভাব প্রকাশ করিতে থাকেন । হুই একখানি প্রাচীন পত্রে এই ঘটনার উল্লেখ দেখিয়া মিষ্টার কিংকেড বালাজী বাজী রাওয়ের সহিত মস্তানীর অবৈধ প্রণয়ের উল্লাসান বৃচনা করিয়াছেন । অনভিজ্ঞ লেখকের হস্তে পড়িয়া এ দেশের ইতিহাসের কতদূর বিকৃতি ঘটিতে পারে, মিষ্টার কিংকেডের বর্তমান প্রবন্ধটি, তাহার একটি উজ্জলদৃষ্টান্ত । তিনি লিখিয়াছেন,—

In her company—as his Chitpawan (কৌকণস্থ) fellow castemen

(১) মিষ্টার কিংকেড লিখিয়াছেন,—গোদাবরী-তীরবর্তী রাওয়ের নামক আমে বাজী রাও প্রাণত্যাগ করেন । কিন্তু রাওয়ের আম যে গোদাবরী-তীরে নহে—মর্শদা নদীর তীরে অবস্থিত, ইহা বোম্বাই গেজেটিয়ারের অন্তর্গত খামদেশের বিবরণে (পৃঃ ৪৬৮) দৃষ্টিপাত করিলে তিনি বুঝিতে পারিতেন । বাজী রাওয়ের মৃত্যু যে মর্শদাতীরে হইয়াছিল, এ কথা এত উক্ত লিখিয়াছেন ।

will, I know, hear with concern—he learnt to regard with favour and to drink with gusto the heady wines of Delhi. * * * And the following extract from a letter (the originals of these letters will be found in the March number of the *Etihav Sangraha*) written by his son Nana Sahib, better known as Balaji II, shows that the fascinations of liquor if not of love had become altogether too much for his distinguished father.

অর্থাৎ “মস্তানীর সহবাসে থাকিয়া বাজীরাজ দিল্লীর তীব্র সুরা অতীব প্রীতি সহকারে পান করিতে শিখিয়াছিলেন, ইহা শুনিয়া কৌকনস্থ ব্রাহ্মণ-গণ দুঃখিত হইবেন। বাজী রাওয়ের পুত্র নানাসাহেবের বা দ্বিতীয় বালাজীর লিখিত পশ্চাত্ত্বিত পত্রাংশ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, বাজী-রাজ একান্ত সুরাসক্ত হইয়া উঠিলেন।” মিষ্টার কিংকেড এস্থলে শুদ্ধ কৌকনস্থ ব্রাহ্মণগণেরই দুঃখিত হইবার কথা লিপিবদ্ধ করায় বুঝা যাইতেছে যে তাঁহার মতে বাজী রাওয়ের প্রতি হিন্দু মাত্রেই সাহানুভূতি থাকা দূরের কথা, মহারাষ্ট্র দেশের কৌকনস্থ তিন্ন অপর কোনও শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরই সাহানুভূতি ছিল না।

পূর্বোক্ত ভূমিকার পর মিষ্টার কিংকেড যে পত্রাংশের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, সেই পত্র ও তদ্বিষয়ক অপর তিনখানি পত্র ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসের ‘ইতিহাস সংগ্রহ’ নামক মারাঠী মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক ত্রিযুক্ত দত্তাজেয়-বলবন্ত পরমশ্রীম মহাশয় ঐ মাসিক পত্রের সম্পাদন করিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয়, তিনিও ঐ পত্রগুলির স্মরণ-গ্রহণ করিতে গিয়া কয়েক স্থলে বিষয় ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। মহারাষ্ট্র দেশের অন্যান্য ঐতিহাসিক লেখকেরা সেই সকল ভ্রম বিশদ প্রমাণ-প্রয়োগ সহকারে প্রদর্শন করিয়াছেন। ঐ পত্রগুলির সম্বন্ধে মহারাষ্ট্রীয় লেখকগণের মধ্যে বাদানুবাদ আরম্ভ হইবার পর মিষ্টার কিংকেড ‘হিন্দুস্থান রিভিউ’ পত্রে সমালোচ্য প্রবন্ধটি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি যদি ঐ পত্র-বিষয়ক আলোচনা-পাঠের ক্রেশ স্রীকার করিতেন, তাহা হইলে বাজী রাওয়ের বিরুদ্ধে সুরাপানের কলঙ্কারোপ করিতে কখনই তাঁহার সাহস হইত না বলিয়া আশা দিগের বিশ্বাস। কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি অতীব ব্যগ্রতা-সহকারে বাজী রাওয়ের কলঙ্ক-খোঁষণায় অগ্রসর হইলেন। এই প্রসঙ্গে মূল মারাঠী পত্র সমূহের অনুবাদে তিনি যেরূপ শোচনীয় ভ্রম-সংঘটন করিয়াছেন, তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।

তিনি প্রবন্ধেব মুখবন্ধে যে পত্রাংশের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার তৎকৃত অনুবাদ এই ;—

I spoke to *my mother* Saubhagya Bai (Bajirao's wife Kashi Bai) about it (Bajirao's conduct) He then took an oath in the most determined manner that he would never touch (liquor) again But every two or three days he has had one or two drinking bouts. Then I said to him, "what is the value of such an oath ?" And I sent by Subhanay Jeti, a most emphatic message that I should not visit him again. At this he was very much ashamed... Last night I sent for Krishnabhat and told him that when we (i e, Bajirao and herself) had gone to the Bhima for the eclipse. Nana and Mastani become very intimate To-night at the second watch she came to Nana's house. And she repeated this to him several times And people have begun to talk freely that Nana and Mastani are great friends I will write this to Swami (Bajirao),

অনুবাদের ভ্রমাত্মক অংশগুলি বক্রাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, এই কয়েক পংক্তির অনুবাদে লেখক কতকগুলি ভ্রম ঘটাইয়াছেন। কোন বিজ্ঞান্যের ছাত্র ঐরূপ কয়েক পংক্তির অনুবাদে এরূপ বহুসংখ্যক ভ্রম-সম্পাদন করিলে, শিক্ষকের হস্তে তাহার কিরূপ লাঞ্ছনা ঘটে, অভিজ্ঞ ব্যক্তি-মাত্রেই তাহা অবগত আছেন। সে যাহা হউক, তিনি এই পত্রকে বাজী রাওয়ের পুত্র নানা সাহেবের লিখিত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে পত্রখানি কে কাহাকে লিখিতেছে, মূল পত্রে তাহার কোনও উল্লেখ নাই। যে পত্রের অনুবাদে তিনি *my mother* (আমার জননী) লিখিয়াছেন, সেই পত্রের প্রকৃত অর্থ "মাতৃস্বরূপা"। (*My* পদটির প্রতিশব্দ মূল নাই।) এক্ষণে পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখুন, বালাজী বাজী রাও (নানা সাহেব) স্বীয় জননীকে পত্র লিখিবার সময় "জননী-স্বরূপা" পত্রের প্রয়োগ করিবেন, ইহা কি সম্ভবপর হইতে পারে? তত্ত্বিজ জনক জননীকে পত্র লিখিবার সময় মহারাষ্ট্র দেশে সাধারণতঃ যেরূপ "পাঠ" লিখিবাব প্রথা প্রচলিত আছে ও সেকালেও ছিল, সেরূপ পাঠও এই পত্রে নাই কেন? ধনশালী সম্রাট ব্যক্তিদিগের কর্ম-চারীরা প্রভুপত্নীদিগকে পত্র লিখিবার সময় যেরূপ "পাঠের" প্রয়োগ করিয়া থাকেন, এই পত্রের "পাঠ" সেইরূপ থাকায় বলিতে হয় যে, উহা বালাজী

বাজী রাওয়ের কর্মচারী “বাবু রাও গণেশ”র (যাহাকে মিষ্টার কিংকেড বালাজী-বাজী রাওয়ের confident agent অর্থাৎ বিশ্বস্ত প্রতিনিধি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, তাহার) দ্বারা নানা সাহেবকে লিখিত।

অনুবাদের প্রথম বাক্যের শেষে about it অর্থাৎ “এই বিষয়ে” এই দুইটি পদ লেখক কল্পনা-বলে সংযোজিত করিয়াছেন। কিন্তু মূল পত্রে ঐরূপ অর্থবোধক কোনও পদই দৃষ্ট হয় না। কায়েই বন্ধনীর মধ্যগত Haji Rao's conduct এই দুইটি কথাও অনুবাদ হইতে বাদ না দিলে অর্থের বিপর্যয় ঘটিবে। প্রকৃত পক্ষে about it এর পরিবর্তে (ঃ—) এইরূপ চিহ্ন প্রদান করিলে পত্রলেখকের মনোভাব অধিকতর পরিষ্কৃত হইত। কারণ, পরবর্তী কয়েক পংক্তিতে যে সকল কথা লিখিত হইয়াছে, তাহা পত্র-লেখক বাবু রাও গণেশ “তাই” বা বাজী রাওয়ের জী কানী বাদীকে বলিয়াছিলেন—ইহাই তিনি এই পত্রে বালাজী বাজী রাওকে জানাইতে-ছেন। কিন্তু লেখক কল্পনাবলে অনুবাদে about it এই দুইটি মূল-বহির্ভূত অতিরিক্ত পদের প্রয়োগ করিয়া সমগ্র পত্রের ভাব-বিপর্যয় ঘটাইয়াছেন। তাহার পর দ্বিতীয় বাক্যের প্রথমংশে He then এই দুইটি পদের প্রয়োগে অর্থের সম্পূর্ণ বৈপরিত্য সংঘটিত হইয়াছে। প্রথমতঃ then পদের অর্থ-দ্যোতক কোনও পদের অস্তিত্ব মূল পত্রে নাই। তাহার পর, দ্বিতীয় বাক্যের দুইটি he পদই she হইবে। সেইরূপ চতুর্থ ও পঞ্চম বাক্যের অন্তর্গত him ও he পদের পরিবর্তে her ও she পদের প্রয়োগ উচিত ছিল।

মারাঠী-ভাষায় জীলিঙ্গান্ত ক্রিয়া পদের কর্তৃস্থানীয় সর্বনাম পদ নিত্য জীলিঙ্গরূপে পরিগৃহীত হইয়া থাকে—মারাঠী ভাষায় এই অতি প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণিক সূত্রের প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করিয়া অথবা তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞতা-নিবন্ধন মিষ্টার কিংকেড বাজী রাওকে মদ্য-পানের ও অপথ-ভ্রমের কর্ত্তা বলিয়া স্থির করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে, মস্তানীই আর মদ্য পান করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল এবং মস্তানীই সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছিল। শুব রাও জেঠীর দ্বারা বাবু রাও গণেশ সেই কথা তাহাকে জানাইয়া বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, তিনি আর মস্তানীর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না। ইহাতে মস্তানী নিতান্ত অপদস্থ হইয়াছিল। সেই কথা বাবু রাও গণেশ কানী বাদীকে বলিয়াছেন—এই সকল কথাই তিনি এই পত্রযোগে বালাজী

বাকী রাওকে জ্ঞাপন করিতেছেন। আলোচ্য পত্রের ইহাই প্রকৃত অর্থ। কিন্তু মিষ্টার কিংকেডের কথায় বাকী রাও খোর সুরাসক্তরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছেন। মূল পত্রের যে বাক্যের অন্তর্বাদে মিষ্টার কিংকেড লিখিয়াছেন—At this he was very much ashamed তাহার প্রকৃত অন্তর্বাদ এইরূপ হওয়া উচিত :—At this she felt very much disgraced। বাকী রাওকে সুরাপায়ী স্থির করিয়াই লেখক নিশ্চিত হইয়াছেন—সেই সুরা যে দিল্লীর বাজার হইতে আনিও হইত, তাহাও তিনি কল্পনা-বলে স্থির করিয়াছেন।

পত্রের এই প্রথম অংশের ছায় দ্বিতীয় অংশেও অন্তর্বাদে লেখক অসংখ্য ভ্রমে পতিত হইয়াছে। নিম্নে ঐ অংশের প্রকৃত অন্তর্বাদ প্রকাশিত হইল :—

গত কল্যা রজনীযোগে তাই কল্যা ভট্টকে ডাকাইয়া বলিলেন, “আমি যখন এহণোপ-লক্ষে ভীমা নীচে গানের অর্থ গমন করিয়াছিলাম, তখন হইতে নানা ও মস্তানীর মধ্যে গুহ গড়াব জন্মিয়াছে। অতঃপাশি দ্বিপ্রহর-কালে সে নানার জীর নিকট আগিয়াছিল। এই কথা সব তিনি নিস্তারিতরূপে তাহাকে (কল্যা ভট্টকে) বলিলেন। লোকের বলিতেছে যে, নানার ও মস্তানীর মধ্যে গড়াব স্থাপিত হইয়াছে। তাই (কল্যা বাই) এই সকল কথা শুধুকে জানাইবেন।”

এই পত্রের শেষ দুই পংক্তির অন্তর্বাদ মিষ্টার কিংকেড প্রদান করেন নাই। সে অংশের অন্তর্বাদ এইরূপ—

“এই কারণে লিখিলাম। পত্রের মেরূপ আদেশ হইলে, সেইরূপ করিব। মস্তানী এইখানে আছে, আমাকে আট দশ দিন পরে মহারাজ শাহর দরবারে গাইতে হইবে। সে সময়ে মস্তানী গৃহে কিরূপে সংযতভাবে থাকিবেন, তাহার অর্থ কিরূপ বন্দোবস্ত করিতে হইবে, তাহা লিখিয়া জানাইবেন।”

এই শেষোক্ত পংক্তিগণটি পাঠ করিলেই মস্তানীর সহিত নানার গড়াব যে কপটতামূলক ছিল, এবং কে কাহাকে এই পত্র লিখিয়াছিল, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। মিষ্টার কিংকেড বলেন যে, মস্তানীর চরিত্রে বাকী রাওয়ের সন্দেহ উদ্ভূত করিবার জন্যই নানা সাহেব তাহার সহিত এই কপট-সখ্য-স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার ফলে মস্তানী তাহার প্রতি আশঙ্ক হইয়া উঠিল। অন্ততঃ এই পত্রের শেষার্ধ্বে পাঠ করিয়া তাহার এইরূপ ধারণা হইয়াছে বলিয়া তিনি নির্দেশ করিয়াছেন। “দ্বিপ্রহর রজনীতে মস্তানী নানার বাড়ীতে গিয়াছিল”—এই বাক্যটির পাঠ করিয়াই বোধ হয়, লেখক

নানার সহিত মস্তানীর অঐবধ সম্বন্ধের কথা কল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই প্রসঙ্গে পত্র-লেখক যে ‘কল্যা’ ও ‘অদ্যা’ পদের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার অর্থের প্রতি মনোযোগ করিলে এবং সে সময়ে বালাজী বাজী রাও পুণায় ছিলেন না ও বাবু রাও গণেশ এই পত্র লিখিয়াছেন, এই কথা মনে রাখিলে তিনি কখনই ঐরূপ ভ্রমে পতিত হইতেন না। প্রকৃতপক্ষে, মস্তানী সে দিন রাত্রিকালে নানার (বালাজী বাজী রাওয়ের) দ্বীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সম্ভাব জানাইতে গিয়াছিল। আর এক কথা, মস্তানীর চরিত্রসম্বন্ধে বাজী রাওয়ের মনে সন্দেহ-সঞ্চার করাই যদি নানার উদ্দেশ্য থাকিত, তাহা হইলে তিনি স্বয়ং তাহার সহিত অঐবধ ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিয়া, সে উদ্দেশ্য সাধন করিতে অগ্রহসর হইবেন, ইহা কি সম্ভবপর? স্বয়ং সেই কলঙ্ককর ব্যাপারে বিজড়িত হওয়া কি তাঁহার পক্ষে নিরাপদ ছিল? তাঁহার সে সন্দেহ থাকিলে, তিনি স্বয়ং মস্তানীর সহিত অঐবধ ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি না করিয়াও, অন্য সহস্র উপায়ে তাহা সুসিদ্ধ করিতে পারিতেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু মিষ্টার কিংকেড এস্থলে প্রথমে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া লিখিয়াছেন যে, ফ্রান্সের Diane de Poitiers যেক্ষণ প্রথমে রাজা প্রথম ফ্রান্সিসের (Francis I) ও তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র দ্বিতীয় হেনরীর (Henry II) প্রণয়িনীরূপে তাঁহাদিগের উভয়েরই উপরে প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিল, এক্ষণে মস্তানীরও সেইরূপ করিবার উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ‘নানা’ তাহার এই চিত্তবিকারের পরিচয়ে ভীত হইয়া, তাহার সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ পরিত্যাগ করেন—ইহাই তাঁহার অঙ্গুমান। এই অঙ্গুমানের কারণ-নির্দেশ-স্থলে তিনি বাবু রাও গণেশের শ্রাবণ কুম্ভা দ্বাদশীর (১৯শে আগষ্ট ১৭৩৯ খ্রিঃ) পত্র হইতে একাংশের ইংরাজী অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়াছেন। সে অনুবাদ এইরূপ :—

On the morning of the Shravan Waidya 9th she (Mustani) sent for me and began to say, *‘very heedlessly I contracted a close friendship for Nana Swami (Nana Sahib) and this close friendship lasted for four or five months. Then it stopped altogether. But while it lasted, every one thought ill of me and I got a bad name with Apppa Sahib (Bajirao's brother Chimnaji). He (Nana) alone knows whether his intention was to win my love under the guise of friendship. But for the last three or four months he has not once written to me. Once or twice when I was in*

the camp I got a letter as broad as your two fingers. But for the last two months I have got nothing at all.' She was very sad and spoke to me in this way at great length.

এই অল্পবাদেও ভুলের ছড়াছড়ি হইয়াছে। মূলে যেখানে “অকপট-চিত্তে” আছে, লেখক সেখানে অল্পবাদে very heedlessly পদের প্রয়োগ করিয়াছেন। মূলে “মিত্রতার” (friendshipএর) কথা আছে—close friendshipএর কথা নাই। মিত্রতা অচল হওয়ায় সর্বত্র আমার “দুর্নাম হইল”—এই বাক্যাংশের অল্পবাদে তিনি লিখিয়াছেন, But while it lasted, every one thought ill of me। মূলে আছে—“আমার সহিত মিত্রতা (সদ্ভাব-স্থাপন) করিবার পর তিনি আমার প্রতি মমতা করিতেন কি না, তাহা তিনিই জানেন।” ইহার অল্পবাদ কেমন চমৎকার হইয়াছে, দেখুন;—He alone knows whether his intention was to win my love under the guise of friendship। কবি যথার্থই বলিয়াছেন, “পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরাদার।” এ ক্ষেত্রে যে নানা সাহেব মস্তানীর প্রণয়পাত্ররূপে চিত্রিত হইবেন, ইহাতে বিশ্বয়ের বিষয় আর কি আছে?

আমাদের মনে হয়, মস্তানী যে, এই পত্রে লেখক বাবু রাও গণেশের নিকট নিজের দুর্নামের কথা বলিয়াছে, সে দুর্নাম, নানা সাহেবের সহিত অসদ্ভাব ও মতপানের প্রতিজ্ঞাভঙ্গ-বিষয়ক। এই সকল পত্রের ভাবে যতদূর বুঝা যায়, তাহাতে অনুমিত হয় যে, নানা সাহেবের সহিত সদ্ভাব-স্থাপনের পর মস্তানী আর মত স্পর্শ করিবে না বলিয়া শপথ করিয়াছিলেন—সে সেই শপথ ভঙ্গ করায় নানা সাহেব রুষ্ট হইয়া তাহার সহিত পক্ষিপাক বন্ধ করেন। এ কথা বাজী রাওয়ের সুহৃদগণের মধ্যে প্রচারিত হওয়ায় তাঁহারা সকলেই মস্তানীর নিন্দা করিতে লাগিলেন। চিমাঙ্গী আপাত সে কথা জানিতে পারিয়া, তাহার উপর বিরূপ হইলেন। নানা সাহেব মস্তানীর সহিত পত্র-ব্যবহার বন্ধ করায় সে বুঝিল যে, তিনি আর তাহার প্রতি সদ্ভাবসম্পন্ন নহেন। হয় ত সে তাঁহাকেই তাহার দুর্নাম রটনার মূল বলিয়া মনে করিয়াছিল, কায়েই সে বাবু রাও গণেশকে ডাকিয়া নানা সাহেবের সম্বন্ধে তাঁহার নিকট অল্পযোগ করিতে লাগিল। এই পত্রে বাবু রাও গণেশ সেই অল্পযোগের পরিচয় নানা সাহেবকে লিখিয়া জ্ঞাপন করিয়াছেন। বাবু রাও লিখিতেছেন,—

মস্তানী আমায় ডাকাইয়া বলিলেন যে, “আমি অপট-টিস্তে নানার সহিত মস্তাব স্থাপন করিয়াছিলাম। ঐ মস্তাব ৪৫ মাস পর্যন্ত অক্ষুর ছিল। পরে উহা অটল হইল। ইহাতে লোক-মধ্যে (সুহৃদগণের মধ্যে) আমার বদনাম (ছনাম) হইল; চিগণাঙ্গী আগ্রার নিকটেও আগার ছনাম হইয়াছে। আমার সহিত মস্তাব স্থাপনের পর তিনি আমায় প্রকৃত মমতা করিতেন কি না, তাহা তিনিই জানেন। কিন্তু সংপ্রতি দুই চারি মাস হইতে তাঁহার আর পত্রও পাই না। শিবিরে অবস্থান-কালে আমি তাঁহার নিকট হইতে দুই একবার দুই অঙ্গুলি-পরিমিত পত্র পাইয়াছিলাম। তৎপরে বিগত দুই মাসের মধ্যে কিছুই পাই নাই।” এক্ষণে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন এবং সেই অল্প এইরূপে বিনাইয়া বিনাইয়া আমাকে এ সকল কথা বলিতেছিলেন।

এই পত্রের অপর অংশে বাবু রাও গণেশ যে সকল কথা লিখিয়াছেন তৎপ্রতি মনেযোগ করিলে মিষ্টার কিংকেড স্বীয় অনুমানের ভ্রান্তি উপলব্ধি করিতে পারিতেন। বাবু রাও গণেশ লিখিয়াছেন,—

প্রভু জিজ্ঞাসা করিবেন যে, সহসা মস্তানীর মনে এরূপ দুঃখোজেক হইল কেন? তাহার উত্তর এই যে, বিগত ঋশ্যষ্টমীর দিন রাজ্যিকালে এখানে হরি-সংকীৰ্ত্তন হইয়াছিল। রাজি সার্ক-বিগ্রহর পর্যন্ত সংকীৰ্ত্তন ও কথকতা হইবার পর, স্বয়ং মস্তানী নৃত্য আরম্ভ করিলেন। সেই সময়ে শ্রীমতী বাঈ সেখানে গমন করিয়াছিলেন। নৃত্যশেষে তিনি বলিলেন, “আমার নামে নানার পত্র আসিয়াছিল; তিনি কুশলে আছেন বলিয়া লিখিয়াছেন।” এই কথা শুনিয়া মস্তানীর ডাবাখর হইল। তিনি বলিলেন “আট দশ দিন অস্তর স্বীয় জনমীর নিকট নানা পত্র লিখিয়া থাকেন; আমিই কি (দোষ) করিয়াছি? যাহা হউক, নানা সত্য-জট্ট হইয়াছেন, হউন; আমিও তাঁহার সহিত অকপট ব্যবহারই করিতেছিলাম এবং পরেও করিব। তাঁহার এরূপ ব্যবহার মিত্রতার ক্ষেত্রে সম্ভব নহে।” এইরূপ অমেক কথা বলিলেন, তাহা পড়ে কত লিখিব? আপনাদের এরূপ করা উচিত নহে। পত্র-যোগে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে ও তাঁহার সংবাদ লইতে দোন কি? আপনি অবশ্য সমস্তই বুঝেন। আমার পক্ষে অধিক লেখা নাছন্দ্য। ইত্যাদি।

এই পত্রাংশ পাঠে বোধ হয় যে, মপক্ষীর মনে ক্লেশ-দানের জন্তই কানী বাঈ মস্তানীকে নানা সাহেবের পত্রের কথা বিশেষ করিয়া বলিয়াছিলেন। সেই কথা শুনিয়া মস্তানী, বাবু রাও গণেশের নিকট আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, “নানা স্বীয় জননিকে আট দশ দিন অস্তর পত্র লিখেন কিন্তু আমায় লেখেন না; আমিই কি দোষ করিয়াছি?” এই উক্তি হইতে কি ইহাই বুঝায় না যে, মস্তানী আপনাকে নানা সাহেবের জননী-স্থানীয় বলিয়া মনে করিয়াই এরূপ আক্ষেপ করিয়াছিলেন? ফলকথা, আমাদিগের সরল বুদ্ধিতে, মস্তানীর কথায় নানা সাহেবের

প্রতি তাহার অবৈধপ্রীতির কোনও নিদর্শন আমরা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না ।

আলোচ্য পত্রটি বারু রাও গণেশের দ্বারা ১৯ আগষ্ট (১৭৩৯ খ্রীঃ) তারিখে লিখিত হইয়াছিল । সে সময়ে চিমাজী আশ্রা কৌকণ প্রদেশে পোর্তুগীজ-দিগের নিকট হইতে লক্ষ প্রদেশের ব্যবস্থা বন্দোবস্ত করিবার কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন এবং নানা সাহেব দক্ষিণ-মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত মিরজ অঞ্চলে মহারাষ্ট্র-অধিকার-প্রতিষ্ঠা-কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন । শ্রীমদ্ ব্রহ্মোজ শামীকে লিখিত বালাজী বাজী রাওয়ের মূল পত্র ও পেশওয়ার মৃত্যুশ্রী আশ্রাজী জ্যাক পুরন্দরের স্মরণ-লিপি-পাঠে জানা যায় যে, নানা সাহেব ঐ অঞ্চলের প্রিয় হইতে নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত মিরজ অঞ্চলেই ছিলেন । (২) বারু রাও গণেশের প্রথম পত্রে যে গ্রহণের উল্লেখ আছে, তাহা পুরন্দরের স্মরণ-লিপি অনুসারে ৯ই জুলাই তারিখে সংঘটিত হইয়াছিল । ঐ সময়ে

(২) পুরন্দরের "স্মরণ-লিপিতে" প্রত্যেক বর্ষের প্রত্যেক মাসের প্রধান প্রধান ঘটনা লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায় । এই স্মরণ-লিপির একস্থলে লিখিত আছে, তাঁহাদিগের দপ্তরখানায় "১৫৪০ হইতে ১৫৯৬ শকাব্দ (১৬১৮—১৬৭৪ খ্রীঃ) পর্য্যন্ত কালের প্রত্যেক বর্ষের প্রধান ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে । তত্ত্বিন্ন সম্রাট, আওরঙ্গজেবের দির্ঘী হইতে আরম্ভবাদ পর্য্যন্ত আগমনের বিবরণ ও মহারাজ শাহর রাজ্যকালের প্রত্যেক বর্ষের ঘটনাবলীও পৃথক পৃথক লিখিত আছে ।" তদ্বাধ্য মহারাজ শাহর রাজ্যকালের ঘটনাবলী তাঁহারই "জোশী" উপাধিধারী জনৈক বিশেষ কর্মচারী দ্বারা লিখিত হইয়াছিল । ছত্রপতি শিবাজীর সময়ের অর্থাৎ ১৬১৮ হইতে ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কালের স্মরণ-লিপিস্থলি সাময়িক লেখকের দ্বারা লিখিত হইয়াছিল, অথবা আশ্রাজী জ্যাক পুরন্দর, পেশওয়ার মৃত্যুশ্রী পদ (১৭১৪ খ্রীঃ) প্রাপ্তির পর রাজ সরকারের প্রাচীন কাগজপত্র হইতে সংগ্ৰহ করাইয়াছিলেন, তাহা জানা যায় না । তাহার চেষ্টায় ঐরূপ প্রাচীনকালের বিবরণ সংগৃহীত হইয়া থাকিলে তাহা তাহার পক্ষে সামান্য প্রশংসার বিষয় নহে । আর যদি সাময়িক লেখকের দ্বারা লিখিত স্মরণ লিপিস্থলির তিনি কেবল অমূল্যলিপিস্থলির সংগ্রহ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বলিতে হয় যে, মহারা শিবাজীর জন্মের পূর্ব হইতেও মহারাষ্ট্রদেশে প্রতিবর্ষের প্রধান প্রধান ঘটনাবলীর বিবরণ স্মরণ র্থ লিখিয়া রাখিবার প্রথা প্রচলিত ছিল । মহারাজ শিবাজীর সময়ে মহারাষ্ট্র-দেশে যেরূপ উচ্চ অঙ্গের সাহিত্য-চর্চা হইত বলিয়া এখন জানা বাইতেছে, তাহাতে সাময়িক ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর স্মরণ-লিপি রচনার প্রথা সেকালে প্রচলিত থাকা কিছুমাত্র বিস্ময়ের বিষয় বলিয়া মনে হয় না । কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই সকল রচনার কয়দংশ বিলুপ্ত ও কয়দংশ লোক-লোচনের অন্তরালে বিচ্ছিন্ন ও ধূলি-ধুসরিত অবস্থায় প্রাচীন সর্দার ও রাজপুরুষগণের বংশধরদিগের গৃহে পড়িয়া আছে।

বাজাজী বাজী রাও মিরজেই ছিলেন। এই কারণেও ঐ পত্র তাঁহার দ্বারা লিখিত হইতে পারে না। মিষ্টার কিংকেড এই সকল তারিখের প্রতি মনোযোগ না করায় ঐ পত্রকে বাজাজী বাজী রাওয়ের লিখিত বলিয়া সিদ্ধান্ত ও পত্রের বিকৃত ভাষান্তর করিয়া বাজী রাওকে স্মরাসক্ত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা নবেম্বর (কার্তিকী পূর্ণিমা, রবিবার) তারিখের সন্ধ্যাকালে নানা সাহেব মিরজ হইতে পুণায় প্রত্যাহৃত হইলেন। ৩৭পূর্বে ওরা সেপ্টেম্বর তারিখে চিমণাজী আপ্পা পুণায় আগমন করেন। নানা সাহেবের পুণায় প্রত্যাগমনের পরদিবসেই চিমণাজী আপ্পা ও বাজী রাওয়ের জননী রাধা বাঈ বাজী রাওকে বলেন যে, “তুমি মন্তানীর মোহজালে পতিত হইয়া ঘোরতর বিলাসী হইয়া উঠিয়াছ; অতএব কিছুদিনের জন্ত তাহার নিকট হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা কর।” এই কথা বলিয়া তাঁহারা মন্তানীকে একটি “হাবেলীতে” রাখিলেন এবং পাছে সে পলায়নপূর্বক বাজীরাওয়ের নিকট গমন করে, এই ভয়ে গ্রহী নিযুক্ত করিয়া হাবেলী রক্ষা করিবার ব্যবস্থাও করিলেন। এই ঘটনায় ক্রুদ্ধ হইয়া বাজী রাও গৃহ-ত্যাগ-পূর্বক কুরকুখ নামক স্থানে দেবদর্শনার্থ গমন করিলেন (৬ই নবেম্বর) ও তথা হইতে পাটস নামক স্থানে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এ দিকে মন্তানী বাজীরাওয়ের বিরহে চঞ্চলা হইয়া উঠিল; বাজী রাওয়ের অবস্থাও সেইরূপ হইল। পুর্নশেষে ২৪শে নবেম্বর তারিখে মন্তানী কোশলক্রমে হাবেলী হইতে পলায়ন করিয়া বাজী রাওয়ের সহিত গিয়া পাটসে মিলিত হইল। এই ঘটনার বিবরণ আজাজী জ্যেষ্ঠ পুরন্দরের “স্মরণ-লিপিতে” লিখিত আছে। মিষ্টার কিংকেড স্মরণ-লিপির ঐ অংশের যে অসুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেও নানা প্রকার ভ্রম সংঘটিত হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে, আমরা এস্থলে আর সে ভ্রমগুলি প্রদর্শনের চেষ্টা করিলাম না।

মন্তানী পুণা হইতে পলায়ন করিলে, বাজী রাওয়ের আত্মীয়গণ তাঁহার পশ্চাৎদর্শন-পূর্বক পাটসে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং মন্তানীকে পুণায় প্রেরণ করিবার জন্ত বাজী রাওকে অনুরোধ করেন। তাঁহাদিগের পীড়াপীড়িতে বাজী রাও মন্তানীকে পুণায় প্রেরণ করিতে বাধ্য হইলেন। ইহার পর নিম্নোক্ত পুত্র নাগির জজের সহিত বাজী রাও যুদ্ধে লিপ্ত হইলে, চিমণাজী আপ্পার আদেশে নানা সাহেব মন্তানীকে বন্দী করিলেন (২৬শে জ্যৈষ্ঠ

য়ারি ১৭৪০ খ্রীঃ) । তাহার পর বাজী রাওয়ের অজ্ঞাতসারে তাহাকে কোনও গিরিহর্গে রাখিবার পরামর্শ চলিতেছিল । কিন্তু তাহার পর সে সম্বন্ধে কি হইল, তাহার উল্লেখ কোথাপি পাওয়া যায় না । এই ঘটনার অল্পদিন পরে ২৮শে এপ্রিল তারিখে বাজী রাওয়ের মৃত্যু হয় । জনপ্রবাদ এইরূপ যে, মস্তানী বাজী রাওয়ের চিতায় আরোহণ করিয়া দেহ-ত্যাগ করে । কিন্তু তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না । কারণ, নাসির জঙ্গের সহিত সন্ধির (২৭শে ফেব্রুয়ারি ১৭৪০) পর বাজী রাও আর পুণায় প্রত্যাবর্ত্তন না করিয়া ৭ই মার্চ তারিখে উত্তর ভারত অভিযুগে অভিযান করেন । স্মরণ্য ২৬শে জানুয়ারি হইলে ৭ই মার্চের মধ্যে মস্তানীর সহিত বাজী রাওয়ের সাক্ষাৎ-কারের কোনও সম্ভাবনাই ছিল না । পক্ষান্তরে ধর্ম্ম-পক্ষী কাশী বাজী নিকটে থাকিতে যে মস্তানী চিতোরোহণের অধিকার পাইবে, ইহাও সম্ভাব্য বলিয়া মনে হয় না । এই কারণে মস্তানীর চিতোরোহণের জনপ্রবাদ অস্বীকার করিতে হয় । কিন্তু মিষ্টার কিংকেউ লিখিয়াছেন,—“মস্তানীর চিতোরোহণের আখ্যায়িকা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে নানা সাহেবই সম্ভবতঃ উৎপীড়ন করিয়া তাহাকে চিতোরোহণে বাধ্য করিয়াছিলেন । কারণ এই ঘটনার দশ বৎসর পরেও তিনি মহারাজ শাহর মহিমী পকওয়ার (সুকুমার) বাজীকে এইরূপেই চিতোরোহণে দেহত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়া-ছিলেন ।” এ কথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন । কোন রমণী যে স্বৈচ্ছায় পতির সহিত চিতায় প্রাণত্যাগে প্রবৃত্ত হইতে পারে, একথা যাহাদের নিকট কল্পনার অতীত ব্যাপার বলিয়া বিবেচিত হয় সতী-দাহের কথা শুনিতেই তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন যে, ঐ ঘটনার মূলে নিশ্চিতই অদৈবম উৎপীড়ন ও বলপ্রয়োগ বিদ্যমান ছিল ।

মস্তানীর গর্ভে ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে বাজী রাও একটি পুত্র লাভ করেন । তাহার নাম সমশের বাহাদুর । মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে তিনি মস্তানীর প্রতি যেরূপ অকুরাগবাহুল্য প্রকাশ করিতেছিলেন, তাহাতে ব্যঙ্গ-প্রিয় লোকেরাই বোধ হয় রটনা করিয়াছিলেন যে, বাজী রাও সমশের বাহাদুরকে যজ্ঞ-পুত্র দান করিয়া, ব্রাহ্মণ করিয়া লইবার, সঙ্কল্প করিয়াছেন । প্রকৃতপক্ষে বাজী রাওয়ের সেরূপ সঙ্কল্পের উল্লেখ কোনও প্রাচীন রচনায় দেখিতে পাওয়া যায় না । পক্ষান্তরে পুণায় এখনও ব্রহ্মপুত্রের মুখে এইরূপ আখ্যায়িকা শুনিতে পাওয়া যায় যে, বাজী রাও মস্তানীকে অস্তঃপুরে আশ্রয়-দান করিয়াছেন

দেখিয়া তদানীন্তন ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে সমাজচ্যুত করিবার সংকল্প করিয়া-
ছিলেন। বাজী রাও মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী, অসাধারণ প্রতিপত্তি-
শালী বীরপুরুষ ও বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণের আশ্রয়দাতা হইলেও সামাজিকেরা
আপনাদিগের সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টায় বিরত হয়েন নাই।
তাঁহাদিগের চেষ্টায় পুণাতে ব্রাহ্মণদিগের একটি মহতী সভার অধিবেশন
হইল। সেই সভায় যবন-সংসর্গ-রূপ ধর্ম্ম-বহির্ভূত কার্য্য করিবার অপরাধে
বাজী রাওকে সমাজ-চ্যুত করিবার প্রস্তাব আলোচিত হইতে লাগিল।
উপস্থিত ব্যক্তিগণের অনেকে বাজী রাওয়ের বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করিলে
একজন সন্ন্যাসী সভা-স্থলে দণ্ডায়মান হইয়া সে প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিলেন।
তিনি বলিলেন, “মোগলদিগের আক্রমণ হইতে মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্যকে রক্ষা
করিতে পারেন, এমন একমাত্র বীরপুরুষকে হারাইলে সমাজের কতদূর
অনিষ্ট ঘটবার সম্ভাবনা, তাহার বিষয় চিন্তা না করিয়া এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া
যখনও উচিত নহে। বাজী রাওয়ের ব্যক্তিগত চরিত্র দুঃখী হইলেও
মহারাষ্ট্র-জাতির কল্যাণ-সাধনে তিনি যে শ্রম স্বীকার করিয়াছেন ও করিতে-
ছেন, তাহা স্মরণ করিয়া তাঁহাকে ক্ষমা করা উচিত। যাহারা নিতান্তই
বাজী রাওকে সমাজচ্যুত করিবার পক্ষপাতী তাঁহারা অগ্রে মহারাষ্ট্র-সমাজকে
বাজী রাওয়ের জায একজন জাতীয় মঙ্গলকামী মহাবীর দান করুন, তাহার
পর তাঁহারা বাজী রাওয়ের প্রতি যথেষ্ট ব্যবহার করিতে অগ্রসর হউন।”
সন্ন্যাসীর এই যুক্তিগত বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া বাজী রাওয়ের প্রতিপক্ষীয়েরা
নিরস্ত হইলেন। সভার বিবেচনায়, বাজী রাওয়ের জাতীয় (national)
সদৃশগাঁত্রলীর সম্মুখোদে তাঁহার ব্যক্তিগত দোষে উপেক্ষা করাই বিধেয়
বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। , সেকালের ব্রাহ্মণ-সমাজ কিরূপ প্রবল-
শক্তিসম্পন্ন অথচ সুবিবেচক ছিলেন, তাহা এই ঘটনা হইতে বুঝিতে পারা
যায়। এইরূপ শক্তিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ-সমাজে বাস করিয়া, বাজী রাও সমস্তের
বাহাদুরের উপনয়নের সমস্ত হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলেন, ইহা বিশ্বাস করা
দুঃসাধ্য। এই কারণে আমরা তদ্বিষয়ক আধ্যাত্মিককে সেকালের কৌতুক-
প্রিয় লোকের রটনা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি। মিষ্টার কিংকেড এই
ঘটনাকে সত্য মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। বোধহই অঞ্চলের
সমাজসংস্কারকেরা এই জনরবের উল্লেখ করিয়া অনেক হেঁচকি করিয়াছেন।

শ্রীসখারাম গণেশ দেউসর।

মৃত্যু-মিলন ।

উপক্রমণিকা ।

মন্দিরে ।

দোল পূর্ণিমার আর এক দিনমাত্র বিলম্ব আছে । নগরে উৎসবের সূচনা স্থচিত হইতেছে, আসন্ন উল্লাসের সাড়া পড়িয়াছে । রাত্রি প্রভাত হইলেই উৎসবের আরম্ভ,—নাগরিকগণ তাহার আয়োজনে ব্যস্ত । গৃহদ্বার সজ্জিত ; রাজপথে মধ্যো মধ্যো পত্রপুষ্প-শোভিত চারু তোরণ ; গৃহচূড়ায় বসন্তপবনান্বোলিত কেতন । সাক্ষ্য গগন নক্ষত্র-খচিত ;—চতুর্দিশীর চন্দ্র আপনার অতি সামান্য অসম্পূর্ণ দেহ লইয়া চক্রবাল হইতে ধীরে ধীরে উথিত হইতেছে ; চারুচন্দ্রালোকে উৎসবসজ্জাসজ্জিত রাজধানীর প্রথর সৌন্দর্য্য কোমল দেখাইতেছে—যেন বিবাহসভায় ঘৃতশমীপল্লবলাজগন্ধী পুত হোমারি হইতে সন্মুখিত স্বচ্ছ ধূমের অন্তরালে বধুর উজ্জল সৌন্দর্য্য স্নিগ্ধশোভায় পরিণত হইয়াছে ।

দেবমন্দিরে আরতির ঘণ্টাধ্বনি ধ্বনিত হইল । বৃহৎ ঘণ্টার বিপুল ধ্বনি শব্দতরঙ্গের মত নগরের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া গেল । মন্দির-তোরণে বাদকদল বাদন আরম্ভ করিল । নবোদিত চন্দ্রের কিরণ যেমন ক্ষুটফেনশোভিত সমুদ্রকে বেলাসকাশে আনয়ন করে, সেই ঘণ্টাধ্বনি তেমনই স্নবেশসজ্জিত পুরনরনারীকে মন্দিরদ্বারে উপনীত করিল ।

মন্দির সজ্জিত । আজ মন্দিরে সাক্ষ্য আরতির বিপুল আয়োজন । তাই কথায় ও কলহাশ্রে রাজপথ মুখরিত করিয়া নরনারী মন্দিরাভি-মুখগামী হইল ; জ্যোতস্বতী যেমন সমুদ্রবক্ষে জলরাশি সমর্পণ করে, রাজপথ তেমনই মন্দিরদ্বারে জনজ্যোতঃ সমর্পণ করিতে লাগিল । দেখিতে দেখিতে বৃহৎ প্রাঙ্গণ পূর্ণ হইয়া গেল । মন্দিরমধ্য হইতে ধূপগন্ধামোদিত ধূম পবন-ধ্বনিত চীনাংগুকের মত প্রাঙ্গণে ভাসিয়া যাইতে লাগিল ।

আবার ঘণ্টা বাজিল । আরতি আরম্ভ হইল । স্বল্প পুরোহিত আজ অগ্নি আরতি করিতে লাগিলেন । তাঁহার বিশাল বপু গৌরবর্ণ, নয়ন

জ্যোতির্নয়, কেশজাল ও শাশ্বরাঙ্গি কুন্দধবল, পরিধানে শ্বেত-বস্ত্র, অঙ্গে বিশদ উত্তরীয়, উন্নত কপাল চন্দনচর্চিত। সমবেত পুরোহিতগণমধ্যে তাঁহাকে বহুশৃঙ্গ গিরির সর্বোচ্চ শিখরবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। জরাম্পর্শে তাঁহার কেশ ও শাশ্ব শুভ্র বর্ণ ধারণ করিয়াছে; কিন্তু সেই স্নগঠিত, বিশাল দেহে বিকৃতির চিহ্নমাত্র লক্ষিত হয় না; বরং মুখশ্রী গাভীর্য্যে সুন্দর-তর হইয়া উঠিয়াছে। বয়সের আধিক্য কেবল চঞ্চল গৌন্দর্য্যের লোপ হয়। কয় বৎসর হইতে তিনি আর স্মরণ আরতি করিতেন না; স্মরণ উপস্থিত থাকিয়া শিষ্যদিগকে আরতির প্রণালী শিখাইতেন,—এখন তাহারাও স্মৃশিক্ষিত। আজও তাহারা তাঁহার আদেশপ্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান ছিল—তিনি যাহাকে আদেশ করিবেন, সে-ই আরতি করিবে। এমন সময় অজিনাসন হইতে উদ্ভিত হইয়া তিনি স্মরণ মার্জ্জন-চিকণ দীপাধার তুলিয়া লইলেন। শিষ্যবর্গ বিস্মিত হইল। সেই বহু দীপাধারের ভরে সে হস্ত কম্পিত হইল না। তিনি আরতি করিতে লাগিলেন। কয় বৎসর পরে আবার তাঁহাকে আরতি করিতে দেখিয়া জনতা হইতে আনন্দধ্বনি উঠিল।

সে ধ্বনি পুরোহিতের কর্ণে প্রবেশ করিল, কিন্তু তিনি তাহা জানিতে পারিলেন না; তিনি তন্ময় হইয়া আরতি করিতেছিলেন। আজ কয় দিন হইতে তিনি কেমন অন্তমনস্ক। কেহ লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইত, তাঁহার নয়নদ্বয় আর্দ্র। অতি দীর্ঘ আরতি শেষ করিয়া তিনি যখন দীপাধার নামাইয়া রাখিলেন, তখন একটি দীর্ঘশ্বাসে তাঁহার হৃদয়ের সমিধিত বেদনা-রাশি যেন বাহির হইবার চেষ্টা করিল, অর্ধশতাব্দীর অভ্যাগম—বংশপরম্পরা-গত বন্ধন ত্যাগ করা সহজসাধ্য নহে।

আরতি শেষ হইয়া গেল।—বিশাল প্রাঙ্গণ পূর্ণ; বিপুল জনতার হ্রাস নাই; নরনারী বৃদ্ধ পুরোহিতের চরণধূলি লইবার জন্ত অপেক্ষা করিতেছিল। তিনি দেউল হইতে আসিয়া মোহন আতিক্রম করিয়া প্রাঙ্গণে নামিবার সোপানে দাঁড়াইলেন। তাঁহার চক্ষুরধৌত দেহ মর্শ্বরগঠিত দেবমূর্তিরই মত প্রতীয়মান হইতে লাগিল। সমাগত নরনারীগণ সাগ্রহে—ভক্তিরে তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিল। তিনি সকলকে আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন।

ক্রমে জনস্রোতঃ আবার রাজপথে প্রবাহিত হইতে লাগিল। প্রাঙ্গণ শূন্য হইতে আরম্ভ হইল। যখন প্রাঙ্গণ হইতে জনস্রোতঃ অপস্থত হইয়া গেল,

তখন কেবল এক পার্শ্বে তিন জন পুরুষ ও একজন রমণী অপেক্ষা করিতে লাগিল ।

রজনীর প্রথম প্রহর অতীত হইয়া গেল । প্রহরীরা দেউলদ্বার রুদ্ধ করিয়া সিংহদ্বারে ফিরিয়া যাইবার সময় তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল । একজন বলিল, “আমরা গ্রাম হইতে ঠাকুরের নিকট আসিয়াছি । পুরোহিত তখন মোহনে গগনবন্ধদৃষ্টি হইয়া কি ভাবিতে ছিলেন । তিনি তাহাদিগের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “বৎসগণ, কি চাহ ?”

তাহারা কথা কহিতে ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া পুরোহিত প্রহরীগণকে চলিয়া যাইতে আদেশ করিলেন । তাহারা চলিয়া গেল । তখন আগন্তুকদিগের মধ্যে যে বয়োজ্যেষ্ঠ সে বলিল, “আমরা রাজ্যের সীমান্তগ্রামবাসী ; আপনার নিকট আসিয়াছি ।”

পুরোহিত স্নেহে প্রশ্ন করিলেন, “তোমাদের কি আবশ্যক ?”

“মোগল-সেনার অত্যাচারে আমরা বিধ্বস্ত হইতে বসিয়াছি ।”

“কেন ?”

“তাহারা প্রায়ই আমাদের গ্রামে প্রবেশ করে ; বলপূর্ব্বক দ্রব্যাদি গ্রহণ করে । প্রভু, বলিতে কি, আমাদের মান, সম্মান, ধর্ম্মও নিরাপদ নহে ।”

“তাহারা কি ধর্ম্মহানিকর কোন কার্য্য করে ? শুনিয়াছি, কাহারও ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করা আকবরের আদেশ-বিরুদ্ধ ।”

“সত্য ; কিন্তু তাঁহার কর্ম্মচারীরা সে আদেশ পালন করে না । বিশেষ কেহ কেহ আমাদের দেবতাকে বিক্রম করিয়া আমাদেরকে বাদসাহের প্রবর্ত্তিত নূতন ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে বলে ।”

শুনিয়া পুরোহিতের নয়নদ্বয় যেন জলিয়া উঠিল । তিনি বলিলেন, “নূতন ধর্ম্ম । আকবরের উচ্চাকাঙ্ক্ষার অন্ত নাই । ভারতবর্ষের সম্রাট হইয়াও তাহার তৃপ্তি হয় নাই ; পরন্তু ঘৃতাভিগাতে পাবকের মত উপভোগে কামনার ইচ্ছাই হইয়াছে । তাই বিষয়বাসনাবদ্ধ, ভগবচ্ছিত্তাহীন মানব আপনার লোক-বলে বলীয়ান হইয়া আপনাকে ধর্ম্মসংস্থাপনক্ষম বিবেচনা করিয়াছে,— আপনাকে দেবতার আসনে উন্নীত মনে করিয়াছে । ধর্ম্ম স্বার্থগন্ধহীন । আকবরের উদ্দেশ্য স্বার্থসিদ্ধি—রাজশক্তি ও ধর্ম্মশক্তি করতলগত করিয়া ভারতবর্ষে আপনার বংশের প্রভুত্ব স্থায়ী করা । জাতি মানব । তুমি অজ্ঞান যত্নে যাহা গঠিত কর, বিধাতা সামান্য ঘটনার সূত্রে তাহার ধ্বংস করিতে পারেন ।”

কিছুক্ষণ কাহারও মুখে বাক্যক্ষুণ্ণি হইল না। তাহার পর আগন্তুক-দিগের মধ্যে একজন বলিল, “ঠাকুর, আমাদের উপায় কি?”

পুরোহিত বলিলেন, “এ রাজ্য ত্যাগ করিয়া যে রাজা রাজ্যরক্ষায় সমর্থ তাঁহার অধিকারে চলিয়া যাও।”

একজন বলিল, “সে কি, ঠাকুর। পিতৃপুরুষের ভিটা, জমী, জমা—সব ফেলিয়া যাইব?”

রমণী বলিল, “বিগ্রহের কি হইবে?”

পুরোহিত বলিলেন, “এ কার্য্য সহজ নহে সত্য, কিন্তু উপায়ান্তর নাই। আমার কথা ভাবিয়া দেখ। এই রাজবংশ যত দিনের, এ মন্দিরের পৌর-হিত্যে ততদিন বংশপরম্পরাক্রমে আমাদের অধিকার। আমি এই মন্দিরের পৌরহিত্য ব্যতীত আর কোন কার্য্য শিখি নাই। শৈশব হইতে আমি এই শিক্ষায় শিক্ষিত; পঞ্চাশ বৎসর আমি স্বয়ং এই কার্য্য করিতেছি। এখন—এই বৃদ্ধ বয়সে আমি যে এই রাজ্য ত্যাগ করিয়া যাইতেছি, সে কি বড় স্মৃথে?”

রমণী সবিস্ময়ে বলিল, “দেবতাকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন?”

পুরোহিত মুহূর্ত্ত করিলেন, বলিলেন, “বৎসে, যে জীবন দেবসেবায় উৎসৃষ্ট সে জীবন থাকিতে দেবতাকে কেমন করিয়া ত্যাগ করিব? দেবতা তাঁহার সেবককে ত্যাগ করিতে পারেন; সেবকের সাধ্য কি, তাঁহাকে ত্যাগ করে?”

বৃদ্ধ উদ্দেশে দেবতাকে প্রণাম করিয়া আবার বলিলেন, “আমি দেবতার দাস, রাজার দাস নহি। দেবতা সর্বত্র বিচ্যমান। কেবল যে রাজ্যে রাজা অধর্ম্মরত, সে রাজ্যে তিনি প্রসন্ন নহেন,—কুপিত।”

“আপনি কবে যাইবেন?”

“আগামী পরশ্ব—প্রতিপদে—প্রত্যুষে তীর্থ-ভ্রমণে বাহির হইব।”

“এ মন্দিরে দেবসেবার কি হইবে?”

“দেবতার সেবকের অভাব কি? আমার বিংশাদিক শিষ্য; সকলেই দেবসেবায় সমর্থ। তাহারা সে কার্য্য করিবে। আমি যদি আজ মরিয়া যাই, তাহা হইলে কি দেবসেবার জাতি হইবে?”

“রাজা এ কথা জানেন?”

“আমি আজ মজীকে বলিয়া পাঠাইয়াছি।”

একজন বলিল, “কিস্তি রাজ্য কি করিবেন ?”

পুরোহিত বলিলেন, “তিনি রাজ্যরক্ষা করিবেন ।” প্রাঙ্গণপ্রান্তে একটি সারমেয় শয়ান ছিল ; তাহার দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করিয়া তিনি বলিলেন, “ঐ উদ্ভিষ্টমুষ্টিপুষ্ট সারমেয়কে স্বাধিকারচ্যুত করিবার চেষ্টা কর, ও তোমাকে দংশন করিবে ।”

“রাজ্য বাদশাহের সঙ্গে বলে পারিবেন কি ?”

“তিনি কি চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছেন ? প্রকৃত রাজশক্তি প্রজাশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত । তোমরাই রাজ্যের বল । রাজ্য সে শক্তি প্রবুদ্ধ করিতে কি চেষ্টা করিয়াছেন ? করগ্রহণ ব্যতীত প্রজার সহিত যে রাজ্যের সম্বন্ধ নাই রাজ্য-রক্ষা ও রাজ্যশাসন যিনি কর্তব্য বিবেচনা করেন না—তিনি অত্যাচারি-মাত্র । তোমরা প্রজা ; তোমরা রাজ্যের অন্য স্বেচ্ছায় প্রাণ দিতে পার, রাজ্যের সহিত তোমাদের এমন কি ঘনিষ্ঠ যোগ আছে ? রাজ্য সে ঘনিষ্ঠ যোগ সংস্থাপনের কি চেষ্টা করিয়াছেন ?”

“রাজ্যের কর্মচারীরা প্রতীকারে অক্ষম । রাজ্যকে একবার অবস্থা জানাইব কি ?”

“চেষ্টা করিয়া দেখ, যদি স্বাবকদলের স্তুতিগুঞ্জনের মধ্যে প্রজার আর্ত-নাদ রাজকর্ণে প্রবেশ করে ।”

পুরোহিতকে প্রণাম করিয়া আগন্তুকগণ চলিয়া গেল । পুরোহিত বলিয়া ভাবিতে লাগিলেন । মন্দির প্রাঙ্গণ জনশূন্য,—চন্দ্রকিরণপাবিত । প্রাঙ্গণে কয়টি পুষ্ট বৃষ ও একটি সারমেয় শয়ান । প্রস্তরভূমির মধ্যে কোথাও কোথাও ছুই একটি তৃণ আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করিতেছে । সবই যেন তাঁহার পরিচিত । তিনি ভাবিতে লাগিলেন ।

ক্রমে চন্দ্র গগনপ্রান্তগামী হইল । প্রাঙ্গণে দেউলের দীর্ঘ ছায়া দীর্ঘতর হইতে লাগিল । তিনি তখনও চিন্তামগ্ন ।

পূর্বগগন যখন উদয়োগ্রথ রবির কিরণপাতে রক্তাভ হইয়া উঠিল—তখন বিহগ-বিরাবে তাঁহার চমক ভাঙ্গিল ।

প্রথম খণ্ড।

—*—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—ঃঃ—

উৎসব।

—*—

আজ দোলোৎসব। রাজপুতানার একটি ধও রাজ্যের রাজধানীতে আজ মহোৎসব। এই উৎসব সে রাজ্যের গর্বপ্রধান উৎসব। উৎসবে বিপুল আয়োজন—অবারিত আনন্দ—অসীম আমোদোচ্ছ্বাস। পৌরজন এই উৎসবের আশায় সমস্ত বৎসর ধরিয়া অপেক্ষা করিয়া থাকে। উৎসবে যোগ দিবার জন্য নানা স্থান হইতে আগন্তুকগণ সমাগত হয়। উৎসবে রাজধানীতে আনন্দস্রোতঃ প্রবাহিত হয়।

আজ আনন্দের দিন—মিলনের দিন—উৎসবের দিন। আজ পুর-বাসীরা দৈনিক জীবনের বৈয়্যিক কার্য- জীবনমংগ্রাম ভুলিয়াছে। চকে দোকান বন্ধ; পথে ভারবাহী যানের চক্রাঘর্ষ নাই। যেন নিত্যকার্যের রথ সহসা পথে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছে—সারথীর ভকুটিকুটিল মুখে শ্মিত-হাস্ত ফুটিয়া উঠিয়াছে। অধিরাম প্রবহমান কর্মস্রোতঃ যেন সহসা নিশ্চল—নিষ্কপ হইয়াছে।

রাজপথ পরিষ্কৃত—সুগন্ধসলিলসেচনশিষ্ট। দুই পার্শ্বে হর্ম্যমালা পত্র-পুষ্পপতাকায় শোভিত। গৃহদ্বারে মঙ্গলঘট—গৃহচূড়ায় পতাকা। কোন কোন গৃহের সজ্জিত আলিসায় উজ্জলবর্ণবৈচিত্র্যমনোরম ময়ূরগুলি গৃহ-সজ্জারই অঙ্গ বলিয়া বোধ হইতেছে। রাজপথে জনস্রোতঃ—সকলেরই পরিধানে নূতন বস্ত্রবর্ণের বৈচিত্র্য মনে হয়, বুঝি নানা প্রফুটিত-পুষ্পশোভিত উদ্যানে বিচরণ করিতেছি। পুরুষের পরিধেয় বস্ত্রে ও উত্তরীয়ে একই প্রকার বর্ণ, রমণীর বসনে বিচিত্রবর্ণের সমাবেশ।

উপরে নীল আকাশ মেঘলেশহীন—সূর্য্যকরোজ্জল। মধ্য মধ্য এক এক দল পারাবত বা টিয়া উড়িয়া যাইতেছে। রাজপথে স্থানে স্থানে জলাধারে আবীররঞ্জিত বারি। সেগুলিকে ঘিরিয়া পিচকারীধারী বালক-

গণ ও যুবকদল দাঁড়াইয়া আছে—এ উহার মুখে, চক্ষুতে, বসনে জল দিতেছে। পথে এ উহার দিকে আবীর প্রক্ষিপ্ত করিতেছে। রাজপথ বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে।

ক্রমে বেলা বাড়িতে লাগিল। জনতা ও বাড়িতে লাগিল। সকলেরই মুখে প্রতীক্ষার ভাব। সকলে এক এক বার উত্তর দিকে চাহিতেছিল। রাজপথ সরল—যতদূর দৃষ্টিচলে কেবল নরমুণ্ড। গত সন্ধ্যায় রাজা প্রাসাদ হইতে নগরোপকণ্ঠে কুঞ্জগৃহে গমন করিয়াছেন। আজ তিনি সদলে সেই কুঞ্জগৃহ হইতে নগরমধ্য দিয়া মন্দিরে যাইবেন। সেই সময় উৎসবের আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে।

সহসা দূরে বাদ্যধ্বনি শ্রুত হইল। ধ্বনি অস্পষ্ট—মধুর, পবনে হিল্লোলিত হইয়া আসিতে লাগিল; যেন দূরে উচ্চবৃক্ষশাখায় বিহগশাবক প্রভাত-পবনে অক্ষুট কাকলী ঢালিতেছে। জনতা হইতে আনন্দধ্বনি উদ্ভিত হইল।

বাদ্যধ্বনি ক্রমে স্পষ্ট শ্রুত হইতে লাগিল। পশ্চিমার্শ্বে গৃহের ছাত বর্ণ-বহুবৈশিষ্ট্যসজ্জিত। রমণীমণ্ডলীতে পূর্ণ হইয়া উঠিল;—কাহারও হস্তে কুঙ্কম,—কাহারও বাম করে আবীরের পাত্র,—কেহ পিচকারী পূর্ণ করিয়া দণ্ডায়মান। কেহ কেহ নিম্নে রাজপথে জনতার উপর এক এক মুষ্টি আবীর নিক্ষেপ করিতে লাগিল; পশ্চিমদিগের মধ্যে কেহ উর্ধ্বে চাহিলে তাহার চক্ষু আবীরে পূর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। কোন রমণী বা রাজপথে কোন পরিচিত বা পরিচিতাকে দেখিয়া আবীর নিক্ষেপ করিতেছে বা পিচকারী-মুখে রঞ্জিত বারি দিতেছে; বলা বাহুল্য, চূর্ণ বা বারি উদ্ভিষ্ট বা উদ্ভিষ্টা ব্যতীত আরও অনেকের উপর পড়িয়া জনতারমধ্যে হইতে উচ্চ হাস্যধ্বনি উদ্ভিত করাইতেছে।

ক্রমে বাদ্যধ্বনি নিকটে শ্রুত হইতে লাগিল। তাহার পর উদ্ভীষ জনতা দূরে ক্রমশঃ অগ্রসর জনারণ্য দেখিতে পাইল। সে জনারণ্য ক্রমে নিকটে আসিল। প্রথমে অশ্বারোহী সেনাদল,—বাম করে বরা, দক্ষিণ করে অর্ধ-চন্দ্রাকার মুক্ত কুপাণ—তাহাতে রবিকর প্রতিফলিত। অশ্বারোহীদিগের শুভ্র উষ্ণীষ ও বেশ আবীরে রঞ্জিত। দ্রুতগতি অশ্বগণ বক্রাকর্ষণে সংযত হইয়া গ্রীবা বক্র করিয়া যেন নাচিতে নাচিতে অগ্রসর হইতেছে। তাহার পর পদাতিদল। সর্বাঙ্গে বর্ষাধারীরা সমপদক্ষেপে অগ্রসর হইতেছে—দীর্ঘ

বর্ষার পরিকল্পিত ফলক রবিকরে জ্বলিতেছে। তাহার পর বন্দুকধারীরা গুরুভার, দীর্ঘনল বন্দুক বহন করিয়া যাইতেছে। তাহার পর ধাতুক্ষগণ—পৃষ্ঠে তুণ নিঃশব্দে শক্তপ্রাণখাতী শরে পূর্ণ—করে ধমুক। তাহার পর নানাক্রম মৈত্র। তাহাদের পশ্চাতে ভারবাহী উষ্ট্রের শ্রেণী। উষ্ট্রের পর শিকারসঙ্গী চিতা—শুজালিত—নয়নে ভীষণ ভূষণ—চারিদিকে চাহিতেছে। তাহার পর দণ্ডধারীদল রৌপ্য-দণ্ড বহন করিতেছে।

তাহার পর সমান উচ্চ দুইটি করী ; তাহাদের পৃষ্ঠে বাজকরদল নানা-যজ্ঞবাদনরত। তাহাদের পশ্চাতে বিশালকায় দস্তী,—দস্তধয়ে স্বর্ণালঙ্কার ; মুক্তাখচিত আস্তরণ দুই পাশ্বে প্রায় ভূমি স্পর্শ করিতেছে ; পৃষ্ঠোপরি আসন ; চারি কোণে চারিটি স্বর্ণ-দণ্ডে বহুমূল্য বস্ত্রের আবরণ বদ্ধ। আসনে রাজা উপবিষ্ট। রাজার বয়স চল্লিশের নিম্নে ; মুখে যৌবনের লাবণ্য বা পরিণত বয়সের গাভীৰ্য্য কিছুই নাই ; নয়নে আলস্য ও বিরক্তিতাব। আজ তাঁহার ওষ্ঠাধরে মুহূ হস্ত দেখা যাইতেছিল সত্য, কিন্তু সে হাসি নিব্বারমুক্ত বারির মত স্রবঃ উচ্ছৃগিত নহে—তাহা কৃত্রিম, ভাবগোপনচেষ্টার ফল—অপ্রাভাবিক। রাজার আসনের পশ্চাতে একজনমাত্র গ্রহরী দণ্ডায়মান।

দুই পাশ্বে গৃহ হইতে শত পিচকারী রাজাকে লক্ষ্য করিয়া আবীররঞ্জিত বারি বর্ষণ করিল ; সহস্র অলঙ্কারশিঞ্জিত হস্ত কুক্ষম নিক্ষেপ করিল। চারি-দিকে আনন্দকোলাহল। রাজার ওষ্ঠাধরে তেমনই মুহূ হস্ত। হস্তী ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। নিম্নে বিপুল জনতা পরস্পরকে রঞ্জিত করিতে লাগিল। রাজহস্তীর পশ্চাতে আর একটি বৃহৎ হস্তী—তাহার পৃষ্ঠে একটি অনতিবৃহৎ রৌপ্য নির্মিত কামান ; সেই কামান ঘন ঘন আবীররঞ্জিত স্নগন্ধ জলধারা উদগীরণ করিয়া জনসমূহকে স্নাত করাইতে লাগিল।

আজ উচ্চ নীচ ভেদ নাই। আজ একই আনন্দলোভে সকলে ভাসিয়া চলিয়াছে ; ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্থ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র আজ সকলেই এক উৎসবে মত্ত। যেমন সহসা বান আসিলে নদী কূল প্লাবিত করিয়া সমগ্র গ্রাম ভাসাইয়া লইয়া যায়, তেমনই আজ এক উল্লাস-প্রবাহ রাজধানীতে সকল নাগরিককে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। বহুদিন বন্ধনে অভ্যস্ত অশ্ব সহসা বন্ধনমুক্ত অবস্থায় শস্যশ্রামল ক্ষেত্রে আসিলে যেমন উল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া উঠে, দীর্ঘ এক বৎসর কার্য্যরত জনগণ তেমনই আজ কার্য্য হইতে মুক্ত হইয়া

উৎসবে যেন উগ্ৰ হইয়াছে। সে আনন্দস্রোতঃ প্রাঙ্গণ হইতে প্রবাহিত হইয়া নগরী প্রাবিত করিয়াছে।

রাজার গমনের সঙ্গে সঙ্গে জনগণও মন্দিরাভিমুখগামী হইল। মন্দিরের সিংহদ্বারে রাজা করিপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলেন। মন্দির তাহার পূর্বেই পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। রক্ষিদল বহু কষ্টে রাজার জন্য একটি সঙ্গীর্ণ পথ জনশূন্য রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল; মন্দির-প্রাঙ্গণে আবার কম অঙ্গুলি উচ্চ হইয়া উঠিয়াছিল।

রাজা মোহনে উঠিলেন। পুরোহিতগণ মালা, চন্দন ও আবার লইয়া রাজার অভ্যর্থনা করিলেন। বৃদ্ধ পুরোহিত এক পার্শ্বে বসিয়া ছিলেন। তিনি আসিলেন না দেখিয়া একজন পুরোহিত যাইয়া তাঁহাকে বলিলেন, “রাজা আসিয়াছেন।”

বৃদ্ধ স্খিভ্রাসা করিলেন, “কোথায়?”

পুরোহিত দেখাইয়া দিলেন।

বৃদ্ধ লজ্জিত করিয়া বলিলেন, “আমি ত দেখিতেছি, বাচাল ষালক। যে রাজা রাজ্য-রক্ষায় অক্ষম, তাহার হস্তে রাজদণ্ড শোভা পায় না।

পুরোহিত বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া রহিলেন।

রাজা বৃদ্ধের কথা শুনিতে পাইলেন। কিন্তু তাঁহার মুখে ক্রোধের চিহ্ন-মাত্র প্রকাশ পাইল না; কেবল ওষ্ঠাধরলিপ্ত মুহূর্ত্তান্তর রেখা লুপ্ত হইয়া গেল। যেন শরতের রবিকরে সরসী-সলিল জ্বলিতেছিল, গরুমা বর্ষনলদ্য মেঘখণ্ড রবিকর নিবারিত করিল—জল স্বচ্ছ অক্ষরময় দেখাইতে লাগিল।

রাজা দেউলে প্রবেশ করিয়া দেবপ্রণাম করিলেন। পুরোহিতগণ তাঁহাকে দেবপ্রসাদ আবারে রঞ্জিত করিয়া দিলেন। তিনি প্রণামী দিয়া দেউল হইতে বাহির হইলেন। মোহন অতিক্রম করিবার সময় রাজা দেখিলেন, বৃদ্ধ পুরোহিত তেমনি ভাবে বসিয়া আছেন।

রাজা প্রাঙ্গণে আসিলেন। জনতা সমুদ্বনি করিয়া উঠিল। তিনি প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া মন্দির হইতে নিজগৃহ হইলেন। রাজহস্তী তাঁহার আরোহণজন্ত উপবিষ্ট ছিল। রাজা করিপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন না; পদতলে অদূরবর্তী উদ্যান-গৃহে চলিলেন। তাঁহার মুখে সেই স্বচ্ছাঙ্গকার লাগিয়াই রহিল।

রাজা গৃহদ্বারে উপনীত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। সেনাদল অতি-

বাদন করিয়া চলিয়া গেল। ক্রমে জনতাও মিলাইয়া গেল। দিবসের উৎসবের অবসান হইল।

সেই দিন সন্ধ্যায় যখন নগরী আলোকমালায় সজ্জিতা হইয়া উঠিল, মন্দিরে সমারোহে সাক্ষ্য আরতি আরম্ভ হইল, তখন মন্ত্রী মহাকারী আসিয়া বৃদ্ধ পুরোহিতকে প্রণাম করিয়া জানাইলেন, মন্ত্রী তাঁহার দর্শন-ভাষ্য-প্রয়াসী।

বৃদ্ধ বলিলেন, “মন্ত্রী বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছেন, আমি মন্দিরের পৌর-হিত্য ত্যাগ করিয়াছি।”

মহাকারী জিজ্ঞাসা করিলে, “মন্ত্রী মহাশয়কে কি নিবেদন করিব?”

বৃদ্ধ বলিলেন, “বলিবেন, আমি আজ আর রাজার মন্দিরের পুরোহিত নহি। আমার সহিত রাজমন্ত্রীর কি কার্য্য থাকিতে পারে?”

মহাকারী প্রত্যাবৃত্ত হইলে মন্ত্রী রাজাকে বৃদ্ধের কথা জানাইলেন।

রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর মন্দিরে জনতার হ্রাস হইলে রাজমন্ত্রী স্বয়ং সাধারণ বেশে মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

মন্ত্রী বিনীত ভাবে বৃদ্ধকে কি নিবেদন করিলেন। বৃদ্ধ প্রথমে অসম্মতি জানাইলেন, পরে মন্ত্রীর প্রার্থনায় সন্মত হইলেন। উভয়ে মন্দির হইতে বাহির হইয়া অদূরবর্তী সেই উদ্যান-গৃহে প্রবেশ করিলেন। তথায় নিভৃত কক্ষে রাজার সহিত বহুক্ষণ বৃদ্ধের কি কথা হইল। আর কেহ তাহা জানিতে পারিল না।

বৃদ্ধ পুরোহিত পরদিন তীর্থলগ্নে বাহির হইলেন।

(ক্রমশঃ)

চিতোর ।

—:—

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই হইয়া চিতোর গড় দেখিতে গিয়াছিলাম । সেবার একাকীই পর্য্যটন করিতেছিলাম—কোন সঙ্গী জুটে নাই । দেখিলাম, একাকী ভ্রমণে অনেক শিক্ষা হয় । নানারূপ গোলযোগ ও ঝগড়ার মধ্যে আপনাকে ঠিক রাখিতে রাখিতে প্রত্যাশ্রয়মতীক বাড়ে এবং আত্মশক্তিতে বিশ্বাস জন্মে ।

ট্রেনে কোন্ শ্রেণীতে ভ্রমণ প্রশস্ত সে বিষয়ে মতভেদ আছে । সামর্থ্য থাকিলে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে যাওয়াই বাঞ্ছনীয় ; কারণ তাহা হইলে সমাজের সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশিবার সুযোগ হয় । প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাইলে ধনী ও পদস্থ ব্যক্তিগণের সহিত আলাপ হয় ; মধ্যম শ্রেণীতে মধ্যবিত্ত এবং তৃতীয় শ্রেণীতে দরিদ্র ব্যক্তিগণের সহিত মিশা-মিশা হইয়া থাকে । বলা বাহুল্য, ট্রেনে অপরিচিত লোকের সহিত যেরূপ সহজে আলাপ পরিচয় হয়, সেরূপ অতি অল্প স্থানেই হইয়া থাকে ।

বরোদা রাজ্য এবং মালব অধিত্যকার মধ্য দিয়া রাজপুতানায় আসিয়া পড়িলাম । এ প্রদেশটি সমতল এবং শস্যশালী ; তবে বাজালার ঠান এ স্থানে জল সুলভ নহে ।

তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে তদেশীয় কুমকাদি দরিদ্র লোকের সহিত গল্প করিতে করিতে যাইতেছিলাম । লোকগুলি প্ৰভাবতঃ শাস্ত্র ও ~~সুদর্শন~~ ^{সুদর্শন} মায়িক । আমার মাথায় পাগড়ী নাই দেখিয়া তাহারা বিস্মিত হইল । তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সঙ্গীদিগকে বুঝাইল, আমাদের বাজালার ঐরূপ ‘হালচাল’ ।

গাড়ীতে এক যুবক মাড়য়ারী বণিক শুইয়া ছিল, এমন সময় একজন দরিদ্র বৃদ্ধ রাজপুত সেই কামরায় উঠিল । বৃদ্ধের হস্তে তরবারি ; * তাহার দীর্ঘ শ্বেত শস্ত্র রাজপুত ধরণে দুই গণ্ডের উপরে উত্তোলিত । বণিক উঠিয়া বসিতে চাহে না দেখিয়া, চক্ষু বিক্ষিপ্ত করিয়া রাজপুত যখন “শা—বেলিয়া ।” বলিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল, তখন তাহার বীরমূর্ত্তি দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়া

* আমরা যেরূপ ছড়ি ব্যবহার করি, রাজপুতগণ সেইরূপ তরবার ব্যবহার করেন।

গেলাম। বলিক অর্থে এবং শারীরিক সামর্থ্যে শ্রেষ্ঠতর হইলেও বিনাবাক্য-ব্যয়ে উঠিয়া রাজপুতের বসিবার স্থান করিয়া দিল। সেই 'বেগিয়া' শব্দটা সে কি ঘণার সহিতই উচ্চারণ করিয়াছিল। শব্দটার মধ্যে নিম্নলিখিত ভাবটা যেন প্রচ্ছন্ন ছিল—“তুমি অর্থকরী ব্যবসায়ের কল্যাণে আজ ধনগর্বে গর্বিত হইয়া উঠিয়াছ—কিন্তু, আমার শিরায় রাজপুত রক্ত বহিতেছে, মরিয়া গেলেও আমি তোমার ন্যায় নীচ ব্যক্তিকে ভয় করি না।”

যখন চিতোরগড় ষ্টেশনে পৌঁছিয়াম তখন রাত্রি প্রায় দশটা। এই অপরিচিত স্থানে একাকী কোথায় যাইব? কাষেই, রাত্রিটুকু ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমে কাটাইয়া দিলাম।

প্রত্যয়ে উঠিয়া চিতোর পাহাড় অভিমুখে যাত্রা করিলাম। ষ্টেশন-মাষ্টারকে বলিয়া আমার জব্বাদি তাঁহার আফিস ঘরের এক কোণে রাখিয়া দিলাম। ষ্টেশনটি অতি ক্ষুদ্র—খাবার মিলে না। যাহা হউক, গৌড়াগ্য-ক্রমে সকালে একজন চা-বিস্কট-বিক্রেতা আসিল—তাঁহার নিকট চা ও বিস্কট ক্রয় করিলাম; তাঁহার পর পাহাড় অভিমুখে রওনা হইলাম।

চারিদিকে সমতল ক্ষেত্রের মধ্যে চিতোর পাহাড় মাথা তুলিয়া আছে। পাহাড়টি অত্যধিক উচ্চ না হইলেও, অত্যন্ত দীর্ঘ এবং প্রস্থেও কম নহে। পাহাড়ের উপরে বিস্তৃত চিতোর দুর্গ—পাদদেশে চিতোর নগর। বহুদূর হইতে এই পাহাড় এবং তদুপরিস্থ রাণা কুন্ডের জয়শুভ্র দেখিতে পাওয়া যায়।

ষ্টেশনটি মাঠের মধ্যে অবস্থিত। প্রায় এক মাইল মাঠ অতিক্রম করিয়া গম্ভীরা নদীর তীরে উপনীত হইলাম। গ্রীষ্মে জল শুকাইয়া প্রস্তরকঙ্করময় তলদেশে বাহির হইয়া পড়িয়াছে—মধ্যে মধ্যে ঝির ঝির করিয়া একটু জল বহিতেছে; হাঁটিয়া পার হইয়া গেলাম। নদীর উপর একটি সেতু আছে, একা বা হস্তী এবং বর্ষাকালে মানুষ তাহারা উপর দিয়া নদী পার হয়।

ক্ষুদ্র নদীটির পর পারেরই চিতোর—এককালে মেবার রাজ্যের মহাসমৃদ্ধিশালিনী রাজধানী, এক্ষণে সামান্য একটি গণগ্রামমাত্র। সকল ‘পশ্চিমা’ সহরের মত সফীর্ণ গলি এবং ছুই ধারে পাথরের বাড়ী, তাহাতে দরজা-জানা-জার সম্পর্ক অতি কম। প্রথম সূর্য্যোদয় হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত এবং দস্যুতন্ত্রের উপজবনিবারণ জন্তই বোধ হয় বাড়ীগুলি এইরূপে নির্মিত হইত।

পাহাড়ে উঠিবার পূর্বে সহর হইতে একজন পথপ্রদর্শক সংগ্রহ করিবার

ইচ্ছা হইল । অনেক অশুসন্ধানের পর একজন লোক মিলিল । সে অগ্রিম চারি আনা পয়সা লইয়া আমাকে পাহাড়ের সকল স্থান দেখাইয়া দিতে সম্মত হইল । সে জাতিতে বাঙাল—বিবাহাদিতে ঢোল বাজায় ।

সহরের শেষে, যে স্থানে পাহাড়ে উঠিবার রাস্তা আরম্ভ হইয়াছে, সেই স্থানে উদয়পুরের মহারাণার একটা থানা হইতে গড় দেখিবার জন্য একখান অশুমতি পত্র লইতে হইল ।

অগ্রশস্ত্র চালু রাস্তা ক্রমাগত ঘুরিয়া ফিরিয়া উপরে উঠিতেছে, এক ধারে সুদৃঢ় প্রস্তর-প্রাচীর পাহাড়ের তলদেশস্থ শত্রু হইতে পথ রক্ষা করিতেছে, অন্যধারে পাহাড় সরল ভাবে উঠিয়াছে । প্রাচীরের উপর হইতে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া বন্দুক ও কামান ছুড়িবার বন্দোবস্ত রহিয়াছে । রাস্তার প্রতি বাকি একটি করিয়া ফটক এবং নিকটে কতকগুলি দুর্গরক্ষক সৈন্যের বাসগৃহ । দুর্গ অধিকার করিতে হইলে শত্রুকে এইরূপ কতকগুলি সুরক্ষিত তোরণ অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে । তোরণগুলির নাম হুম্মান পোল, গণেশ পোল, সুরথ পোল ইত্যাদি । এক একটি তোরণ কত শত সহস্র শিশোদীয় বীরের রক্তে রঞ্জিত ।

প্রতি ফটকে একজন করিয়া বন্দুক-তরবারি-ধারী রাজপুত, সৈনিক পাহারা দিতেছে ।-- তাহাদিগকে ছাড়পত্রখানি দেখাইয়া যাইতে লাগিলাম । এই সৈনিকগুলির কি গভীর মূর্তি, কি গর্ভিত মুখভাব ! এই গর্ব ও গাভীর্য্য অতীত গৌরবের চিত্তাভ্যাস রক্ষকের পক্ষে বড়ই শোভন বোধ হইতেছিল ।

পাহাড়ের উপর কেবল অট্টালিকা, মন্দির, সমাধিস্তম্ভ, অয়স্তম্ভ, প্রকৃতির খাঁট প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ । তাহার মধ্যে কত ঐতিহাসিক ভগ্ন লুকায়িত রহিয়াছে !

এই বিস্তৃত শাশানে কেবল কয়েক খর দরিদ্র অধিবাসী, ওটিকয়েক ভগ্ন-মন্দির-নিবাসী সন্ন্যাসী এবং রাণার জনকয়েক ভৃত্য এবং সৈনিক বাস করিতেছে ।

এত উচ্চে পাহাড়ের উপর স্রুপের জল যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় । কয়েকটি কূপের তলদেশ হইতে উৎসের জল বাহির হইতেছে । জলের সুবিধা না থাকিলে কোন পাহাড়ের উপর দুর্গ নির্মাণ করা বাতুলতামাত্র, কেন না দুর্গ আক্রান্ত হইলে সৈন্যগণ জলাভাবেই বিনষ্ট হইবে ।

দুর্গমধ্যে নীলকণ্ঠের মন্দির। এই পুরাতন শিব মন্দিরটির উপর এ
প্রদেশের লোকের অচলা ভক্তি—অনেক দূর হইতে লোক নীলকণ্ঠ দর্শন
করিতে আইসেন। সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণত্যাগী বীরগণের সমাধির পার্শ্ব দিয়া
যাইতে যাইতে রাণা কুণ্ডের শ্বেতপ্রস্তর-নির্মিত ওয়ন্তুন্ডের নিকট আসিয়া
পড়িলাম। অতি উচ্চ শুভ, নয় ভগ্নে বিভক্ত—শুভের গায়ে নানাবিধ
সুন্দর মূর্তি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। সমরে বার বার মুসলমানগণকে পরাস্ত
করিয়া কুণ্ড এই কীর্তিস্তম্ভ স্থাপন করেন। নিকটে ঝৈনদিগের দ্বারা নির্মিত
একটি ক্ষুদ্র শুভ, দুর্গমধ্যে একদা ঝৈনগণের সমৃদ্ধির পরিচয় স্বরূপ
দণ্ডায়মান। চিতোরাধিষ্ঠাত্রী করালী কালীর মন্দিরটি প্রায় ভূমিসাৎ
হইয়া গিয়াছে। ইনিই এককালে রাজপুত-রক্ত-পিপাসায় অধীরা হইয়া
বলিয়াছিলেন “মৈ ভুখা হুঁঃ। মৈ ভুখা হুঁঃ।” নিকটবর্তী সরোবরের তীরে
বসিয়া দেখিতে লাগিলাম, ভগ্ন প্রস্তররাজির উপর ময়ূর পৈথম খুলিয়া
বেড়াইতেছে। মহারাণা কুণ্ডের মহিষী, হরিভক্তি পরায়ণা মীরা বাইয়ের
প্রতিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরটি এখনও সুরক্ষিত। কয়েকটি রাজপুত জী ও
পুরুষ মন্দিরে অর্চনা করিতেছিলেন। মন্দিরের শীতল ছায়ায় কিছুক্ষণ
উপবেশন করিলে মন শান্তিরূপে পূর্ণ হইল। কিয়দূরে মহারাণী পদ্মিনীর
প্রাসাদ; সরোবরের মধ্যে সুন্দর, অতি বৃহৎ অট্টালিকা। উদয়পুরের
মহারাণা কর্তৃক সম্প্রতি ইহার ধ্বংস-সংস্কার হইয়াছে।

এই প্রাসাদের সম্মুখে বসিয়া মেবারের ইতিহাসের কত কথা ভাবিতে-
ছিলাম। মীরা ও পদ্মিনী রাজস্থানের দুইটি অতুলনীয় রমণীরাজ। একজন
রাজরাণী-হইরাও সম্রাটিনী—মহাবীর কুণ্ডের মৈত্র কোলাহলের প্রতি
কর্ণপাতমাএ না করিয়া হরিনামামৃত পানে বিভোরা। আর এক জন
মুষ্টিমতী ক্ষত্ররাজকন্যা—কর্ণায়গণকে কর্তব্য-পালনে প্রোৎসাহিত করিতেছেন
এবং আর্য্য রমণী যাহাতে সত্যীত্বের মর্যাদা বিশ্বস্ত না হয়েন সে বিষয়ে যত্ন-
বতী রহিয়াছেন। উভয়েই ধার্মিকপ্রেরণা, তবে দুই জনের দুই বিভিন্ন পন্থা।
এক জন মুষ্টিমতী ভক্তি, আর এক জন দেহধারিণী কর্তব্যবুদ্ধি। ভক্তি-
যোগের ও কর্মযোগের একরূপ মনোহর দৃষ্টান্ত অগতের ইতিহাসে
সুপ্রসঙ্গ নহে। রাজপুতগণের সমকক্ষ বীর গ্রীসে ছিল, রোমে ছিল
এবং আরও কোন কোন স্থানে ছিল, স্বীকার করি—কিন্তু মেবারের রমণী-
বৃন্দের ছায় শৌর্য্যবতী রমণী কোন দেশে কোন কালে ছিল বলিয়া ত মনে

হয় না । একজন নহে, দুইজন নহে, দলে দলে স্নানরীকুল সমীতকলতানে প্রাঙ্গণ মুখরিত করিয়া অগ্নি-প্রবেশ করেন, এই রোমাঞ্চকর দৃশ্য, পৃথিবীতে এই স্বর্গের অভিনয়,—পাঠক কি আর কোথাও দেখিয়াছেন ?

প্রতি বৎসর অনেক সম্রাট যুরোপীয় পর্য্যটক এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গড় দেখিতে আসিয়া থাকেন ;—তাই বোধ হয় মহারাণা বাহাদুর গড়টিকে অনেকটা সংস্কৃত অবস্থায় রাখিয়াছেন এবং মধ্যস্থলে বিশ্রামের জন্য একটি সুন্দর উদ্যান রচিত করিয়া দিয়াছেন । একস্থানে একটি অজা-গারে সেকালের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কামান, গোলা প্রভৃতি রক্ষিত হইয়াছে । এই পুরাতন পদ্ধতি অনুসারে নির্মিত কামানগুলি যেমন বর্তমান কালে অব্যবহার্যরূপে পরিগণিত হইয়াছে, গিরিচূর্ণ গুলিও সেইরূপ সেকালে অজ্ঞেয় হইলেও একালে সেরূপ নহে । আজকাল যেরূপ কামান এবং গোলা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে ক্ষুদ্র কোনও চূর্ণ (গিরিচূর্ণ অতি বিস্তৃত হইতে পারে না) অধিক দিন আশ্রয়লা করিতে পারে না । এই জন্যই ইংরাজ গভর্নমেন্টে সহ্যাদি পর্ব্বতস্থ শিবাজীর গিরিচূর্ণগুলি ব্যবহার করেন না—অথচ মোগলদিগের সহিত যুদ্ধে এই গিরিচূর্ণগুলি অজ্ঞেয় ছিল ।

আমার পথপ্রদর্শক নিরঙ্কর এবং ইতিহাসবিষয়ে অজ্ঞ । আমি যতই তাহাকে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানগুলি দেখাইতে বলি, ততই মেমনমা, কালভৈরব গণেশ প্রভৃতির প্রতিমা দেখাইয়া বেড়ায় । তবে পানীীর প্রাসাদের ছাদে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ স্থানগুলি অবশ্য তাহার পরিচিত । তাহার নিকট হইতে তদদেশ-প্রচলিত এই বাক্যটি শুনিলাম—

“গড় ত চিতোর গড় ঔর ত গড়িয়া ;

রাণী ত কমলাবতী ঔর ত গড়িয়া

তড়াগ ত ভূপাল তড়াগ ঔর ত নটিয়া ।”

চিতোরের ইতিহাস সম্বন্ধে তাহার এইটুকু জ্ঞান আছে যে, এইস্থানে বহুকাল ধরিয়া রাজপুত বীরগণ ‘কালীকা মা’জী’র সহায়তায় মুসলমানগণকে যুদ্ধে পর্য্যুদস্ত করেন । যখন গড়ের উপর হইতে নামিলাম তখন রৌদ্র ঝাঁঝী করিতেছে ।

পথে কষ্টের অন্ত ছিল না ; কিন্তু দেশ দেশান্তর হইতে তীর্থযাত্রীরা অজস্র কষ্ট স্বীকার করিয়া তীর্থক্ষেত্রে উপনীত হইলে যেমন ত্রীমূর্ত্তি-দর্শন-মানে তাহাদের সমস্ত ক্লেশ দূর হইয়া হৃদয় আনন্দ-রসে আপুত হইয়া উঠে,

তেমনই মুসলমান যুগে হিন্দু ইতিহাস রূপ অমাবস্তা রজনীর সর্বোজ্জ্বল নক্ষত্র রামাজ্জুন-বংশধর পুণ্যশোক ক্ষত্রবীরগণের লীলাক্ষেত্র এবং আদর্শ-ভারত-রমণীকুলের বিহারভূমি এই চিত্তোরতীর্থ যে আমি দর্শন করিয়াছি—সে পবিত্র ধূলির স্পর্শে যে আমি পবিত্র হইয়াছি—ইহাতেই আমি আপনাকে মৌভাগ্যমান বলিয়া বিবেচনা করি।

শ্রীমতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

বঙ্গীয় নদনদীর জীবন-সংগ্রাম।

কুলপাবিনী প্রবাহিনী পর্বতশিখর হইতে প্রবাহিত হইয়া যখন সাগর-সঙ্গমে মিশিতে যায় তখন সে যেন ক্রীড়াচ্ছলে কখন বা তীর ভাঙ্গিতে কখন বা নুতন পলীশুর দ্বারা তাহার কণ্ঠেবর বৃদ্ধি করিতে থাকে। জগতের নিয়মে নুতন পুরাতনের স্থান অধিকার করে। যেমন নুতন ধাতু আসিয়া পুরাতনকে অপহৃত করিয়া দেয়, যেমন নুতন রাজা আসিয়া প্রাচীন নরপতির অধিকার স্বীয় করতলগত করিয়া থাকেন, সেইরূপ বৎসর বৎসর নুতন জলপ্রোতঃ আসিয়া প্রবলবেগে পুরাতন তটভূমি ও সিকতারাশি বিভগ্ন ও বিধ্বস্ত করিয়া অল্প স্থানে নুতন চরের সৃষ্টি করিয়া থাকে। প্রবাহিনীর বেগ যত প্রবল হয়, নদী যত প্রখরা হয়, এই চর সৃষ্টি-ক্রিয়াও তত দ্রুত হইয়া থাকে। আমাদের ব্রহ্মদেশে নদ-নদীর অভাব নাই। পূর্ববঙ্গে ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, পদ্মা, তিস্তা (ত্রিপ্রোতা) ও পশ্চিম-বঙ্গে গঙ্গা, ভাগীরথী, প্রভৃতি কত নদ, নদী, উপনদী, শাখানদী প্রবাহিত হইতেছে। পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদের প্রবাহ যে যে স্থান বিধৌত করিয়া প্রবাহিত ছিল এখন সেই সেই স্থান নদী হইতে বহু দূরে। সেই গতি-পরিবর্তন কেন হইল বর্তমান নিবন্ধে তাহারই আভাস দেওয়া হইবে।

নদী সচরাচর উচ্চদেশ হইতে ক্রমশঃ নিম্নতর প্রদেশে ধাবিত হইয়া থাকে। সেইজন্য আমাদের সকল নদনদীই উন্নত হিমাচল-পর্বত-প্রদেশ হইতে উদ্ভূত হইয়া ক্রমশঃ বঙ্গদেশের সমতল ভূমি অতিক্রম করিয়া সাগর-গর্ভে নিপতিত হইয়াছে। প্রবাহিনী যখন উচ্চ প্রদেশ হইতে নিম্নতর

ভূমিতে প্রবাহিত হয় তখন সে গমনপথে বহু বাধা বিভিন্ন করিয়া প্রস্রবিত চূর্ণবিচূর্ণ প্রস্তর ও পলি বারিরাশির সহিত ভাসাইয়া লইয়া যায়। নদীর প্রথর গতি রোধ করিবার মত শক্তি অতি অল্প বস্তুই আছে। কিন্তু যে স্থানে কোন কারণে সেই প্রচণ্ড বেগের গতিরোধ হয়, সে স্থানে সে বার নদীর প্রবাহ বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত হয়। পর বর্গে বর্গাবারিপাতে পূর্ণা প্রবাহিনী আকুল আবেগে আবার সেই বাধা অতিক্রম করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করে। তখনও যদি তাহার শক্তি বাধার শক্তি অপেক্ষা ক্ষীণ হয় তাহা হইলে নদীর গতি চিরকালের জন্য অল্প দিকে কেবল যে ফিরিয়া যায় এমন নহে, পরন্তু সেই বাধা আপনার শক্তিবৃদ্ধি করিবার মত সামগ্রী লাভ করে। প্রবাহিনী যে সমস্ত চূর্ণবিচূর্ণ প্রস্তরাবলী ও পলীমাটির অংশ ভাসাইয়া আনিতেছিল, তাহার অধিকাংশই বাধার মুখে আগিয়া জমিতে থাকে; ক্রমশঃ অল্প সন্নিয়া যাইলে সে সব শুষ্ক হইয়া জমাট বাধিয়া নূতন স্তরে পরিণত হয়, আর পর বৎসর আবও প্রবল জলে বাধা দিবার অবসর পাইয়া থাকে।

বঙ্গীয় নদনদীর জীবন সংগ্রাম কত দিন হইতে কি ভাবে চলিয়া আসিতেছে এবং পরে কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহার কথাঞ্চি আভাস আমরা মিষ্টার টি, এইচ, ডি, লার্টন লিখিত এগিয়াটিক সোসাইটিতে পঠিত বৈজ্ঞানিক মন্দর্ভে পাইয়াছি।

আমাদের এই পৃথিবীর জন্মকাল হইতে মানবজাতির অস্তিত্বের পূর্ণ পর্য্যন্ত এই পৃথিবীতে কত প্রকার পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে ভূতত্ত্ব হইতে আমরা তাহার পরিচয় পাইয়া থাকি। এক কালে এই প্রাথমিক ভূতল চিরভূয়ান-নিহিত ছিল। ক্রমশঃ আভ্যন্তরিক উত্তাপ-সম্বন্ধে-বহু উপার-তল বিপর্য্যস্ত—বিধ্বস্ত হইয়াছে, বহু নূতন ভূমি জন্মদ্য হইতে উপরে উঠিয়াছে। হিমালয়ের গান পরীক্ষা করিয়া ভূতত্ত্ববিদগণ নির্দেশ করিয়া ছেন যে, এই অলভেদী হিমাচলও একদিন ভূয়ান-নিহিত ছিল। তাহার নানা নিদর্শন বর্তমান। এই হিমালয়-প্রদেশস্থ উপত্যকা ও অগ্নিত্যকানিচয়ে এই ভূয়ানবরণের অনেক নিদর্শন এখনও পণ্ডিত হইয়া আছে। তবে উপত্যকা-পাদদেশে নিদর্শন যত সহজে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, সমতল ভূমিতে তত অন্বেষণে নয়নগোচর হয় না। সেই জন্য সাধারণ সমতল ভূমিতে ভূয়ানবরণের তাদৃশ নিদর্শন বিজ্ঞমান নাই। তবে সমতল ভূমিতে নিদর্শন সংগ্রহ করিবার উপায় ও আছে। কোন নদীর তীরস্থিত উভয় দিকের

মৃত্তিকাস্তরের পৌরোপৰ্য্য সম্বন্ধ দৃষ্টিগোচর করিয়া এবং তাহা কি ভাবে বর্তমান রহিয়াছে এবং কিরূপে স্তর ভেদ করিয়া নদী তাহার গতি অব্যাহত রাখিয়াছে তাহার পূজাশুপূজা পরীক্ষা করিয়া প্রাচীন ভূসারাবরণের অনেকানেক নিদর্শন লাভ করা যায়।

গঙ্গা ও তাহার উপনদী সমূহের তটভূমি এইভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, তাহার পার্শ্বস্থ উভয় দিকের মৃত্তিকাস্তরের মধ্যে প্রাচীন পলী-স্তর বিস্তৃত আছে। এমন কি এই পলীস্তর সচরাচর বজ্রার সময় জল বহু দূর পর্য্যন্ত উঠিতে পারে তাহার অপেক্ষা প্রায় একশত ফুট উচ্চে বিস্তৃত। ভূতত্ত্ববিদগণ বলিয়া থাকেন যে, ভূসারাবরণ যুগ অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের। কাষেই যখন সেই ভূসারানি হইতে বারিরাশি পর্কত, উপত্যকা ও নদী-বক্ষ দিয়া প্রবাহিত হয় তখন বরফের চাপে অনেকানেক পর্কতগাত্র বিভগ্ন হইয়া যায়, এবং সেই অপরিমেয় বারিপ্রবাহ যে স্থান দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছিল সে স্থানের ভূমি বিধৌত হইয়া পলী মৃত্তিকারূপে প্রচুর পরিমাণে সেই জল মধ্যে ভাসিয়া আসিয়াছিল। পর্কতোপত্যকায় বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড এখন সেই ভূসারাবরণ কালের নিদর্শন স্বরূপ পড়িয়া আছে; আর সাধারণ সমতল ভূমিতে, নদীর ধাতে, তীর-ভূমির গাত্র প্রাচীন পলীস্তর-সেই একই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। যাহাকে অধুনা পূর্ববঙ্গের মধুপুর জঙ্গল বলে—যাহার উচ্চতা এখন বুদ্ধি পাইয়া সাধারণ বজ্রার জলসীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে—সেই মধুপুর জঙ্গল এইরূপে ভূসার-বিগলিত-জলরাশি-বাহিত পলী মৃত্তিকায় গঠিত বলিয়া মনে হয়। পরে বৎসর বৎসর বর্ষার জলাগমে নূতন পলী পড়িয়া তাহা বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। সামান্য চর ক্রমশঃ বিস্তৃত ভূমিখণ্ডে পরিণত হইলে নদীর গতিও যে বাধা পাইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে?

এইরূপে নদীর গতি প্রতিহত হইয়া নদীপ্রবাহ অন্য দিকে ধাবমান হইলে তাহাতে নদীতীরস্থ স্থানসমূহের অনেক প্রকার ক্ষতি হয়। আজ যদি ভাগীরথী ডিয়া দিকে প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে কলিকাতা নগরীর বিচিত্র সৌন্দর্য্য, বিপুল বাণিজ্য এ সব কোথায় যাইবে? ব্রহ্মপুত্র নদ পূর্বে ঢাকা নগরীর পূর্বদিকে প্রবাহিত ছিল এখন তাহার প্রবাহ কত দূরে গিয়া পড়িয়াছে! পরিবর্তন বিষয়কর।

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে মিষ্টার ফাউসন মধুপুর জঙ্গলস্থ ভূখণ্ড কিরূপে

মাগাচ চর হইতে এত উচ্চ ভূমিখণ্ডে পরিণত হইল, সেই বিষয় আশোচনা করিতে যাইয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন যে, এই মধুপুর জলস্রোত প্রদেশগম্য কোনপ্রকার “উর্দ্ধগমন ফলে” উৎথিত হইয়াছে এবং সেইজন্মই ব্রহ্মপুত্র নদের প্রবাহ মেঘনা ও শ্রীহট্টের “বিলের” দিকে প্রবাহিত হইয়াছে । কিন্তু এ কথা সহজে স্বীকার করা যায় না । কারণ তাহা হইলে সমস্ত প্রদেশেই বহু নৈসর্গিক চিহ্ন একটিত থাকিত । আর যদি মধুপুর জল এই প্রকার উর্দ্ধগমনজন্য উচ্চতা লাভ করিয়া থাকে তাহা হইলে ব্রহ্মপুত্র নদের প্রবাহ সাধারণতঃ ও স্বভাবতঃ পশ্চিম দিকে ধাবিত হইত ।

তিব্বতের সাঙ্গু নদীর জল পাইয়া ব্রহ্মপুত্রের শক্তি বিকাশ করিবার সুবিধা হইয়াছে । পূর্বে মানচিত্রে সাঙ্গুর প্রবাহ-পথ অতুল্য প্রদর্শিত হইত ; কিন্তু মিষ্টার রেনেল ১৭৬৫ খৃঃঅঙ্গে স্থির করেন যে, সাঙ্গুর জল ডিহাং নদী হইয়া ব্রহ্মপুত্রে, পতিত হইতেছে । এই জল না পাইলে ব্রহ্মপুত্রেব এত শক্তি-বিকাশ বোধ হয় সম্ভবপর হইত না । আর মিষ্টার বার্ড ও মিষ্টার হেডিন যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, এই জলাগমের পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ গঙ্গা নদী অপেক্ষা নিম্নে ও অল্পশক্তিসম্পন্ন ছিল । আর সেই জন্মই গঙ্গার আনীত পলীস্তরমণ্ডিত মধুপুর চর বা আধুনিক মধুপুর জল ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহকে স্থানলষ্ট করিয়া দিয়াছিল । কিন্তু যখন ডিহাং নদী দিয়া সাঙ্গুর জল একত্রিত হইয়া ব্রহ্মপুত্রে আগিয়া পড়িল তখন ব্রহ্মপুত্রের গতি অপ্রতিহত হইয়া উঠিল ।

অধুনা আবার তিস্তা নদীর ‘বিষাধাতকতায়’ গঙ্গার যে পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে ব্রহ্মপুত্রের সেই পরিমাণ শক্তিবৃদ্ধি হইয়াছে । ১৮৮৭ খৃঃঅঙ্গে তিস্তানদীর জল, গঙ্গা-বদল প্রবাহিত না করিয়া সহসা ব্রহ্মপুত্রে আগিয়া পড়ে ; আর সেই অবধি ব্রহ্মপুত্রের শক্তি অত্যন্ত বাড়িয়া উঠে । ইহার ফল কি হইবে তাহা প্রথমে কেহ বুঝিতে পারে নাই । ইহার পর হইতে গঙ্গার ও ব্রহ্মপুত্রের সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে, সংগ্রামের শেষ হইয়া যে ফলাফল নির্ধারিত হইয়াছে এমন মনে হয় না । হয়ত ভবিষ্যতে এই সংগ্রাম ফলোই বঙ্গের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ নূতন ভাবে গঠিত হইবে । ব্রহ্মপুত্র এখন যেক্ষণ ক্ষমতাশালী, তাহাতে সে যে তাহার বর্ত্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিবে এমন বোধ হয় না । কারণ, যত দিন পর্য্যন্ত আগামের উপত্যকা প্রদেশ সম্পূর্ণ ভাবে সমতলাকার ধারণা না করে, ততদিন ব্রহ্মপুত্র স্বীয় ভেজ ও পরাক্রম

প্রকাশে যত্নবান থাকিবে। বস্তার সময় নদীর পরাক্রম নিয়ন্ত্রণ প্রদেশেই সমধিক মাত্রায় প্রকাশ পাইয়া থাকে; কারণ খরস্রোতে উপর হইতে জল আসিয়া প্রবলবেগে নিয়ে জমিতে থাকে। ১৮৩৮ খৃঃাব্দে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের সম্মিলনের নিকট গঙ্গাকে এমন ভাবে সঙ্কুচিত হইতে হইয়াছিল যে গোয়া-লন্দের নিকট অনেক স্থলে লোকে পদতলে পার হইতে পারিত। এই কারণেই গরাই পল্লভোয়া ক্ষুদ্র নদী হইতে গভীর ও প্রশস্ত প্রবাহিনীতে পরিণত হইয়াছে। জল বদ্ধ হইয়া অতিরিক্ত জল গরাই নদী-গর্ভে প্রবাহিত হইয়া কলিকাতা হইতে উত্তরে গঙ্গাতীরবর্তী প্রদেশসমূহে যাতায়াতের বিলম্বণ সুবিধা করিয়া দিয়াছে। আবার এই রূপ নূতন বিস্ময়কর ঘটনার সংঘটন অসম্ভব নহে। কালে ভাগীরথীর জল একেবারে নিঃশেষিত হইয়া জমাদ্বীপ নিকট হইতে অতীতকৈ প্রধাবিত হইতেও পারে। এই ঘটনা ঘটিলে বর্তমান বঙ্গে কি স্বপ্নাতীত পরিবর্তন ঘটবে! ত্রিস্রোতাকে পুনর্বার যদি গঙ্গা-গর্ভে প্রবাহিত করিতে পারা যায় তাহা হইলে কতকটা সুফল ফলিতে পারে। কিন্তু স্বভাবের কার্য নিয়ন্ত্রিত করা অধিকাংশ স্থলেই মানবের বুদ্ধির ও শক্তির পক্ষে অসম্ভব। তবে বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিয়া ঈশ্বরের আশাও করিতেছে।

শ্রীকালীকুমার দত্ত।

— — — — —

সংগ্রহ ।

—ঃঃ—

সাহিত্য ।

— " —

ওমর খৈয়াম ।

আজকাল যুরোপে ওমর খৈয়ামের কবিতার যে অসাধারণ আদর লক্ষিত হইতেছে এডওয়ার্ড ফিট্জিরাউডের অনুবাদেই যে আদরের আরম্ভ । ওমরের কবিতায় মানব-হৃদয়ের অভূত-আকাঙ্ক্ষা-তৃষ্ণার অগ্র ব্যাকুল ব্যাণ্ডা যে ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—মানবের সুখলাভ-ভালসা যেরূপে প্রকাশ হইয়াছে—সংসারের অনিত্যতা যে প্রকারে পরিস্ফুট হইয়াছে তেমন আর কোথাও হইয়াছে কি না সম্ভব । সুতরাং যে কবিতার সমাদরে নিম্নিত হইবার কারণ নাই । সংগ্রহিত 'ইষ্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট' পক্ষে মুস্তাফা আলি বাঁ ফিট্জিরাউডের অনুবাদ উপলক্ষ করিয়া একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন । বর্তমান ক্ষেত্রে সেই প্রবন্ধ আমাদের অবলম্বন ।

ফিট্জিরাউড স্বভাবতঃ লাজুক ছিলেন । তিনি পল্লীগ্রামে নাম করিতেন ; মর্সিদা খোক-

পরিচয় ।

চক্ষুর অন্তরালে থাকিতে ভাল বাসিতেন । তিনি অগাধ সাহিত্য-

রসিক ছিলেন । ১৮৪৬ খ্রিষ্টাব্দে কাণ্ডমেলের সাহিত্য উহার পরিচয়

হয় । কাণ্ডমেলের আয়োজনায় ১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দে ফিট্জিরাউড পারসিক ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন । কাণ্ডমেল অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকাগারে ওমরের কবিতার এক-খানি পাণ্ডুলিপি পাইয়া অধ্যাপকরূপে কলিকাতায় আসিবার পূর্বে বন্ধুকে—উহার এক খানি প্রতিলিপি দিয়া আসিয়াছিলেন । কবিতাগুলি ফিট্জিরাউডের বড়ই ভাল লাগিয়াছিল । ইহার পর কলিকাতা হইতে কাণ্ডমেল বন্ধুকে অগাধ পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপিও পাঠাইয়া-ছিলেন ।

১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে ওমরের কবিতার ৭৫টি শ্লোকের অনুবাদ সম্পূর্ণ করিয়া ফিট্জিরাউড

অনাদর ও আদর । 'ফেজাবুস্ সাগাফিনে' প্রকাশার্ণ প্রেরণ করেন । উহা প্রকাশিত

না হওয়ায় কবি উহা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত করেন । তখন

মোট ২৫০ খানি পুস্তক মুদ্রিত হয় । পুস্তক বিক্রয় হয় না দেখিয়া প্রকাশক মূল্য ত্রাস করিয়া ইহা এক আনা (গম্ বনের, চার আনা) মূল্যে বিক্রয় করেন । সেই সময় কবি রসেটী ও কবি সুইনবার্ণ ইহার পরিচয় পাইয়া কথখানি পুস্তক ক্রয় করেন । কেতা দেখিয়া প্রকাশক মূল্য বৃদ্ধি করেন ও পরদিন পুস্তকের মূল্য দুই আনা বাধা হয় । ইহার পর

অনেকেই ইহার যশগৌরবে থাকিতে হইলেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে একজন আমেরিকান প্রথম সংস্করণের একখানি পুস্তকের মূল্য ৬৭৫ টাকা পর্যন্ত দিতে চাহিয়াছিলেন। ফিট্জিরাডের পুস্তক দাক্ষণ অনাদরের পর কিরূপ অসামান্য আদর লাভ করিয়াছে, ইহা হইতেই তাহা বুঝা যাইবে।

মশ বৎসর পবে পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তাহাতে ১১০টি শ্লোক সন্নিবিষ্ট ছিল। অনুবাদক অনুবাদে এত পরিবর্তন করিয়াছেন যে, **অনুবাদ।** পুনঃ পুনঃ পরিবর্তনে ও পরিবর্তনে ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণে পুস্তকের ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইয়াছে। প্রকাশিত অনূদিত শ্লোকগুলির মধ্যে প্রায় অর্দ্ধাংশ এক একটি মূল শ্লোকের অনুবাদ। প্রায় আর অর্দ্ধাংশ একাধিক মূল শ্লোকের ভাবব্যঞ্জক, চারিটিতে অল্প পারসিক কবির ভাব অভিব্যক্ত, আর কতকগুলি ফিট্জিরাডের মৌলিক রচনা।

যৎকালে নর্ম্মাণগণ ইংলণ্ড অধিকার করিতেছিল, তৎকালে নিশাপুরে (খোরাসান) **ওমর।** ওমরের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা দরিদ্র তাগু-নির্ম্মাতা ছিলেন; কিন্তু মেদানী পুস্তকে সুশিক্ষা দিতে ব্যয়কুঠ হইলেন নাই। ওমর শেষে প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ইমাম মৌয়াককের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। আবুল কাসেম ও হাসান বিন মাক্বা তাঁহার সতীর্থ ছিলেন। এই তিনজন বিদ্যার্থী উত্তর কালে পরস্পরকে উপাধিভূক্ত অর্থেই সমান অংশ দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। আবুল কাসেম স্থলভানের উজীর হইয়া বহু-দ্রব্যকে রাজকর্মে নিযুক্ত করিতে চাহিলে ওমর বিদ্রোহিতা করিবার জন্য রাজদরবার হইতে "বার্ষিক" চাহিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য বহু বহু প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। ওমর শিল্প দর্শন, অক্ষরাজ ও জ্যোতিষ চর্চা করিতেন। ওমর প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বহু পুস্তক প্রণয়ন করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। স্থলভান জেলাখুদীন যে মাটলন পণ্ডিতের উপর পল্লিকা-সংস্কারের ভার অর্পণ করেন, ওমর তাঁহাদিগের একজন। গত শতাব্দীর মধ্যভাগে একজন অর্ধাংশ অধ্যাপক ওমরের বীজপ্রসূত মশফীয় একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। ওমর অক্ষরাজের আলোচনায় কালাতিপাত করায় যুগ্ম যুগ্ম শ্লোক ব্যতীত অল্প কোনরূপ কবিতার রচনা করিয়া যাইতে পারেন নাই। প্রত্যেক শ্লোকে এক একটি সম্পূর্ণ ভাবের অভিব্যক্তি। মে'মকল শ্লোক এমনই সর্লীক্ষসুন্দর যে, অক্ষরাজের আলোচনায় অবসরের অভাবে ওমর যে আর অধিক কবিতার রচনা করিতে পারেন নাই, ইহা নিতান্ত আশ্চর্যের বিষয় বলিতে হইবে।

ফিট্জিরাডের মনে হইল, যেন ওমর তাঁহার মনের কথা বলিয়াছেন; যেন তিনি **অনুবাদ ও অনুবাদক।** ওমরের প্রতিকৃতি। যে ভাবপ্রাবল্য ও সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা ফিট্জিরাডের স্বভাববিন্দু—ওমরের কবিতায় তাহাই পরস্পূট। তাই বেন্সন্ সত্যই বলিয়াছেন, ওমরের উপমাানে নিপুণ শিল্পী ফিট্জিরাড অনিম্যসুন্দর রচনা রচিত করিতে পারিয়াছিলেন। ফিট্জিরাডের শব্দসম্পদের অভাব ছিল না। তিনি সুকবি ছিলেন। ওমরের কবিতায় তিনি যেন আপনার ঐচ্ছিক বস্তু পাইয়াছিলেন। যে ছন্দে তিনি ওমরের কবিতার অনুবাদ করিয়াছিলেন, সে ছন্দ ফিট্জিরাডের নিজস্ব।

নিদেশে পুঞ্জিত ওমর স্বদেশে জ্যেষ্ঠ কবিকুলে স্থান লাভ করিতে পারেন নাই। কেনন
 ওমরের আদর। যে দীর্ঘ কবিতা রচনা না করাতেই তাঁহার জ্যেষ্ঠকবিসম্মানলাভ
 ঘটে নাই, এমন নহে। তাঁহার কল্পনার দৌর্ভাগ্যই তাঁহার কারণ।
 তিনি অক্ষশাস্ত্রের চর্চায় নিমগ্ন থাকায়—কল্পনাকুশল হইতে পারেন নাই। তাঁহার
 হৃদয়াক্ষিত প্রত্যেক ভাব এক শ্লোকে মগ্নকাশ। কিন্তু সেই অচ্যুত সে মকল শ্লোক সম্পূর্ণ
 ও সুমধুর। কবির দেশবাসীদিগের নিকট যে কারণে তাঁহার সম্মানের অভাব, সেই
 কারণেই ফিট্‌জিরাড তাঁহার কবিতায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। অল্পবাদে ওমরের কবিতা
 ভোগের গান :—

স্বপ্নের আশা আছে, নরকের ভয়;
 আগি জানি, এ জীবন বহু দিন নয়।—
 এই কথা মত্যা জানি,
 আর সব মিথ্যা মানি।

এই কথা জানি আগি মার,—

যে ফুল বারেক ফুটে—ফুটে না সে কখন আবার।

ওমরের কবিতার মতামত লইয়া বহু বিতর্ক হইয়াছে। সে কবিতা ভোগের, কি গর্হের,
 মতামত। তাঁহার বিচারের অবসর আমাদের নাই। তবে হেরন এজেন্স
 মতাই বলিয়াছেন, ওমরের কবিতামুকুরে প্রত্যেক পাঠক স্বীয়
 হৃদয়ের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইবেন। ফিট্‌জিরাড সে কবিতায় আপনাত মতের অভিব্যক্তি
 দেখিয়াছিলেন। তাই তাঁহার অল্পবাদ তাঁহাকে ইংরাজি কবিকুলে স্বর্গাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া
 তাঁহাকে অক্ষয় যশে বশীল করিয়াছে।

ওমরের কবিতার অল্পবাদে ফিট্‌জিরাড অসাদারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। অসাদারণ
 কৃতিত্ব। নটন বলিয়াছেন, অল্পবাদ একজন কবির ভাবে অল্পপ্রাপিত অচ্য
 কবির কবিকীর্তি, ইহা অল্পকরণ নহে, প্রতিকৃতি, অল্পবাদ নহে—

কবির ভাবের পুনরাভিব্যক্তি। ডেনহাম বলিয়াছিলেন, কবিতার মাদুরী অল্পবাদে থাকে
 না; যদি অল্পবাদে অল্পবাদক নূতন ভাবের সঞ্চার করিতে না পারেন, তবে তাহা সমসী
 শব্দসমষ্টি মাত্র হয়। ফিট্‌জিরাড অল্পবাদে নূতনভাব-সংস্কারে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি
 ওমরের ভাবে গুতপ্রোত হইয়া ওমরের কবিতাকে আপনাত মজায় মজিত করিয়াছিলেন—
 তাই ইংরাজি ভাষা যতদিন স্থায়ী হইবে—ফিট্‌জিরাডের অল্পবাদ ততদিন অমর।

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।

রাজপুত রাজ্যে।

এখন প্রতি বৎসর হিমাগমে বহু বিদেশী ভ্রমণকারী ভারত-পর্যটনে আসিয়া থাকেন। স্বদেশে বর্ষব্যাপী কার্যের পর এ ভ্রমণ বিশ্রামের মাগান্তর মাত্র। বিশেষ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য প্রভেদ এমন এখনও পরিস্ফুট যে, মাধারণ ভ্রমণকারীর পক্ষে ভারত-ভ্রমণে নূতন নূতন দৃশ্যদর্শন ব্যতীত বিশেষ কিছু লাভ ঘটে না; ভারতের অন্তর্নিহিত রহস্যভেদ তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। ভারত-ভ্রমণ কষ্টবহুল জীবনের বিরলপ্রাপ্ত সুখমাত্রেরে পর্য্যবসিত হয়। কিন্তু সকল নিয়মেরই ব্যতিক্রম আছে। কোন কোন বিদেশী ভ্রমণকারী সতর্ক পর্য্যবেক্ষণশক্তির পরিচালনা করিয়া ভারতের অন্তর্নিহিত রহস্যভেদ করিতে সচেষ্ট হয়েন—সে চেষ্টা, সর্বত্র না হউক, কোথাও কোথাও যে সফল হয় তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। বিশেষ যে মহাহুভূতি ব্যতীত অপরের হৃদয়ে প্রবেশাধিকারলাভ অসম্ভব, সে মহাহুভূতি-সম্পন্ন যাহাদিগের থাকে তাঁহাদিগের চেষ্টা সহজে সফল হয়। এইরূপ সাকল্যের ফল ‘পিয়েরলোটি’ ছদ্মনামধারী ফরাসী লেখকের ও মার ফেড্রিক ট্রিভগের ভারত-ভ্রমণ-বিবরণে দেখা যায়। গত বৎসর মিষ্টার রামজে ম্যাকডোনাল্ড ভারত ভ্রমণে আসিয়াছিলেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি আপনাত ভ্রমণবিবরণ ও অভিজ্ঞতার বিষয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত করিতেছেন। ‘ডেলি ক্রনিকেল’ পত্রে তিনি রাজপুতরাজ্যের বিষয়ে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন নিম্নে তাহার মার সংক্ষিপ্ত হইল :—

বনোদার উর্বরে ভূমি সমতল ও তৃণাকৃত। প্রাকৃতিক দৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গে দেশের

পুরাতন।

অমিনাসিগণের পরিবর্তন ও সহজে অলুভূত হয়। ইহারা সমধিক

‘দর্শনধারী’। ইহাদিগের শত্রু মধ্যভাগে বিভক্ত ও কর্ণ পার্শ্ববন্ধ।

ইহাদিগের হস্তে পুরাতন আগ্নেয়াস্ত্র ও তরবার। সফ্যাগমে চারি দিকে নানা পথ দিয়া গৃহপালিত পশুপাল গোমে ফিটিয়া আইসে। এই রাজপুতানা—দীর্ঘপ্রমবিনী—বীরাজনা-সমভূমি। বনোদা যেন হাসিয়া বলে, “আমি নূতন।” রাজপুতানা গর্বিত স্বরে বলে, “আমি পুরাতনপ্রিয়”। রাজপুতানার কোন কোন অংশ বাণিজ্যের ও রাজনীতির আক্রমণ ইতে অব্যাহতি লাভ করে নাই; কোন কোন রাজপুত রাজা বিদেশীর অত্যাচারতৎপর। কিন্তু এসব পরিবর্তন এখনও সর্বত্র সংক্রমিত হইতে পারে নাই।

রাজপুত রাজাদিগের মধ্যে প্রতাপ সিংহের সহিত লেখকের প্রথম পরিচয় হয়। তিনি

শৌর্য।

দুঃখ করিয়া বলিলেন, তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন; হায়ত তাঁহার ভাগ্যে

আর নগ্নক্ষেত্রে গমন নাই। ইহার সহিত দুই তিন দিন একত্রে বাস

করিয়া লেখক রাজপুতের স্বভাবগিজ শৌর্যের বিষয় বুঝিতে পারেন। সে শৌর্য চিতোরের

মান । ভারতে গমন করিয়া ধর্মসকলপুষ্ট চিত্তোন্নয়ন মানিত, প্রাসাদ, বাগিচা, মনোহর বা দেবিলে ভারত ভ্রমণ পণ্ডিতমহাজ । চিত্তোন্নয়ন পুরজাতিতে কিম্বদন্তী কি পুতলকদান বিলভিত করিয়াছে । সুদূর-প্রাচীর-মণ্ডলভী তোরণ বহু বক্রিম পথে যাইতে যাইতে মেন মনে হয়, রাজপুত মেনার অশ্বপদধ্বনি প্রতিগোচর হইতেছে ; পর্বতের পাদদেশে শু উপরে অবস্থিত পল্লীর কোলাহল শুনিয়া মনে হয়, সুখি রাজপুত নারী যোগলের হস্ত হইতে উচ্চাৎ পাইবার জ্ঞান গাহিতে গাহিতে ছতাননে আত্মসমর্পণ করিতে যাইতেছেন । এই পথে --এই ধর্মসমুপের উপর যাইবার সময় নয় পদে নয় দশকে যাইতে হয় । এ মহাশ্রমানে সবই পবিত্র । সজ্জা হইয়া আসিল । সহসা চারিদিকে বায়ামনি ভক্ত হইল,—মন্দিরে মন্দিরে দীপ জ্বলিয়া উঠিল,—স্বব্রজোক্ত পাঠের উদাত্ত ধ্বনি শ্রবণ পূর্ণ করিল । মনে হইল, মেন সমস্ত দেশের উপর অতীতের ছায়াপাত হইল । চিত্তোন্নয়ন অতীত মৃত নির্মাণে তাহার স্বরূপ অনুভূত হয় । কিন্তু মৃতন রাজধানী উদয়পুরে অতীত দিবালোককে দেদীপ্যমান ।

অপ্সৃষ্ট যেমন মন্দিরের বাহিরে দাঁড়ায় মন্দিরমধ্যে তাহার প্রবেশাধিকার নাই—রেল পথ তেমনই উদয়পুরের বাহিরে শেষ হইয়াছে । তথা হইতে নগর জায় এক জোশ দূর ।

উদয়পুর । নগরে বহু সমৃদ্ধ খেত প্রাসাদ ও মন্দির—চারিদিকে পর্বতেও প্রাসাদ, দুর্গ ও মন্দির ।

রাজপথে ভ্রমভূমিত নগরায় সমাসীদা যাতায়াত করিতেছেন, বা তরুতলে উপবিষ্ট হইয়া অনন্তের চিন্তা করিতেছেন । নগরে যাইয়া লোক শুনিলেন, প্রাসাদ হইতে ধর্মসংস্কে শোভামাত্রা আরম্ভ হইয়াছে । অশ্ব ও গজ বহু লোক আসিতেছে—স্বর্গাভিজাতলে মহারাজা স্বয়ং আসিতেছেন । শৃঙ্গনাদ, ঢকানাদ, ভেরীনাদ শ্রুত হইতেছে । বর্ষা শেষ হইয়াছে । পূর্বে এই সময় সামন্তগণ সমবেত হইয়া রাজার সহিত যুদ্ধযাত্রা করিতেন । যাত্রার পূর্বে দেবতাকে ভূষ্ট করা আবশ্যক । সেই জন্ত একজন সাধু অশ্ব তরবার লইয়া অনাহারে—অনিজার দশ দিন মন্দিরে বসিয়া থাকিতেন, প্রতিদিন সন্ধ্যার পূর্বে সমাস্ত মহারাজা তাঁহাকে প্রণাম করিতে আসিতেন । এখন শু মেরি প্রথা প্রচলিত আছে । গরলোকগত কোম রাজার তরবার অশ্ব লইয়া একজন যোগী মন্দিরে বসিয়া আছেন—মেন দেশে শান্তি সংস্থাপিত হয় নাই—মেন বর্গের পর দিকে দিকে রণবাছ বাজিয়া উঠে । পর দিন প্রাতে মহারাজা লোককে ডাকিয়া পাঠাইলেন । প্রাসাদমধ্যে সবই গোলমাল ; রবিকরদীপ্ত অমলমণ্ডলপ্রাচীরপরিবেষ্টিত প্রাঙ্গণে উষ্ট্র, অশ্ব, গজ বিহগ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে । শিশু হইতে বৃদ্ধ সবই তথায় বিচরমান । বিচারার্থীরা আবেদন পত্র লইয়া দ্বারে বসিয়া আছে, মৈনিকগণ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, লোক ও পারিষদগণ স্তম্ভে হেলান দিয়া বসিয়া আছে বা মর্ম্মরবেদীতে শয়ন করিয়া আছে । বহু পথ ও সোপান অতিক্রম করিয়া লোক রাজার সমীপে নীত হইলেন ।

রাণা বলিলেন, তিনি পূজায় ব্যাপৃত ছিলেন । তাঁহার অশ্ব একখানি তরবার ছিল । তিনি সেখানি নাড়িতেছিলেন । রাজার নিকটে আসিলে মনে হয়, মেন সুদূর অতীতে

উপনীত হইলাম । রাজার গর্ভ এই যে, তাঁহার পরিবারের সহিত কখন মুসলমানের বিবাহ-সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয় নাই ; তিনি কখন রাজ-

পুত্রে মূল মজা ত্যাগ করেন নাই :—যে মর্গ রক্ষা করে, মর্গ তাহাকে রক্ষা করে। তিনি বলেন, তিনি প্রাচীন প্রথার সমর্থক। রাজ্যে ভ্রমণ কালে তিন মহত্ব অল্পতর তাঁহার মহাগামী হয়। তিনি প্রতিদিন প্রাতে দেবপূজা করেন, প্রতিদিন বিচারার্থীদিগের আবেদন শুনে; মৃগ্যুর্গী বঞ্চিত করিয়া ভরবার-চালন-কৌশল অব্যাহত রাখেন। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ যেমন মোগলের আঘাত বীকার করেন নাই, তাঁহার ঘড়ী ও তেমনই কলিকাতার সময় রাখেন না। লোক মগন প্রাচীন প্রথার বিরোধের প্রতিবাদ করিলেন, তখন রাজা বলিলেন, তাঁহার সামন্তগণ সকলে প্রাচীনের প্রতি অল্পরক্ত নহেন। রাজপুত্রে দেশে—প্রাচীনের প্রিয় ভূমি ও বিজয় ছর্গ রাজপুতানায় পুরাতনের স্থান নূতন অধিকার করিতেছে। ইহা অনিবার্য। তবে পুরাতনের ভিত্তি উপর যে নূতন প্রতিষ্ঠিত হয় তাহাই স্থায়ী হয়, তাহাই সমাজের উপযোগী ও উপকারী; অক্ষ অল্পকরণ-প্রিয়তার ফলে যে নূতনের অভ্যুদয়, তাহা সমাজের কল্যাণকর হয় না।

—ঃঃ—

বিবিধ ।

ভারতীয় অবস্থা ও ব্যবস্থা ।

মার থিয়োডোর মরিসন আলিগড়ে মুসলমান কলেজের পরিচালক ছিলেন, এক্ষণে ইংলণ্ডে অবস্থিতি করিতেছেন। ইনি কিছু দিন পূর্বে ভারতে শিক্ষা-সংস্থান বিষয়ে একখানি পুস্তক প্রকাশিত করিয়া অর্থনীতির আলোচনা করিয়াছেন। এই পুস্তকে তিনি আলা ও অবোধ্য অঞ্চলের অবস্থান ও ব্যবস্থার আলোচনা করিয়াছেন। এই অঞ্চলের সহিত তাঁহার পরিচয় সমুদয়বর্ষব্যাপী। সুতরাং এই অঞ্চলের অবস্থান ও ব্যবস্থার আলোচনার তাঁহার বিশেষ সুবিধা ছিল। আমরা অর্থনীতি সম্বন্ধে যে সকল যুরোপীয় ও আমেরিকান পুস্তক পাঠ করি, সে সকলে বর্ণিত অবস্থার সহিত ভারতের অবস্থার তুলনার আলোচনা দাতীত আমাদেব উপকারের সম্ভাবনা নাই। সকল দেশে ও সকল সমাজে একই ব্যবস্থা উপকারী হয় না,—হইতে পারে না। যে সকল ব্যবস্থা সমাজবিশেষের পক্ষে হিতকর, সে সকল অন্য সমাজের পক্ষে যে হিতকর হইবেই এমন নহে। মৃষ্টান্তরূপ ইংলণ্ডে অল্পতর অবাধ বাণিজ্য ব্যবস্থার উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভারতের অবস্থা বুঝিয়া ভারতীয় ব্যবস্থার নির্ধারণ প্রয়োজন। ভারতে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আলোচনা এখনও যথেষ্ট হয় নাই। এ সম্বন্ধে পরলোকগত রানাড়ে মহোদয়ের পুস্তকই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু সে পুস্তকও এই অটল বিষয়ের সম্পূর্ণ বা সর্বাংশের আলোচনা নহে। তিনি কেবল পথ দেখাইয়াছেন মার থিয়োডোর সংগ্রহিত লিখনে ভারতীয় অবস্থা ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে কমটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন। সে সকল প্রবন্ধে ভারতীয় অর্থনীতির কথা আলোচিত হইয়াছে। আমরা নিম্নে তাঁহার কথার মারসঙ্কলন করিয়া দিলাম :—

বহুদিন পূর্বে 'এরিক ম্যাকে' বলিয়াছিলেন, ভারতে অসাড়তা সর্বব্যাপী, ছাতিশস্ত্র লাগিয়াই আছে । ভারতে ছাতিশস্ত্র এখন ষড়পরিবর্তনের সহিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে । কামের

ছাতিশস্ত্র । ভারতের অর্থনীতির কোন কথা বলিতে হইলে সর্বোপরি ছাতিশস্ত্রের কথা বলিতে হয়, ছাতিশস্ত্রের কারণে কাদামুখীজাতির অপমান

ব্যতীত ভারতের ভাগ্যগগনে সূর্যমুখ্যালোকনিকাশ অসম্ভব । মাত্র বিমোড়ের শুভাশংকিতীয় একে ভারতে ছাতিশস্ত্রের কথা বলিয়াছেন । তিনি বলেন, মেকাকো পনের ও যানের অসুবিধা থাকায় এক স্থান হইতে অন্য স্থানে অল্প পরিমাণ বাদ্যজবাহার অসম্ভব ছিল । মেকাকো যুরোপে ও ভারতে এই কারণে সর্বদাই ছাতিশস্ত্রের ভয় থাকত ; তখন ধনবানগণ ইচ্ছা করিলেও বিপদের নিপদ নিবারণ করিতে পারিতেন না । ভারত বর্ষে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে পাকা রাস্তা, খাল, রেলপথ প্রভৃতির আবর্তনের ফলে ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে-ছাতিশস্ত্র-কালে ছাতিশস্ত্র পীড়িত স্থানে ও শস্ত-সম্পদ-সম্পন্ন স্থানে বাদ্যজবাহার যুলোর ভারতম্য হয় নাই । এই প্রায় সরকারের পক্ষে বাণিজ্যের ব্যবস্থাপনাবর্তন আবশ্যক হয় নাই । কিন্তু বাদ্য জবাহার পাইলেও লোকের বিনিবারণ সাধ্য কোথায় ? ভারতে বৎসর না ফিরিলে—আবার বর্ষের সিল্ক ভূমিতে শস্ত উৎপন্ন না হইলে ছাতিশস্ত্রের একোটা ক্রান্তি হয় না । এইপ্রায় মেকাকো ল্যাক্সামায়ের তুলার ছাতিশস্ত্র শতকরা গাড়ে আটকান লোক মাত্র বিপন্ন হইয়াছিল, আর ভারতে ছাতিশস্ত্র শতকরা পঁয়ষট্টিজন লোক বিপন্ন হয় । তাই সরকার বিপন্নদিগকে বাটাইয়া পানিশ্রমিক দিবার ব্যবস্থা করেন ।

মাত্র বিমোড়ের পুরাতন কথা বলিয়াছেন, এক পক্ষে কথা বলিয়াছেন । রেলপথ বিস্তারের সহায় সুবিধার কথা কেহ অস্বীকার করেন না । কিন্তু ইহার অসুবিধার দিনটা

এবেবাবে উড়াইয়া দেওয়া যায় না । রেলপথ সম্বন্ধে ভারত সরকার

ভালমন । কারের ভূতপূর্ব পরামর্শদাতা মিষ্টার হোয়েস বেল এ বিমোড়ের আলোচনা করিয়াছিলেন । তিনি বলিয়াছিলেন, ১৮৮১-৮০ খ্রিষ্টাব্দে ছাতিশস্ত্র কমিশন বলিয়াছিলেন—রেলপথ বিস্তারে ছাতিশস্ত্র দুই নাই হউন ছাতিশস্ত্রের আটোপদায় হইবে । তখন তাঁহারা বলিয়াছিলেন আর ১০,০০০ মাইল রেলপথ বিস্তৃত হইলে ছাতিশস্ত্র মানব মনস্কামী হইবে । এখন ১০,০০০ মাইলের অধিক রেল পথ বিস্তৃত হইয়াছে, কিন্তু ছাতিশস্ত্র-দমন হয় নাই । রেল-বিস্তারের ফলে বাদ্যশস্ত্রের অপ্রাপ্তি অসম্ভব হইয়াছে ; কিন্তু হয়ত রেলপথ-বিস্তারের ফলেই খাদ্য-শস্ত্রের মূল্য এত বাড়িয়া যায় যে, দরিদ্রের পক্ষে তাহা জয় করা অসাধ্যসাধন হইয়া দাঁড়ায় । মাত্র অর্জ ক্যামেল বলিয়াছিলেন, পনের সুবিধার ফলে লোকে শস্ত সরকার অধ্যায় ত্যাগ করিয়াছে ; ফলে স্তম্ভমগে সরকারী না হইয়া তাহারা দুঃসময়ে দুর্ভিক্ষ পতিত হয় । ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে ছাতিশস্ত্র কমিশন শু এই কথা স্বীকার করিয়াছিলেন । আবার পনের সুবিধায় এখন অনেক খাদ্য শস্ত প্রত্যক্ষভাবে বিদেশের প্রায় অল্প শস্তের চায় হইতেছে । আবার একে ত খাদ্যশস্ত্রের মূল্য যে হারে বাড়িয়াছে পানিশ্রমিক সে হারে বাড়ে নাই, তাহাতে আবার পনের সুবিধায় ছাতিশস্ত্রের আন্তর্ভূত শক্তিজনগণ পল্লী হইতে কর্মক্ষেত্র সহরে আসিয়া পানিশ্রমিকের হার আরও বর্ধাইয়া

দেয় । সুতরাং রেলপথ বিস্তারে সুবিধাও যেমন—অসুবিধাও তেমনই । ইহাতে উপকার ও অপকার উভয়ই আছে ।

এবলাস্তরে সার থিরোডোর ভারতে পুরাতন ব্যবস্থার পরিবর্তনের কথা বলিয়াছেন । তিনি তিন স্থানের মধ্যে যাতায়াতের অসুবিধা, ভ্রমবিভাগের অভাব, মূলধনের অল্পতা ও ভ্রমজীবী কর্তৃক শিল্পের পরিচালনা পূর্ববর্তী ব্যবস্থার বিশেষত্ব অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ । ছিল । এখন সে ব্যবস্থা পরিবর্তিত হইয়াছে । অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে যেমন প্রাচীরের স্থান নবীন অধিকার করিয়াছিল, এখন ভারতে তেমনই পুরাতনের পতন ও নূতনের অভ্যুদয় হইতেছে । যাতায়াতের সুবিধা ব্যতীত নূতন ব্যবস্থার প্রযুক্তি অসম্ভব, সে সুবিধা হইয়াছে । ইহাতে নৈকিছু অপকার হইয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই । এই সুযোগে বিদেশী দ্রব্যের প্রবল প্রতিযোগিতায় ভারতের সমুচিত শিল্পের সর্বনাশ হইয়াছে । দৃষ্টান্ত স্বরূপ কলকাতার আমদানীতে তাঁতের সর্বনাশের উল্লেখ করা যাইতে পারে । কিন্তু ক্ষতির তুলনায় লাভ অনেক অধিক । ভারতেও কলকারখানা সংস্থাপিত হইয়াছে ও হইতেছে । বাস্তবিক ভারতে কলকারখানা সংস্থাপন একপাশে এবং বৈদেশিক সম্পাদিত হইতেছে যে, যুরোপেও সর্বত্র সেকণ হয় নাই । যূত রাণাড়ে মহোদয় ইহা বুঝিয়াছিলেন । তিনি বলিয়াছিলেন, ভাবতবর্ষ পূর্বে কেবল কৃষিজাতের উৎপাদনে ব্যাপ্ত ছিল, এখন ভারতে কলকারখানা সংস্থাপিত হইতেছে, বাণিজ্য ও প্রসার প্রাপ্ত হইতেছে । একথা যে সত্য তাহাতে সন্দেহ নাই । বিশেষ অল্প দেশের প্রবল প্রতিযোগিতার প্রতিকূলে দাঁড়াইয়া আত্মরক্ষা করিতে হইলে ভারতের পক্ষে প্রতীচ্য প্রথার অবলম্বন আবশ্যিক । কিন্তু ইহাতে ভারতের দারিদ্র্য-সমস্যার সমাধান হইবে না । প্রতীচ্য প্রথায় যে গ্রহবন্ধ শিল্পের (compulsory industries) সর্বনাশ হইয়াছে, সেই শিল্পে দেশে দারিদ্র্যের প্রকোপ নিবারণ হইতে পারে । যুরোপে ও আমেরিকায় বড় বড় কলকারখানার ফলে একদিকে পুঙ্খবুদ্ধি মন—অল্প দিকে দারিদ্র্য দারিদ্র্য, একদিকে গর্বিত মনী—অপর দিকে নিম্পিষ্ট ভ্রমজীবী—সমাজে বিষম অশান্তির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে । সার থিরোডোর সে সকলের আলোচনা করেন নাই । তাই তাঁহার প্রবন্ধ এক পক্ষের কথায় পূর্ণ ।

সমালোচনা ।

রাজনারায়ণ বসুর আত্ম-চরিত ।*

রাজকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ‘প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাসের’ সমালোচনা করিতে যাইয়া বন্ধিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন,—“মে দাতা মনে করিলে অর্ধেক রাজ্য ও এক রাজকন্ডা দান করিতে পারে, মে মুষ্টি ভিক্ষণ দিয়া ভিক্ষুককে বিদায় করিয়াছে।” আজ রাজনারায়ণ বাবুর আত্ম-চরিতের আলোচনা করিতে যাইয়া সেই কথা আমাদের মনে পড়িতেছে। রাজনারায়ণ বাবু বাঙ্গালার সন্ধি যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন মুসলমান প্রভাবে প্রভাবিত বাঙ্গালার “মরা গাঙ্গে”—ইংরাজী প্রভাবের বজ্রা অবেশ করিতেছে। সেই নূতনের ও পুরাতনের সন্ধিকালে রাজনারায়ণ বাবুর জন্ম। তৎকালে দেশে ধর্ম্ম, শিক্ষা, রাজনীতি ও সমাজ—এই সব দিকে সংস্কার কার্য্যে যাহারা প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাঁহারা ঐয়া সকলেই বসু মহাশয়ের বন্ধু বা সহকর্মী। স্মরণ্য তিনি ইচ্ছা করিলে নব্য বাঙ্গালার প্রথম যুগের বিশদ ইতিহাস লিখিতে পারিতেন। ভুল্টেয়ার দেখাইয়াছেন,—নৃপতির বিবরণে ও যুদ্ধের বর্ণনায় ইতিহাস সম্পূর্ণ হয় না—দেশের লোকের অবস্থার আলোচনাই ইতিহাসের উদ্দেশ্য। দেশের জনগণের নেতৃবৃন্দের—সংস্কারকদিগের কথা ইতিহাসের হিমায়ে নৃপতিবৃন্দের কার্য্য-বিবরণের অপেক্ষা অধিক মূল্যবান। নবীনচন্দ্র বলিয়াছেনঃ—

“ভারতের পরাক্রান্ত নৃপতিনিচয়
হয়েছে অদৃশ্য সহ রাজ্য-সিংহাসন,
ত্রিকালের সীমা শুই হের নিকৃষিয়া
দাঁড়ায়ে রয়েছে তিন দরিদ্র লাক্ষণ,
নগর জোনা কিতানি গিয়াছে নিবিয়া,
অমর তারকাগুলি রয়েছে চাহিয়া।”

বাঙ্গালার সমসাময়িক সামাজিক ইতিহাস লিখিবার স্রোত ও সম্ভব রাজনারায়ণ বাবুর ছিল। নব্যবঙ্গের গঠনকারীরা অনেকেই মে বসু মহা-

* রাজনারায়ণ বসুর আত্ম চরিত—কুস্তলীন প্রেস হইতে প্রকাশিত, মূল্য কাগজে বাঁধাই ১৮/০, কাগজের থলিতে ১৮/০।

শয়ের বন্ধু বা সহকর্মী ছিলেন, সে কথা পূর্বেই বলিয়াছি। আবার যে স্বল্প পরিবেক্ষণশক্তি ঐতিহাসিকের আবশ্যক গুণ, বস্তু মহাশয়ের তাহা প্রচুর পরিমাণ ছিল। আশোচ্য পুস্তকে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। নিম্নোক্ত—সমিতি-বর্ণনায় পাঠক তাহার পরিচয় পাইবেন। ইহাতে অল্প কথায় তিনি অনেক লোকের ও ঘটনার এবং সঙ্গে সঙ্গে সে সময়ের আচার-ব্যবহারের চিত্র চিত্রিত করিয়াছেন। আর তাঁহার অসাধারণ সরলতার আলোকে সেই চিত্র উদ্ভাসিত :—

“১৮৭৫ সালে ৩০শে জুলাই তারিখে আমি তদানীন্তন লেফটেনেন্ট গবর্নর সার্ জর্জ টেম্পল দ্বারা বেলভিডিয়ায় ভবনে সাক্ষাৎ সম্মিলনে নিমন্ত্রিত হই। ঐ সাক্ষাৎ সম্মিলনে সকল প্রসিদ্ধ বাঙালী প্রত্নতাত্ত্বিককে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। সার্ জর্জ টেম্পলের বাহা দোষ থাকুক না কেন তাঁহার একটি মহৎ গুণ ছিল। তিনি বাঙালী জাতিসাধারণের প্রিয় হইবার চেষ্টা করিতেন। আমি যে ভাড়াটিয়া গাড়ীতে বেলভিডিয়ায় যাই, সেই গাড়ীতে প্রসিদ্ধ নাট্যকলা মনোমোহন বসু ছিলেন। তিনি আমাকে বলিলেন, ‘ছোটলাট বাহাদুরের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিব তাহা প্রতি পদে পদে আমাকে শিক্ষা দিবেন।’ আমরা যখন পিয়া পৌজিলাম তখন ছোটলাট অনেকগুলি প্রসিদ্ধ সাহেবের সহিত আহ্বান করিতেছিলেন। আমরা পিয়া চাপরাসী-প্রদত্ত আসনে বসিলাম। সাহেবরা আহ্বানের পর যে ঘরে আমরা ছিলাম সেই ঘরে আসিলে আমরা চাপরাসীশ্রেণীর স্থায়ী ছই লাইনে কাতার দিয়া দাঁড়াইলাম। তাহার মধ্য দিয়া ছোটলাট ও ছোটলাট পত্নী প্রত্যেকের সঙ্গে কন-মর্দন করতঃ চলিয়া যাইতে লাগিলেন। নরায়ণী লেডি টেম্পল পিঙ্গী ঠাকুরাণীর স্থায়ী প্রদত্ত করতঃ সকলের প্রতি সদয় ব্যবহার করিলেন। তিনি এমন সদয় ও স্নেহ ব্যবহার করিলেন যে তাঁহাকে আমি মনে মনে পিঙ্গী ঠাকুরাণী না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। ছোটলাট যখন চলিয়া যাইতে লাগিলেন এই কথা বর্ণনার সময় মণ্ডল চলিয়া যাইতে লাগিলেন আমার বলা উচিত ছিল। এমন ক্ষমকাল গৌফ কখন দেখি নাই। সার্ জর্জ টেম্পলের নিকট তাঁহার গৌফ বড় স্বাধীন বিষয় ছিল। লোকে বলিত যে তাঁহার গৌফ নেপোলিয়ান বোনাপার্টের স্থায়ী ছিল। যেমন তিনি আমাদের মধ্য দিয়া প্রত্যেকের করস্পর্শ করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন গভর্নমেন্টের বঙ্গোত্তরাদক রবিনসন সাহেব (টোনসেণ্ড ও রবিনসনকে বুড়া শিশু মার্শমেনের নন্দী ভূষী বলিয়া ঈশ্বর গুপ্ত বর্ণন করিয়াছিলেন) আমাদের প্রত্যেকের পরিচয় তাঁহার নিকট দিতে আরম্ভ করিলেন। সকল প্রত্নতাত্ত্বিক অপেক্ষা মনোমোহন বসু ছোটলাট সাহেবের নিকট অধিক আদর প্রাপ্ত হইলেন। অতএব ছোটলাট সাহেবের নিকট কিরূপ আচরণ করিতে হইবে সে বিষয়ে আমাদের নিকট হইতে তাঁহার আর কোন শিক্ষা লইতে হইল না। বরং তিনি যদি আমাদের প্রতি নেকৃ মন্তব্য করিতে লাট সাহেবকে অস্বস্তি করিতেন তাহা হইলে শোভা পাইত। হেয়ার সাহেবের স্কুলের শিক্ষক হরলাল রায়ের প্রণীত ‘বঙ্গের স্মৃতিস্মান

নাটকের কথা পাড়িয়া ছোটলাট তাঁহাকে উপহাস করিতে লাগিলেন। সেই নাটকে হরলাল বাবু (কবি) পরিমাণে স্বাধীনতাস্বপ্ন প্রকাশ করিতে ছোটলাট সাহেবের নিকট উপহাসাস্পদ হইয়াছিলেন। * * উল্লিখিত সাক্ষ্য সম্মিলনে সালোয়ার (ঐ সময়ে ভারী) গবর্নর এন্টিকফ্ সাহেব উপস্থিত ছিলেন। তিনি ভারত ভ্রমণ জন্ত ঐ সময় বিদ্যা হইতে আসিয়াছিলেন। উক্ত সম্মিলনে বঙ্গহিতৈষী মনসী কটন সাহেব উপস্থিত ছিলেন। ইনি মেদিনীপুরে যখন আসিষ্ট্যান্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন তখন তথায় আমার নাম অনিয়াছিলেন। তিনি আঃ হের সহিত আমার সঙ্গে আলাপ করিলেন। এই সম্মিলনে মুঁসে মিনাসফ্ উপস্থিত ছিলেন। ইনি কুমদেবী পণ্ডিত, সংস্কৃত ভাষা জানেন। ইনি একদিন আমি প্রাকসমাধের কার্যালয়ে গিয়া আমার প্রণীত ইংরাজী পুস্তিকাসকল জমা করিয়াছিলেন। ইনি আগ্রহের সহিত আমার কন্মর্দন করিলেন। ইনি এই সময়ে ভারত-ভ্রমণার্থ আসিয়া-ছিলেন। বিখ্যাত মহেশচন্দ্র গায়ত্রকের সমভিব্যাহারে ইনি ভাটপাড়া ও নবদ্বীপের টোল সকল পরিদর্শন করিয়াছিলেন। পরিদর্শন সময়ে তিনি কেবলই ইংরাজের নিম্নাবাদ ও ক্রমের প্রশংসাবাদ করিয়াছিলেন। মার রিচার্ড টেম্পল তাঁহার রোটস্ নামক বিলাস-ভরণীস্থ সম্মিলনে (আগষ্ট, ১৮৭৫ সাল) নদী ভ্রমণে উল্লিখিত প্রকর্তাদিগকে নিমন্ত্রণ করেন। সে দিন অনেক বড়মানুষদিগকেও নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। সেইদিন গরীব প্রকর্তা ও বড়মানুষ লইয়া এক উৎসবের মিশ্র দৃশ্য হইয়াছিল। বড়মানুষদিগের মুখখোঁচে বিশ্বাসের চিহ্ন আসনা অল্পভব করিলাম। তাঁহারা মনে মনে করিতেছিলেন, “এ বেটারা কোথা হইতে আইল?” মার রিচার্ড টেম্পলের পত্র ইডেন সাহেব লেফটেনেন্ট গবর্নর হইলে আমাদিগের নাম বেলভিডিয়ার রাজত্ববনে নিমন্ত্রণীয়দিগের নামের ফর্দ হইতে উঠাইয়া দেন। বিলাস-ভরণীতে যে সকল ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদিগের জলযোগজন্ত ছোটলাট নিশিষ্ট আয়োজন করিয়াছিলেন। পূর্বে দিন বেঙ্গল গবর্নমেণ্টের সহকারী সেক্রেটারী বাবু রাজেন্দ্রনাথ মিত্রকে বলিয়া তাঁহার পরিবারদিগের দ্বারা এক হাজার পানের খিল প্রস্তুত করান হইয়াছিল। মোড়াওয়াটার, লেমনেড, আইসক্রিম, সন্দেশ ও নারিকেল যথেষ্ট ছিল। দেবীলাস, পরলোকগত রাজা নগরেন্দ্র বিখ্যাত কৃপণ পুত্র বিনাব্যয়ক রাজবাটীর আইসক্রিম, বেঙ্গলগম্ভ ভক্ষণ করিতেছিলেন। আমি কিছু আহার করিতে মানস করিয়াছিলাম কিন্তু টেকটাদ ঠাকুর (প্যারীটাদ মিত্র) প্রকাশ্য রূপে ইংরাজের ভরণীতে জলযোগ করিতে নিষেধ করিতে আমি তাহা হইতে বিরত হইলাম। ইংরাজের ভরণীতে আমার প্রকাশ্য রূপে জলযোগ করিতে কোন আপত্তি ছিল না, কিন্তু বুদ্ধের কথা শুনা কর্তব্য বোধ করিলাম। প্যারীটাদ মিত্র মহাশয় আমার পরলোকগত পিতার ও আমার পদমুহুরিত ছিলেন। প্যারীটাদ বাবু অপ্রকাশ্যরূপে যবন-স্পৃষ্ট জন্য বাইতেন কিন্তু প্রকাশ্যরূপে বাইতে বিহিত বোধ করিতেন না। যে ঈশ্বর রোটমকে টানিয়া দাইয়া বাইতেছিল সেই ঈশ্বরে যখন ব্যস্ত ব্যক্তি লাগিল ও নদীর স্রোত বাবু গায়ে লাগিতে লাগিল তখন মনে বড় আনন্দের উদয় হইল। যশস্ব মার রিচার্ড টেম্পল মহাশয় বদনে অত্যন্ত ব্যস্ত কন্মর্দন করিয়া সাদর সম্বোধন করিলেন। এক দিন

বেঙ্গলভিভিয়ারের হাতার ভাণ্ডা পড়িয়া তাহার ভিতর আমাদিগকে পোজাও খাওয়াইতে ছোটলাট সাহেব সংকল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু আমাদিগের দ্রুতদৃষ্টে বশতঃ তিনি শীঘ্রই বাম্বাইয়ের গবর্ণর হইয়া যাওয়াতে সে সংকল্প কার্যে পরিণত হয় নাই।"

রাজনারায়ণ বাবুর সঙ্গীর্গদিগের মধ্যে অনেকেই উত্তরকালে যশস্বী হইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেনঃ—

"আমার সহাধ্যায়ীরা মধ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, প্যারিচরণ সরকার, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র ঘোষ, আনন্দকৃষ্ণ বসু, অগদীশনাথ রায়, ঐশ্বরচন্দ্র মিত্র, নীলমণ্ডল মুখোপাধ্যায়, গিরীশচন্দ্র দেব ও গোবিন্দচন্দ্র দত্ত প্রমুখ ছিলেন। পরলোকগত কবিবর মাইকেল মধুসূদন সেকেন্দ্র ক্রাস হইতে খ্রীষ্টান হইয়া ছাড়িয়া যান। তৎপরে বিশাখ কলেজে ভর্তি হইলেন। প্যারিচরণ সরকার প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রোফেসর এবং সুরাপাননিবারণী সভার প্রথম সংস্থাপক ছিলেন। জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর বারিষ্টার। তিনি খ্রীষ্টান হইয়া বিাত যান। ইনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু আইনের অধ্যাপক পদে দিন কতক নিযুক্ত ছিলেন। " " লিভিতে ইহার কথার ভারতীয় পরিচ্ছদ দেখিয়া ভারত সাম্রাজ্যোদ্ভবী ভিক্টোরিয়া বড় সম্ভ্রাম প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইনি খ্রীষ্টান হইয়া যখন ভারতে ছিলেন, তখন এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, 'I am a Brahmin Christian' মাতৃস্ব হাজার উদার হউক তাহার পক্ষে আত্মভিমান সম্যকরূপে পরিত্যাগ করা সুকঠিন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভুত মশের সহিত Inspector of Schools পদের কার্য সম্পাদন করিয়া এক্ষণে পেশন লইয়াছেন। ইনি বঙ্গভাষায় ঐতিহাসিক উপন্যাসের সৃষ্টিকর্তা এবং 'গাহস্থান' প্রভৃতি কতকগুলি অতি উত্তম গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষাতে রচনা করিয়াছেন। যোগেশচন্দ্র ঘোষ কলিকাতার বিখ্যাত কালীশঙ্কর ঘোষদিগের বংশজাত। ইনি প্রথিত বিদ্যাতে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন এবং ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটী কার্য কিছুদিন করিয়া পরলোক গমন করেন। আনন্দকৃষ্ণ বসু বিখ্যাত সর্ব রাজা রাণাকান্ত দেবের দৌহিত্র। " " ইনি কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ বিদ্বান " " অগদীশ নাথ রায় বাঙ্গালীর মধ্যে প্রথম District Police Superintendent পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐশ্বরচন্দ্র মিত্র অনেক দিন অত্যন্ত সুখ্যাতির সহিত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটী কার্য করিয়া এক্ষণে পেশন লইয়াছেন। পরলোকগত নীলমণ্ডল মুখোপাধ্যায় কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার ছিলেন। গিরীশ চন্দ্র দেব অনেক কাল হেমার সাহেবের স্কুলের প্রধান শিক্ষকতা কার্য ব্যাতির সহিত সম্পাদন করিয়া এক্ষণে পেশন লইয়াছেন। গোবিন্দচন্দ্র দত্ত সেকালের ছোট আদালতের জজ বিখ্যাত রসময় দত্তের পুত্র। আমি কলেজে থাকিতে ইংরাজী কবিতা পড়িতাম না বলিয়া, তাহা গিলিতাম বলিলে হয়, তাহা এমনি আশ্রয়ের সহিত পাঠ করিতাম। ইনি এক্ষণে আমার সঙ্গে এক-হৃদয় ছিলেন বলিলে হয়। প্রাচীন ও আধুনিক সূত্রতম ইংরাজী কবির গ্রন্থ পর্যন্ত আমরা পড়িতাম। " " " ইনি ইংরাজী কবিতা উত্তম রচনা করিতে পারিতেন। ইনি বিখ্যাত তরু দত্তের পিতা। ইনি যেমন প্রভাবতঃ ভ্রমলোক ছিলেন এমন অতি অল্প পাওয়া যায়।"

রাজনারায়ণ বাবু আপনার পিতামহ রামসুন্দর বসু ও তাঁহার স্যেঠ রামপ্রসাদ বসু কথায় মেকালের সমাজের যে মনোভূ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা একালে অমুকরণযোগ্য :—

“রামপ্রসাদ বসু বড় উদারচিত্ত ব্যক্তি ছিলেন। যাহা উপার্জন করিতেন, তাহার অধিকাংশ দান করিতেন। বোড়ালের ব্রাহ্মদিগকে সূবর্ণ ও অন্নাচ্ছ বস্তু দান করিতেন। সূবর্ণ দানে অনেক ফল বলিয়া তাহা দান করিতেন। মেকালে অতিথি-সেবা একটি পরম ধর্ম বলিয়া গণিত হইত। এদিকে থড়ো বাড়ী (মেকালে কোটা বাড়ী কতিবার স্নীত এত প্রচলিত হয় নাই) এবং পিতামহী ঠাকুরাণীদিগের হাতে রূপার টৈপে, তথাপি বাড়ীতে প্রভাহু ছই বেলা এক শত পাত পড়িত। পিতামহী ঠাকুরাণীরা অহস্তে পাক করিয়া লোকদিগকে খাওয়াইতেন, এবং কেবল বাড়ীর কর্তা যি থাইলে ভাল দেখায় না বলিয়া সকলের অচ্ছ প্রস্তুত রাশীকৃত উষ্য অন্নের উপর যি ঢালিয়া দিতেন। কোন কারণ বশতঃ আমার বড় ঠাকুর দাদা ঢাকার কর্ম পরিভ্রাণ করিতে বাধ্য হইলেন। যখন কক্ষ পরিভ্রাণ করিয়া বাড়ীতে বসিয়া ছিলেন, তখন উপরি উল্লিখিত স্বপ্নাচ্ছ উষ্ম একমাত্র জীবনোপায় ছিল। * এক দিন আমার একটি অতি মরিজ ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহাকে বলিল যে, কল্যা আমার খাওয়া হয় নাই। ঐ সময়ে তাঁহার নিকট একটিমাত্র টাকা ছিল। তিনি আপনার কি হবে না ভাবিয়া ঐ টাকাটি ব্রাহ্মণের হস্তে অর্পণ করিলেন। ব্রাহ্মণ তাহা লইতে অসম্মত হন। অনেক ক্ষেদাক্ষেদির পর তিনি তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। ব্রাহ্মণ যাইবার সময় বড় ঠাকুরদাদামহাশয় তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, ‘তোমাকে আমি এই টাকাটি দিলাম, বড় গিন্নি (তাঁহার বড় স্ত্রী) যেন টের না পায়, তাহা হইলে আমাকে গাল দিয়া ভুত ছাড়া করিবে; যেহেতু এই টাকাটি আমার অচ্ছকার এক মাত্র অবলম্বন।’ যথার্থে কথার বাণী শ্রবণের পর, কলিকাতার এক বাবুর চিকিৎসা করিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট হইতে যোজন টাকা আইগে। * * * * * আমার পিতামহ রামসুন্দর বসু বড় উদারচিত্ত লোক ছিলেন। প্রতিদিন প্রাতঃকালে একটি ছাতি খাড়ে করিয়া গ্রামের প্রত্যেক লোকের বাড়ীতে যাইতেন এবং প্রত্যেক লোকের সেই দিনের লচ্ছ আহার লবা আছে কি না, জিজ্ঞাসা করিতেন। যাহার না থাকিত, তাহাকে তাহা নিজ বাড়ী হইতে পাঠাইয়া দিতেন। বিদেশে চাকরী করে, এমন লোকের পুষ্করিণী খনন অথবা বাড়ী নির্মাণের ভার লইয়া ছই গ্রহণ রোগে * * * ছাতা লইয়া ঐকর্গ্য তদারক করিতেন। * * * ঠাকুরদাদা বাড়ীতে যে সকল রোগী স্বপ্নাচ্ছ উষ্ম লইতে আসিত তাহাদিগের নিষ্ঠামূক্ত অহস্তে পরিষ্কার করিতেন। রোগীদিগের মঙ্গলদিগকে সেবা করিতে দিতেন না, নিজে অহস্তে তাহাদিগের সেবা করিতে ভাল বাগিতেন। ইহা তিনি পুণ্য-

* বসু মহাশয়ের পিতামহ পাড়ুনোপে আজ্ঞাপ্ত হইয়া “হত্যা দিবস” লচ্ছ বৈদ্যনাথ যাইতেছিলেন। রাস্তা অগ্ন হইয়া। তাহাতে তিনি স্বপ্নাচ্ছ উষ্ম লাস্ত করেন।

কার্য মনে করিতেন। একজনকার সভ্যতাভিমानी ব্যক্তিদ্বিগের চার ভাষাদিগের বিষ্ঠা-
মূত্র স্বহস্তে পরিষ্কার করিতে ঘৃণাবোধ করিতেন না।”

ইহারপর বস্তু মহাশয় যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা
উদ্ধারযোগ্যঃ—

“কোন কোন ইংরাজকে আপনাদিগের অতি প্রিয়বস্তুর এইরূপ শুদ্ধতা করিতে
দেখা যায়। ইনাকে তাঁহারা nursing বলেন।” পুরুষ অপেক্ষা বিবিয়া এই কার্য অধিক
করিয়া থাকেন। কিন্তু আপনাদিগের বর্তমান বাঙ্গালী বাবুরা, যাহারা ইংরাজদিগের অনু-
করণ করিতে ভালবাসেন, তাঁহারা এই কার্যকে ঘৃণা করেন। আমরা ইংরাজদিগের
দোষগুলি অনুকরণ করিতে পটু, সদৃশ অনুকরণ করিতে পটু নহি। রামস্বন্দর বস্তু
দীনদরিজের যেরূপ সেবা শুদ্ধতা করিতেন, বর্তমান বাবুরা ততদূর না করুন, খুব নিকট
সম্পর্কীয় ব্যক্তিদ্বিগের একপ শুদ্ধতা করিতে ঘৃণা না করিলে বাঁচি।”

যে সরলতা ও সত্যপ্রিয়তা বস্তু মহাশয়ের চরিত্রের প্রধান গুণ ছিল
সেই সরলতা ও সত্যপ্রিয়তাপ্রযুক্ত ঐতিহাসিক হিসাবে আলোচ্য পুস্তকের
মূল্য বহুগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। একস্থানে তিনি লিখিয়াছেনঃ—

“তখন হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা মনে করিতেন যে মদ্যপান করা সভ্যতার চিহ্ন,
উহাতে দোষ নাই। * * * তাঁহারা কখনই পানাসক্ত হইতেন না যদ্যপি তাহা
সভ্যতার চিহ্ন মনে না করিতেন। আপনাদিগের বাসা তখন পটলডাঙ্গায় ছিল।
আমি পাড়ার ঐশ্বরচন্দ্র ঘোষাল, প্রমথকুমার সেন এবং নন্দলাল মিত্র প্রভৃতির সহিত
কলেজের গোলদীঘিতে মদ খাইতাম, এবং এখন যেখানে সেনেট হউগ হইয়াছে,
সেখানে কতকগুলি শিক-কাবাবের দোকান ছিল, তথা হইতে গোলদীঘির তেল টপ-
কাইয়া (ফটক দিয়া বাহির হইবার বিলাস সহিত না) উক্ত কাবাব কিনিয়া আনিয়া
আমরা আহার করিতাম। আমি ও আমার সহচরেরা এইরূপ মাংস ও জলস্পর্শমুখ
প্রাণি খাওয়া সভ্যতা ও সমাজ সংস্কারের পরাকাষ্ঠাপ্রদর্শক কার্য মনে করিতাম। একদা
আমি গোলদীঘিতে মদ খাইয়া টুপডুজড হইয়া রাজিতে বাটীতে আসাতে মাতাঠাকুরানী
অতিশয় বিরক্ত হইয়া বলিলেন “আমি আর কলিকাতার বাসায় থাকিব না, বোড়ালে
গিয়া থাকিব।” পিতাঠাকুর আমার আচরণের বিষয় অবগত হইয়া আমাকে পরিস্ফুট
মদ্যপায়ী করিবার জন্য একটী কৌশল অবলম্বন করিলেন। * * * মেকালে
মুন্সি আমীর আলী সদর দেওয়ানী আদালতের একজন প্রধান উকীল ছিলেন। * *
পিতাঠাকুরের সহিত মুন্সি আমীর আলীর আন্তরিক বন্ধুতা জগিয়াছিল। মুন্সি সাহেব
আমার পিতাঠাকুরকে ‘রাজদার দোস্ত’ বলিতেন। যে বন্ধুকে গোপনীয় কথা বলা
যাইতে পারে, পার্শ্বিতে তাহাকে ‘রাজদার দোস্ত’ বলে। প্রায় প্রতিদিন মুন্সি আমীর
আলীর বাটী হইতে আপনাদিগের বাসায় একটা টিনের বাজ আসিত। আমি মনে
করিতাম যে, মুন্সি আমীর আলী পিতাঠাকুরকে তরঙ্গমা জন্ম সদর দেওয়ানীর কাগজপত্র

পাঠাইয়া দিয়া থাকেন। * * * একদিন সকাল পূর্ব অমাকে যিহাজীর তাঁহার লিখিত পত্র ডাকিলেন। ডাকিয়া যের দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। আমি খুঁটতে পারিলাম না যে ব্যাপারটা কি? তাঁহার পর দেখিলাম, তিনি একটি দেয়াল খানসি একটি কর্কস্তু ও একটি মেরীর বোতল ও একটি শুয়াইন মাংস বাহির করিলেন। তৎপরে একাঙ টিনের বাজাটি খুলিলেন। টিনের বাজা খোলা হইলে আমি দেখিলাম যে, তাহাতে সমস্ত দেওয়ানীর কাগজ নাই, পোলাও, কালিয়া, ও কোস্তা রাখাছে। পিতাঠাকুর আমাকে বলিলেন, 'তুমি এতাহ সকাল পর আমার সঙ্গে এই সকল উত্তমজবা আহার করবে, কিন্তু মদ (মেরী) ছই মাসের অধিক পাইবে না, যখনই আনিব অত্র মদ পাও, সেই দিন অবধি এই বাসুয়া বন্ধ করিয়া দিবা' কিন্তু আমি সেইকণ পারিলাম না যে সমস্ত হইতাম না। অত্র পান করিতাম। এইকণ অপরিমিত মদ্যপানে আমার একটি পীড়া জন্মিল।"

বস্তু মহাশয় যে ছই যুগের সন্ধিকালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন সেই ছই যুগের গুণভাগ আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। সেই 'না তাঁহার চিন্ত-কণা বিশেষ ভাবে আলোচনার যোগ্য। তিনি ইংরাজী শিক্ষার সুশিক্ষিত ছিলেন এবং ইংরাজী শিক্ষার ও সভ্যতার প্রভাবে বঙ্গীয় সমাজের সংস্কার-কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অকারণ ও অনাবশ্যক অশ্লুকরণের বিরোধী ছিলেন। তাঁহার প্রসিদ্ধ 'মে কাল আর এ কাল' গ্রন্থে তিনি পুনঃ পুনঃ হীন অশ্লুকরণের প্রতিবাদ করিয়াছেন। ঐ পুস্তকে তিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন :—

"আমাদের দেশের কোন বিখ্যাত ব্যক্তি ভূতপূর্ব লেপ্টেনেন্ট গবর্নর বিডন সাহেবের সহিত মিত্রি চাপর পরিয়া দেখা করিতে যাইতেন, তাহাতে গবর্নর সাহেব বিজ্ঞিত আকাশ করিতেন। একবার গ্রীষ্মের সময় দেখা করিতে গিয়াছেন, গিয়া দেখেন, গবর্নর সাহেব চিলে পাখামা ও পাতলা কাগজ পরিয়া বাসিয়া আছেন। আমাদিগের বন্ধুকে দেখিবামাত্র তিনি বলিলেন,—'তোমাকে দেখিয়া আমার হিংসা হইল, হিংসা করে, তোমাদিগের দ্বার পরিচ্ছন্ন করিয়া থাকি।' আমাদিগের বন্ধু উত্তর করিলেন, 'তাহে কেন করুন না?' বিডন সাহেব বলিলেন, 'ওরূপ পরিচ্ছন্ন পরিধান করা আমাদের দেশচার বিকল, সুতরাং কেমন করে করি?' আমাদিগের বন্ধু উত্তর করিলেন,—'আপনাদিগের বেলা দেশচার বলবৎ, আর আমাদিগের বেলা তাহা কিছুই নহে, আপনাদিগের একপ বিবেচনা করেন কেন?'"

ঐ পুস্তকে তিনি লিখিয়াছেন :—

"আমি বিজ্ঞাতে যাইবার প্রতিপক্ষ নহি। বিজ্ঞাতে যাইলে অনেক উপকার আছে, কিন্তু হুঃপের বিষয় এই যে, যৌহানা বিজ্ঞাত হইতে পারিয়া আহমেন, তাঁহারা হিন্দু সমাজের সহিত একেবারে সম্বন্ধ পরিত্যাগ করেন। যৌহানা অক্ষণে বিজ্ঞাত হইতে পারিয়া আহমেন হিন্দু-সমাজ তাঁহাদিগকে নোকমানের বাতায় আনিতে লাগা হয়েন। বারু বিজ্ঞাত হইতে,

মাছের মাছিয়া ফিরিয়া আসিলেন, না কাহারে সঙ্গে পোয়াগে গিলে, না কাহারো সঙ্গে বাহানে গিলে। কোথাও তাঁহারা যে জানোয়ারে করিয়া গাইলেন, সেও জানালোকে অদেখা দিগকে বিভ্রমিত করবেন না এবেবারে সমাজভাড়া হয়ে বসলেন। তাঁহার উভয় দলের তাজা হলেন। বাছালীদিগের সঙ্গে তো তাহাদিগের গিলে না, ইংরাজেরা ও তাঁহাদিগকে অনুকরণকারী মাঝামাঝি নালিয়া খুঁচা করে।"

সমাজ-সংস্কারের কথাই তিনি বলিয়াছেন, "আমাদের দেশের সমাজ-সংস্কারকেরা যদি অদেখা ভাবে পুণ্ড্র ভূমি করিয়া সমাজ-সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহা হইতে কৃতকার্য হইতে পারেন সন্দেহ নাই।"

বসু মহাশয় খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন। আলোচ্য গ্রন্থে প্রীমারে আসাম যাত্রার কথাই তিনি লিখিয়াছেন :—

"আমার ষাট বর্ষাবয়স গাঢ় বাঙ্গালীভর ; আমার কলেজের শিক্ষা উহার উপর পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রেরণ করিয়া আরোপ করিয়াছিল মাত্র, কলেজের ছাত্র উহা আমার প্রকৃতির উপর গাঢ়রূপে বসে নাই। আমি মনো মনো খান ও মদ খাইতাম বটে, কিন্তু সচরাচর প্রত্যহ দুই বেলা মাছের কোল ভাত না খাইলে চলিত না। ক্রমাগত মদ ও খান খাইলে অত্যন্ত গরম হইয়া উঠিত। প্রীমারে ক্রমশঃ জীবন যাপন করিতে হয় তাহা পূর্বে জানিলে সেইরূপ উপায় করা যাইত অর্থাৎ মদে তৈল ইত্যাদি সঙ্গে লইতাম। প্রীমারে কক্ষ স্নান ও দিবসের মধ্যে তিন বার অর্থাৎ হাঙ্গরি, টিফিন ও ডিনরে মাংস বাস্তব্যাতে চাকায় না পৌঁছিতে পৌঁছিতে তিন চারি দিবসের মধ্যে বিজাতীয় গরম হইয়া উঠিল। রাজিতে ঘুম হয় না। চাকায় যখন প্রীমার পৌঁছিয়া তখন আমাকে হাড়িয়া দিতে দেখিয়া বাকুকে অনেক অসুখ বিনয় করিলাম। তিনি আমাকে চাকায় নামাইয়া দিলেন। আমি মাছের কোল খাইবার অভিলাষে আমার কলেজের সমান্যায়ী প্রীমার জে. ডি. মি. র বাসায় আসিয়া অর্থাৎ হুওয়াতে তদতিমুখে গমন করিলাম। * * কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ দেখি তিনি ও টেবিল পাতিয়া ইংরাজ রকমে আহার করিতেছেন। কি করি, আমি বাসিয়া গেলাম। পাছে আমাকে নিভাস্ত বাছালী বলিয়া মনে করেন সেই জন্য তাঁহাকে মাছের কোলের কথা তিন চারি দিন বলিতে আমার সাহস হইল না। পরে বিজাতীয়োপনি বিজাতীয় গরম হওয়াতে আমি তাঁহাকে এক দিন আমার অভিলাষ জ্ঞাপন করিলাম। তাঁহার প্রীমার এক মুসলমান দাসী ছিল। তাঁহাকে মাছের কোল প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু সে মুসলমান বলিয়া পেয়ালা নহন দিয়া কি এক রকম স্মিগল তৈয়ার করিয়া দিল তাহা আমার বড় গালাপ লাগিল। তৎপরে ঐ বাবু প্রীমারকে অনুপ্রবেশ করিয়া পাঠানতে তিনি অনুগ্রহ করিয়া অর্থাৎ মাছের কোল প্রস্তুত করিয়া দিলেন। অনেক দিনের পর মাছের কোল খাইয়া তাহা প্রকারে ভিতর দিয়া পেটে যখন পড়িল কি পর্যন্ত ঠাণ্ডা হইলাম বলিতে পারি না। ঐ বাবু এক দিন এক কাণ্ড করিলেন। তাঁহার প্রীমার সহিত আমার আলাপ করাইয়া দিবস সাধ হওয়াতে তিনি পার্শ্বের ঘর

ইতে তাঁহাকে বাহির করিবার জন্য তাঁহার হাত ধরিয়া টানিতে লাগিলেন । তিনিও কানমতে আসিবেম না । পবে আমি এ ঘর হইতে অনেক বজাতে আলাপ করানো যায় হইতে নিরত হইলেন । অনেক দিন ইংরাজী রকমে মানান মাথিয়া কম খান দ্বারা অত্যন্ত গরম হওয়াতে এক দিন ঐ বাবুর চাকরকে দিয়া বাজার হইতে তৈল আনিয়া নোচের তলায় একটি অঙ্ককার ঘরে তৈল মর্দন করিতেছিলাম । সে অঙ্ককারে ঐ বাবুর কখন আসিবার প্রয়োজন হয় নাই । সে দিন কোন প্রয়োজন দশমতে আমি তৈলমর্দনকণ অপর্য্য করিবার সময়ই তাহা কর্তৃক ধৃত হইলাম । তিনি লিলেন, 'এ কি' ? আমি বলিলাম, 'তৈল বাজার হইতে আনা'ইয়া মাঝিতেছি । অনেক দিন তৈল না মাঝাতে গরম বোধ হইতেছে ।' তিনি বলিলেন, 'আমাকে বলিলেই হইত, আমি আনা'ইয়া দিতাম ।' আমি বলিলাম, 'পাছে তুমি আমাকে নিতান্ত বাজারী ঠাণ্ডাও এই জন্য বলি নাই ।' এই সকল ক্ষুদ্র বিষয় লিখিতাম না ; ভাবনাৎসঙ্গীমদিগকে আমাদিগের যৌবনকালের কোন কোন ইংরাজীতে রূতবিলু ব্যক্তির আচার ব্যবহার কিকণ ছিল তাহা আনা'ইবার জন্য লিখিতাম ।"

বঙ্গ মহাশয়ের এই খাঁটি বাঙ্গালীও এমনই সপ্রকাশ ছিল যে, যে কেহ তাঁহার সংসর্গে আসিলে তাহা অনুভব করিতে পারিত । আমার তাহা জানিবার যে সকল স্মরণ ঘটনাছিল সে সকলের মধ্যে একটির উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব । ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজী বর্ষান্ত্রে আমার জ্যেষ্ঠ ও আমি বঙ্গ মহাশয়কে নববর্ষের উপহার পাঠাইয়াছিলাম । সেই উপলক্ষে তিনি আমাদিগকে লিখিয়াছিলেন :—“তোমাদিগের উদ্দিষ্ট উপহার পাওয়া বাধিত হইলাম কিন্তু নববর্ষের অভিবাদন এখন করিব না, ১লা দৈশাখ (যদি তত দিন বাচিয়া থাকি) করিব । ঐ দিনের জন্য Art Studio দ্বারা বাঙ্গালা ক্ষুদ্র কবিতাযুক্ত উল্লিখিত উপহারের স্থায় উৎকৃষ্ট উপহার জব্য কি প্রস্তুত করাইতে পার না ?” পর বৎসর ১লা দৈশাখ তিনি লিখিয়াছিলেন, “নববর্ষের অভিবাদন পাওয়া কি পর্য্যন্ত আনন্দিত হইলাম তাহা বলিতে পারি না । প্রতিবৎসর ১লা দৈশাখেই এইরূপ অভিনন্দন করিব ।”

বঙ্গ মহাশয়ের এই আশ-চরিত বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাসের লেখকের পক্ষে অমূল্য উপদানের আকর বলিলেও অত্যাঙ্গ হয় না । সেই জন্য ও সমসাময়িক সকল সংকর্ষে উজ্জ্বল পুরুষের চরিত-কথা বলিয়া বঙ্গদেশে এই পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয় ।

প্রভাতে ।

—ঃঃঃ—

এখনো নয়ন ঘুমে অচেতন ?
 পূরবে শোনিয়া অরুণ-রাগে ;
 প্রভাত-সমীর বহিছে অধীর,
 সরমে শিহরি' কমল জাগে ;

বিহগের স্নরে সুধাধারা বারে ।
 কুসুমে বদ্ধ জাগিছে অলি ;
 আপন গোপন সুরভি পবন
 এসেছে যাচিতে, ফুটিছে কলি ;

মান শশি-কায় গগনে মিলায় ;
 কবরীর মালা হয়েছে মান ।
 ভূমিত আমার নয়ন তোমার
 স্পৃহাসুখমা করিছে পান ।

অধরে আমার জাগিছে তোমার
 কোমল-সোহাগ-পরশ-সুধা ;
 ভূমিত অধরে নয়নের 'পরে
 এখনো আমার আকুল ক্ষুধা ।

অগরুগারুণ নয়ন করুণ
 খুদিয়া দিয়াছি আদরে তুমি,
 বাক্যপাশে অয়ে, অয়েছি হৃদয়ে,
 ষেগে চেয়ে আছি—খুমায়ে তুমি ।

ଦିବାକୋକ ଶାନ୍ତି

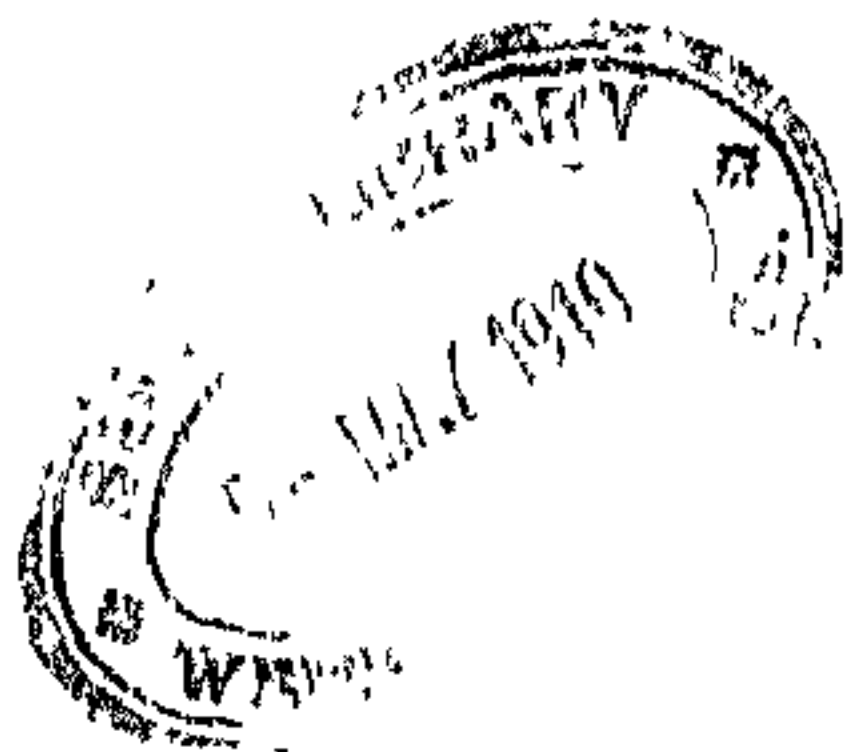
ବାତାସନେ ମାନ୍ତି

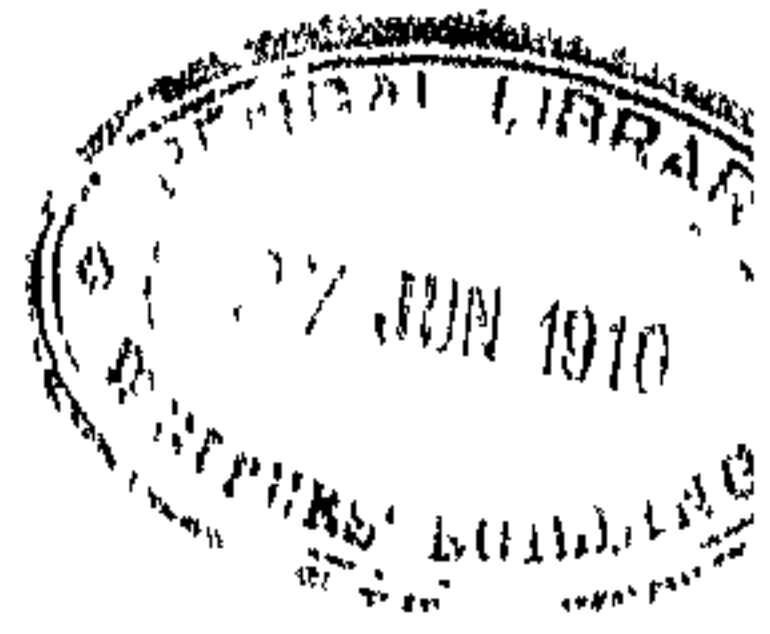
ଏଥନି ଜାଗା'ବେ ମରମ ମାନ୍ତି ;

ବିହଗ କୁଞ୍ଜେ

ସୁରାଞ୍ଜି ମନେ

ମିଳ ନିମିଳିତ କମଳ ଅଂଶି ।





নিরুদ্দেশ যাত্রা ।

১

কয় বৎসর পূর্বে কিছুদিন ধরিয়া সংবাদপত্রে একটি অসাধারণ বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছিল । কলিকাতা পোতাশ্রয়ের কর্তারা বিজ্ঞাপনদাতা ;— বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য—কোন নিরুদ্দিষ্ট গৃহস্বামীর সন্ধান । পোতাশ্রয়ের প্রসার-বৃদ্ধি-কল্পে ভূমিক্রয়কালে একজন গৃহস্বামীর সন্ধান না পাইয়া পোতাশ্রয়ের কর্তারা এই বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়াছিলেন । যে গৃহের অধিকারীর জ্ঞাত এই বিজ্ঞাপন প্রকাশ, সে গৃহ ক্ষুণ্ণায়তন নহে ; বিস্তৃত ভূমিখণ্ড-মধ্যে অবস্থিত; কিছুকাল হইতে জনশূন্য । গৃহসংলগ্ন ভূমিখণ্ডে পূর্বে পুষ্পোচ্চান ছিল, এখন উন্মূল জমিয়াছে—মধ্যে মধ্যে কোথাও বা একটি গোলাপ গাছ, কোথাও বা একটি টগর গাছ আত্মরক্ষার জন্ত প্রাণান্ত চেষ্টা করিতেছে—সেই চেষ্টায় তাহাদের শীর্ণ শরীরের সমস্ত শক্তি ব্যয়িত হইতেছে, সে শক্তি আর কুসুমের আত্মপ্রকাশ করিতে পারিতেছে না । ছাত্তের আশ্রিতা হানে স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে । যুক্ত দ্বার ও দ্বাভাঙ্গন পথে আশোক ও বাতাস যেন কাহাকে সন্ধান করে । সমস্ত গৃহস্থানি যেন রহস্তের কুণ্ডলিকায় আবৃত । দশ বৎসর হইতে গৃহ জনহীন । কিন্তুদন্তী এই গৃহে বহু অলৌকিক কীর্তির কল্পনা প্রচার করিয়া রহন্তকুণ্ডলিকা আরও ঘন করিয়া তুলিয়াছে ।

২

এই গৃহের যে নিরুদ্দিষ্ট অধিকারীর জ্ঞাত সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার পূর্বনিবাস বর্দ্ধমান জিলায় কোন সমৃদ্ধ পল্লীগোমে । এ দেশে প্রায় দেখা যায়, লক্ষীর রূপা কোন পরিবারে দীর্ঘকালস্থায়ী হয় না । কিন্তু তিনি যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সে পরিবারে এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল । শতবর্ষাধিক কাল হইতে তাহার পূর্বপুরুষ-গণ সে অঞ্চলে ব্যবসায়ীদিগের “মহাজন” । এই কার্যে তাহাদের অর্থ বাড়িয়া শেষে তাহারা সে অঞ্চলে প্রাধান ধনী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন । যাহার ধনবল থাকে—তাহার শত্রুর অভাব হয় না ; কিন্তু সেই ধনবলহেতুই শত্রুরা সহজে তাহার কোন অনিষ্ট করিতে পারে না । এই নিরুদ্দিষ্ট গৃহস্বামীর পরিবারে

ধন যেমন বাড়িয়াছিল—ধন ভোগ করবার লোক তেমন বাড়ি নাই ; কায়েই বিভাগে সে ধনের হ্রাস হয় নাই । এই নিরুদ্দিষ্ট গৃহস্থানো পারবারের সমস্ত সময়ের অধিকারী হইয়াছিলেন ।

তাহার পুত্রসন্তান জন্মে নাই ; 'গৌড়' অনস্থায় এক কতামান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল । সেই কন্যাই তাহার উত্তরাধিকারী । যশাকালে কন্যার বিবাহ হয় । গৃহিণীর অশ্রুরোধে তিনি জামাতাকে গৃহে রাখিয়াছিলেন । কিন্তু স্বাভাবিক সন্দেহ-প্রাবল্য হেতু তিনি কিছুতেই জামাতাকে বিশ্বাস করিতে পারিতেন না । তাহার ব্যবহারে সে সন্দেহ সন্দর্ভেই আত্মপ্রকাশ করিত । ইহাতে পুত্রচরিত্র জামাতার হৃদয় ব্যথিত হইত । জামাতা আর শত্রুরের কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না ; বরং আপনার পরিবার প্রতি-পালনের উপায় নির্ধারণের জন্য ব্যস্ত হইতেন । জামাতার এই ভাবে শত্রুরের সন্দেহ ক্রমে বিরক্তিতে পরিণত হইয়াছিল । উভয়ের মধ্যে মনোমালিখ্য ক্রমে ধনীভূত হইয়াছিল । কথায় কথায় সেই মনোমালিখ্য সপ্রকাশ হইত । শেষে শত্রুরের ব্যবহারে জামাতার আত্মসম্মান আহত হইতে লাগিল । তখন তিনি একদিন পত্নীকে বলিলেন, “আমি আর শত্রুরের গলগ্রহ হইয়া থাকিব না । আমি এ গৃহ ত্যাগ করিব ।” পত্নী কিছুদিন হইতে পতিগ্ন মনোভাব উপলব্ধি করিতেছিলেন । তিনি বলিলেন, “যে গৃহে তোমার স্থান নাই, সে গৃহে আমারও স্থান নাই ।” ফলে চন্দ্রকরোদ্ভব নিম্নোক্ত দুই মাস মাত্র বয়স্ক শিশুপুত্রকে লইয়া পতি-পত্নী সেই প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া পথে দাঁড়াইলেন ।

যাইবার সময় ছহিতা জননীকে একখানি পত্র লিখিয়া যাইলেন ;—

মা,

আমি বিদায়কালে তোমার পদে প্রণাম করিয়া যাইতে পারিলাম না, আমার এ দুঃখ মরিলেও যাইবে না । কিন্তু তুমি জানিতে পারিলে আমি যাইতে পারিব না । তুমিই শিলাইয়াছ, যেখান আমার স্থান—সেখান জীর আশ্রয় । যে স্থানে মানুষ আদরের আশা করে সে স্থানে অনাদর বড় বেদনার কারণ ; সেখান মানুষ বিশ্বাসের আশা করে, সেখান সন্দেহ বড় যাতনাদায়ক । তাই তিনি এ গৃহ ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন, কায়েই আমিও যাইতেছি । মা আমার—তোমার ছঃখিনী কন্যাকে আশীর্বাদ করি, যেন—যে আশ্রয়ের আশায় তোমার আশ্রয় ত্যাগ করিতেছি সে আশ্রয়ে আমার সকল আশার অবসান হয় ।

তোমার হতজাগিনী কন্যা ।

তখন গৃহ নীরব ; পুরবাগীরা স্তম্ভিত ; সাবধানে ক্ষিপ্ৰহস্তে দ্বারাগল মোচনের শব্দ কাহারও শ্রুতিগোচর হইল না। পিতৃগৃহত্যাগী কন্ঠার নয়ন হইতে ছুই বিন্দু অশ্রু পিতৃগৃহাঙ্গণে পতিত হইল। এই তিনি প্রথম সে গৃহ ত্যাগ করিলেন। তিনি এ আশ্রয়ে আর ফিরিবেন কি না কে জানে ? মেহশীলা জননীৰ কথা ভাবিয়া তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইতেছিল। তিনি যে তাঁহার একমাত্র সন্তান।

৩

প্রভাতে উঠিয়া ভৃত্যগণ দেখিল, গৃহদ্বার মুক্ত। কে গৃহদ্বার খুলিল, এই কথা লইয়া তাহারা আন্দোলন করিতে লাগিল—এ উহাকে দোষী প্রতিপন্ন করিতে সচেষ্ট হইল। সেই আন্দোলনকলরবে গৃহিণীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। কলরবের কারণ অনুসন্ধানের জন্য যাইবার সময় তিনি দেখিলেন, কন্ঠার কক্ষদ্বার মুক্ত কক্ষে কেহ নাই। কক্ষে প্রবেশ করিয়া তিনি দেখিলেন, শয্যা অভুক্ত—সেই অভুক্ত শয্যায় কন্ঠার পত্র রহিয়াছে। সেই পত্র পাঠ করিয়া গৃহিণী হর্ষ্যতলে লুটাইয়া পড়িলেন ; তাঁহার বোধ হইল, যেন জগতের আদ্যোপনিষৎ নির্বাপিত হইয়াছে।

গৃহিণীর এই অবস্থা দেখিয়া একজন ভৃত্য যাইয়া কর্তাকে সংবাদ দিল। তিনি কন্ঠার কক্ষে আসিয়া উপনীত হইলেন। কর্তাকে দেখিয়া গৃহিণী উন্মাদের মত তাঁহাকে কন্ঠার পত্রখানি দিলেন; বলিলেন, “এখনই সন্ধান লোক পাঠাও।” এতক্ষণ বেদনার আতিশয্যে তাঁহার নয়নে অশ্রু ঝরে নাই, —এখন সমবেদনা-প্রাপ্তির আশায় তাঁহার নয়ন অশ্রুসঞ্ছল হইয়া আসিল।

কর্তা কন্ঠার পত্র পাঠ করিলেন। তাঁহার চক্ষুতে রোষদীপ্তি বিকশিত হইয়া উঠিল, মুখে কঠোর ভাব ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। তিনি তীব্রকণ্ঠে বলিলেন, “যাহারা আমার অপমান করিয়াছে, আমার গৃহে আর তাহাদের স্থান নাই।”

গৃহিণী সমিলমুত্তিতনয়নে কর্তার দিকে চাহিয়া বলিলেন, “তবে কাহাকে লইয়া সংসারে থাকিব ?”

কর্তা বলিলেন, “আমি পোষ্যপুত্র লইব।”

গৃহিণী উঠিয়া বসিয়াছিলেন ; কর্তার এই নিষ্ঠুর কথায় আবার হর্ষ্যতলে লুটাইয়া পড়িলেন। কর্তার কথা যেন তীক্ষ্ণধার ছুরিকার মত তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ করিল। হায় মাতৃ-হৃদয় ! পুরুষের সাধ্য কি তোমার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে ?

কর্তা কল্যাণ পলখানি হস্ত্যন্তরে ফেলিয়া দিয়া বাহ্যাজাতে গমন করিলেন । গৃহিণী সেখানি কুড়াইয়া লইয়া আপনার বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন । সে পত্র তাঁহার হৃদয়-সর্ব্বস্বের শেষ সম্ভাষণ ।

৪

গৃহিণী সেই যে শয্যা লইলেন, আর উঠিলেন না । অনাহারে অনিদ্রায় তিন দিন কাটিয়া গেল । চতুর্থ দিন তাঁহার প্রবল জ্বর দেখা দিল । তিনি কাহাকেও জ্বরের কথা বলিলেন না । স্বাপদসঙ্কল, কঙ্করকটকাকর্ণ পরিতপথে—তমিষাতমসে পথভ্রান্ত শ্রান্ত পথিক উমালোকবিকাশে যেমন আনন্দিত হয়, গীড়ায় তিনি তেমনই আনন্দিত হইলেন,—যদি মৃত্যু মুক্তি দেয় । হইলও তাহাই । জ্বর প্রকাশের তিন দিন পরে বিকার দেখা দিল ; অনাহারজীর্ণ—চিস্তাজীর্ণ দেহে ব্যাধি দেখিতে দেখিতে ভীষণ আকার ধারণ করিল । শেষে যে পূর্ণিমারজন্যে কল্যাজামাতা গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন সেই পূর্ণিমার পর অমাবস্তা আসিতে না আসিতেই জ্বরঘোরে শিশু দৌহিত্রের কথা বলিতে বলিতে গৃহিণীর সকল জ্ঞান জুড়াইল । এক পক্ষের মধ্যে সূর্য্যকান্তের গৃহ শূন্য হইল । গৃহিণী পরলোকে—কল্যাজামাতা-দৌহিত্রের কোন উদ্দেশ্য নাই, বিপুল ধন লইয়া শূন্য গৃহে সূর্য্যকান্ত একক । তিনি বুঝিলেন, তাঁহার এ অবস্থা—এ দুর্দ্দশা তাঁহারই কৃতকর্ম্মের ফল । তিনি যে অহঙ্কারে অন্ধ হইয়াছিলেন—সে অহঙ্কার দারুণ আঘাতে তাঁহারই হৃদয় চূর্ণ করিয়া দিল ।

৫

গৃহিণীর মৃত্যুর পর সূর্য্যকান্ত দেখিলেন, গৃহ শূন্য—হৃদয় শূন্য । যে অহঙ্কারের আবরণ তাঁহার অপত্যস্নেহকেও আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল, গৃহিণীর চিত্তানলে তাহা ভস্মসাৎ হইয়াছিল । তাই প্রকৃতি যখন আত্মপ্রকাশ করিল—সে স্নেহ যখন মেঘমুক্ত দীপ্ত দিবাকরের মত প্রকাশিত হইল—তখন তিনি দেখিলেন, তাঁহার হৃদয় ক্ষতবিক্ষত । তখন তাঁহার মনে হইল, তিনিই পত্নীর মৃত্যুর কারণ ; আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল—এ দুর্দ্দিনে যাহারা নিকটে থাকিলে বেদনার মংশনজালা প্রদীপিত হইত—যাহারা শোকে সাধুনা—তাঁহারই দুর্দ্দাবহারে তাহারা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে । তিনি বিষম যাতনায় ব্যাকুল হইলেন ।

এই অবস্থায় সূর্য্যকান্ত বিষয়কর্ম্মে—অনঙ্গ যাতনা ভুলিতে সচেষ্ট

হইলেন। বৃথা চেষ্টা। বিষয়কর্ম ভাল লাগে না। কেহ তাঁহার সঙ্গ চাহে না। বরং লোকে তাঁহার সকল কথা জানিয়া তাহাকে ঘৃণা করে। তাঁহার সম্পদপ্রাচুর্য্যে তাঁহার শত্রুর অভাব ছিল না; শত্রুদল এখন তাঁহাকে উপহাস করিতে লাগিল। তাহাদের উপহাস সূর্য্যকান্তের হৃদয়ে বিষাক্তবিশিষ্ট-বৎ বিদ্ধ হইত। এখন তিনি বুঝিলেন, কতাদোহিত্ত তাঁহার কত প্রিয় ছিল। তাহাদিগকে হারাইয়া শূন্য গৃহে বাস ও লোকের ঘৃণা ও উপহাস ভোগ তাঁহার পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠিল। তিনি গৃহত্যাগ করিলেন।

৬

যে অপরিচিত জনতার মধ্যে আপনার অতীত জীবন ভুলিবার চেষ্টা করে তাহার পক্ষে জনাকীর্ণ নগরে বাসই সুবিধাজনক। সূর্য্যকান্ত কলিকাতায় আসিলেন; নগরোপকণ্ঠে গৃহ ক্রয় করিলেন। তিনি নূতন স্থানে আসিলেন, কিন্তু নূতন সমাজে মিশিতে পারিলেন না—ভয়, পাছে সকলে তাঁহার প্রকৃত পরিচয় পায়—তাঁহার জীবনকাহিনী জানিতে পারে। প্রতিবেশীরা তাঁহার গৃহে গমন করিলে তিনি বিব্রত—চঞ্চল হইয়া উঠিতেন। তাঁহার এইরূপ ভাব লক্ষ্য করিয়া তাঁহার শিষ্টাচারের অনুরোধে বিরত হইলেন। তাঁহার এই নূতন প্রতিবেশীটিকে একটি অভূত জীব মনে করিতে লাগিলেন।

কিন্তু মাহুয কর্মহীন জীবন যাপন করিতে পারে না। অবসরের প্রাচুর্য্য অধিকাংশ স্থলে কষ্টের কারণ। যাহার কোন কায নাই তাহার 'অকায়ের' আকর্ষণ প্রবল। বিশেষ সূর্য্যকান্তের মত যাহারা কার্য্যের ব্যস্ততায় হৃদয়ের যাতনা ভুলিতে চাহে—তাহাদের পক্ষে কার্য্যের অভাব একান্ত কষ্টকর। সূর্য্যকান্ত কর্মহীন জীবন যাপন করিতে পারিলেন না।

প্রতিবেশীরা সবিশেষে দোষিলেন, সূর্য্যকান্ত অসীম উৎসাহে গৃহসংলগ্ন ভূমিতে উচ্চান রচনা করিতেছেন। প্রভাত হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত সমস্ত দিন শ্রমজীবীগণকে লইয়া তিনি উচ্চান-রচনায় ব্যস্ত।

দেখিতে দেখিতে তাঁহার গৃহসংলগ্ন ভূমি নবীন শ্রী ধারণ করিল। তথায় নানা জাতীয় বৃক্ষলতা রোপিত হইল—নানাবিধ লতাকুঞ্জ—বৃক্ষগার প্রভৃতি রচিত হইল। নানা স্থান হইতে ছুজ্রাপ্য বৃক্ষাদি সংগৃহীত হইল। সে উচ্চানে গোলাপের প্রাচুর্য্যে সকলেই বিম্বিত হইল। সূর্য্যকান্ত খেত, রক্ত, পীত, নানাবর্ণের নানাজাতীয় গোলাপগাছে উচ্চান পূর্ণ করিলেন।

সূর্য্যকান্ত উজান লইয়া সর্কদাই ব্যস্ত থাকিতে সচেষ্টে । যোকে বলিত, গথ বটে ! কিন্তু তাঁহার সে কার্য্যের প্রকৃত কারণ আর কেহই জানিত না ।

৭

সূর্য্যকান্তের উজান-রচনা শেষ হইল । অজস্র যত্নে রোপিত ও বর্দ্ধিত বৃক্ষে ফুল ফুটিতে লাগিল । কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের শূণ্য পূর্ণিল না । তিনি সর্কদাই বিমর্ষ । তাঁহার দেহে অকালজরার বিকাশ বিদ্যমান ।

একদিন ফাঙ্কনের অপরাহ্নে তিনি উজানদ্বারের উপর লৌহশলাকার অবলম্বনে কুসুমসুগমাসুন্দর কুহস্কালিমলতা দেখিতে দেখিতে দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিতে পাইলেন, বিজ্ঞানয় হইতে প্রত্যাবর্ত্তনপথে কয়টি বালক দাঁড়াইয়া তাঁহার উজান লক্ষ্য করিতেছে । তিনি তাহাদিগকে ডাকিলেন— উজানমধ্যে আসিতে বলিলেন । বামকগণ প্রথমে আসিতে চাহিল না, শেষে ফুললাভের প্রয়োজনে আগিল । সূর্য্যকান্ত তাহাদিগকে উজানের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফুলগুলি দিয়া বলিলেন, তাহারা যখন ইচ্ছা আসিয়া উজানে ফুল ভুলিতে পারে । তাঁহার এই ব্যবহারে বালকদিগের ও তাহার ভৃত্যদিগের বিশ্বাসের সীমা রহিল না ।

পরদিন বিজ্ঞানয়ে এই সংবাদ রাষ্ট হইলে প্রত্যাবর্ত্তনপথে বহু বালক সূর্য্যকান্তের উজানে প্রবেশ করিল । তাহাদিগের কলরবে সূর্য্যকান্তের উজান যেন সজীব হইয়া উঠিল—যেন তাহার প্রাণহীন সৌন্দর্য্যে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইল ।

বালকদিগের আনন্দ-কলরবে সূর্য্যকান্ত এক নূতন অনুভূতি অনুভব করিলেন । তাঁহার মনে হইল, তিনি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত নহেন । সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনে হইল, তিনি আপনার কর্ম্মক্ষেত্রে হৃদয় সন্মতিদিগকে হারাইয়া আজ পরকে লইয়া হৃদয়ের ভূমণ নিবারণের স্বপ্না চেষ্টায় চেষ্টিত । হায়—তাঁহার ছুহিতা সে আজ কোথায় ? তাঁহার সেই মেহের পুস্তক দৌরিয়া—এই ছুই বৎসরে সে কত বড় হইয়াছে ?

সূর্য্যকান্তের উজানে অতিথির সংখ্যা বাড়িতে লাগিল । বিজ্ঞানয়ের বালক ছাত্রগণ ফুলের গোভে নিত্য সে উজানে আসিতে লাগিল । সঙ্গে সঙ্গে পল্লীর বালকবালিকারাও আসিতে লাগিল । সূর্য্যকান্তের গৃহের অনতিদূরে একটি বহুজনাকর্ণ 'বস্তি' ছিল । বহু দরিদ্র পরিবার সেই 'বস্তিতে' স্বল্পপরিমল গৃহে বাস করিত । সেই সকল পরিবারের বালক-

বালিকারা দিনান্তে এই উজানে আসিয়া পরম আনন্দ লাভ করিত। তাহাদের সরলতাময় সুন্দর আননে আনন্দবিকাশ লক্ষ্য করিয়া সূর্য্যকান্তের হৃদয় যুগপৎ আনন্দে ও বিষাদে পূর্ণ হইত। এইরূপে একবৎসর কাটিয়া গেল।

৮

ক্রমে এমনই দাঁড়াইল যে, সূর্য্যকান্ত মধ্যাহ্ন হইতে উজানে বালকবালিকা-দিগের আগমনের প্রতীক্ষা করিতেন। যাহারা নিত্য আসিত তাহাদের মধ্যে একজন না আসিলে তিনি বিষন্ন হইতেন। ইহাদিগকে লইয়া তিনি শূন্য হৃদয়ের এক অংশ পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এমনই ভাবে তাঁহার দিন যাইতে লাগিল। যখন সন্ধ্যা হইত, বালকবালিকারা যে যাহার গৃহে চলিয়া যাইত, তখন সূর্য্যকান্তের মনে হইত—বিশাল বিশ্বে তাঁহার কোন কাগ নাই—তাঁহার জীবনের কোন সার্থকতা নাই।

তাঁহার গৃহের নিকটস্থ 'বস্তি' হইতে যে সকল বালকবালিকা তাঁহার উজানে আসিত ফাল্গুনের শেষে এক দিন তাহাদের সঙ্গে একটি শিশু আগিল। তাহার পরিধানে ছিন্ন বসন—কোমল চরণদ্বয় নগ্ন। তাহার মুখে হাসি নাই—পরন্তু নিবিড় বিষাদাকার ব্যাপ্ত। তাহাকে দেখিলে অকাণ্ডজলদোদয়ে সঞ্চিত প্রভাতপদ্মের মত বোধ হয়। যে বয়সে চাঞ্চল্য ও চপলতা স্বাভাবিক সেই বয়সে বালকের মুখে গাভীর্য্য ও বিষন্নতাব সপ্রকাশ। বালককে দেখিয়া সূর্য্যকান্তের দয়া হইল; তাঁহার হৃদয়ে মেহের উৎস উচ্ছৃঙ্খিত হইয়া উঠিল। তিনি তাহাকে বক্ষে লইবার চেষ্টা করিলেন; বালক যে বালিকার সহিত আসিয়াছিল তাহার বসন চাপিয়া ধরিল। সূর্য্যকান্ত তাহাকে নানাবিধ ফুল দিতে চাহিলেন; বালক লইল না। সূর্য্যকান্ত তাহাকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিলেন; বালক উত্তর দিল না—কেবল একবার বিষন্ন দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিল।

সূর্য্যকান্ত তাহার সঙ্গিনীকে জিজ্ঞাসা করিয়া কেবল ইহাই জানিতে পারিলেন যে, কয়দিন পূর্বে তাহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে, তাহার আশ্রয়-হীনা বিধবা জননী পুত্রকে লইয়া 'বস্তিতে' স্বামীর এক বন্ধুর আশ্রয়ে আসিয়াছেন।

দেখিতে দেখিতে বায়ুকোণে ঘন ধূসর মেঘ পুঞ্জীভূত হইতে লাগিল; দিবসের শেষ আলোক মলিন হইয়া উঠিল। যেন সহস্রাত-সংস্কার-বশে

কোন আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় গগনে উড্ডীয়মান বিহগকুল বিস্তারিত পক্ষ সজ্জিত করিয়া দ্রুত নাগিয়া আসিতে লাগিল। সূর্য্যকান্তের উজ্জানে সমাগত বালকবালিকারা গৃহে ফিরিবার উজোগ করিতে লাগিল। ‘বস্তি’ হইতে একজন বৃদ্ধা দাগী বালকবালিকাদিগকে লইতে আসিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া সূর্য্যকান্ত জানিলেন, বালকের জননী কোন পল্লীবাসী ঘনীর একমাত্র সন্তান। তাঁহার পিতা কল্যার বিবাহ দিয়া জামাতাকে গৃহে রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার কুব্যবহারে অভিমাত্রী জামাতা স্বস্তরের আশ্রয় ত্যাগ করেন। তাঁহার পত্নী ও পতির অনুরাগিনী হইয়াছিলেন। তখন বালকের বয়স দুইমাসমাত্র। বালকের পিতা পত্নীপুত্র লইয়া একান্ত অসহায় অবস্থায় উদরাম-সংস্থানের চেষ্টায় কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তাঁহার কোন দূর সম্পর্কীয় কুটুম্বের সাহায্যে তাঁহার একটি চাকরী জুটিয়াছিল। সে চাকরীর বেতনে অতিকষ্টে জামাজাদন নির্বাহ হইতে পারে। অল্পস্বল্পে—বিলাসে অত্যন্ত পত্নীপুত্রের কষ্টে তিনি সর্বদাই কষ্ট পাইতেন এবং অধিক উপার্জনের আশায় অত্যধিক পরিশ্রম করিতেন। অবস্থা বিপর্য্যয়ে দুশ্চিন্তায় ও অতিরিক্ত শ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। কিন্তু দরিদ্রের ভাগ্যে মৃত্যু ব্যতীত বিশ্রামলাভ ঘটে না। দুই বৎসরের অধিককাল দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া কয়দিন হইল তাঁহার ভাগ্যে সেই বিশ্রামসুখলাভ ঘটিয়াছে। তাঁহার যে কুটুম্ব তাঁহার চাকরী জুটাইয়া দিয়াছিলেন দয়া-পরতন্ত্র হইয়া তিনি তাঁহার শেষ অনুরোধ রক্ষা করিয়াছেন—তাঁহার পত্নী-পুত্রকে আশ্রয় দিয়াছেন। তাহাদের কিছুই নাই—বালকের জননী পরিধেয় বস্ত্র ব্যতীত আর সব বিক্রয় করিয়া স্বামীকে চিকিৎসা করাইয়াছিলেন। সম্বল কেবল যে আফিসে স্বামী চাকরী করিতেন সেই আফিসের সাহায্য-ভাণ্ডার হইতে মাসিক পাঁচ টাকা বৃত্তি। কিন্তু পাঁচ টাকায় কি হইবে? যিনি তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছেন—তিনিও দরিদ্র—সামান্য বেতনে চাকরী করেন। তিনি বালকের মাতামহকে সংবাদ দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। বালকের জননী কিছুতেই সে প্রস্তাবে সম্মতি দান করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে যেন সে কাঁচ করা না হয়। তাঁহার শারীরিক অবস্থা যেরূপ শোচনীয় তাহাতে বোধ হয়, তাঁহারও বাঁচিবার আর অধিক দিন নাই।

দাগী বালকবালিকাদিগকে লইয়া চলিয়া গেল। তৎক্ষণে অন্ধাশ্র

বালকবালিকারা যে যাহার গৃহে চলিয়া গিয়াছে। গগনে মেঘের উপর মেঘ পুঞ্জীকৃত হইতেছে।

বৃদ্ধা দাসীর কথা শুনিতে শুনিতে সূর্য্যকান্তের বোধ হইতেছিল, যেন কোন গুরু চাপে তাঁহার হৃদপিণ্ড নিষ্পিষ্ট হইতেছিল। ইহারা কাহারা? তিনি জীবনব্যাপী যাতনায় যাহাদিগের প্রতি দুর্ক্যবহারের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছিলেন,—ইহারা কি তাহারা? যদি তাহারা হয়। সূর্য্যকান্তের অন্ধকার হৃদয়ে আশার আলোক বিদ্যাদীপ্তির মত দেখা দিল। তাহার পর নির্দোষিত-বিদ্যাদালোক গগনে অন্ধকার যেমন নিবিড়তর হয়—তাঁহার হৃদয়ের অন্ধকার তেমনই নিবিড়তর হইল। যদি ইহারাই তাহারা হয়,— তবে তাঁহার দুর্ক্যবহারের ফলে তাহাদের কি সর্ব্বনাশই হইয়াছে।

সূর্য্যকান্ত উঠিয়া গৃহে আসিলেন; একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া বালকের ও তাহার জননীর পরিচয় জানিয়া আসিতে উপদেশ দিলেন।

ভৃত্য চলিয়া গেল। সূর্য্যকান্ত বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

৯

বায়ুকোণে পুঞ্জীভূত অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া কুটিল রেখায় বিদ্যাদীপ্তি বিকশিত হইয়া উঠিল। মেঘগর্জনে ধরণী গগন কাঁপিয়া উঠিল; সূর্য্যকান্তের বাতায়নে কাচকপাট বাঁঝানু করিয়া উঠিল। বাত্যা ও বুষ্টি যেন এই সঙ্কেতের জন্ত অপেক্ষা করিতেছিল। দীর্ঘকাল বদ্ধ থাকিবার পর সহসা মুক্তিপ্রাপ্ত দ্রুতগতি অগ্নের মত পবন প্রবল বেগে বহিতে লাগিল; অদূরে বৃক্ষশাখা ভাঙ্গিবার শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে বুষ্টি নাগিল। চারিদিক অন্ধকার—এক একবার মেঘশুভ্রিতসহচর বিদ্যাদালোকে প্রকৃতির ক্রিষ্ট মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। সূর্য্যকান্ত ভৃত্যের প্রত্যাবর্ত্তন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

প্রবল বাড়ে পবিপার্শ্বস্থ বৃক্ষশাখা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল—বারিপাত হইতেছিল; সেই দুর্যোগে পথে বাহির হওয়া বিপজ্জনক বলিয়া ভৃত্য প্রত্যাবর্ত্তনে বিলম্ব করিতে লাগিল। পরে বহুক্ষণ অপেক্ষার পর সে কোনরূপে গৃহে আসিয়া উপনীত হইল। সূর্য্যকান্ত ততক্ষণ দারুণ মানসিক যাতনা ভোগ করিতেছিলেন। ভৃত্য আসিয়া যাহা বলিল তাহাতে বালকের জননী যে তাঁহারই একমাত্র সন্তান সে বিষয়ে সূর্য্যকান্তের আর সন্দেহ রহিল না। তাঁহার হৃদয়ে বেদনার উপর বেদনার ভার একান্ত দুঃসহ হইয়া উঠিল। আপনাকেই কন্যার সর্ব্বনাশের কারণ জানিয়া তাঁহার হৃদয় আত্মগানির তুয়ানলে দগ্ধ হইতে লাগিল।

সূর্য্যকান্ত ভৃত্যকে বলিলেন, “চল আমি তথায় যাইব ।”

ভৃত্য বলিল “এ ছুর্যোগে যাইতে পারিবেন না ।”

সূর্য্যকান্ত অনিলেন না, ভৃত্যকে সঙ্গে আশিতে আদেশদান করিয়া তিনি সেই দীক্ষণ ছুর্যোগে গৃহের বাহির হইলেন ; কিন্তু কয় পদ যাইয়া তার অগ্রসর হইতে পারিলেন না । তাঁহার প্রবল মানসিক শক্তি প্রতিকূল প্রাকৃতিক শক্তিকে পরাভূত করিতে পারিল না । তিনি ফিরিয়া আসিলেন । তাঁহার পরিচ্ছদ সিক্ত হইয়া গিয়াছিল,—পরিবর্ত্তন করিবার কথা তাঁহার মনে হইল না । তিনি মুক্তবাতায়নমুখে বসিয়া প্রভাতের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন ; বাত্যাবাহিত বৃষ্টিবারি তাঁহাকে সিক্ত করিতে লাগিল । সে দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না । তাঁহার হৃদয়ে প্রবলতর ঝটিকা বহিতেছিল ।

ঝড়ের বেগ প্রশমিত হওয়া দূরে থাকুক, বাড়িতে লাগিল । বোধ হইতে লাগিল যেন, উন্মাদ প্রকৃতি সৃষ্টি-সংহারে সমুদ্রত হইয়াছে ।

১০

নিশাশেষে পবনের বেগ প্রশমিত হইল ; বৃষ্টি থামিয়া গেল । যখন পবন-চঞ্চল, বর্ষণলগ্ন, ধূসরাত্ত মেঘে পূর্ণ গগনে পূর্ব্বসীমায় উষালোক ফুটিয়া উঠিল—তখন বাত্যা ও বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে । প্রকৃতির মুখে শিথিল প্রশান্তি ; যেন চঞ্চল বালক জীড়াচ্ছলে যাহা পাইয়াছে নষ্ট করিয়া—শ্রান্তিবশে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিন্ন ও ভগ্ন জব্যাদির মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে । সূর্য্যকান্তের সমস্তরচিত উন্মাদ ছিন্ন ভিন্ন ; সম্মুখে রাজপথ ভগ্ন ও পতিত বৃক্ষশাখায় ভুগ্নম ।

দিবালোক ফুটিতে না ফুটিতে সূর্য্যকান্ত নিদ্রিত ভৃত্যকে ডাকিয়া ডুলিলেন । ভৃত্য প্রভুর পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া বিষয়ে নির্বাক হইল । তিনি যেন উন্মাদ ।

সূর্য্যকান্ত ভৃত্যকে লইয়া ‘বস্তিতে’ গমন করিলেন । ‘বস্তি’র এক অংশে কয়খানি গৃহ ভূমিসাৎ হইয়াছে । তাহারই একখানিতে তাঁহার কচ্ছা ও দোহিত্র আশ্রয় পাইয়াছিল । তখন ঘর সরাইয়া পতিত গৃহের অভ্যন্তরে আবস্তসমাদি-প্রাপ্তদিগকে বাহির করিবার চেষ্টা চলিতেছে ।

বুদ্ধ দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন । তাঁহার হৃদয়স্পন্দন যেন থামিয়া গেল ।

কিছুক্ষণ চেষ্টার পর চালের এক অংশ কাটিয়া সরান হইল । বুদ্ধ উন্মাদের মত ছুটিয়া যাইয়া দেখিলেন, দ্বারের নিকটে মলিনবসনা, শীর্ণকায়া রমণীর শব ; রমণীর বক্ষে শিশুর যুতনেত্র । বোধ হয় অনন্য পুত্রকে লইয়া বাহির হইতেছিলেন,

এমন সময় প্রাচীর ভাঙ্গিয়া উভয়ের উপর গৃহের চাল পড়িয়াছিল। উভয়ে আঘাতের উপর জীবন্ত সমাধির দারুণ যাতনা ভোগ করিয়া মরিয়াছে।

আর সকলে শবদেহ টানিয়া বাহির করিল। মৃতমুখে দিবালোক পড়িল। সে মুখ সূর্য্যকান্তের পরিচিত; তাঁহার পিতৃহৃদয়ে তাঁহার যে প্রতিচ্ছবি আছে— তাহা তিনি কিছুতেই মুছিয়া ফেলিতে পারেন নাই।

শঙ্কাতাড়িতের মত চঞ্চলপদে সূর্য্যকান্ত সে স্থান ত্যাগ করিলেন। তিনি আর গৃহে ফিরেন নাই। তিনি নিরুদ্দেশযাত্রার যাত্রী। তিনি কোথায় গিয়াছেন, কেহ জানে না। তাঁহার শূন্য গৃহে যুক্তবাতায়নপথে পবন যেন কাহার সন্ধান করিয়া ফিরে—তাহাকে না পাইয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া যায়।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

মিলন।

১

সেই প্রাণ, মন আছে, শুধু মোর নাহি কাছে,
একখানি তরুণ হৃদয়।
আছে পড়ি' কর্মরাশি, পিছে নাই শিথল হাসি,
আছে যশ, নাহি তাহে জয়।
আছে দিন, নিশি-পরে, সে নহে আমার তরে,
বহে তা'র আকুল নিশ্বাস;
দিনশেষে নিশি আসে, ফিরিতে আপন বাসে,
শূন্য শয্যা করে উপহাস।

২

শুধু সন্ধ্যা সেই আসে, আর না গবাক্ষ-পাশে,
হেরি তা'র মধুর মুরতি,
দেখিত যে অনিমেয়ে— চাঁদ যায় ভেসে ভেসে,
নীল জলে সরাল যেমতি।
আছে জ্যোৎস্না—আছে নিশি, আছে চির মগ্ন-ঋষি,
শুধু সে-ই নাহিক ধরায়;
জীবনের কোন্ পারে, আজি সুধাইব কানে,
এক জন্ম আগে সে কোথায় ?

সোণাবিবি।

কোন বীর্যবতী ভারতরমণীর কথা বলিতে হইলেই আমাদেরকে বাঙ্গালার শ্রামল প্রান্তর ছাড়িয়া দূর রাজপুতানার উয়র ক্ষেত্রের এবং মহারাষ্ট্র দেশের রুক্ষ পার্বত্য সৌন্দর্যের মধ্যে অনুসন্ধান করিতে হয়। কিন্তু সত্য সত্যই কি এত বড় বাঙ্গালা দেশে এমন একজন বীরাজনাও জন্ম গ্রহণ করেন নাই যাহার বীরকীর্তি-গাথা গাহিয়া আমরা ধন্ত হইতে পারি? এক দিন যে দেশের নরনারীর নিকট সহমরণের পুণ্যকথা একান্ত পরিচিত ছিল—যে দেশের নারী সংসারের শত মায়ার বন্ধনকেও মৃত পতির পুত্র স্মৃতির নিকট তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া সানন্দে মরণকে বরণ করিয়া লইতেন—সে দেশের অধিনাসী আমরা, আমাদের নিকট রাজপুতজলনাগণের ‘জহর ভ্রতের’ কথা যত পরিচিত—একজনও বন্দী বঙ্গলীল আত্ম-বিসর্জন-কাহিনী তত পরিচিত নহে। ইতিহাসকে পূর্ণাঙ্গবে গড়িয়া তুলিতে হইলে এক দিকে যেমন দেশের বীরপুত্রগণের মহাজীবনীর আলোচনা করা আবশ্যিক, অন্য দিকে আবার তেমনই অনুসন্ধান দ্বারা বীরাজনাগণের বিস্মৃত কীর্তি-কথার উদ্ধার সাধনে যত্নবান হওয়াও আমাদের একান্ত কর্তব্য। আমরা সেই আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়াই অল্প বাঙ্গালার প্রাচীন ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে একজন বীর্যবতী বঙ্গরমণীর অপূর্ণ বীরত্বের ও আত্ম-বিসর্জন-কাহিনীব পুণ্য ইতিহাস পাঠকবর্গকে উপহার প্রদান করিলাম। আশা করি, তাঁহারাও ভবিষ্যতে আমাদেরকে এ বিষয়ে সাহায্য করিবেন।

বাঙ্গালার ইতিহাস পাঠকের নিকট বারভূঞার কাহিনী চিরপরিচিত। আবার সে সকল প্রাতঃস্মরণীয় ভূঞাগণের মধ্যে বিক্রমপুরাধিপতি চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের বীরত্ব-গাথাই বা কাহার অজ্ঞাত? আমাদের প্রবন্ধোক্ত সোণাবিবি চাঁদ রায়ের কন্যা ও কেদার রায়ের ভাতৃপুত্রী। সোণামণি বা স্বর্ণময়ী বালবিধবা। তৎকালে তাঁহার রূপ-লাবণ্যের খ্যাতি পূর্ববঙ্গের সর্বত্র প্রবাদের ছায় প্রচলিত ও পরিচিত ছিল। বিধবা সোণামণি হিন্দুর চিরপবিত্র ব্রহ্মচর্যাশ্রম দ্বারা পিত্রা-লগ্নে দিনাতিপাত করিতেন। কিন্তু ভাগ্যচক্রের বিস্ময়কর আবর্তনে তাঁহার জীবন ভিন্ন পথে চালিত হইয়া কল্লনাভীত কার্যপরম্পরার সৃষ্টি করিয়াছিল।

সে ষোড়শ শতাব্দীর কথা। তখন বাঙ্গালা দেশে বড় গোঁলযোগ। মোগল সম্রাট আকবর শ্রীর সুদীর্ঘ জীবনের সন্ধ্যায়, এবং তাঁহার পরলোক গমনের পরে, সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁহার সিংহাসনারোহণের পরেই বারভূঞাগণের বিজোহ সমা-

চায়ে ব্যতিশাস্ত হইয়া, পড়িয়াছিলেন। “যশোর নগর দায়ের” প্রতাপাদিত্য, বিক্রমপুরের চাঁদ ও কেদার রায়, থিঞ্জিরপুরের ঈশা খাঁ প্রভৃতি দুর্দান্ত অমীরগণের স্বাধীনতা-ঘোষণার বাণী—দলিত পরগণার ফণা উত্তোলনের মত সম্রাট আবাদীরকে উদ্ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল; তাই তিনি বারভূঞারূপ শূন্য পতঙ্গ কম্বটিকে দমন করিবার নিমিত্ত মানসিংহকে বঙ্গদেশে প্রেরণ করিবার মন্বনা করিতেছিলেন। এ হেন দুর্দিনে বার ভূঞাগণের পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্বের বন্ধন যে কতটা দৃঢ় হওয়া আবশ্যক হইয়াছিল তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন। সে সময়ে আবার বার ভূঞাগণের মধ্যে ধনবলে ও জনবলে থিঞ্জিরপুরের ঈশা খাঁ সর্বপ্রধান ছিলেন। এই থিঞ্জিরপুর সরকার সোণারগাঁও অন্তর্ভুক্ত ছিল, এতদ্‌ব্যতীত উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গের বহুস্থলেও ঈশা খাঁ স্বীয় অধিকার বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কত্রাডুপুরে তাঁহার রাজধানী ছিল। রাণফ্‌ ফিচ্‌ ঈশা খাঁর সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন যে * * * The chief king of all these countries is called Isacan, and he is chief of all other kings, and is a great friend to all Christians. * এই ঈশা খাঁর সহিত চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল; তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, যদি তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে কোনরূপ মনান্তর না হয় তাহা হইলে এই নদ-নদীসমূহ দেশে মোগলের শক্তি-বিস্তার অসম্ভব হইবে। কিন্তু তাঁহাদিগের মিলনমঙ্গলের মধ্যে চির অশান্তির বীজ নিহিত ছিল। কিম্বদন্তীতে প্রকাশ যে, একবার ঈশা খাঁ কেদার রায়ের রাজধানী শ্রীপুরে আসিলে কোর্ন প্রকারে চাঁদ রায়ের একমাত্র দুহিতা স্বর্গময়ীকে দেখিতে পাইয়া তদীয় রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়-পটে সে অপূর্ণ রূপমীর রূপলাবণ্য মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল। তিনি স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়াই চাঁদ রায়ের নিকট তদীয় দুহিতার পাণিপ্রার্থনা করিয়া দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। ঈশা খাঁর এতাদৃশ অশিষ্টাচরণে রায়ভ্রাতৃত্বের হৃদয়ে ঘৃণার ও বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে দারুণ বিদ্বেষবহি প্রাঙ্গলিত হইয়া উঠিয়াছিল। কথিত আছে যে, ঈশা খাঁ অবশেষে চাঁদ রায়ের অন্ততম প্রধান কর্মচারী শ্রীমন্ত খাঁকে হস্তগত করিয়া তাঁহার সহায়তায় চাঁদ রায়ের বিধবা কন্যা সোণামণিকে করতলগত করতঃ তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন।† সোণামণিও

* Harton Ryley's Ralph Fitch p. 118.

† ডাক্তার ওরাইজ্‌ এগিয়াটিক সো ইটিং জার্নালে (Vol. XLIII, Part I. 1874, 202). প্রকাশিত তদীয় বারভূঞা শীর্ষক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, “Between Isa Khan

ঈশা খাঁর শৌর্যবীর্যদর্শনে মোহিতা হইয়া সোণামণি মুসলমান ধর্মে দীক্ষিতা হইয়া ঈশা খাঁর সহিত পরিণীতা হইয়াছিলেন । * ঈশা খাঁ সোণামণির পানিগ্রহণ করিয়া তাহার নাম অলিনেমামত বিবি রাখিয়াছিলেন ; কিন্তু দেশের লোকে র নিকট সে নাম পরিচিত হয় নাই—তিনি চিরদিনই সোণাবিবি নামে পরিচিতা হইয়া আসিতেছেন । এই সোণাবিবির বীরত্বকাহিনীই আমাদের বক্তব্য বিষয় । পাঠকসাধারণের সুবিধার জন্যই আশাদিগকে এখানে প্রাচীন ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত করিতে হইয়াছে ।

সোণামণির অপহরণঘটিত অপমানের তীব্র জ্বালায় অর্জ্জরিত হইয়া চাঁদ রায় অত্যন্ত সময়ের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করেন । কেদার রায়ের হৃদয় হইতে অকলঙ্ক-কুলে কলঙ্ককালিমার সঞ্চারহেতু প্রজ্জ্বলিত প্রতিহিংসাবহি কিছুতেই নির্বাপিত

of Khizrpur, whose stronghold was on the opposite bank of the Ganges, and the two brothers there was constant warfare. Isa Khan made a successful raid into his enemies' country, carried off and forcibly married Sonai (Svarnamayi), the only daughter of Chand Rai." ডাক্তার ওয়াই-জের এই উক্তির সহিত কিন্তু চির প্রচলিত কিম্বদন্তীর এবং অত্যাশ্চর্য্য অনেক ইতিহাসিকগণের মতের মিল নাই । ঈশা খাঁ যে রূপে স্পর্ধিত হইয়া সোণামণিকে বিবাহ করিবার জন্য চাঁদ রায়ের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন সেইরূপ সমুচিত শিক্ষাও পাইয়াছিলেন । ডাক্তার ওয়াইজ ডাহার এ উক্তির সমর্থনে যথেষ্ট প্রমাণ উপস্থাপিত করিতে পারেন নাই । অতএব স্রীমন্তের বিবাসঘাতকতায় ঈশা খাঁর সোণামণিকে লাভ করিবার কথাই সম্ভব বলিয়া মনে হয় । এ বিষয়ে 'সুবর্ণগ্রামের ইতিহাস' প্রণেতা স্বরূপচন্দ্র রায় মহাশয়ের সংগৃহীত বিবরণীর সহিত বিক্রমপুরের চিরবিশ্রুত সোণামণি সম্পর্কিত ঘটনাবলীর সামঞ্জস্য আছে । স্বরূপ বাবু তদ্রূপিত আছে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, "ঈশা খাঁ বিক্রমপুরের অধিপতি সুপ্রসিদ্ধ চাঁদ রায়ের পরমাত্মন্দরী বিধবা কন্যা সোণামণিকে বিবাহ করিবার মানসে তথায় দূত প্রেরণ করেন । চাঁদ রায় ও কেদার রায় অবগম্য অলঙ্ঘ্য অগ্নিবৎ ব্রূজ হইয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন । প্রথম আক্রমণেই চাঁদ রায়, ঈশা খাঁর কলাগাইছার দুর্গ বিলম্ব করেন । ঈশা খাঁ, ত্রিবেণীর দুর্গে আশ্রয়লাভ করিতে লাগিলেন । চাঁদ রায় ত্রিবেণী অন্বেষণ করিয়া বিজিরপুরের বহুতর অনিষ্টসাধন করিতে লাগিলেন । ঈশা খাঁ মনে মনে স্থির করিলেন, কোনওরূপে সোণামণি আমার হস্তগত হইলেই চাঁদ রায় কথার শোকে বিহ্বল হইবেন এবং হয়ত যুদ্ধ করিতেও নিবৃত্ত থাকিবেন । ঈশা খাঁ অর্ধবলে চাঁদরায়ের প্রধান কার্যাব্যক্ষকে হস্তগত করেন । প্রধান কর্মচারী বিবাস-ঘাতকতাপূর্বক সোণামণিকে ঈশা খাঁর হস্তে সমর্পণ করেন ।" (সুবর্ণগ্রামের ইতিহাস ১০৩-৪পৃষ্ঠা)

* Sona Bibi won by the courage and address of her captor soon ceased to repine at her lot, and renouncing Hinduism she embraced

হইল না । ঈশা খাঁ যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন যেমন তিনি পুনঃ পুনঃ তদীয় রাজ্যের বিভিন্নাংশ আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে বিন্দুমাত্রও শাস্তি দেন নাই, ঈশা খাঁর মৃত্যুর পরেও তেমনই তিনি তাঁহার ভাঙা রাজ্যভিগুণে স্ময় সৈন্য প্রেরণ করিতে থাকেন । সে সময়ে আরাকানদেশবাসী মগগণের অত্যাচারে পূর্ণবয়স বিশেষরূপে সম্মানিত হইয়া উঠিয়াছিল । গৃহার্জন, শ্রীলোকের সতীত্বাপহরণ প্রভৃতি সর্ববিধ দুর্কার্য করিতে এই সকল মগগণ বিন্দুমাত্রও দ্বিধাবোধ করিত না । * ঈশা খাঁর বীরত্বপ্রভাবে মগগণ তদীয় রাজ্যমধ্যে কোনরূপ অত্যাচার করিতে সাহসী হয় নাই, কিন্তু এখন তাহারা স্বেযোগ বুঝিয়া ঈশা খাঁর রাজ্য অধিকারের প্রলোভনে ধাবিত হইল । রাজ্য অরাজক, কামেই চারিদিক হইতে সকলেই স্বেযোগ বুঝিয়া সোণারগাঁর দিকে অগ্রসর হইল । মগদের অত্যাচার ও ত্রিপুরেশ্বর ও বিক্রমপুরাধিপতি কেশরী নামের ভীষণ আক্রমণ হইতে কে এখন ঈশা খাঁর রাজ্য রক্ষা করিবে ? অরাতিবৃন্দ সকলেই ভাবিয়াছিল যে, তাহাদিগকে সোণারগাঁ অধিকার করিতে কোনওরূপ ক্রেশ পাইতে হইবে না ; অতি সহজেই উহা অধিকৃত হইবে । কিন্তু শীঘ্রই তাহাদিগের এ ভ্রম অপনোদিত হইল ।

her husband's faith remaining throughout his life a devoted helpmate, and defending the kingdom against his enemies, her kith and kin, even after his decease. *Romance of an Eastern Capital* by F. H. Bradley Birl. pp. 79-80.

* বিক্রমপুরে অত্যাধি মগদিগের দ্বারা উৎপীড়িত কয়েক খর লোকের বংশধরগণ বাস করিতেছেন । ইঁহারা জমিদারদের নিকট 'গউয়া লাক্ষণ' নামে পরিচিত । ইঁহারা নামোপাধিক লাক্ষণ । মুন্সিগঞ্জ থানার নিকটবর্ত্তী কাঠাদিয়া নামক গ্রামে ইঁহারা বাস করিতেছেন । ঐমত জনগণ ইঁহাদের গৃহে সামাজিক জিয়া কর্ম্য দূরে থাকুক আহারাদিও করে না । গাম-বাগীকর্জুক এইরূপ ভাবে অত্যাধাত হইয়া ইঁহারা এখন নিতান্তই অনাদৃত হইয়া রহিয়াছেন । লাক্ষণ হইয়াও ইঁহারা এখন সমাজ কর্জুক অনাদৃত হইয়া অবস্থাপন্ন কৃষকদিগের দ্বারা আচারপরিচয় হইয়াছে । বিশ্বদত্তী এই যে, যখন মগেরা নিক.পুরের ভিন্ন ভিন্ন স্থান লুণ্ঠন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া তখন এই কয়েক খর লোকের গৃহ লুণ্ঠিত হইয়াছিল এবং গৃহস্থ কুল-কার্মিনীগণ অপমানিত হইয়াছিলেন । তদবধি এই লাক্ষণগণ পতিতলাক্ষণরূপে বাস করিতেছেন । বর্তমানকালে ইঁহারা খুব গদমর্যাদার পুনর্জাতির অল্প বিশেষ মতে । এখন বিদেশে আর ইঁহারা গাত্ত লাক্ষণ বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেন না । মগদিগের এইরূপ লুণ্ঠনে ও দুর্কার্যে পূর্বাঞ্চলের সামাজিক জিয়ার যে শোচনীয় পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল তাহা এই আলেখ্যে বিশেষরূপে পরিষ্কৃত ।

ঈশা খাঁর মৃত্যুর পর সোণাবিবি নিজহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া রাজকার্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। এই সময় সোণাবিবি যে অপূর্ব বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা অত্যাধিক শতমুখে পরিকীৰ্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। বাঙ্গালীর ইতিহাসে এইরূপ রাজনীতি-কুশলতা, স্বাধীন ভাবে রাজ্য-পরিচালনার ক্ষমতা সোণাবিবি ব্যতীত অল্প কোনও রমণী প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না। কথিত আছে যে, ত্রিপুরার রাজা ও কেশরী রায় সন্মিলনে সোণারগাঁয় উপস্থিত হইলেই কেশরী রায় তাঁহাকে আশ্রয়-সমর্পণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া দূত প্রেরণ করেন। তদুত্তরে সোণাবিবি বলিয়াছিলেন, “আমার শরীরে এক বিন্দু শোণিত থাকিতে বিনাযুদ্ধে আমার স্বামীর পরিত্যক্ত একখণ্ড সামান্য ভূমিও কাহারও হস্তে সমর্পণ করিব না।” বীররাজনার এই অপূর্ব বীরবাহীতে কেশরী রায় বিস্মিত হইয়াছিলেন। এ কি তাঁহাদের স্নেহপালিতা আদরিণী সেই স্বর্ণময়ী! এক দিকে একজন বিধবা রমণী—অন্য দিকে ত্রিপুররাজ, মগগণ ও কেশরী রায়—ত্রিশক্তির সম্মিলিত আক্রমণ!

উভয় পক্ষে বহুদিন পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিল। সোণাবিবি স্বয়ং সৈনিকগণকে পরিচালিত করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু হায়! একা রমণীর পক্ষে এইরূপ শক্তিশালী শত্রুগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করা অসম্ভব। অবশেষে যখন তিনি দেখিতে পাইলেন যে, কোনরূপেই আর রক্ষা নাই—তখন তিনি স্বামীর প্রিয়তম দুর্গ শত্রুহস্তে সমর্পিত হওয়া অপেক্ষা ধ্বংস হওয়াই মঙ্গলবোধে—সৈন্যগণকে শীতললক্ষ্ম্যানদীতীরবর্তী সাধের সোণাকুণ্ডা দুর্গে অগ্নি সংযোগ করিতে আদেশ করিলেন,—রাণীর আদেশে উহাতে অগ্নি সংস্কৃত হইল, দেখিতে দেখিতে বহির বিকট গ্রাসে ঈশা খাঁর দুর্গ ভস্মরূপে পরিণত হইতে চলিল—আর সেই প্রবল অগ্নিরানিতে প্রকৃত বীররাজনার ছায় সোণাবিবি পতিপদ চিন্তা করিতে করিতে আত্মবিসর্জন করিলেন। বঙ্গ-রমণীর এরূপ অপূর্ব বীরত্ব-কাহিনী কয়জন বাঙ্গালী অবগত আছেন জানি না—কিন্তু যদি কেহ কোন দিন নারায়ণগঞ্জের নিকটবর্তী সোণাকুণ্ডা নামক স্থানে বেড়াইতে যান, তাহা হইলে অল্প কৃষকদিগের মুখে সোণাবিবির এই বীরত্ব-কাহিনী শুনিতে পাইবেন। তাহারা অত্যাধিক সেই দুর্গের শেষ চিহ্ন একটি মৃত্তিকাস্তূপ দেখাইয়া বলে—“ঐ দেখুন, সোণাবিবির কেল্লা।*”

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

* F. B Bradley Birl তদীয় *Romance of an Eastern Capital* নামক গ্রন্থের

পাষণের কথা ।

(১)

আমার সময়ের ধারণা নাই, সুতরাং আমার অগ্ন-মূর্ত্ত হইতে কত কাল অতীত হইয়াছে তাহা আমি বলিতে পারি না । যতদূর স্মরণ আছে তাহাই বলিতেছি । শৈশবের কথা এইমাত্র মনে পড়ে যে, প্রোশস্ত সমুদ্রসৈকতে আমি ও আমার ভ্রাতৃবর্গ খেলা করিয়া বেড়াইতাম—বায়ুভরে উড়িয়া যাইতাম, ঘূর্ণবাত্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতাম, কখন বা সমুদ্রের জলে পতিত হইতাম, জল সরিয়া যাইলে—ভূমি শুষ্ক হইয়া যাইলে পুনরায় ফিরিয়া আসিতাম । সে সমুদ্রের বিশালতা ধারণা করিবার শক্তি তোমাদিগের নাই । সে সমুদ্রসৈকতের বিস্তৃতি তোমাদিগের মহা-প্রদেশসমূহের দৈর্ঘ্য অপেক্ষা অধিক । যে সকল জলজন্তু সেই মহাসমুদ্রে বাস করিত যৌবনের মুচ্ছাভঙ্গের পর তাহাদিগকে আর দেখি নাই । আমার শৈশবে আমি একবার মূচ্ছিত হইয়াছিলাম । মুচ্ছাভঙ্গে দেখি, আমি যৌবনপ্রাপ্ত হইয়াছি । শুনিয়াছি, তোমাদিগের এই সংগ্রহশালায় সেই মহাসমুদ্রের

৭৯—৮০ পৃষ্ঠায় গোপাধিবির এই অপরূপ আত্মোৎসর্গের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

“Isha Khan's death was the signal for his enemies to swoop down upon his kingdom and wreak the vengeance which they had so often before attempted in vain. Kedar Rai * * * with the Raja of Tipperah sailed up the Megna with a great fleet, confident of success now that the great Afghan Chief was gone. But they were soon to find that though Isha Khan was dead, a valiant defender remained to guard his memory and protect his kingdom. Their own kinswoman, the Afghan's widow was as vigorous and determined a foe as Isha Khan himself. Entrenched in the fort of Sonakunda on the Lakhiya she held out stubbornly for many weeks, defying all the forces of her enemies, and at length, when the end drew near, determined that her dead lord's fort should never surrender to his foes, she ordered it to be burned to the ground, and perishing in its ashes, made of it her funeral pyre. To this day the memory of Sona Bibi is held in honour on the banks of the Lakhiya.”

জীবজন্তুর অস্থি আছে। কিছুকাল পূর্বে শেতকায় বিরলকেশ একজন সাধক পর্বত ভেদ করিয়া সেই সকল জীবজন্তুর অস্থি লইয়া আসিয়াছিলেন।

কতদিন সমুদ্রসৈকতে উড়িয়া বেড়াইয়াছি তাহা বলিতে পারি না। অবস্থা-
জ্বরপ্রাপ্তির পূর্বের কথা সামান্যমাত্র আমার মনে পড়ে। একদিন মধ্যাহ্নে প্রথম
সূর্য্যতপ্ত বায়ু আমাকে অপর কতকগুলি বালুকণার সহিত সমুদ্রবক্ষে নিক্ষেপ
করিয়াছিল। সেদিন যত দূরে আসিয়া পড়িয়াছিলাম, জীবনে আর কোন দিন ততদূর
আসিতে পারি নাই। আমার জীবনযাত্রায় সেই প্রথম পাদক্ষেপ। সে দিন বুঝিতে
পারি নাই যে, পরে অতীতকালের সাক্ষিরূপ বহুযুগের ইতিহাস বহন করিয়া
আমাকে সংগ্রহশালায় আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইবে। সে দিন যে স্থানে
আসিয়াছিলাম সে স্থান হইতে সমুদ্রের জল সরে না, স্মৃতরাং শৈশবের আবাসভূমি
আর কখনও দেখি নাই।

সমুদ্রগর্ভে অপরাপর বালুকণার সহিত বহুকাল বাস করিয়াছি। কত অপরূপ
জলজন্তু আমাদিগের বক্ষের উপর দিয়া চলিয়া যাইত। আমরা তাহাদিগের জন্মমৃত্যু
দেখিতাম। বালুকাময় সমুদ্রগর্ভে তাহাদিগের জন্ম হইত। তাহারা আমরণ
সেই বালুকাক্ষেত্রেই বাস করিত। জীবনান্তে তাহাদিগের অস্থিগুলি শুভ্র
বালুকাক্ষেত্রটিকে গুলতর করিয়া তুলিত। সেই সকল অস্থি তোমাদিগের অতীত
জীববিচার মূল। তোমরা সেই যুগের কোন জীবেরই সমগ্র কঙ্কাল সংগ্রহ
করিতে পার নাই, একখানি দুইখানি অস্থি লইয়া তোমরা অতীত যুগের জীবনের
চিত্র অঙ্কিত করিতে চাহ; কিন্তু তাহা হয় না। অতীতের সাক্ষী আমি সেই সকল
জীব দেখিয়াছি। আমি তাহাদিগকে স্পর্শ করিয়াছি, তাহাদিগের জীবনের প্রারম্ভ
হইতে তাহাদিগের চৈতন্যের শেষসীমা পর্য্যন্ত তাহাদিগের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়াছি,
জীবনান্তে বহুযুগ তাহাদিগের অস্থিনিচয় বক্ষে ধারণ করিয়াছি—আমি বলিতেছি,
তাহা হয় না। তোমরা অতীতযুগের জীবসমূহের যে চিত্রাবলী রাখিয়াছ তাহা
হাস্যোদ্দীপক। বালুকণার যদি উচ্ছাস্ত্র করিবার ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে
আমার উচ্ছাস্ত্রে তোমাদিগের এই গৃহ ধ্বনিত হইয়া উঠিত। আমি
দেখিয়াছি, আমার স্মরণ আছে, কিন্তু আমার মনের ভাব প্রকাশ করিবার
ক্ষমতা নাই, তোমাদিগের মত বলিবার বা লিখিবার ক্ষমতা নাই, স্মৃতরাং সব
জানিয়াও আমার কিছু বলা হইল না।

সমুদ্রগর্ভস্থ বালুকাক্ষেত্রে কত দিন বাস করিয়াছিলাম তাহা বলিতে পারি
না, কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার সময়ের ধারণা নাই। শৈশবে যে আমার

মূচ্ছা হইয়াছিল তাহাও পূর্বে বলিয়াছি । একদিন সূর্যাস্তকালে কোন দানব
আখাতে সমুদ্রগর্ভ নিদ্রা হইয়া গেল, গভীর আলোড়নে বিশাল জলরাশি
ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, বহু জলজন্তুর জীবনাশ হইল । আমি মূচ্ছিত
হইলাম । তাহার পর কাণপ্রবাহ কি ভাবে কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল
তাহা কেমন করিয়া বলিব ? অজ্ঞান অবস্থায় আমি যেন অত্যন্ত ক্লেশ
অমুভব করিতাম, যেন দুর্নিমহ যাতনা অমুভূত হইত, বোধ হইত যেন কেহ
ভীষণ বলে আমার গুহ্র দেহখানিকে গুহ্রতর করিবার চেষ্টা করিতোছিল ।
এতদ্ব্যতীত আর কিছুই স্মরণ নাই । মূচ্ছাভঙ্গে দেখি, অস্ত্রাত শক্তির প্রয়োগে,
বানুকাক্ষেতে বিযম বিপর্যয় ঘটিয়াছে । সেই সমুদ্রমৈকত, সেই বিশাল
জলরাশি, সেই সব জীবজন্তু উদ্ভিদ সমস্তই অন্তহিত হইয়াছে, সে অগৎ আর নাই ;
অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে নক্ষ লক্ষ বানুকাক্ষা একত্র হইয়া ব্রহ্মবর্ষ প্রান্তরে
পরিণত হইয়াছে, আমার নৈশবের দেহ তখন বিশাল অশ্রুধারা করিকামায়ে
পরিণত হইয়াছে, আর আমার স্বাধীনতা লুপ্ত হইয়াছে ।

চেতনার প্রারম্ভে দেখিলাম, নূতন জগতে তৃণলক্ষ্য, তরুজতা, জীবজন্তু প্রভৃতি
সমস্তই পরিবর্তিত হইয়াছে । সে নূতন জগতের আকাশ অনেকটা বর্তমান
জগতের স্থান । তাহার পর স্থানে স্থানে পরিবর্তন হইয়াছে মাল । আমি
তখন যে প্রান্তরখণ্ডের দেহে পীন হইয়াছিলাম মূচ্ছা অবস্থানে দেখি, তাহার
দেহ সিন্ধু শ্রাম দুর্বাদলে আচ্ছাদিত ; নূতন আকারের চতুষ্পদ আঁব তাহার
উপরে নিচরণ করিতেছে । সময়ে সময়ে সমীক্ষমবর্ণ ছাগচর্ম্মাচ্ছাদিত ভোমা-
দিগের শ্রেণীর জীবগণ তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিত । তাহারা নদ,
দস্ত, বা উপজলখণ্ডের সাহায্যে চতুষ্পদ জীবগুলিকে জয় করিবার চেষ্টা করিত
ও লোকবলের আধিক্যে অনেক সময় তাহাদিগকে নিদন করিতে সমর্থ হইত ;
কিন্তু কখন কখনও শূঙ্গের তাড়নায় পরাসিত হইয়া পলায়ন করিতেও বাধ্য
হইত । আমার নিকটে ইহাই মানব-জীবনের ইতিহাসের দুঃসংগত । মনুষ্য
আমার নিকটে তখন নবজাত জীব । আমি যখন জানলাভ করি তখন
মনুষ্যজাতি উন্নতির পথে কিয়দূর অগ্রসর হইয়াছে, সুতরাং মনুষ্য জীবনের
প্রারম্ভের কথা বলিতে আমি অক্ষম । আমি সর্বপ্রথমে মনুষ্যজাতীয় যে সকল
জীব দেখিয়াছিলাম তাহারা অত্যন্ত খণ্ডিত ছিল এবং মৃগমাই তাহাদিগের
উপজীবিকা ছিল বলিয়া বোধ হইত । শুনিয়াছি তৎকালেই দানব সমুদ্রের
উপকূলে অস্থাপি বাস করিয়া থাকে ; অপেক্ষাকৃত বলবান জাতি কষ্টক

ভাঙিত হইয়া তাহারা এখন বৃক্ষশাখা আশ্রয় করিয়াছে ; বৃক্ষাকার জন্তর অভাবে তাহারা কীটপতঙ্গ প্রভৃতির দ্বারা অর্চরানল নিবৃত্ত করিয়া থাকে । ইহারাই এই দেশের প্রকৃত অধিপতি, কারণ মনুষ্য-জীবনের প্রারম্ভে ইহারাই শুক ভূমির এই অংশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল । পরে তোমাদিগের পূর্ব-পুরুষ প্রভৃতি যে সকল জাতি আসিয়া এদেশে বাস করিয়াছে তাহারা সকলেই দস্যু ও অধর্মাচারী । যে কৃষক ও খসারকার মনুষ্যজাতির কথা বলিলাম, তাহারা সংখ্যায় অত্যন্ত অল্প ছিল—শতাব্দিক ব্যক্তিকে কখনও একত্রিত হইতে দেখি নাই । তাহারা ধাতুর ব্যবহার জানিত না, শিলাখণ্ডই তাহাদিগের একমাত্র গায়ন ছিল । কিছুকাল পরে সে জাতীয় মনুষ্য এ প্রদেশে আসিয়া আস্তিত হইল । তাহারা কোথায় গেল, কেন গেল তাহা বলিতে পারি না, কারণ তখনও আমরা ভূগর্ভনিহিত ছিলাম । তোমরা ভুলমান কর, সভ্যতর জাতি আসিয়া বীজধান অঙ্গের সাহায্যে পূর্বোক্ত কৃষক ও খসারকার মনুষ্যজাতির ধ্বংসসাধন করিয়াছিল । তাহার কতকটা সত্য হইতে পারে, কারণ ইহার পরবর্তী মনুষ্যেরা উজ্জল ধাতুগয় অঙ্গের সাহায্যে ভূগয়া করিত । একদিন এক জন ঐরূপ অঙ্গের সাহায্যে আমাদিগকে ভেদ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল । দূরে পাটলীপুত্র-বাসী ভিগ্নদত্ত যে শুভ্র দেখিতেছে উহার একপার্শ্বে অজ্ঞাবধ সেই অজ্ঞাঘাতের চিহ্ন বর্তমান আছে । পরে জানিয়াছি, ঐ ধাতু তাম্র । শুনিয়াছি, যে জাতীয় মনুষ্য তাম্রনির্মিত অস্ত্র ব্যবহার করিত তাহাদিগের বংশধরেরা বিস্তারিত দামিণীতে এখনও বাস করিতেছে । তোমাদের সংগ্রহশালায় তাম্রনির্মিত আয়ুধের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প, কিন্তু তুমি বোধ হয় এই জাতীয় অস্ত্র অনেক দেখিয়াছ । তোমাদিগের পূর্বপুরুষেরা যখন লৌহনির্মিত অস্ত্রের সাহায্যে ভারতবর্ষ অধিকার করেন, তখন পূর্ববাসীরা ভাঙিত হইয়া বিক্রা পর্বতের দক্ষিণে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিল । ক্রমে বিজৈতারাও লৌহ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করায় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাম্রের ব্যবহার রহিত হইয়া যায় । একদিন স্বাত্তিকালে তাম্রনির্মিত অস্ত্রধারী কতকগুলি লোক আমাদিগের বংশের উপরে আসিয়া কয়েক স্থানে অগ্নি প্রজ্জালিত করিল । বহুকাল পরে সেই দিন ঐ আলোক দর্শন করিলাম । ইহার পূর্ববর্তী ঘটনা যাহা বলিয়াছি তাহা পার্শ্ববর্তী বায়ুকাকণার নিকট শুনিয়াছিলাম । অধির সাহায্যে ক্রমে আমাদিগের বক্ষ ও পার্শ্বস্থিত তুণক্ষেত্র ভাঙ্গে পরিণত হইল । দারুণ উত্তাপে আমরা বিদীর্ণ হইয়া গেলাম ও জনগণ পলায়ন করিতে বাধ্য হইল । অল্পকাল পরেই শ্বেতবর্ণ, দীর্ঘকায়, সুদীর্ঘ পিঙ্গলবর্ণকেশধারী কতকগুলি মনুষ্য

পাশ্চাত্য বনভূমি হইতে নির্গত হইয়া আসিল। তাহারা আসিবামাত্র চতুর্দিক হইতে অসংখ্য কৃষ্ণবর্ণ, ভাগ্নিনির্মিত অঙ্গদারী পুরুষ তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। শ্বেতকায় ব্যক্তিগণ আত্মরক্ষার চেষ্টা না করিয়া মৃত্যুকালে অগ্নি ও আকাশকে লক্ষ্য করিয়া নুতন ভাষায় গভীর শব্দে কি বলিয়া গেল। সেই শব্দ-মালার গাভীর্য্য এত অধিক যে, আক্রমণকারীদের মধ্যে কয়েকজন ভীত হইয়া পলায়ন করিল। শ্বেত-কৃষ্ণ মনুষ্যের বিবাদের ফলে আমি অগ্নির আলোক দর্শন করিলাম। পরে কতবার সেরূপ আলোক দেখিয়াছি, কতবার উজ্জ্বলতর অগ্নি আমার নিকটে প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে, কিন্তু প্রথম সে আলোকদর্শনে যে আনন্দ তাহা পরে আর কখনও অনুভব করি নাই। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রজতশুলবর্ষ্মাবৃত, স্মৃতিহীন অঙ্গদারী শ্বেতকায় সৈনিকগণ দলে দলে আসিয়া ভস্মরাশি বেষ্টন করিয়া ফেলিল। বিলাপে পর্ব্বতের সান্নিধ্য প্রাতিধ্বনিত হইতে লাগিল। দলে দলে সৈনিকবর্গ কাষ্ঠ অন্বেষণে চলিয়া গেল। কেবল কয়েকজনমাত্র মৃতদেহের পাশে বাসিয়া রহিল।

কিয়ৎকাল মধ্যে চিতাধূম গগন স্পর্শ করিল, অরণ্যবাসী শ্বেতকায় মনুষ্যগুলির দেহ ভস্মীভূত হইয়া গেল। দক্ষাবশিষ্ট অস্থিগুলি একটি শূন্য মৃগ্যর পায়ে রক্ষিত হইল, দলে দলে শ্বেতকায় মনুষ্য আসিয়া তাহাতে পুষ্পবৃষ্টি করিয়া গেল। মক্ষ্যাকালে একটি গুরুভার দণ্ডের সহিত ভস্মাদারটি ভূগর্ভে প্রোথিত হইল। ইহার পর কয়েক দিবস চারি পাশের পর্ব্বতশ্রেণী হইতে গভীর আর্দ্রনাদ উথিত হইত। অনিতে পাইতাম, কৃষ্ণবর্ণ মনুষ্যজাতির শোণিতে পর্ব্বতের সান্নিধ্য প্রাতিধ্বনিত হইতেছে, ভীষণ প্রাতিহিংসার প্রাবল্যে শ্বেতকায় সৈনিকগণ কৃষ্ণকায় আত্মীয় ধ্বংস সাধন করিতেছে, বৃদ্ধ ও বালক, স্ত্রী ও পুরুষ দলে দলে নিহত হইতেছে, পর্ব্বতের উপত্যকাগুলি ক্ষেপণঃ জনশূন্য হইতেছে। বায়ু আসিয়া ভস্মরাশিকে উড়াইয়া লইয়া গেল, ভস্মসিক্ত ভূমির উর্ব্বরতা বর্ধিত হইল, আত্ম অঙ্গকালের মধ্যে উপত্যকা আবার শিথিলতা বনরাশিতে আবৃত হইল। ইহার পর আমরা আর গর্ভদা মনুষ্যের মুখ দেখিতে পাইতাম না, কৃষ্ণকায় মনুষ্যেরা অতি সাবধানে মৃগয়া করিতে আসিত, অধিক সংখ্যক কৃষ্ণকায় মনুষ্য আর কখনও দেখি নাই। কখন অরণ্যবাসী জটাম্বজদারী পুরুষগণ সমিধপুষ্পাহরণের জন্য গভীর বনে আসিতেন, কখন বা প্রাতিহিংসাপন্নবশ কৃষ্ণকায় অলগ্নে শ্বেতকায় বনচারীর পশ্চাদ্গমন করিত। কিন্তু সে পর্ব্বতের সান্নিধ্য বা উপত্যকায় বহুকাল পর্যন্ত মনুষ্যের বাস ছিল না।

শুনিয়াছি, ক্রমে শ্বেতকায় মনুষ্যে দেশ প্রাবৃত হইয়া গেল, কৃষ্ণকায় মানবজাতি ক্রমে লুপ্ত হইতে লাগিল, যাহারা অবশিষ্ট রহিল তাহারা অধীনতা স্বীকার করিয়া

নবাগত জাতির অনুকরণে প্রবৃত্ত হইল ও ক্রমে শ্বেতজনসংঘে মিশিয়া গেল। শ্বেতজন জনগণের চরম উৎকর্ষের অবস্থা আমি দেখি নাই। আমি যখন পুনরায় মনুষ্যসমাজের সংসর্গে আনীত হইয়াছিলাম তখন শ্বেতকায় জাতির অবনতি স্মৃতিত হইয়াছে। শুনিয়াছি, এই জাতির যেক্রপ উন্নতি হইয়াছিল এতদেশবাসী অপরা কোন জাতিরই সেরূপ হয় নাই। তাহারা বৃহৎ কাঠের দ্বারা গৃহ নির্মাণ করিত, স্মৃতিগু অস্ত্রের দ্বারা হস্তাধারী সূক্ষ্মচিহ্নশোভিত করিত, ক্রমে কাঠের পরিবর্তে পর্বতগাত ছেদন করিয়া গৃহনির্মাণের জন্য পাষণ লইয়া যাইত, অঙ্গসাহায্যে তাহার মলিনত্ব দূর করিয়া তাহার ঔজ্জল্য সাধন করিত। তাহারা কাঠখণ্ডের সাহায্যে জলরাশি উত্তীর্ণ হইত, বৃহদাকার কাঠখণ্ডের নিম্নে বর্তুলাকার কাঠখণ্ড সংলগ্ন করিয়া গো, মহিষ, অশ্ব প্রভৃতি বনবাসী জীবসমূহকে ভারবহনে নিযুক্ত করিত। যে ব্যক্তি বর্তুলের পরিবর্তে রথে চক্র যোজন করিয়াছিল তাহার নাম অতাপি তোমরা করিয়া থাক। ক্রমে সূর্য্যের প্রথর উত্তাপে ও ক্রয়কায় জাতির সহিত মিশ্রণে তাহাদের বর্ণের পরিবর্তন হইতে লাগিল। যখন মনুষ্যসমাজে নীত হইলাম তখন দেখিলাম, নবাগত জাতির বর্ণের বৈষম্য ঘটিয়াছে, আচারব্যবহারে পরিবর্তন ঘটিয়াছে, বলেরও লাঘব হইয়াছে।

বহুকাল পরে পার্শ্বদেশে দারুণ ক্লেশ অনুভব করিলাম। শুনিয়াছি, পাষণে যে ক্লেশ অনুভব করে তাহা তোমরা এখন স্বীকার কর। দেখিলাম, মলিনবেশধারী জনৈক মনুষ্য আমার পার্শ্বে লৌহকীলক প্রোথিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। অনেক চেষ্টার পর, অনেকগুলি কীলক ভগ্ন হইবার পর একটি কীলকের কিয়দংশ আমার পার্শ্বে প্রবেশ করিল। আমার যজ্ঞা ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা নাই, রোধ করিবার ক্ষমতা নাই, সমস্ত ঘটনা স্মরণ করিয়া রাখিবার ক্ষমতা নাই, কিন্তু তথাপি বলিতে পারি, এক্রপ অসহ্য যজ্ঞা কখনও ভোগ করি নাই। এক্রপ অসহনীয় যজ্ঞা সমুজ্জগৎ বাসকালে মুচ্ছার প্রারম্ভেও বোধ হয় অনুভব করি নাই, পরবর্তী জীবনে একবার মাত্র ভোগ করিতে হইয়াছিল। ক্রমে সংবাদ আসিল যে, পর্বতের নানা স্থানে মনুষ্যগণ কীলক প্রোথিত করিবার চেষ্টা করিতেছে, দারুণ যজ্ঞায় সকলেই অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। একটি, দুইটি, তিনটি ক্রমে দশটি কীলক সমরেখায় প্রোথিত হইল। আমাদিগের আক্রমণকারী লৌহদণ্ডধারী আরও কয়েকজন মনুষ্যকে আহ্বান করিয়া আনিла। কীলকমূলে লৌহদণ্ড প্রয়োগে ও মনুষ্যবর্ণের সমবেত চেষ্টায় আমরা সশঙ্কে বিদীর্ণ হইয়া গেলাম। আমাদিগকে অপসারিত করিয়া আততায়ীরা পুনরায় কীলক প্রোথিত করিতে লাগিল। ক্রমে

পর্কতের সান্নিধ্যে সমস্ত স্থান হইতেই এই নির্ভর বিদারণের শব্দ আশ্রিতে লাগিল ; আমরা জানিতে পারিলাম যে, উপত্যকার পর্কস্থানেই পায়ানের উপর অত্যাচার হইতেছে । এইরূপে সন্ধ্যাগমের পূর্বেই পর্কতসামুদ্র আকার অন্তরূপ হইয়া গেল । অন্ধকারের আগমনের সহিত চতুর্দিকে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতে লাগিল, বনভূমি বহুকাল পরে মল্লিকা কর্তৃক প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল ।

পরে আনিয়াছিলাম, স্তূপনির্মাণের জন্য নগর হইতে সহস্রাদিক ব্যক্তি পাঠান ছেদন করিতে পর্কতের নিকটে আসিয়াছিল । তাহারা সমস্ত দিন পাথর ছেদন করিয়া পর্কতের সান্নিধ্যে রাজিয়াপন করিত । সূর্যোদয় হইতে সন্ধ্যার সমাগম পর্যন্ত পাথর ছেদনের শব্দ ও সেই শব্দের প্রতিধ্বনিতে নৈশশ্রেনী কম্পিত হইত । শাপদসকুল বনাবৃত সান্নিধ্য জীবন্ত হইয়া উঠিল । মানবগণ মাসব্যয় পর্কতপার্শ্ব হইতে শিলাছেদনে ব্যাপৃত ছিল । শিলাছেদন শেষ হইলে নগর হইতে শত শত গোয়ান আসিয়া উপস্থিত হইল, গোয়ান মাতাঘাতের জন্য উপত্যকা হইতে নিয়তুমি পর্যন্ত পথ প্রশস্ত করা হইয়াছিল । দলে দলে বৃহৎকায় হস্তিগণ পর্কতনিম্নে আনীত হইল ও দিনের পর দিন হস্তিগণ বৃহৎ পাথরগুচ্ছসমূহ শুণ্ডে উঠাইয়া গোয়ানে স্থাপন করিতে লাগিল । দ্বিমহাস বৎসর পূর্বে হীনবল মানব আতি ক্লেশে এই গুরুভার পাথররাশি পর্কতশ্রেণী হইতে বহুদূরবর্তী নগরের সান্নিধ্যে লইয়া গিয়াছিল, বাণীয়া যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত গুরুভার পাথর ক্লেশে ভূমি হইতে উত্তোলিত হইয়াছিল, তাহা ভাবিয়া তোমরা নিশ্চিন্ত হও, কিন্তু আমি তখন আশ্চর্যজনক নিশেষ কিছুই দেখি নাই । আমি কিম্বা বিশ্বাস বোধ কার শুনবে ? আমার বিশ্বাস বোধ হইয়াছিল গোধকট দেখিয়া, গোধকটের চক্র দেখিয়া, চক্রের প্রবর্তন দেখিয়া । আমি ভাবিয়াছিলাম, কাষ্ঠনির্মিত যুদ্ধ চক্র গুরুভার পায়ানের ভার বহন করিতে সমর্থ হইবে না, ভার বহনেও যদি সমর্থ হয় শকট চালাতে সমর্থ হইবে না, নিশ্চয়ই কোন না কোন বিপদ ঘটিবে । কিন্তু সামান্য চেষ্টাতেই শকট চলিল, চক্র প্রবর্তিত হইতে লাগিল, ক্রমে অতি অল্প সময়ের মধ্যে পথ অতিবাহিত হইতে লাগিল । মেরুপ গোধকট তোমরা এখন আর ব্যবহার কর না, দুই একজনমাত্র, তাহার পায়ানে গোদিত চিহ্ন দেখিয়া থাকিবে । তাহা বর্তমানকালে প্রচলিত গোধকটের আয় নহে । বর্তমানের গোধকট দ্বিচক্র, কিন্তু সেগুলি চারি বা ততোধিক চক্রের উপরে স্থাপিত হইত । রথচক্র কোন স্থানে ভূমিতে প্রবেশ করিলে বা পথের কোন স্থান কর্দিমাত্র থাকিলে হস্তিবৃন্দ আসিয়া সাহায্য করিত, শুণ্ডে রথচক্র মুক্ত করিত, কখন বা ভারবাহী গোধকটকে সাহায্য করিত । এইরূপে গোধকটে সহস্রাদিক শিলাগু নূতন

পথ ধরিয়া শতাব্দিক যোজন পথ আনীত হইল। শিলাবাহী শকটসমূহ যে দিন নগরের প্রান্তে উপস্থিত হইয়াছিল সে দিন নগরে মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছিল। দলে দলে নগরবাসিগণ আসিয়া আগাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অনেক একপ দীর্ঘকায় প্রান্তর পূর্বে কখনও দেখে নাই; তাহারা বিষয় প্রকাশ করিতে লাগিল। ক্রমে শকটশ্রেণী নগরপ্রাকার অতিক্রম করিয়া নগরে প্রবেশ করিল। তখন জনতা ক্রমে পথরোধ করিয়া ফেলিল। মুষ্টিমেয় রাজপুরুষের চেষ্টায় পথ মুক্ত হইল না; তখন অতি বৃদ্ধ লোলচর্ম, মুণ্ডিতশীর্ষ কাষায় বস্ত্র পরিহিত একজন মনুষ্য আসিয়া ভগবান্ বুদ্ধের নাম উচ্চারণ করিয়া পথমুক্ত করিতে অনুরোধ করিলেন। বুদ্ধের ও রাজপুরুষগণের চেষ্টায় পথ মুক্ত হইল। শকটসমূহ নগর অতিক্রম করিয়া পুনরায় নগরপ্রাকারের বাহিরে এক প্রান্তরে আসিয়া সমবেত হইল। এই সময়ে দেখিলাম, মনুষ্যজাতির অনেক পরিবর্তন হইয়াছে; অনেক উন্নতি হইয়াছে, অনেক বিষয়ে অবনতিও হইয়াছে। নূতন নাম, নূতন আচার ব্যবহার, নূতন অঙ্গ ও অঙ্গান্ন ব্যবহার্য্য সামগ্রী আসিয়া আমার পূর্বপরিচিত খেতকায় জাতিতে অনেক পরিবর্তন ঘটাইয়াছে। বুদ্ধ, শ্ববির, ভিক্ষু, সজ্জ, সজ্জারাম, চীবর, কাষায় প্রভৃতি কথা পূর্বে কখনও শুনি নাই। মনুষ্যজাতির আবাসস্থল নগরসমূহ স্পৃহা গগন-স্পর্শী আবাসভবনে পরিপূর্ণ হইয়াছে; রাজপথসমূহ প্রস্তরাদ্বিত হইয়াছে; বিশালনগরে জগাভাব দূর করিবার জন্য কৃত্রিম নদীসমূহ খনিত হইয়াছে; হস্তী, উষ্ট্র, অশ্ব প্রভৃতি জীবগণ নদ্রজাতির বশীভূত হইয়া তাহাদিগকে বহন করিতেছে, উষ্ট্র ও অশ্ববাহিত শকটের শব্দে প্রাতিরোধ হইবার উপক্রম হইয়াছে; নগরমাধ্যে জলপথে বিচিত্র তরলীসমূহ ইতঃসুতঃ যাতায়াত করিতেছে। আমি একপ নগর পূর্বে কখনও দেখি নাই, ক্রমে হস্তিযুথের সাহায্যে শকট হইতে প্রান্তরসমূহ ভূমিতে নিষ্কিপ্ত হইল, সমুদায় প্রান্তর নাগাইতে সম্যাকাল উপস্থিত হইল। শকটের পশ্চাতে যে বিশাল জনসম্মেলন প্রান্তরে আসিয়াছিল, তাহারা একে একে নগরে প্রত্যাগমন করিতে লাগিল। ক্রমে বিশাল প্রান্তর জনশূন্য হইয়া গেল। পূর্বে নগর ও নাগরিক কখন দেখি নাই। সে দিন সহস্র সহস্র নাগরিকের কথোপকথন কর্ণগোচর হইয়াছিল, তাহার কতক বৃষ্টিতে পারিতেছিলাম, কতক পারি নাই। তবে এইমাত্র নিশ্চয় জানিয়াছিলাম যে, মানবজাতির ভাষার অবস্থাস্তর ঘটয়াছে। পূর্বে কৃষ্ণকায় বনবাসী মানবজাতির মুখে যে ভাষার প্রয়োগ শুনিয়াছিলাম সে ভাষার অবিমিশ্র প্রয়োগ আর শুনি নাই। পূর্বে নবাগত খেতকায় জাতির মুখে যে ভাষা শুনিলাম, সে ভাষাও আর শুনি নাই। এখন নাগরিকগণকে যে ভাষা

ব্যবহার করিতে শুনিলাম, তাহা প্রাচীন শ্বেতকায় আঁতর ভাষার ছায়, কিন্তু মেরুণ পরুষ নহে, তাহা অপেক্ষাকৃত কোমল ও সুশ্রাব্য ।

বহুকাল পরে মনুষ্যজাতি দেখিলাম । আমি বৃদ্ধ,—অতি বৃদ্ধ,—আমার বয়সের পরিমাণ কনিবার যদি আমার ক্ষমতা থাকিত তাহা হইলে আমার বয়স শুনিয়া তোমরা বিস্মিত হইতে । বৃদ্ধগণ সাধারণতঃ প্রগল্ভ হইয়া থাকে ; নগরবাসী মনুষ্য জাতিকে কি প্রকার দেখিলাম তাহা বলিতেছি, তুমি চিত্ত সংযত কর, আমার প্রগল্ভতায় বিরক্ত হইও না । শকট-বাহিত পাশাণ দেখিতে নানাবিধ মনুষ্য আসিয়াছিল । যাহারা রাজপথে আসিয়াছিল তাহাদিগের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ, বৃদ্ধ ও বাৎসক, শ্বেত ও কৃষ্ণ, সর্ষবিধ মনুষ্যই দেখিয়াছিলাম । যাহারা আমাদেরকে ছেদন করিতে পর্ষতপার্শ্বে গমন করিয়াছিল, তাহারা শ্রমজীবী, কঠোর পরিশ্রমে পটু, পরুষভাষী, বহুভাষী ও বহুভোজী । শকটে প্রস্তুত আসিতেছে শুনিয়া যাহারা নগরপ্রান্তে আমাদেরকে দেখিতে গিয়াছিল, তাহারা অধিকাংশই শ্রমজীবী, তবে তাহাদিগের মধ্যে দুই একজনকে দেখিয়া বোধ হইয়াছিল, তাহারা যেন অপর কোন জগতের মনুষ্য, তাহাদিগের সুদীর্ঘ ঝপু ও কোমল মুখকান্তি দেখিয়া মনে হইয়াছিল, যেন তাহারা কঠোর শারীরিক শ্রমে অভ্যস্ত নহে । তাহারা স্নদৃশ্য বহুমুগ্য পরিচ্ছদ ব্যবহার করে, তাহারা যে স্থান দিয়া চলিয়া যায় সে স্থান স্রগন্ধে পূর্ণ হইয়া উঠে, তাহাদিগের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ অথচ যেন আলস্যজড়িত । পরে জানিয়াছিলাম, তাহারা বিশাসপ্রিয় নাগরিক । নগরপ্রাচীর অতিক্রমকালে আর এক শেখার মনুষ্য দেখিয়াছিলাম, তাহারা দীর্ঘকায়, স্নদর্শন, কোমল অথচ কঠোর, তাহারা পরিচ্ছদের উপর লৌহবর্ম ধারণ করিয়াছিল, কোমলহস্তে শালিত লৌহ ধারণ করিয়াছিল, তাহাদিগের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ও বশদৃশ্য । পরে জানিয়াছিলাম, তাহারা যুদ্ধবানসায়ী । পূর্বে যে শ্বেতকায় আঁতি দেখিয়াছিলাম তাহাদিগের মধ্যে যাহারা যুদ্ধ করিত, তাহারা দেব-সেবা করিত, তাহারা হ্রলকর্ষণ করিত ; কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে বিনাসিতা ছিল না । বর্তমান কালে এ কথা তোমাদিগের নিকট প্রতিকঠোর হইবে । সহস্র সহস্র বর্ষকাল ব্যাপিয়া তোমরা আতিভেদে—আত্মাশ্রমারে কন্মভেদে অভ্যস্ত, স্মৃতরাং এ কথা তোমরা হয়ত বিশ্বাস করবে না । তোমাদিগের নিকটে তোমাদিগের প্রাচীন প্রণার অবশেষ যাহা কিছু আছে, তাহা হইতে তোমরা আনিয়া আসিতেছ যে, আতিভেদ বহুকালের । কিন্তু আমি আতিভেদ অপেক্ষাও প্রাচীন, আমি মনুষ্যজাতি অপেক্ষা প্রাচীন, আমি সর্ষজীবী অপেক্ষা প্রাচীন, আমার কথা বিশ্বাস করিও । নগর কাছকে বলে তাহা সেই দিন দেখিলাম । দেখিলাম, তাহা

মনুষ্যের অবগাবিশেষ । যতদিন পর্বতের পদপ্রান্তে পড়িয়াছিলাম ততদিন দেখিয়াছি, জীব দেখিলে জীব হন তাহার নিকট আসিয়া মিলিত হয়, নহে ত দূরে পলায়ন করে, হয় আলাপে প্রবৃত্ত হয়, নহে ত পরস্পরের প্রাণহরণের চেষ্টা করে । এত অল্প পবিসর স্থানের মধ্যে, এত অধিক জীব পরস্পর বিবাদ না করিয়া, হিংসা না করিয়া কিরূপে বাস করে তাহা আমার নিকট অতীব বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হইয়াছিল । কিন্তু শুনিয়াছি, বিবাদ ও হিংসার প্রকারভেদ হইয়াছে ; যে স্থানে জীবের অস্তিত্ব আছে বিবাদ ও হিংসা এখনও সে স্থানে বিদ্যমান আছে । যখন নগরপ্রাকার অতিক্রম করিয়া নগরমধ্যে গমন করিতেছিলাম তখন দেখিতেছিলাম, জনস্রোতঃ নানা পথ হইতে আসিয়া একত্র মিলিত হইতেছে । পরস্পর অভিভাষণ না করিয়া, এমন কি পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাতও না করিয়া যে যাহার গন্তব্য পথে চলিয়া যাইতেছে । প্রথম দিন নগর দেখিয়া ইহা আমার নিকট একান্ত বিস্ময়কর বোধ হইয়াছিল । রাজপথের উভয় পার্শ্বে সুসজ্জিত বিপণীশ্রেণী, অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা, বিপুল পণ্যের সমাবেশ প্রথম দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম । বিপণীর উপরে গবাক্ষ-পথে শকট-শ্রেণীদর্শন-লোলুপ অবগুষ্ঠনশূন্য অন্তঃপুরিকাগণকেও দেখিয়াছিলাম । ইহার পূর্বে কখনও এত অধিক জীজ্ঞাস্তি একত্র সমাবেশ দেখি নাই । সে দিন কত অলঙ্কার, কত বস্ত্র, কত বেশভৈচর্য্য দেখিয়াছি তাহা কি বলিব ! শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিবাহিত হইয়াছে, কিন্তু মনুষ্যজাতির প্রথম নগর দেখিয়া যেরূপ আনন্দ হইয়াছিল সেরূপ আনন্দ আর কখনও উপভোগ করিব কি না সন্দেহ । আমাদিগকে দেখিতে নগরের প্রায় সমুদায় লোকই আসিয়াছিল ; রাজাও আসিয়াছিলেন । তিনি নগরের মধ্যভাগে অষ্টাশ্রয়োজিত স্তব্ধনির্মিত রথারোহণে আসিয়াছিলেন । অশ্রাব্য রাজকর্মচারিগণ তাহাকে বেঁটন করিয়া ছিল ; তাহাকে দেখিয়া নগরবাসিগণ আনন্দধ্বনি করিতেছিল, বাতায়নপথে নাগরিকাগণ পুষ্প ও লাজ বৃষ্টি করিতেছিল । রাজসমাগম যেন একটি স্বতন্ত্র উৎসব হইয়া উঠিয়াছিল । রাজপথে দেখিয়াছিলাম, সুন্দরী রমণীগণ পুষ্পসজ্জায় সজ্জিত হইয়া নাগরিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে, তাহাদিগের আকার, ইঙ্গিত, আচার, ব্যবহার তখন আমার নিকট সম্পূর্ণ নূতন । পরে শুনিয়াছি, তাহারা বারাজনা বা লেনা-শোভিকা । বারাজনা নাম শুনিয়া জ্ঞ কুণ্ডিত করিও না, বর্তমান কালে মনুষ্যজাতি বাবনারীগণকে যেরূপ ঘৃণা করে, অস্পৃশ্য বিবেচনা করে, প্রাচীনকালে নাগরিকগণ সেরূপ করিত না । তখন বারাজনাগণ সমাজে সম্মাননীয় ছিল, সমাজে পাপের

অবাধস্রোতঃ স্রোতঃ করিবার উপায় বলিয়া বিবেচিত হইত। সমাধের পাঁচাল জল নির্গমনের পয়ঃপ্রবাহরূপে বারান্দানাগল তখন সমাধের অত্যাশ্চর্য্যক অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইত।

নগর অতিক্রম করিয়া দেখিয়াছিলাম, নগর প্রাকারের বহির্ভাগে সুসজ্জিত পুষ্পবাটীকাসমূহ নরনারীতে পরিপূর্ণ। বিবিধবর্ণের সজ্জিত, নানা আভরণে ভূষিত সূন্দরীগণের কলহাস্ত্রে নগরোপকণ্ঠ যেন নূতন শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের আসবপানে ইন্দ্রজ্ঞ আকর্ষণবিশ্রান্ত নয়ন কঠাকপাতে যেন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। সেরূপ বিলাসবিহ্বল দৃষ্টি পরে আর কখনও দেখি নাই। যাহারা কাদম্ব পান করিত, তাহাদিগের কাদম্বের সহিত তাহারাও আশ্বহিত হইয়াছে। লোকে নিত্য যাহা দেখিয়া থাকে তাহার প্রতি লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না; যাহা নূতন দেখে তাহা দেখিয়া যেন তৃপ্তি হয় না। নগর, নাগরিক, নাগরিকা, উপনগর, পুষ্পবাটীকা, উৎসব সকলই তখন আমার নিকট নূতন। সেদিন যে ভাবে মনুষ্যজাতিকে দেখিয়াছিলাম, তাহার পূর্বে কখনও সে ভাবে দেখি নাই, আর কখনও সে ভাবে দেখিব না। যখন পর্ব্বতের সান্নিধ্য দেখেছিলাম তখন দেখিতাম সন্ধ্যাগমে বনরাজী নিঃশব্দ হইত, যে দিন চন্দ্রোদয় হইত না, সেদিন খন্ডোত্তের আলোকে পর্ব্বতমালা ভীষণ বোধ হইত। নগর দেখিয়া আমার সেই কথা মনে হইত। আমরা যে প্রান্তরে পড়িয়াছিলাম, সন্ধ্যাগমে সেই স্থান হইতে দেখিতাম, দূরে বিশাল পর্ব্বতমালার আশ্রয় অন্ধকারাচ্ছন্ন গৌণশ্রেণীর অস্পষ্ট মূর্ত্তি দৃষ্ট হইতেছে, পর্ব্বতগাত্রে খন্ডোত্তশ্রেণীর আশ্রয় নগরে অসংখ্য দীপ-শ্রেণী প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে। দীপ কাহাকে বলে পূর্বে তাহা জানিতাম না। অগ্নির আলোক দেখিয়াছি, কিন্তু পূর্বে দীপালোক দেখি নাই। দূর হইতে যিহ্ন দীপালোক স্নিগ্ধতর বোধ হইত। নিশাগমে নগরের নানা স্থান হইতে শ্রীত-বাৎসর্য্য রব আসিত। ক্রমে নদীবক্ষে দুই একখানি তরল দেখা যায়; ক্ষুদ্র তরলীতে যুবক যুবতী একত্র নৈশবায়ু সেবনে নিগত হইয়াছে, যুবতী গান গাহিতেছে, যুবক ক্ষেপণী চালন করিতেছে। কোন কোন বৃহদাকার তরলীতে বিলাসীরা আসবোত্তা বারনারী পরিবৃত্ত হইয়া কলরব করিতে করিতে চলিয়াছে। তাহাদিগের আমোদ প্রমোদ, আশা ভরসা, স্নেহ দুঃখ লইয়া তাহারা চলিয়া গিয়াছে, কেবল সুদূর অতীতের সাক্ষরূপেই যেন আগাকে রাখিয়া গিয়াছে।

শ্রীরাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ।

মৃত্যু-মিলন।

—ঃঃ—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—ঃঃ—

রাজা।

—ঃঃ—

ঢেজের মধ্যাহ্ন। বাতাস উষ্ণ। গগন নীল। বৃক্ষলতায় নবীন পল্লব—
প্রস্ফুটিত পুষ্প। মধ্য মধ্য বিহগ-কুজন শ্রুত হইতেছে। গ্রামাদে বিশ্রামগৃহ-
সংলগ্ন উদ্যানে একটি ক্ষুদ্র কুঞ্জমধ্যে মর্ম্মররচিত আসনে বসিয়া রাজা ভাবিতে-
ছেন। কুঞ্জ ছায়াস্নানীতল—সলিলসেচনসিঞ্চ। কুঞ্জে লবঙ্গলতিকা কুসুমের
ভারে অবনতবল্লরী—তুই একটি বৃগুচ্যুত কুসুম রাজার মস্তকে, অঞ্চ, বেশে পতিত
হইতেছে। রাজার সে দিকে দৃষ্টি নাই। তিনি ভাবিতেছেন। উপবনে নানা-
জাতীয় বিহগ—কেহ যুক্ত, কেহ বন্ধ, কেহ দণ্ডে, কেহ পিঞ্জরে; তাহারা কুজন
করিতেছে। আজ রাজার সে দিকে মন নাই। তিনি চিন্তামগ্ন। দূরে একটি
মাত্র দ্বার মুক্ত—আর সব দ্বার বন্ধ; মুক্ত দ্বারে একজন মাত্র প্রহরী,—উদ্যানে
আর কেহ নাই।

আজ দশ দিন হইল বৃক্ষ পুরোহিত চলিয়া গিয়াছেন। এ দশ দিন রাজা তাঁহার
কথা ভাবিতেছেন। বৃক্ষ বলিয়াছিলেন, যে জীবনে আপনার বা অপরের কোন
উপকার করে নাই—যে জীবনে আপনি প্রকৃত সুখ পায় নাই, আর কাহাকেও
সুখী করিতে পারে নাই—তাঁহার জীবন ব্যর্থ। রাজা ভাবিতেছিলেন, তাঁহার
জীবন সত্য সত্যই ব্যর্থ। তিনি জীবনে আপনার বা অপরের কোন উপকার
করিতে পারেন নাই, অর্থ সুখ পান নাই, আর কাহাকেও সুখী করিতে
পারেন নাই।

আজ কয় দিন রাজা কেবল আপনার অতীত জীবনের আলোচনা করিয়াছেন।
আজও তিনি তাহাই করিতেছিলেন। বাণ্য হইতে আজ পর্য্যন্ত কত দিনের কত
কথা আজ তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। শৈশব হইতে তাঁহার শিক্ষা বিলাসে
বেষ্টিত। সে শিক্ষা তাঁহাকে রাজার প্রকৃত কর্তব্য শিখায় নাই—তাঁহার মনুষ্যত্ব-

বিকাশে সাহায্য করে নাই। আবার সংসর্গদোমে—শিক্ষকেরদোমে তিনি সে শিক্ষারও সার অংশ—গ্রহণীয় অংশ—গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

তাহার পর কৈশোর যৌবনে বিকশিত হইতে না হইতে তাঁহার পরিণয় নিষ্পন্ন হইয়া গেল। তখন তরুণ হৃদয়ে নবীন আশা—অগতঃ সুখময়—সুখময়। কি আনন্দ, কি আশায়, কি উৎসাহে যুবকের হৃদয় নূতন জীবনে সুখেই কল্পনা করিয়াছিল। পত্নীর সহিত দ্বিতীয় সাক্ষাতে সে কল্পনা সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। তখন যৌবন-পুলকে তাঁহার তরুণ হৃদয়-নন্দন হিঙ্গোদিত। পত্নী-সমাগম-পলকে তাহার কুসুম শোভা বিকশিত হইয়া উঠিল—দিকে দিকে বিহগকুক্ষন লাভ হইল। জীবনে বাস্তব অপেক্ষা কল্পনায়—আশায় অধিক সুখ।

প্রথমে তাঁহার প্রেমাবেশ যেন তাঁহার পত্নীর হৃদয়ে সংক্রান্ত হইয়া সে হৃদয়েও প্রেম-পুলক সঞ্চারিত করিয়াছিল। তাঁহার ব্যবহারেও প্রেম সর্বদা সপ্রকাশ বোধ হইত। পত্নীর অসামান্য রূপে যুবকের হৃদয় তখন মুগ্ধ; পত্নীর পোমে তিনি তখন দগ্ধ হইবাব আশায় আশাবিত। তখন তাঁহার মনে হইয়াছিল, সে আশা কলবতা হইবে—সাদনার সিদ্ধি অদূরবর্ত্তিনী।

এই ভাবে কয় মাস গেল। সে সময় অনর্গল সুখের।

তখন তিনি প্রেমেরই সুখের ও শান্তির সন্ধানে ব্যস্ত। অবকাশ ঘাপনের প্রদান উপায় যুগায় তাহার আর অনুরাগ নাই; তেজস্বী অশ্রু মন্দ্রতা পূর্ণ—তিনি তাহাদিগকে আর দেখেন না; সমবয়স্ক সঙ্গীরা আর সর্বদা তাঁহার সাক্ষাৎ পায় না—তাহারা গোপনে বিজ্ঞপবাণ বর্ষণ করিতে লাগিল, সম্মুখে কিছু বাগতে সাহস পাইত না।

তাহার পর তাঁহার পত্নী তাঁহাকে রাজ্যসম্বন্ধীয় নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। তিনি একে কখনই রাজকাণ্ডের বিশেষ সংবাদ রাখিতেন না, তাহাতে আবার কিছু দিন স্বরচিত স্বপ্নলোকের বাহিরের সংবাদ লয়েন নাই। তিনি সকল কথার উত্তর দিতে না পারিয়া লজ্জিত হইতেন; সময় সময় স্পষ্টে বুঝিতে পারিতেন, রাজকাণ্ড সম্বন্ধে তাঁহার অপেক্ষা তাঁহার পত্নী অধিক সংবাদ রাখেন।

ইহার পর হইতে কোন অজ্ঞাত কারণে উভয়ের মধ্যে ব্যবধান অল্পভূত হইতে লাগিল। তিনি বহু চেষ্টায় আপনার অপরাধ বা ত্রুটি বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রেমের উচ্ছৃঙ্খল প্রবাহ পত্নীর উদাস অবস্থায় প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে—কিছুতেই তাহা দূর করিতে পারে নাই। ক্রমে উভয়ের

মদ্যে ব্যবধান বন্ধিত হইয়াছে ; তাঁহার জীবনের সুখস্বপ্ন আমার প্রতিপন্ন হইয়াছে। অতুণ্ড নয়নে পত্নীর অসামান্য সুন্দর মুখে চাহিয়া বহু বার তাঁহার মনে প্রাচীন কবির সেই প্রশ্ন উদিত হইয়াছে—

ইন্দীবরেণ নয়নং মুখমম্বুজেন
কুন্দেন দন্তমধরং নবপদ্মবেন।
অঙ্গানি চম্পকদলেঃ স বিদায় ধাতা
কাস্তে কণং ঘটিতবামুপভোজ চেতঃ ॥
ইন্দীবরে নিরমিলা গুগল নয়ন ;
অম্ব জে গঠিলা ওই আনন সুন্দর ;
শুল কুন্দে নিরমিলা দশন মোহন ;
নবীন পল্লবে বিদ্যি রচিলা অধর ;
চম্পকের দলে অঙ্গ করিলা নির্মাণ।
কেবল অদয় কেন কঠিন পামাণ ?

সে কথা মনে হইতে—সে গুতিগিজু গণিত হইতে, আত্মও তাঁহার হৃদয়ে বিষম বেদনার সম্ভার হইল ; তাঁহার নয়নধর আজ হইয়া আসিল।

তাঁহার পর পিতার মৃত্যুতে রাজ্যভার তাঁহার উপর অর্পিত হইল। কিন্তু তিনি কি রাজ্যের কর্তব্যপালন করিয়াছেন ? প্রজার হিতসাধনে তিনি কি স্বার্থ-ত্যাগ করিয়াছেন ? আশ রাজ্য বিপন্ন, প্রজা দুর্দশাগ্রস্ত, মোগলের সর্ব্বভাগী বিজয়লাভের তাঁহার ক্ষুদ্ররাজ্য গ্রাস করিতে উদ্যত। তিনি কেমন করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আছেন ? বৃদ্ধ প্রাজ্ঞ সতাই বলিয়াছেন, যে রাজা রাজ্য-রক্ষায় অক্ষম তাঁহার হস্তে রাজদণ্ড শোভা পায় না।

এইরূপ নানাচিন্তাশ্রিত হৃদয়ে রাজা যখন দুশ্চিন্তাপ্রবাহে কুল পাইতেছিলেন না, তখন দূরগত বহনরকঁঠোড়ুত কলকল ধ্বনি তাঁহার প্রতিগোচর হইল। তিনি প্রহরীকে ডাকিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রহরী চলিয়া গেল এবং অল্পক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল,—অগ্নিযোগে চক ভস্মীভূত হইতেছে।

রাজা যে বেশে ছিলেন সেই বেশেই উদ্যান ত্যাগ করিয়া বিগ্রাম গৃহ ও তাঁহার পর কয়টি প্রাজ্ঞ ও কক্ষ অতিক্রম করিয়া সিংহদ্বারে উপনীত হইলেন। সিংহদ্বারে দুই পার্শ্বে দুইজন অশারোহী প্রহরী ছিল। রাজা ইঙ্গিত করিতে তাঁহারা ভূমিতে অবতরণ করিল। চক তাঁহার অশ্ব পাঠাইতে আদেশ প্রদান

করিয়া রাজা একজনের হস্ত হইতে কশা লইয়া এক লম্বা তাহার অশ্ব আরোহণ করিলেন । তিনি বহুদিন অশ্বারোহণে অনভ্যস্ত ; কিন্তু অশ্ব বুনিজ, আরোহণ অশ্বারোহণ-নিপুণতা অনন্তসাধারণ । কশাদ্বাৰে অশ্বকে বেগে চালাইয়া রাজা চকের দিকে অগ্রসর হইলেন । বিশ্রমে গ্রাহরিদয় কিছুক্ষণ মুকবৎ দাঁড়াইয়া রহিল ।

চকে উপস্থিত হইয়া রাজা দেখিলেন, ধু ধু করিয়া অগ্নি জলিতেছে, পবন-বিকম্পিত শত নিখা গগনে উঠিতেছে—গৃহ হইতে গৃহান্তরে ধ্বংসবীজ লইয়া যাইতেছে । চকের সম্মুখে বিশাল জনতা ; তত লোক সত্য সত্য চেষ্টা করিলে অগ্নিনির্কীপণ অসম্ভব হয় না, কিন্তু অনেকেই সে বিষয়ে নিশ্চেষ্ট—দর্শক, সমালোচক বা উপদেষ্টা মাত্র । একজন এক কার্য্য করিতে বলিলে দশ জন তাহার সমালোচনা করিতেছে । কেবল গৃহের অধিকারীরা অগ্নি নির্কীপণের ব্যর্থ চেষ্টায় চেষ্টিত । অন্তর নিকটবর্ত্তী হইয়া রাজা বলিলেন, “পথ ছাড় ।”

সকলে ফিরিয়া মনিস্রয়ে দেখিল,—রাজা ! কোনরূপে পথ পাঠিয়া রাজা সাবধানে অশ্বকে পবিচালিত করিলেন । চকের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া রাজা আদেশ-প্রদানে অভ্যস্ত কণ্ঠে ডাকিয়া বলিলেন, “কেহ আমার অশ্ব ধর ।”

অশ্বের বন্ধ্যা দ্বিবার জন্ম শত হস্ত প্রসারিত হইল । রাজা অবতরণ করিয়া বলিলেন, “আইস, অগ্নি নির্কীপিত করিতে হইবে ।” তিনি স্বহস্তে একটি পতিত কুস্ত তুলিয়া লইলেন । তখন চারি দিকে সকলেই অগ্নি নির্কীপণকার্য্যে ব্যস্ত হইল । রাজার আদেশে হস্তমালা হইতে নিষ্কৃত হস্তী আনীত হইল । করিপৃষ্ঠে জল আসিতে লাগিল ; গজশ্রেণী আকৃষ্ট হইয়া প্রজলিত গৃহ ভূমিসাৎ হইতে লাগিল । রাজার বিস্ময় নাই । যে স্থানে কেহ যাইতে ইতস্ততঃ করে, তিনি সে স্থানে গমন করেন,—অপরে তাঁহার অনুসরণ করে ।

অক্লান্ত চেষ্টার ফলে সমস্ত পূর্বেই অগ্নি নির্কীপিত হইল । রাজা উত্তরীয়ে ভস্মমণ্ডল জলাটের ধর্ম্ম মুছিয়া দাঁড়াইলেন । সেই যানভেজ দিবালোকে প্রজ্জ্বলিত তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া অমধবনি করিল । তখন রাজকর্ম্মচারীরা সকলেই আসিয়াছেন । রাজা বলিলেন, “অগ্নিমোগে যাহাদেন গৃহ ধ্বংস হইয়াছে, তাহার সকলে প্রাসাদে চল ; আহার ও আশ্রয় পাইবে ।” তাঁহার অশ্ব উপস্থিত ছিল ; অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিবার সময় তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “আশ্রয়হীনগণ প্রাসাদে যাইতেছে ত ?

একজন নিবেদন করিল, “একজন বৃদ্ধ দোকানদার কিছুতেই উঠিতেছে না।”

রাজা তাহার নিকট গমন করিলেন। সে তখন ভূমিতে ঘুটাইয়া কাঁদিতেছিল। রাজা তাহাকে বলিলেন, “প্রাসাদে চল।”

সে বলিল, “প্রভু আমার সর্ব্বশ্ব গিয়াছে। আমার আর বাঁচিয়া ফল কি? আমি আর আহাৰ করিব না।”

রাজা অহস্তে তাহার ধূলিমণ্ডিন হস্ত ধারণ করিয়া তাহাকে তুলিলেন, বলিলেন, “বৎস, তুমি অভুক্ত থাকিলে আজ আমি আহাৰ করিব না। আজ তুমি অনাহারে থাকিলে তোমার রাজার অকল্যাণ হইবে।”

রাজার কথা শুনিয়া বৃদ্ধ কৃতজ্ঞতায়া কাঁদিয়া ফেলিল। সে জনতার অনেকেরই নয়ন আর্দ্র হইয়া আসিল।

রাজা আসিয়া অশ্বে আরোহণ করিলেন। অশ্ব প্রাসাদাভিমুখগামী হইল। সে দিন রাজা হৃদয়ে যে আনন্দ অনুভব করিলেন তাহা তাঁহার পক্ষে একান্তই অনন্তভূতপূর্ণ।

বিপুল জনতা তাঁহার সহগামী হইল। সে দিন মহত্স প্রজা তাঁহার জন্ত প্রাণ দিতে প্রস্তুত; তিনি ইঙ্গিত করিলে মহত্স প্রজা তাঁহার অশ্বের পদতলে বক্ষ পাতিয়া দিত। জনতা মুহুমূহঃ জয়ধ্বনি করিতে লাগিল।

অন্তঃপুরে রাণী অদূরবর্তী সাগরের গর্জনের মত সে ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। তিনি তখন পরিচারিকার নিকট বর্ণিত ঘটনায় বিবরণ শুনিতেছিলেন। পরিচারিকা ভৃত্যবর্গের নিকট হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “ও ধ্বনি কিসের?” পরিচারিকা বলিল, “বোধহয় রাজা ফিরিতেছেন।”

রাণী অভ্যস্ত গাভীৰ্য্য পরিহার করিয়া বাস্তবাবে প্রাসাদচূড়ায় আরোহণ করিলেন,—যে দৃশ্য দেখিলেন, তাহা দেবতার উপভোগযোগ্য। তাঁহার মনে হইল, প্রজার ভক্তির প্রভায় রাজার মুখশ্রী স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে সুন্দর হইয়াছে। তিনি হৃদয়ে কি নূতন ভাব—কি ব্যথা—কি আনন্দ অনুভব করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

বিচারক ।

শঙ্কর সিংহ রাজার বয়স—সুস্থ—সখা । রাজবংশের এক শাখার সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ । তাঁহার পিতা রাজার গিতার সখা ছিলেন । শঙ্কর সিংহ শৈশবে রাজার খেলার সাথী ছিলেন ;—বাল্যে উভয়ে একত্রে অধ্যয়ন করিয়াছেন ;—যৌবনে তিনি যুগ্মায় ও ভ্রমণে সর্বদা রাজার সঙ্গে থাকিতেন ;—এখনও উভয়ের মধ্যে সেই অনাবিল বন্ধুত্ব অনাহত । শঙ্কর সিংহের নিকট রাজা কোন কথা গোপন করিতেন না । শৈশব হইতে অন্তঃপুরেও শঙ্কর সিংহের অব্যাহত গতি—আজও অন্তঃপুরদ্বার তাঁহার পক্ষে মুক্ত ; বর্তমান রাণীও শঙ্কর সিংহের সহিত কথা কহিয়া থাকেন । আবার শঙ্কর সিংহের ভগিনী বিবাহের অল্প দিন পরে বিধবা হইলে রাণী তাঁহাকে সখী করিয়া অন্তঃপুরে রাখিয়াছেন ;—তিনি উমাকে ভগিনীর মত দেখেন । রাজার বিশ্বাস, শঙ্কর সিংহের মত হিতৈষী তাঁহার আর নাই ।

পূর্বপরিচ্ছেদে যে দিনের ঘটনা বিবৃত হইয়াছে তাহার পর দিবস প্রভাতে প্রাসাদে রাজার বিশ্রামগৃহে যাইয়া শঙ্কর সিংহ দেখিলেন, রাজা সভায় গমনোন্মোগী । শঙ্কর সিংহ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, “বিচারালয়ে যাইব ।”

রাজা রাজপদপ্রাপ্তির পর কামাসমাজে অমর বিচারালয়ে বসিয়া বিচারকার্য্য নিৰ্ব্বাহ করিয়াছিলেন । তাহার পর হইতে বিচারালয়ে রাজার আগমন শূন্য থাকে—মন্ত্রীই বিচার করেন । তথাপি আজ রাজার এই কথা শুনিয়া শঙ্কর সিংহ বিস্মিত হইলেন না । তিনি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাতের পর হইতে রাজার যে পরিবর্তন লক্ষ্য করিতেছিলেন তাহাতে রাজার এ কার্য্য বিস্ময়কর বোধ হইল না । রাজার এই পরিবর্তনে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইতেছিলেন ।

রাজা শঙ্কর সিংহের সহিত বাহির হইয়া বিশ্রামগৃহ ও বিচারালয়ের মধ্যবর্তী উদ্যানে ভ্রমণ করিতে গেলেন । বিচারালয়ের সম্মুখবর্তী প্রাঙ্গণে গভীর ঘণ্টাধ্বনি বিচারপ্রার্থীদিগকে জানাইয়া দিল, অবিলম্বে বিচারকার্য্য আরম্ভ হইবে । রাজা বিচারালয়ের পশ্চাদ্বর্তী কক্ষে প্রবেশ করিলেন ; তাহার পর যে দ্বারপথে তিনি সেই কক্ষ হইতে বিচারালয়ে প্রবেশ করিতেন, সেই দ্বার মুক্ত করিলেন ।

দ্বার বহুদিন বন্ধ ছিল ; মুক্ত করিতে নন্দ হইল। সেই শব্দে সকলে চাহিয়া দেখিলেন—রাজা !

সকলে বিস্ময়াবেগগ্রহত হইয়া ব্যস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রাজা আপনাত্মক উপবেশন করিয়া অভিযোগ-তালিকা চাহিয়া লইলেন।

এদিকে অন্তঃপুরে রাণী সংবাদ পাইলেন, রাজা স্বয়ং বিচারগৃহে বিচারকার্য করিতেছেন। বিচারগৃহে যে স্থানে রাজার আসন তাহার পশ্চাতে প্রাচীরের নিম্নোভাগে প্রস্তরে লতাপত্রপুষ্পের মধ্যে মধ্যে ছিদ্র বিস্তারিত। পশ্চাতের কক্ষ হইতে সেই সকল ছিদ্রপথে শুদ্ধাস্ত্রশোভিনীরা বিচারালয়ের ঘটনা লক্ষ্য করিতে পারেন। অন্তঃপুর হইতে সেই কক্ষে আসিবার স্বতন্ত্র আবৃত পথ আছে। রাজা বিচারগৃহে আগমন বন্ধ করার পর রাণী আর সে কক্ষে আইসেন নাই। আজ এই সংবাদ শুনিয়া তিনি উমাকে সঙ্গে লইয়া সেই কক্ষে চলিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কয়জন পরিচারিকাও চলিল।

রাণী যে পথে চলিলেন, সে পথ বহুদিন ব্যবহৃত হয় নাই ; পরিচারিকারা পথ পরিত্যক্ত রাখিত মত, কিন্তু সময়ে নহে। গবাক্ষমুখে উর্ধ্বাভ জাল পাতিয়াছে, হর্ম্যাতল মলিন, স্থানে স্থানে ধূলি। রাণী পরিচারিকাদিগকে তিরস্কার করিলেন।

নিম্নে বিচারালয়ে রাজার একবার মনে হইল, যেন উর্দ্ধে—প্রাচীরের পশ্চাতে অলঙ্কারশিঞ্জিত শূন্যে পাইলেন। রাণী আসিয়াছেন। রাজা মনে মনে হাসিলেন—সে কল্পনাও যে অসম্ভব। তাঁহার কাষে রাণীর আর কোন আকর্ষণ নাই।

বিচারকার্য আরম্ভ হইল। সে দিন কয়টিমাত্র অভিযোগ ছিল। সেগুলির নিষ্পত্তি হইলে রাজা বলিলেন, “আর একটি অভিযোগের বিচার আবশ্যিক। নগরপালের বিরুদ্ধে বিষম অভিযোগ আছে। নগরে থাকিয়া নগরের ও নগরবাসীর বিপদ নিবারণ ও সম্পদ সংরক্ষণ তাঁহার কর্তব্য। অল্পমতি ব্যতীত তাঁহার পক্ষে নগরত্যাগ নিষিদ্ধ। গত কল্যা চকে অগ্নিযোগে সহর বিপন্ন হইয়াছিল। নগরপাল তখন কোথায় ছিলেন ?”

মঞ্জীর ইঙ্গিতে নগরপাল ধীরপদক্ষেপে অগ্রসর হইয়া আসিয়া অভিযুক্তের নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়াইলেন। তাঁহার উদ্ভূত শির আজ নত—নগরবাসীর ভীতির কারণ দৃষ্টি আজ ধরাতলবদ্ধ—কঠোর কর্তব্য আজ নীরব। তাঁহার মুখে কথা সঞ্চিত হইয়াছে না।

রাজা বলিলেন, “আমি অবগত হইয়াছি, আমি চকে যাইবার পর তাঁহার সহ-

কারীরা নগরোপকণ্ঠে বিলাসগৃহ হইতে তাঁহাকে ডাকিয়া আনাহইয়াছিল । কর্তব্যের এরূপ অবহেলা কর্তার শাস্তির উপযুক্ত । নগরপালের অগশ্বে কিছু বলিবার আছে ?”

নগরপাল কোন উত্তর করিতে পারিলেন না ।

এই সময় দূরে রাজপথে—বিচারালয়প্রাঙ্গণপ্রবেশদ্বারের নিকটে বালককে রোদনধ্বনি শ্রুত হইল । রাজা উৎকর্ণ হইয়া শুনিলেন, বোধ হইল, কেহ বিচারালয়প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে চাহিতেছে, পারিতেছে না । রাজা মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে রোদন করে ?”

মন্ত্রী বলিলেন, “বোধ হয় ভিখারী হইবে ।”

“যেই হউক ; বিচারালয়ের দ্বার সকলের জন্ত উন্মুক্ত ।”

রাজার আদেশে প্রহরী বাহিরে গেল এবং অনতিবিলম্বে একটি বালককে লইয়া আসিল । সে রোদন করিতেছিল,—বিচারগৃহমধ্যে নীত হইয়া যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইল । রাজা তাহার অবস্থা দেখিয়া সম্মেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কাঁদিতেছিলে ?”

বালক বলিল, “হাঁ ।”

“কেন ?”

“আমার বাড়ী প্রায় দুই কোশ দূরে—”

মন্ত্রীর সহকারী বালককে রাজার প্রাঙ্গণের উত্তর দিতে বলিলেন । রাজা তাঁহাকে নিবাসিত করিলেন ।

বালককে বহু প্রশ্ন করিয়া রাজা বুঝিলেন, বালকের গৃহ দুই কোশ দূরে । গৃহে তাহার রূপা জননী ব্যতীত আর কেহ নাই । আজ সে গৃহপ্রাঙ্গণস্থ তরুর দুইটি ফল লইয়া রাজধানীতে আসিয়াছে ; মূল্য যাহা পাইবে, তাহাই দিয়া জননীর জন্ত পথ্য ক্রয় করিয়া লইয়া যাইবে । সে বাজারে যাইতেছিল । পথে প্রাঙ্গণের প্রধান প্রহরী তাহার একটি ফল লইয়াছে । প্রহরী প্রথমে মূল্য দিতে চাহে নাই, শেষে যে মূল্য দিতে স্বীকৃত হইয়াছে তাহাও গ্রাফা মূল্য নহে । তাহার গ্রামবাসীরা তাহাকে পূর্বেই সতর্ক করিয়া দিয়াছিল—এ পথে যাওয়া নিরাপদ নহে । সে তাহা ভুলিয়া গিয়াছিল ।

শুনিয়া রাজা মন্ত্রীকে বলিলেন, “তবে প্রাঙ্গণের পথে দস্যু তরঙ্গের ভয় বলিয়া লোকের বিশ্বাস জন্মিয়াছে । বিচারালয়ের দ্বারে প্রাঙ্গণ জব্য অপহৃত হয় ।”

রাজা বলিলেন, “সে প্রহরী কোথায় ?”

একজন কর্মচারী যাইয়া তাহাকে ডাকিয়া আনিল ।

রাজা ক্রোধব্যাঞ্জক স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি এই বালকের জন্য লইয়া মূল্য দাও নাই ?”

গ্রহণী প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল, রাজাকে অভিবাদন করিয়া বলিল, “আপনার ভৃত্য এমন কাণ্ড করিতে পারে না । বালক অত্যধিক মূল্য চাহিয়াছিল । আমি তাহাকে বলিয়াছি, অবশিষ্ট ফলটি সে যে মূল্যে বিক্রয় করিতে পারিবে, আমি সেই মূল্য দিব ।”

রাজা বুঝিলেন, চতুর বটে । তিনি মনে মনে হাসিলেন, বলিলেন, “সে ভাল কথা ।”

তখন মূল্যনিকপণের জন্য ভাণ্ডারীর ডাক পড়িল ।

ভাণ্ডারী আসিলে রাজা তাহাকে ফলটি দেখাইয়া তাহার মূল্য জিজ্ঞাসা করিলেন । যে কর্মচারী ভাণ্ডারীকে ডাকিতে গিয়াছিল, সে তাহাকে সব কথা বলিয়াছিল । গ্রহণীর সুবিধার জন্য ভাণ্ডারী ফলের মূল্য কম করিয়া বলিল । সে মূল্যের কথা শুনিয়া বালক কাঁদিয়া উঠিল । রাজা তাহাকে শাস্ত হইতে বলিয়া ভাণ্ডারীকে বলিলেন, “রাজসংসারের জন্যও অবশ্য এ ফল ক্রয় করা হয় ?”

ভাণ্ডারী স্বীকার করিল ।

রাজা ভাণ্ডারীকে হিসাব আনিয়া সে কত মূল্যে ঐ ফল ক্রয় করিয়াছে, তাহা দেখাইতে বলিলেন । ভাণ্ডারীর মস্তকে যেন আকাশ ভাঙিয়া পড়িল । এমন বিপদেও মামুষ পড়ে ! কিন্তু আর উপায় নাই । ভাণ্ডারী হিসাব আনিয়া দেখাইল ।

হিসাব দেখিয়া রাজা বলিলেন, “ভাণ্ডারী ফলটির যে মূল্য নির্দেশ করিয়াছে, হিসাবে লিখিত মূল্য তাহার চতুর্গুণ । রাজসরকারের জন্য ভাণ্ডারী ক্রয় করিলে যদি জব্বোর মূল্য চতুর্গুণ হয়, তবে রাজা আপনার জন্য স্বয়ং ক্রয় করিলে জব্বোর মূল্য ভাণ্ডারীদত্ত মূল্যের চতুর্গুণ হওয়া অসম্ভব নহে । ফলটি আমি ক্রয় করিলাম । এই হিসাবে বালককে মূল্য দেওয়া হউক ।”

তাহার পর রাজা গ্রহণীকে বলিলেন, “তুমি বলিয়াছ, বালক অবশিষ্ট ফলটির জন্য যে মূল্য পাইবে, তুমি তাহাকে তাহাই দিবে । আমি ভাণ্ডারীকে যে মূল্য দিতে বলিলাম—তুমিও তাহাই দাও ।”

সমস্ত গৃহে যেন আনন্দের হিঙ্গোল বহিয়া গেল । সকলে বুঝিল, রাজার বুদ্ধির নিকট আর সকলের বুদ্ধি পরাজিত হইল ; ভাণ্ডারীর অসাধুতা প্রতিপন্ন হইল ;

প্রাচীর শিক্ষা হইল ; বাজক উৎকৃষ্ট হইল । দুই একজন কাণাকানি করিল,—
এইত রাজা ।

ইহার পন রাজা আবার নগরপালের বিচারে প্ৰস্তুত হইলেন । তিনি নগর-
পালকে পুনরায় অিজাসা করিলেন, “তোমার স্বপক্ষে কিছু বলিবার আছে ?

নগরপাল কোন উত্তর দিতে পারিলেন না ।

রাজা বলিলেন, “এ বিচারে তিনটি বিষয় বিবেচ্য—প্রথম, আমার কর্তব্য ;
দ্বিতীয়, নগরপালের কর্তব্য ; তৃতীয়, শাস্তি । যে কর্মচারী নিদিষ্ট নিয়ম পালন
করে না, পরন্তু স্বাধিকার প্রমত্ত হইয়া কর্তব্যে অবহেলা করে, তাহাকে সে কার্যের
অনুপস্থিত জানিয়া আর সে কার্যে না রাখাই আমার কর্তব্য । সেই কর্তব্যপালন
করিতে ইচ্ছুক হইয়া আমি নগরপালকে কর্মচ্যুত করিলাম । নগরপালের অনবধান-
তায় যথাকালে অগ্নিনির্বাপনের কোন ব্যবস্থা হয় নাই—তাহাতে নগরবাসীরা
অতিশয় হতম হইয়াছে । যথাকালে অগ্নিনির্বাপনের চেষ্টা হইলে এত ক্ষতি হইত না ।
সেই ক্ষতিপূরণ নগরপালের কর্তব্য । সুতরাং আমি আদেশ করিতেছি, রাজকোষ
হইতে ক্ষতিগ্রস্তগণের অর্ধেক ক্ষতি পূরণ হইবে, অপরার্ধ নগরপালকে
দিতে হইবে ।”

শুনিয়া নগরপাল বসিয়া পড়িলেন । তাঁহার মুখে আর কথা মনিল না । কিন্তু
এই কথা শুনিয়া আনন্দে বহু কণ্ঠ হইতে অশ্রুধারা উৎখিত হইল ।

সে কোণাহয় নিবৃত্ত হইলে রাজা বলিলেন, “আমি নগরপালের শাস্তির কোন
ব্যবস্থা করিব না, কারণ, এ বিষয়ে আমিও দোষী । এক দিন নগরপালের কাষের
উপস্থিত ওজাবদানের ব্যবস্থা না করায় আমার পক্ষে কর্তব্যের অবহেলা হইয়াছে ।
সুতরাং আমি তাহাকে শাস্তি দিবার উপস্থিত নহি ।

বিপুল অশ্রুধারার মধ্যে বিচারকাণ্ড শেষ হইল ।

রাজা উঠিয়া প্রস্থান করিলেন ।

উর্ধ্বে প্রান্তরপ্রাচীরের পশ্চাতে পুনরায় অলঙ্কারশিল্পন শ্রুত হইল । দীর্ঘকাল
শ্রম করিয়া রাণী উঠিলেন । তাঁহার মুখে বিষাদ ও আনন্দ ছায়াভোকে মত
শোভা পাইতে লাগিল ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—ঃঃ—

মোহিনী।

—০—

নিদাঘের মধ্যাহ্ন। পবনে অনলের আভাস। আকাশ তপ্ততাপবর্ণিত। একজন অশ্বারোহী একখানি ক্ষুদ্র গ্রামের প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সে স্থানে একটি সরোবর। সেই সরোবরকূলে জলাসমতরচ্ছায়ায় বিশ্রাম লাভ করিবার জন্য অশ্বারোহী অবতরণ করিলেন। অশ্ব ও আর্বোহী উভয়েই শ্রান্ত। আর্বোহী মৈনিকবেশধারী।

আর্বোহী অশ্বপৃষ্ঠ হইতে সজ্জা নামাইয়া লইলেন, বদ্য মাজ রহিল। অশ্ব সুশিক্ষিত। তাহাকে মুক্ত রাখিয়া আর্বোহী অশ্বপৃষ্ঠসজ্জা ভূমিতে সংস্থাপিত করিলেন; তাহার পর সেই সজ্জা উপাধান করিয়া শ্রামসম্পাদিত ভূমিতে শয়নের উদ্যোগ করিলেন।

অশ্ব তৃষ্ণার্ত হইয়াছিল,—সরোবরে জলপানার্থ নিম্নগ ভূমি অতিক্রম করিয়া জলাভিমুখগামী হইল। তাহা দেখিয়া অশ্বারোহী উঠিলেন; অশ্বের বদ্য ধরিয়া তাহাকে কিছুক্ষণ ছায়ায় রাখিয়া পরে জলপান করাইয়া আনিলেন; তাহার পর কোষলক তরবারী বাহির করিয়া অদূরে একটি বৃক্ষের গাভাবলম্বী লতিকার ছেদন প্রয়াসে অগ্রসর হইলেন। দীপ্ত রবিকরে ভঞ্জনপূজাত তববারী বালকিতে লাগিল। লতিকা আনিয়া মৈনিক তাহা বদ্যের সহিত বদ্ধ করিয়া অশ্বকে বৃক্ষ-শাখায় বদ্ধ করিয়া শয়ন করিলেন, এবং অল্পকাল মধ্যেই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

প্রায় এক প্রহর পরে মৈনিকেব নিজাভঙ্গ হইল। তখন সূর্যের কর আর প্রথর নহে, বৃক্ষের ছায়া ক্রমে দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইয়া উঠিতেছে, দূরে—মেঘের কোলে গিরিশৃঙ্গে বর্ণবিকাশ সূচিত হইতেছে।

মৈনিক উঠিয়া বসিতেই সম্মুখে এক অপূর্ব দৃশ্য দেখিলেন। তিনি যে স্থানে শয়ন করিয়া ছিলেন, তথা হইতে অল্পমান দুই হস্ত ব্যবধানে উদ্যানসীমাবৃতি। উদ্যান সমস্তে রচিত ও সুবাসিত। উদ্যানের মধ্যভাগে গৃহ—ক্ষুদ্রায়তন, কিন্তু সুন্দর—সুগন্ধিত—সুসজ্জিত। গৃহের সোপান হইতে কঙ্করাস্ত পথ সরল ভাবে উদ্যানের শেষ সীমা পর্যন্ত আসিয়াছে। পথের উভয় পার্শ্বে ছায়াবহন—সুখাচ্ছ-

ফল ভরসাজি । সৈনিক যে স্থানে বসিয়াছিলেন, সে স্থান হইতে উদ্যানমধ্যে একটি কুণ দেখা যাইতেছিল । কুণের নিকটে গুল্মোদ্যান ; তাহাতে নানা-জাতীয় বৃক্ষ, কোন কোন বৃক্ষে ফুল ফুটিয়া আছে ।

সৈনিক দেখিলেন, দুইজন যুবতী গৃহ হইতে নিজান্তা হইয়া কুণের নিকটে আসিলেন । উদ্যান পরিদর্শন করিয়া উভয়ে সৈনিক যে দিকে ছিলেন সেই দিকে আসিতে লাগিলেন । উভয়ের প্রায় একই বয়স ; তবে বেশে বৃদ্ধিতে পারা যায়, একজন পরিচারিকা বা সখী । সে উদ্যানপরিদর্শনকালে কয়টি ফুল তুলিয়াছিল, সেগুলি অপরাধ চুলে পরাইয়া দিয়া । সেই কুসুমভূষণে তাঁহাকে পার্শ্বতীর গত দেখাইতে লাগিল । উভয়ে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । দুইজনে সমবয়সী—যৌবনস্বয়ং চাপল্যে উভয়ের মধ্যে কোনকপ ব্যবধানের লেশমাত্র অনুভূত হইতেছিল না ; হাসিতে হাসিতে—কথা কহিতে কহিতে উভয়ে অগ্রসর হইতেছিলেন ।

সৈনিকের তৃপ্ত নয়ন যেন সৌন্দর্য্যস্থাপানে পরিতপ্ত হইতেছিল । সখী-সহগামিনীও সৌন্দর্য্য সত্যই অসাধারণ । বর্ণ গৌর—মুক্ত বায়ুর স্পর্শ ও অটুট স্বাস্থ্যসম্পদ তাহাতে রক্তাভার সঞ্চার করিয়াছে ; নগরের বজ্র বায়ুতে বর্ণের যে পাণ্ডিত্য অনিবার্য্য যুবতীর বর্ণে তাহার চিহ্নমাত্র নাই । কেশরাশি মুক্ত,—সেই দীর্ঘ, চিকণ কৃষ্ণ কেশরাশির সাগিন্দ্যে যুবতীর সৌন্দর্য্য যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে । যুবতীর সুগঠিত নাসিকায় ও নয়নের দৃষ্টিতে দৃঢ়তা প্রকাশ পাইতেছে । পানপূর্ণ যৌবনের উচ্ছ্বসিত সৌন্দর্য্যের উপর স্বাস্থ্যের কমনীয় জামলা শোভা পাইতেছে—যেন ভাজের ভরা নদীতে চল নামিয়াছে । মুখে লজ্জার বা সঙ্কোচের ভাব নাই ।

সৈনিক মুগ্ধ নয়নে সেই মোহিনী সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে ভাবিলেন, উদার অধরতলে, মুক্ত পবনে, অনাহত বনিকরে যে কুসুম বিকশিত হয় প্রাসাদের বিলাসবহুল শুদ্ধান্তে তাহাও তুলনা কোণায় ?

যুবতী উজানবৃত্তির সমিকটে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন । পশ্চিমগগনগামী রবির করজালা সেই সৌন্দর্য্যের উপর পড়িল, সে সৌন্দর্য্য যেন জ্যোতির্ময় হইয়া উঠিল ।

যুবতী ফিরিয়া সখীকে বলিলেন, “ভ্রাতা, আজ বেলা ঠিক করিতে ভুল হইয়াছে । দেখ, এখনও শিলাখণ্ডের উপর রৌদ্র রহিয়াছে ।

বৃত্তির পরই একটি প্রাচীন বৃক্ষ । তাহারই মূলে একখণ্ড শিলা পতিত ছিল ।

গুণতী অপরাহ্নে আসিয়া সেই শিলাখণ্ডের উপর উপবেশন করিতেন। আজ সময়ানিষ্ঠারূপে ভ্রমহেতু তিনি এখন আসিয়াছেন, তখনও শিলাখণ্ডের উপর হঠাৎ তপনকিরণ অপসৃত হয় নাহি। গুণতী হতাশভাবে মথীকে বলিলেন, “চল, ফিরিয়া যাই।”

ভদ্রা বলিল, “অলক্ষণের মধ্যেই ছায়া পড়িবে। আর ফিরিয়া যাইয়া কাঁচ নাহি। বরং চল, ততক্ষণ ছায়ায় ছায়ায় একটু বেড়াইয়া আসি।”

“না। আমি ছায়ায় দাঁড়াই। সে দিন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল, ঝুলনায় উঠিতে পার নাহি বলিয়া তুমি বড় দুঃখ বোধিয়াছিলে। আজ ততক্ষণ তুমি ঝুলনায় জুল। আমি দোল দিব।”

ভদ্রা প্রস্তুতবে সম্মতি দিল। যৌবন চঞ্চল ক্রীড়া যেমন ভালবাসে আর কিছুই তেমন ভালবাসে না।

ভদ্রা বৃক্ষশাখায় বদ্ধ ঝুলনা ঝুলাইতে ঝুলাইতে বলিল, “পাতরখানা গড়াইয়া আনা যায় না?”

গুণতী হাসিয়া বলিলেন, “চেষ্টা কর,—তুমি নিশ্চয়ই পারিবে। সে দিন দাদা চেষ্টা করিয়া পারেন নাহি।”

ভাবে বোধ হইল, গুণতীর নিকট “দাদা”ই বলবানের আদর্শ।

ভদ্রা বলিল, “তোমার কি মনে হয়, কেহ এই পাতরখানা গড়াইয়া এই ছায়ায় আনিতে পারে না?”

গুণতী বলিলেন, “না।”

ভদ্রা হাসিয়া বলিল, “যদি কেহ পারে, তুমি তাহাকে বিবাহ করিতে সম্মত থাক?”

যেমন প্রশ্ন—তেমনই উত্তর;—গুণতী হাসিয়া বলিলেন, “নিশ্চয়।”

তখন ভদ্রা বলিল, “দেখ, কোন্ রাজপুত্র সহসা আসিয়া এই কার্য্য করিয়া তোমাকে লইয়া অশ্চালনা করিয়া চলিয়া যান। তখন আমি গৃহে ফিরিয়া ঠাকুরাণীকে কি বলিব?”

“তাঁহা! যদি বলিবার কথা খুঁজিয়া না পাত, তবে না হয় তুমিই রাজপুত্রের সঙ্গে যাইও; আমি গৃহে ফিরিয়া যাহা বলিবার—বলিব।”

“তখন কি আর সে কথা মনে হইবে? তখন ভদ্রার কাছে একবার বিদায় লইতেও বিলম্ব সহিবে না।”

এইরূপ রহস্যলাপ করিতে করিতে ভদ্রা ঝুলনাখানি খুলিল।

যুবতী সুলনায় দোল দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাড়াইলেন । সে ভাঁজটিতে তাঁহাকে যেন আরও সুন্দর দেখাইতে লাগিল । সৈনিক যুবক মুগ্ধ নয়নে সে সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলেন ।

ভজা অভ্যস্ত ভাবে দুই দিকের বজ্জু ধরিয়া সুলনায় উঠিয়া বসিল । যুবতী দোল দিবার জন্য হস্ত প্রসারিত করিলেন ।

সহসা বৃত্তির পরপারে সৈনিককে দেখিয়া ভজা ভাঙে নাগিয়া পড়িল, আশ্চর্য্যে যুবতীকে বলিল, “বৃত্তির পারে কে বসিয়া আছে ।”

যুবতী চাহিয়া দেখিলেন । তাঁহার দৃষ্টিতে বিরক্তির ভাব ফুটিয়া উঠিল । তিনি গৃহে ফিরিবার উদ্যোগ করিলেন ।

সৈনিক তাহা দেখিয়া মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করিয়া উঠিয়া দাড়াইলেন । তিনি বলিলেন, “আমি সৈনিক । এই পথে ফিরিবার সময় দিগ্ভ্রমে আস্ত হইয়া বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিতেছিলাম । ক্রমে নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলাম । নিজান্তরে আমি উঠিলে আপনাদের খেলার ব্যাধাত ঘটিবে বুঝিয়া কি করিব, ভাবিতেছিলাম । অপরাধ লইবেন না । আমি চলিয়া যাইতেছি ।”

যুবতী গমনোদ্যোগ স্থগিত করিলেন ।

সৈনিক ভজাকে বলিলেন, “আপনারা বসিবার স্থান পাইতেছিলেন না । যদি অসুস্থ হইতেন, প্রান্তরখানি ছায়ায় লইয়া যাইবার চেষ্টা করি ।”

ভজা ভাবিল, সৈনিক সে কার্য্যে অকৃতকায্য হইবে । রূপ দেখিবার অভি-
পায়ে সে বলিল, “ভাল ” ।

যুবতী ভজার প্রতি স্নেহবাক্য কবিলেন ।

সৈনিক এক লক্ষ্যে বৃত্তি অতিক্রম করিয়া উদ্যানে আসিলেন ; প্রান্তরখণ্ড গড়াইবার চেষ্টা করিলেন । প্রথমবার চেষ্টা ব্যর্থ হইল । ভজা কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় সৈনিকের দিগ্ভ্রমের চেষ্টায় প্রান্তর উল্টাষ্টয়া গেল । সৈনিক আর একবার গড়াইয়া সেখানি ছায়ায় আনিয়া দিলেন ।

যুবতী বিস্মিত হইয়া যুবকের দিকে চাহিলেন । চানি চকু মিলিল । মুহূর্ত্ত-
মধ্যে যুবতীর দৃষ্টি চরণ-সংলগ্ন হইল । সৈনিকের মনে হইল, সে দৃষ্টি প্রত্যক্ষ
মাধুরীতে যেন স্বপ্নের কি চাক্ষুষ ফুটিয়া বাহির হইতেছিল ।

সৈনিক পুনরায় বৃত্তি অতিক্রম করিয়া আসিয়া অগ্রবে গভীরত করিলেন ।
অশ্রুপূর্ণ আশ্রয় করিয়া যাইবার সময় সৈনিক ভজাকে বলিলেন, “আপনার
সখী আপনার প্রান্তর গড়াইবার কথায় যে আশ্চর্য্য করিয়াছিলেন, তাহা মনে

করিয়া তাঁহার নাজতা হইবার কোন কারণ নাই। তিনি যেন রহস্যচ্ছলে
উচ্চারিত সে প্রতিশ্রুতিতে আপনাকে বদ্ধ মনে না করেন।”

যুবক অগচারণা করিলেন। পশ্চাতে কি যেন তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে
গাঙ্গিন। কিন্তু তিনি চিত্তসংযমে অভ্যস্ত—চিত্ত সংযত করিলেন।

যুবতা শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া গাঙ্গিন, যে আপনার প্রতিশ্রুতিতে আপনি
কি কে তাঁহাকে মুক্ত করিতে পারে ?

আশারোহী ক্রমে রাজধানীতে উপনীত হইলেন।

তিনি প্রাসাদদ্বারে উপনীত হইলে প্রহরীরা ব্যস্তভাবে তাঁহাকে অভিবাদন
গিলল।

দ্বারের পর প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া তিনি যে কক্ষে উপনীত হইলেন, সে
ক্ষেত্র কয়জন লোক বসিয়া ছিলেন ; তাঁহার আগমনে তাঁহারা উঠিয়া দাঁড়াইলেন।
কজন বলিলেন, “আমরা আপনার আগমন-বিলম্বে চিন্তিত হইতেছিলাম।”

তৈমিক বলিলেন, “আমি অত্র পথে আসিতে পথে বৃষ্টিচ্ছায় নিজাগত
ইয়াছিলাম। তাই আসিতে বিলম্ব ঘটিয়াছে।”

উষা ।

১

তুমি এস ধীরে ধীরে চম্পক-কক্ষে
অবগুষ্ঠন করায়,
এস নির্মল নব-মেঘ-নিরে
স্বর্ণ-মুকুট পরায় ।

তুমি এস আলো করি' বকুলবীথিকা,
অরুণ কিরণ ছড়ায়,
মুছ কম্পনে নব কিশলয়ে
নিশিরবিন্দু ঝারায় ।

২

তুমি এস স্নিত মূণে কুঞ্জকাননে
অমললতানি দুটায়,
অমিয়গন্ধ পরনে তোমার
কুসুমপুঞ্জ দুটায় ;
দিকে দিকে দিয়ে চিরমঞ্চিত
সৌরভরাশি দুটায়,
জুগনরত মত্ত অধীর
মধুপান দুটায় ।

৩

হেথা লুকু সমীর বহিবে—তোমার
মুক্তঅনক পরশি'
নবভূষণ উঠিবে—তোমার
চরণালঙ্কে সরসি' ।
হেথা কোকিল করবে বনানা তব
মঙ্গীতধারা বরাযি,
বিস্তৃত তব স্বর্ণকাস্তি
বক্ষে ধরিবে সরসী ।

সারসগৌমোহন ঘোষ ।

সমালোচনা।

ম্যালেরিয়া।*

ম্যালেরিয়া নামক জনপদবিধবংসী ব্যাধির প্রভাবে আজ সমগ্র বঙ্গদেশ, কেবল বঙ্গদেশ কেন প্রায় সমগ্র ভারত—অসামান্যর ঘোর অন্ধকারে আবৃত হইয়া পড়িয়াছে। যে দেশ সর্বদাই সুকুমার শিশুর হাস্যকৌমুদীতে, সদানন্দচিত্ত যুবক-যুবতীর প্রেমাগাপে, প্রোচপ্রোচীর আতিসন্ধ্যাপে, স্থাবরস্থাবিরার ধর্ম্যাগাপে মুগ্ধরিত থাকিত; যে দেশে সন্ধ্যার পর প্রতিগ্রামে আরাবিকের ঘণ্টাধ্বনি, ও নিশীথ পর্যন্ত মধীতধ্বনি উত্থিত হইত আজ সেই দেশ এই লোকসংহারী ব্যাধির প্রভাবে নীরব, নিথর ও গুপ্তিত ভাব ধারণ করিয়াছে। যে বাঙ্গালা এক সময় “কুসুম-দামসজ্জিত দীপাবলি তেজে উজ্জলিত নাট্যশালা সম” ছিল, আজ সেই দেশে এই দুঃস্বপ্ন রোগের প্রভাবে “একে একে শুকায়েছে ফুল এবে, নিবেছে দেউটী, নীরব রবান, বাঁণা, মুরজ, মুরলী।” সর্বত্রই যেন প্রলয়কালীন ভীষণ অন্ধকার জলস্থল আবৃত করিয়া রহিয়াছে, কেবল শ্মশান-সৈকতে চিতানলের উৎকট আলোকরশ্মি সেই দিগন্ত-বিসারী অন্ধকারের সমতা ভঙ্গ করিয়া উহার ভীষণতা বুদ্ধি করিতেছে।

প্রতিবর্ষে বাঙ্গালায় অর রোগে মতের আঠার লক্ষ লোক কালান্তকের কবলে নিপতিত হইতেছে; এই ঋণ্ডিত বঙ্গের পশ্চিমার্কেই প্রতিবর্ষে প্রায় বার লক্ষ করিয়া লোক শমনসদনে নীত হইতেছে। এই ঋণ্ডিত বঙ্গের পশ্চিমার্কে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ১১ লক্ষ ৩২ হাজার ৫ শত ৭৯ জন, ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ১১ লক্ষ ৭১ হাজার ৫ শত ৪০ জন এবং ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ১১ লক্ষ ৮৪ হাজার ৭ শত ৪ জন লোক কেবলমাত্র অররোগেই প্রাণ হারাইয়াছে। ইহা ভিন্ন কত লোক প্রতিবর্ষে এই রোগে আক্রান্ত হয়, তাহার ইমত্তা করা কঠিন। অনুমান হয়, এই অষ্ট কোটি আধিবাসী-অধ্যুষিত বঙ্গে অন্ততঃ পাঁচ কোটি লোক এই দুঃস্বপ্ন রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। যাহারা এই রোগ কর্তৃক আক্রান্ত হয়, তাহাদের জীবনী-শক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়ে। তখন অশ্রান্ত নানা ব্যাধি সহজে তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয়। সুতরাং অররোগে প্রতিবর্ষে মুখ্যতঃ এগার বার লক্ষ লোক মরে মৃত্যু, কিন্তু গৌণতঃ এই রোগ যে আরও অনেক অধিক লোকের মৃত্যুর কারণ এ কথা

* ম্যালেরিয়া—গ্রীকো-রীজমোহন শব্দ, এন্, এম্, এম্, প্রণীত। গ্রীকি-রোগের নাম কর্তৃক প্রবাহিত, মূলের। মূল্য ১২ টাকা।

অস্বীকার করিবার উপায় নাই । সুতরাং একমাত্র জরুরীগতি লেট মৌলান বাঙ্গালাকে স্মরণে পরিণত করিয়া মেঘিতভেদে, একথা বলিলে কিছুমান অত্যাচার হয় না । অতঃ কোন দেশে একপন শোচনীয় ঘটনা ঘটিলে ইহার নিবারণ ও তৎকালের উপায় আনিবার জন্য সংস্কৃত দেশে যের আন্দোলন ও চাঞ্চল্য উৎপাদিত হইত । কিন্তু এহ অপর্যাপ্ত আন্দোলনগত দেশে ইহার জন্য জনসাধারণের অধরে নিয়ম বিক্ষোভ উপস্থিত হইলেও বাহিরে সে বিক্ষোভ বিশিষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে না ।

যাহা হউক, সম্রাট ন্যালোরিয়াসম্বন্ধে বন্দদেশে কিছুকি আন্দোলন হইতে আরম্ভ হইয়াছে । এই রোগসম্বন্ধে কয়েকখানি পুস্তকও বাঙ্গালায় প্রকাশিত হইয়াছে । আমরা ন্যালোরিয়াসম্বন্ধে এ পর্যন্ত যে কয়খানি পুস্তক দেখিয়াছি, তন্মধ্যে ডাক্তার শ্রীমত সৌবীন্দ্রমোহন গুপ্ত মহাশয়ের প্রণীত 'ন্যালোরিয়া' নামক পুস্তকখানিই সর্বোৎকৃষ্ট । বর্তমান সময়ে বৈজ্ঞানিক অধ্যয়নে ন্যালোরিয়া-সম্বন্ধে যে সকল তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, চিকিৎসকসমাজে যে মত প্রভাব বিস্তারিত হইতেছে, ডাক্তার শ্রীমত সৌবীন্দ্রমোহন গুপ্ত তাহাই তাঁহার পুস্তকে লিপিত করিয়াছেন । গুপ্তমহাশয় কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র, বর্তমানে চিকিৎসা-কার্যে নিযুক্ত । এই রোগসম্বন্ধে তিনি বিশেষরূপে আন্দোলন করিয়াছেন । তাহার উপর ভাষায় মনো প্রাণ ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে । তাঁহার ভাষা সরল, মিষ্ট ও হৃদয়গাহী । যাহার ভাষায় সামান্য-মাত্র অধিকার আছে, সেও তাঁহার রচনা সহজে বুঝিতে পারিবে । যাহারা চিকিৎসা-বিজ্ঞান পড়েন নাই, চিকিৎসা-বিজ্ঞানের পরিভাষা বা পারিভাষিক শব্দের সহিত যাহাদের পরিচয় নাই, তাঁহাদেরও এ পুস্তক পড়িলে ন্যালোরিয়া সম্বন্ধে বিশেষরূপে জ্ঞানলাভ করিতে পারিবেন । তবে একপন পুস্তক একবারে পারিভাষিক-শব্দ-বর্জিত হইতেই পারে না । সুতরাং ইহাতে পারিভাষিক শব্দ অনেক আছে । কিন্তু ডাক্তার গুপ্তমহাশয় সে সকলের অর্থ বেশ সল ভাবে সাধারণের বোধগম্য করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন । আমরা তাঁহার পুস্তক পড়িয়া প্রীত হই-
য়াছি । পায় দুই বৎসর পূর্বে শ্রীমৎ রাজকৃষ্ণ মজুমদার নামক একজন সম্রাট ব্যক্তি 'বঙ্গ ন্যালোরিয়া' নামে একখানি পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছিলেন । মজুমদার মহাশয় ডাক্তার বা চিকিৎসা-ব্যবসায়ী নহেন ; কিন্তু তিনি ন্যালোরিয়া সম্বন্ধে অনেক অধ্যয়ন করিয়াছেন । তাঁহার অধ্যয়নে সংগৃহীত তথ্য তিনি পুস্তক-
কারে প্রকাশিত করিয়াছেন । ইহা ভিন্ন কয়েক জন হোমিওপ্যাথী ও ক্রনোপ্যাথী

চিকিৎসকও ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে দুইএকখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। এ প্রবন্ধে সে পুস্তকগুলির আলোচনা করিব না।

এই শ্রেণীর পুস্তকে তিনটি অতি আবশ্যিক বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা থাকে— (১) পীড়ার নিদান, অর্থাৎ যে সকল কারণ হইতে পীড়ার উৎপত্তি হয় তাহা; (২) পীড়ার ব্যাপন, বিকাশ ও পরিণতি বা শেষ ফল; (৩) চিকিৎসা। এই তিনটির একটির অভাবে পুস্তক অক্ষয়ী হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন পীড়া-প্রাদুর্ভাবের ইতিহাস, জনসাধারণের উপর ইহার প্রভাব, আনোচা রোগের আনুষঙ্গিক পীড়া, আনোচা রোগোৎপত্তির অনুরূপ ও প্রতিকূল অবস্থা, প্রতিষেধক উপায়, রোগিচর্যা, পথ্যাপন্য, ইত্যাদি অনেক আবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই শ্রেণীর পুস্তকে লিখিত থাকে। শুণ্ড মহাশয় তাঁহার পুস্তকে এই জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম।

শুণ্ড মহাশয় তাঁহার পুস্তকের প্রথমেই ম্যালেরিয়া রোগের একটি ইতিবৃত্ত দিয়াছেন। তিনি প্রথমেই বলিয়াছেন, “ম্যালেরিয়া কবে আমাদের দেশে প্রভাণমন করিল, এবং কত দিন হইতে সে ‘অতিথির মত আসিয়া কুটুম্বের মত রহিয়া গেল’— তাহা সঠিক জানিবার উপায় নাই।” তাহার পর তিনি শুভ্রাত, চন্দ্রক প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ হইতে বচনাদি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ঐ সকল গ্রন্থে এক প্রকার নিয়ম জরের উল্লেখ আছে,—ঐ রোগের লক্ষণের সহিত ম্যালেরিয়ার লক্ষণের কতকটা সৌমাদৃশ্যও আছে। সেই লক্ষণগুলির উপরেই নির্ভর করিয়া আমাদের দেশে প্রাচীনকালে ম্যালেরিয়া ছিল একথা নিশ্চিত বলা যায় না। “কেমনা এই সকল জরে ম্যালেরিয়ার অছায়া লক্ষণের উল্লেখ দেখা যায় না।” মুসলমান রাজত্বকালে, এক একটি জনপদবিধ্বংসী ব্যাধি প্রকট মূর্তি ধরিয়া বিশাল বিস্তৃত জনপদকে শব্দানে পরিণত করিয়াছে, ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু তাহার লিখিত বিস্তৃত বিবরণ না থাকায় তাহা ম্যালেরিয়া, প্লেগ অথবা অন্য কোন জনপদবিধ্বংসী ব্যাধি তাহার নির্ণয় করা কঠিন।

পলাশীর যুদ্ধের পর আর অর্ধ শতাব্দী কাল মধ্যেও এদেশে ম্যালেরিয়ার কোনও সাদা শব্দ পাওয়া যায় নাই। সরকারী কাগজপত্রে এ রোগের কোনও সংবাদ পাওয়া যায় না। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদে ও কানিমবাজারে ভীষণ জ্বর-রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। তৎকাল মধ্যে বহুলোক এই রোগে আক্রান্ত হইয়া শমন-ভবনে গীত হয়। সেইবার ম্যালেরিয়ার প্রথম পরিচয় পাওয়া গেল। তাহার পর বিশ বৎসর কাল নীরবে চলিয়া গেল। লোকে “মুর্শিদাবাদের মড়কের” কথা

অনেকটা বিস্তৃত হইল। অকস্মাৎ যশোহরে সীতারাম রায়ের রাজধানী মহম্মদপুরে ম্যালেরিয়ার বিজয়ভেরী বাজিয়া উঠিল। কয়েক মাসের মধ্যে এই দুঃস্বপ্ন রোগে সহস্র সহস্র লোক কাণাস্তকসমনে প্রেরিত হইল। ক্রমে চিকিৎসাদীরা উভয় তীরস্থ জনবহুল জনপদসমূহে টেবল রবে ম্যালেরিয়ার তুর্গানাদ শ্রুত হইতে লাগিল। নলডাঙ্গা, গদখালি প্রভৃতি অনকোলাহলগুণরিতা সমৃদ্ধিশালিনী নগরীগুলি শ্মশানে পরিণত হইল। তাহার পর ক্রমশঃ নদীয়া, হুগলী, বর্ধমান প্রভৃতি অনাকীর্ণ জিলা এই বোগের প্রকোপে জনশূন্য হইয়া উঠিল। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে এই বোগ হুগলী জিলায় দানবাসিনী হইতে ২৪ পরগণার বাবাসত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ইহা কাটোয়া হইতে মেহেরপুর পর্য্যন্ত এবং হুগলী জেলার দারবাসিনী হইতে ২৪ পরগণার গোববডাঙ্গা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। ১৮৬৬—৬৭ খৃষ্টাব্দে এই রোগ বর্ধমান জিলার সর্ব্বনাশ সাধন করে। এখন ইহা বাঙ্গালার ঘরে ঘরে বাস্তব ভূজঙ্গের মত বাস করিতেছে।

শুণ্ড মহাশয় তাহার পুস্তকে এই লোমহর্ষণ ইতিবৃত্ত বিস্তৃতভাবে বর্ণিত করিয়াছেন। এই দুঃস্বপ্ন রোগের প্রভাবে বাঙ্গালার গাম—জনপদ কিরূপ শ্রীহীন হইয়াছে,—বাঙ্গালীর মানসিক, নৈতিক ও আর্থিক ক্ষতি কিরূপ হইয়াছে, তাহা তিনি হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। পাঠক তাহা মূলগ্রন্থে পড়িয়া দেখিবেন।

অতঃপর শুণ্ড মহাশয় তাঁহার গ্রন্থে ম্যালেরিয়ার উৎপত্তির কারণসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি প্রথমে এই রোগের নিদানসম্পর্কে পূর্ব্বকৃত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ যে মত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাও কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছেন। আমরা এই স্থলে তাঁহার কথাই উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"ম্যালেরিয়া রোগের কারণ সম্বন্ধে আগে বক্তৃতা লোকে কত কথাই না বলিত। কেহ বলিত ইহার কারণ দুগ্ধিত বায়ু, কেহ বলিত ইহা আর্জ ভূমিসম্প্রাদ। বক্তৃতা শুধু মূল্য মত প্রচারিত, পরিবর্তিত, বিনষ্ট হইয়া গেল, তাহার আর সংখ্যা নাই; ক'র আলোচনা, ক'র পরস্পর প্রতীক মস্তিষ্ক আলোড়িত করিল, তাহার সীমা নাই; কেহ বলিল ইহা আবহাওয়ায় দৈত্যতা ও বৈদ্যুতিক অবস্থার পরিবর্তনে ঘটয়া থাকে (Chill and Electrical theory), কেহ বলিলেন ইহার কারণ দুগ্ধিত বায়ু ভিন্ন আর কিছুই নয়; পরে ঠিক হ'ল ভূমিই সকল আনিষ্টের মূল। জমির দোষে ও বিকারেই এটা পীড়ার উদ্ভব ও প্রসার (Telluric theory) কেহ কেহ আবার এই কথাটি মতের সমন্বয় করিয়া বলিলেন যে জীবনের উদ্ভিষ্ট ও পাতা পাতা দ্বারা জন্মসময়ে সরস ও সূর্য্যতাপে তপ্ত হইয়া এক প্রকার বিকার প্রাপ্ত হয়,—পচিয়া কি গাজিয়া উঠে (Fermentation theory) এবং তাহা হইতে এক প্রকার দুগ্ধিত বায়ু জন্মে; তাহা সমীর-সঞ্চালিত হইয়া যখন যেখানে আসে, সেইখানেই এইরূপ অর হয়।"

বলা বাহুল্য গুপ্ত মহাশয় পূর্বতন পণ্ডিতগণের সকল মত বিশদভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করেন নাই,—এবং সকল মতের ও উল্লেখ করেন নাই । দৃষ্টান্ত স্বরূপে বলা যাউতে পারে Fungus Theory বা বক্তের পরসূহ মতের উল্লেখ তাঁহার পুস্তকে দেখিলাম না । ঐ সকল মতের বিশদভাবে আলোচনায় বিলক্ষণ লাভ আছে । ঐ সকল মত অধুনা পরিত্যক্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু উহাদের বিশদভাবে আলোচনা করিলেই বুঝা যায় যে, ইতঃপূর্বে যাহারা এই রোগের কারণতত্ত্ব আলোচনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মত ভ্রান্ত বলিয়া সম্ভ্রামণ হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাঁহারাও তাঁহাদের গবেষণার ফলে প্রকৃত কারণের কতকটা সমিহিত হইয়াছিলেন, একথা অস্বীকার কবিবার উপায় নাই । ইংলণ্ডের ইসেকা অঞ্চল দুইশত বর্ষ পূর্বে ম্যালেরিয়াব আক্রমণ ছিল । জননিকাশের সুব্যবস্থার পর হইতে ঐ অঞ্চল একেবারেই জবজ্বালাশূন্য হইয়াছে । ইটালির ক্যাম্পানা ও পন্টাইন অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব ছিল, এখনও বোধ হয় কতকটা আছে । প্রাচীন রোমকেরা “মশক মত” (Mosquito theory) জানিতেন না সত্য, কিন্তু তথাপি তাঁহারা ঐ অঞ্চলে জননিকাশের চেষ্টা কবিয়াছিলেন । এখনও “মশক মত” সর্ববাদিসম্মত বলিয়া গ্রাহ্য হয় নাই । এখনও অনেক বিজ্ঞ চিকিৎসক দূষিত বাষ্পমতের (Miasma theory) পক্ষপাতী । সুতরাং পূর্বতন মত গুলির একটু বিশদ আলোচনা থাকিলে পুস্তকখানি সর্বাঙ্গ-সুন্দর হইত ।

যাহা হউক, “মশক মত” কি প্রকারে গৃহীত হইল, আলোচ্য গ্রন্থে তাহা সুন্দর ভাবে বর্ণিত আছে । আমরা নিম্নে তাহার একটু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ;—

“১৮৮০ খৃঃ মে দিন ফরাসিস্ স্থলী ডাক্তার ল্যাভেরন অরোগীর শোণিতে অনুবীক্ষণ-যোগে বহু জীবাণুর সন্ধান পাইলেন, সেই দিনেই এই ম্যালেরিয়া জরের কারণ একরূপ নিরীকৃত হয় । এবং তাঁহার ইহা মত বলিয়া গ্রহণ করিবার কারণও ছিল ;—কেন না,

- (১) ম্যালেরিয়া রোগীদ্বয়েরই শোণিতে কখনও না কখনও ইহার সন্ধান পাওয়া যায় ।
- (২) এই জীবাণুর পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে জরের নুনাধিক্য বিনয়ে ও পালার প্রাকারভেদ দেখা যায় ।

(৩) এই জীবাণুর পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে ইহা এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণ রক্তক পদার্থ প্রস্তুত করে, তাহা ম্যালেরিয়া রোগীর যকৃৎ গীহা প্রভৃতিতে সঞ্চিত দেখা যায় । রক্তের সহিত তাহার শরীরের বিভিন্ন অংশে আসিয়া জমে ।

(৪) ম্যালেরিয়া রোগীর রক্ত যদি সুস্থ শরীরে কোনও ব্যক্তির দেহে সঞ্চারিত করা যায়, তাহা হইলে তাহার রক্তেও এই জীবাণু সংক্রমিত হয় এবং সুস্থ ব্যক্তিও ম্যালেরিয়াভোগ্য হয় ।

(৫) যে কুইনাইন এই জ্বর বন্ধ করে, তাহা এই জীবাণুকুলও ধ্বংস করে ।

ক্রমে অনেক আলোচনা ও অনেক গবেষণার পর মনস্তত্ত্ব স্বামী গাভ্রীতর্ক কতক ইহা মত বলিয়া গৃহীত হয় ।”

ইহার পর ডাক্তার গুপ্ত মহাশয় তাঁহার পুস্তকে ম্যালেরিয়া জীবাণু সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন । এই জীবাণু মানব দেহে কি প্রকারে প্রবেশ লাভ করে, কি প্রকারে উহা মানব-শোণিতের রক্তকণিকাতে আশ্রয় করিয়া মানবের সর্বনাশসাধন করে, তাহার বিবরণ বিশেষরূপ নিম্নমুদ্রিত ও কোতুহল-প্রদ । আলোচ্য গ্রন্থে উহা বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে ।

মশকই মানবদেহে ম্যালেরিয়ার জীবাণু বিসর্জিত করে এই মত ইদানীং বৈজ্ঞানিক সমাজে অন্ততঃ অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে । আলোচ্য গ্রন্থেও এই মত অস্বাস্ত্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে । এ সম্বন্ধে আলোচ্য গ্রন্থে কতকগুলি প্রমাণও প্রদত্ত হইয়াছে । আমরা তাহা হইতে কয়েকটি প্রমাণ নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

“মশকগালাঘ্যে এই জীবাণুকুল যে নরশোণিতে প্রবেশ লাভ করে তাহার আরও প্রমাণ পাওয়া যায় । প্রথমতঃ ম্যালেরিয়া কায় দেশ হইতে আনীত কতকগুলি মশক দ্বারা ইংলণ্ডের কয়েক জন নীরোগ ব্যক্তিকে আক্রমণ করান হয় । তাহাতে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণেরই জ্বর হয়, অথচ তাহদের তখন মোটেই মা'দোরিয়া ছিল না । * * * * *
জাপান গবর্ণমেন্ট ম্যালেরিয়া এর মশকদংশনে ঘটে কি না, তাহা স্থির করিবার জন্য ম্যালেরিয়া-প্রদান ফর্মোসা দ্বীপে দুই দল টেম্প প্রেরণ করেন । তথায় তাহারা ১৬ দিন পরামর্শ করে । এক দল বেশ ভাল দিয়া খেয়ে খোরা মশকের অগম্য যায়গায় বাস করিতেছিল, অপর দলের গো বন্দোবস্ত ছিল না । প্রথম দলের কাহারও মা'দোরিয়া হয় নাই, দ্বিতীয় দলের ২৪ জন ম্যালেরিয়াক্রান্ত হইয়া পড়িলে এ বিষয়ে আর কাহারও মনেহেঁর কারণ রহিল না । বিশেষ অল্প-মশক না থাকিলে যে দেশে মোটেই মা'দোরিয়া হয় না ইহাও সত্য বলা যেন ।”

যে স্থানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অত্যন্ত অধিক, সে স্থানে যে মশকজ যথেষ্ট ইহা বোধ হয় অনেকেরই লক্ষ্য করিয়াছেন । শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ মণ্ডল মহাশয় তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন, - “শয্যায় বিযজ্ঞাপন করিবার জন্য যেমন ছাঁরপোকার সৃষ্টি, বায়ুর বিযজ্ঞাপন করিবার জন্য সেইরূপ মশককুলের সৃষ্টি, সুতরাং মশক ম্যালেরিয়ার সৃষ্টি বা বিস্তার কৰ্ত্তা নহে, ম্যালেরিয়ার জীবাণু মাত্র ।”

তিনি তাঁহার পুস্তকেই লিখিয়াছেন :—

“কোন কোন জাতিগণের মতে মশকগুলিই ম্যালেরিয়া জ্বরের একমাত্র কারণ বলিয়া গিচ্ছাত্ত হইয়াছে ও নানা স্থানে মশকদংশনের বাবস্থাও হইতেছে । মা'দোরিয়াক্রান্ত বা দুগ্ধিত বায়ু-পূর্ণ স্থানবাজেই মশকের আবির্ভাব দেখিয়া বোধ হয় তাঁহারা একপ জন্মে পতিত হইয়াছেন ।

বাস্তবিকই, ম্যালেরিয়ার সহিত মশককুলের সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ যে, কোন স্থানের মশকের সংখ্যা দৃষ্টে তাহার ম্যালেরিয়ার পরিমাণ স্থির করিতে পারা যায়। কিন্তু তাই বলিয়া মশক-কুল ম্যালেরিয়ার কারণ বা তাহারে বিনাশে ম্যালেরিয়ার অতিকার হইতে পারে, এ কথা, বিশ্বাস করিতে আমাদের প্রযুক্তি হয় না। ম্যালেরিয়া থাকিলেই মশক থাকিবে, ইহা নিশ্চিত। মশক থাকিলেই ম্যালেরিয়া আছে ইহাও নিশ্চিত। সুতরাং মশককে ম্যালেরিয়ার জ্ঞাপক বলা হইতে পারে, ম্যালেরিয়া একটি রূপ, রোগ, প্রজাতিবিহীন বিষাক্ত পদার্থ মাত্র। ম্যালেরিয়া বিষ শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া প্রকৃতরূপে রোগ জগাইবার পূর্বে, ইহার অস্তিত্ব জাগিবার অল্প উপায় নাই। এক জন্মট, পরম পিতা পঃসম্বর পূর্ব হইতেই তাহার অস্তিত্ব জাগন করিবার অল্প মশককুলের সৃষ্টি করিয়া প্রাণাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছেন।"

কিন্তু তিনি এই পুস্তকের অল্প স্থানে লিখিয়াছেন ;—

"আমার স্মরণ হয়, যে আজ ৩০ বৎসরের কথা, তখন আমার বয়স ১৪১৫ বৎসর, প্রথম যে বৎসর আমাদের দেশে ম্যালেরিয়া আসিল, সে ভীষণ ব্যাপার মনে করিতেও ভয় হয়। গ্রামে শিশু স্ত্রীলোক লইয়া প্রায় ২০০০ লোক ; আরে পড়িল না এমত কেহই রহিল না। আমার এক বাম্য বন্ধুকে মাজ এই আরের হস্ত হইতে পরিজ্ঞান পাইতে দেখিয়া-ছিলাম, উপরি উপরি। তন বৎসর এইরূপ ভীষণ প্রকোপ, কিন্তু তিন বৎসরই তিনি এড়াইয়া ছিলেন। আমি নানারূপ প্রমাণ দ্বারা জানিয়াছিলাম যে গ্রামের অপর সকল লোক হইতে তাহার অল্প পার্থক্য কিছুই ছিল না, কেবলমাত্র মাজে নিজায় সময় আপাদমস্তক আবৃত করিয়া বারমাস একখানি মোটা গাজবস্ত্র ব্যবহার তাহার অভ্যাস ছিল। এই কারণেই হউক বা অল্প যে কারণেই হউক তাহার সেই ভীষণ তিন বৎসরের মধ্যে আদৌ মর হয় নাই।"

মণ্ডল মহাশয় কার্যতঃ আপনিই আপনার কথার প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানপ্রণালীতে অভ্যস্ত নহেন। ম্যালেরিয়াজাত স্থানে মশকের আধিকা দেখিয়াই বৈজ্ঞানিকেরা মশকই ম্যালেরিয়ার কারণ, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হনেন না। তাঁহারা এ সম্বন্ধে বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। আমরা ডাক্তার গুপ্ত মহাশয়ের পুস্তক হইতে সেই অনুসন্ধান প্রণালীর দুইটি দৃষ্টান্ত উপরে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি। একদম দৃষ্টান্ত অনেক আছে। মণ্ডল মহাশয়ের বাম্যবন্ধু রাত্রিকালে মোটা চাদরে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া নিদ্রা যাইতেন, সেই জন্য তিনি তিন বৎসর কাল ভীষণ ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়াছিলেন। মোটা চাদর ভেদ করিয়া মশক তাঁহাকে দংশন করিতে পারিত না, সেই জন্য তিনি অরোগ্য হনেন নাই। যদি দূষিত বাষ্প ম্যালেরিয়ার কারণ হইত, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই অরোগ্য হইতেন। তাঁহার নিঃশ্বাসের সহিত দূষিত বাষ্প নিশ্চয়ই তাঁহার শরীরান্তরে প্রবিষ্ট হইত। আর এক কথা, দূষিত বাষ্প ম্যালেরিয়ার কারণ হইলে ঐ রোগের প্রথম অবস্থাতেই শ্বাস

যন্ত্রের কোনও না কোনও রূপ বিকৃতি দেখা যাইত। কিন্তু ঐ রোগের প্রথম অবস্থায় শ্বাসযন্ত্র বিকৃত হয় না, রক্ত এবং শোঁহা ও যকৃতেরই বিকৃতি দৃষ্ট হয়। সুতরাং দূষিত বাষ্প ইহার কারণ বলিয়া মনে হয় না।

অনেক স্থানে মশা আছে, ম্যালেরিয়া নাই। ইহার কারণ, সকল মশাই ম্যালেরিয়ার অনক বা বিসর্পক নহে। মশকেরা নান্য আতিতে বিভক্ত। তন্মধ্যে এনোফিলিস জাতীয় মশকই মানবদেহে অর রোগের মণ্ডার করিয়া দেয়। যেমন মর্পের মধ্যে চৌড়া, হেলে ডাঁড়স প্রভৃতির বিষ নাই, অন্তঃ সে বিষ মাহুষের প্রাণনাশক নহে, সেই রূপ কয়েক প্রকার মশকের দেহে ম্যালেরিয়া জীবাণুবর্জক পদার্থ নাই। তাহারা মশকজাতির মধ্যে চৌড়া। তাহাদের কামড়ে জালা আছে, জ্বর নাই। যেমন বোড়া, চিতি প্রভৃতি কতকগুলি সাপের বিষে সহসা মৃত্যু হয় না, কিন্তু শরীরে বিষম ক্ষত জন্মে, সেই রূপ এক প্রকার মশক গোদ, বাত শিরা, সাঁজর প্রভৃতির জীবাণু বহন করে। আর এনোফিলিস মশক জাতির মধ্যে কেউটে,—ইহাদের বিষেই ম্যালেরিয়া জীবাণুর গুটি ও মানবদেহে সঞ্চার হয়।

এই এনোফিলিস জাতীয় মশক দেখিতে অস্বাভাবিক হইতে অনেক বিভিন্ন। শুষ্ঠ মহাশয় তাঁহার পুস্তকে তাহাদের আকৃতির প্রাকৃতি ও প্রকৃতির পরিচয় দিয়াছেন। আমরা শুষ্ঠ মহাশয়ের পুস্তক হইতে ইহাদের একটু পরিচয় উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ;—

“এই অরমশকেরা মিশাটর, দিবাভাগে পাপ বড় বিরল। দিবাভাগে ইহারা ঘরের কোণে, গোশালায়, খম্বনচ্ছায়ায়, কোণে কোণে অলিতে গলিতে, বন্ধগার কোণে, আলনার পাশে লুপ্তায়িত থাকে। যেমন আঁধান হয়, আন অমান ঝাঁকে ঝাঁকে বাহির হইয়া বৃক্ষশোষণ কার্য্যে ব্যাপৃত হয়। আবার প্রভাত হইবামাত্র অদৃশ্য হইয়া যায়। কাজেই ম্যালেরিয়াজাত হইবার ভয় এই রাজ্যে। জাম উপকণ্ঠস্থ বা ঘামের ভিতরকার খাল, ডোবা, পয়োনালার ইহাদের উৎপত্তি ও পরিণতি এবং লোকালয় ইহাদের আলম। উৎপত্তিহীন হইতে এক পোয়া এবং জাম হইতে অর্ধ পোয়া দূরে এই মশকেরা উড়িয়া যাইতে পারে না। বর্ষা ও গরমের সময় ইহাদের বংশবৃদ্ধি, শীতকালে ইহারা মৃতপ্রায় হইয়া কোন রকমে টিকিয়া থাকে। পরিণতি ও বংশবৃদ্ধি শীতকালে ইহাদের আশ্রয়ই হয় না।”

এনোফিলিস জাতীয় সকল মশকও মানবদেহে ম্যালেরিয়া-বিষ বিসর্পিত করিয়া দিতে পারে না। যে সকল এনোফিলিস মশকের শরীরে জীবাণু-কোরক সঞ্চিত থাকে, এবং যে সকল কোরক তাহাদের শরীরে সুপরিণত হইয়া জী-পুষ্কযযোগে বংশবৃদ্ধি কারিতে থাকে, সেই সকল মশকের দংশনে ম্যালেরিয়ার

উৎপত্তি হইয়া থাকে। মশক মনুষ্য-শরীর হইতে এই বিষ গ্রহণ করে। ম্যালেরিয়া জরোৎপত্তির অল্পকাল অবস্থা কি কি তাহা আলোচ্য গ্রন্থে এইরূপ লিখিত হইয়াছে ;—

“প্রথমতঃ। কোনও দেশে বা স্থানে বথেষ্ট পরিমাণে জ্বর মশক থাকা প্রয়োজন।

দ্বিতীয়তঃ। ম্যালেরিয়া জ্বরগ্রস্ত রোগী থাকা চাই, তবে না মশক শোণিতসহ ঐ জীবাণু শিশু গ্রহণ করিয়া তাহাকে পরিণত ও আত্মবিভাগদ্বারা তাহার শত শুণ বংশবৃদ্ধি করিয়া মানবদেহে পুনঃ সঞ্চারিত করিবে।

তৃতীয়তঃ। মশক হইতে মনুষ্য শরীরে ও মনুষ্য শরীর হইতে পুনশ্চ মশকদেহে জীবাণুকুলের গমনাগমনের সুবিধা থাকা চাই।

চতুর্থতঃ। মশকের পরিণতি ও বংশবৃদ্ধির অল্পকাল আবহাওয়া নহিলে চলে না।

এই কয়টির কোনও একটির অভাব থাকিলে ম্যালেরিয়া জ্বর হয় না। এই জন্য অনেক দেশে জ্বর মশক গড়েও ম্যালেরিয়া নাই, এবং অনেক স্থানে মশকও জ্বর মধ্যেও বৎসরের অনেক সময় জ্বর বিমুক্ত থাকে। তখন আবহাওয়া এমন হয় যে তাহা মশকদংশন ও মশক-জ্বরের পরিণতির পক্ষে অসমর্থ অল্পকাল নহে। সেমম আমাদের দেশে শীত কাল ও বসন্ত কালের প্রথম ভাগটা। তাহা ছাড়া জ্বরমশকের আবার প্রণীবিভাগ আছে, তাহার সকলেই কিছু সমান জীবাণু বহন করে না। যেখানে জ্বর মশক কম জীবাণু বহন করে সেখানে জ্বর কম হয়, যেখানে বেশী বহন করে, সেখানে জ্বর বেশী হয়।”

আমরা আলোচ্য গ্রন্থ হইতে মোটামুটি “মশক মতের” আভাসমাত্র প্রদান করিলাম। মশক মানব, শরীর হইতে ম্যালেরিয়ার জীবাণু লইয়া নিজ শরীরে উহার পরিণতি ও বংশবৃদ্ধি করিয়া উহা আবার মানবশরীরে প্রবেষ্ট করাইয়া দেয়। মানব-শোণিতে উহার অযোনিমস্তব (asexual) বংশবৃদ্ধি ও মশক শরীরে উহার যোনিজ (sexual) বংশবৃদ্ধি হয়। মশকশরীরে পরিপকতা লাভ না করিলে ঐ জীবাণুর জন্ম-অনন-শক্তি জন্মে না। এখন জিজ্ঞাস্য, মানব শরীরে এই প্রাথমিক জীবাণু কোথা হইতে আইসে ? ইহাই এই “মশক মতের” প্রধান সমস্যা।

গুপ্ত মহাশয় কুইনার্টাইনকেই ম্যালেরিয়ার একমাত্র উৎস নির্দেশ করিয়াছেন। তাহার পুস্তকখান চিকিৎসক ও জনসাধারণের বিশেষ উপকারে আসিবে। দাজলার এই প্রণীর পুস্তক যতই প্রণীত ও আদৃত হয়, ততই মঙ্গল।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

বুদ্ধাঙ্কি ।

—:০৪:—

[কয়লাস পূর্বে পেশোয়ারের নিকটে কনিদের কীর্তি স্থূপের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে । এই ভগ্নাবশেষমধ্যে—ভ্রূগড়ে প্রাণিক আদারে বুদ্ধাঙ্কি পাওয়া গিয়াছে । পেশোয়ারে এই স্থূপের বিষয় বহু চীন দেশীয় পর্য্যটক বলিয়া গিয়াছেন । পেশোয়ারের বিনয়ন লিখিবার সময় অসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ ও প্রত্নতত্ত্ববিদ কানিংহাম সে কথার উল্লেখ করিয়াছিলেন । কানিংহামের বিবরণ পাঠে জানা যায়, ৪০০ খৃষ্টাব্দে ফা হিয়েন ফো-নিউ-সা বলিয়া পেশোয়ারের উল্লেখ করেন । পরে ৫০২ খৃষ্টাব্দে স্ত্রং ইউন ইহার উল্লেখ করেন । তৎকালে গান্ধারের নৃপতির সহিত কাবুল, গজনী ও সম্মিলিত পদেশের রাজার যুদ্ধ চলিতেছিল । ৬৩০ খৃষ্টাব্দে হিউয়েন সাং যখন ভারতে আসেন তখন গান্ধার কান্ধারের অধীন । কিন্তু পূর্বে রাজধানী পেশোয়ার (পবশাওয়ার) তখনও সমৃদ্ধির সমুচ্চ চূড়ায় সমাসীন । ইহার পর খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে মুসলমান, একাদশ শতাব্দীতে রিহান ও মোড়না শতাব্দীতে বাবর ইহার উল্লেখ করিয়াছেন । আকবর পবশাওয়ার নাম পরিবর্তিত করিয়া পেশোয়ার (সোমাস্ত নগর) নাম রাখিয়াছিলেন । এই স্থানে বুদ্ধের কমণ্ডলুর ও একটি বিত্ততবচনায় বুদ্ধের উল্লেখ—সকল অবসরগেই পাওয়া যায় । কিন্তুদস্তী ছিল যে, এই বুদ্ধ ছায়ায় সমাসীন হইয়া বৃন্দেব কনিদের আবির্ভাবের কথা ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিলেন । ফা হিয়েন এই বুদ্ধের উল্লেখ করেন নাই । কিন্তু স্ত্রং ইউন এই ঘনপল্লব বুদ্ধের উল্লেখ করিয়াছেন । বুদ্ধমূলে পূর্ববর্ত্তা চারজন বুদ্ধের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল । ১৫০৫ খৃষ্টাব্দে বাবর এই বুদ্ধ দেখিয়াছিলেন । তখন এই বুদ্ধ অস্তিত্বঃ ১৫০০ বৎসরের । ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে ‘আইন আকবরীতে’ ইহার উল্লেখ না থাকায় অনুমান হয়, তৎপূর্বেই বুদ্ধটি মরিয়া গিয়াছিল । কনিদের স্থূপ এই বুদ্ধের দক্ষিণে আশ্রিত ছিল । ফা হিয়েন বলেন, ইহা ৪০০ ফিট উচ্চ এবং বহু বহুমুখ্য দেবো মণ্ডিত । স্ত্রং ইউন বলেন, প্রকাশ, ভারতে ইহার তুল্য স্থূপ আদ্য নাই । ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে কানিংহাম লিখিয়াছিলেন,— “এখন আর এই স্থূপের কোন নিদর্শন নাই ।”

দীর্ঘকাল পরে এই স্থূপের অগ্নিদগ্ধতা ও বুদ্ধাঙ্কির আবিষ্কার প্রত্নতত্ত্বের হিসাবে বিশেষ আনন্দীয় ঘটনা । ভারত সরকার এই বুদ্ধাঙ্কি অঙ্গদেশে সংস্থাপিত করিতে দিয়াছেন । ব্রহ্ম হট্টে গাহারা বুদ্ধাঙ্কি লইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহা-

দিগকে এই পুত্ৰ অস্থি প্রদানের সময় ভারত সনকারের পুরাবস্তুবিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল স্মৃতি গিটার মার্শাল এই বিষয়ে একটি মনোজ্ঞ ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। আমাদিগের অনুরোধে তিনি আবশ্যক সংশোধন করিয়া ঐ প্রবন্ধ আমাদিগকে দিয়াছেন। জেজু আমরা তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। নিম্নে সেই প্রবন্ধের অনূবাদ প্রকাশিত হইল।—সম্পাদক]

এই পুত্ৰ প্রবোধ ইতিহাসের উদ্ধাব করিতে হইলে আমাদিগকে ভারতে আগত চীনদেশীয় ভ্রমণকারীদিগের বিবরণের আলোচনা করিতে হইবে। এই সকল ভ্রমণকারী খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী হইতে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। ইহাদিগের মধ্যে ফা হিয়েন, সুং ইউন ও হিউয়েন সাং—এই তিন জন পেশোয়ারের সন্নিহিত রাজ্য কনিঙ্কব কীর্ত্তি একটি বৃহৎ স্তূপের উল্লেখ করিয়াছেন। হিউয়েন সাং স্পষ্টই বলিয়াছেন, এই স্তূপে বুদ্ধদেবের মরদেহাবশেষের এক অংশ রক্ষিত ছিল। এই সকল ভ্রমণকারী, এই স্তূপটির অসামান্য সৌন্দর্য্যের ও বৈভবের কথা বলিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে মধ্যে বহুমূল্য প্রবোধ বেঁটনী ছিল এবং আয়তনে ও বৈভবে ভারতে আর কোন স্তূপ ইহার সমকক্ষ ছিল না। ভূমির উপরেই ইহার পরিধি প্রায় এক চতুর্থাংশ মাইল ছিল। ইহার উচ্চতা কাহারও মতে চার শত আবার কাহারও মতে সাত শত ফিট ছিল। এই অমোদনতলে বিভক্ত স্তূপের নিম্নাংশ প্রান্তরে গঠিত ও উপরিভাগ কাষ্ঠ রচিত হইয়াছিল এবং স্তূপ চূড়ায় স্বর্ণাধরাবৃত্ত বৃত্ত শোভা পাইত।

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে উৎকর্ণ লিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, তখন পর্য্যন্ত এই স্তূপ বিদ্যমান ছিল। তাহার পর ইহার কি দশা ঘটিয়াছিল, ইতিহাসে তাহার উল্লেখ নাই। তবে ইহা যে পরে আরও অনেক বৌদ্ধ স্তূপাদির মত মামুদের লুণ্ঠনলোলুপ অন্নবর্ত্তীদিগের দ্বারা নষ্ট হইয়াছিল—এ অনুমান বোধ হয় অসঙ্গত নহে। সে যাহাই হউক পরবর্ত্তী কোন গ্রন্থে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায় না। শেষে ভারতের সীমান্ত প্রদেশে বৌদ্ধধর্মের বিলম্বের সঙ্গে সঙ্গে লোকে ইহার অস্তিত্ব-নিদর্শনও বিস্মৃত হইয়াছিল।

যাহা হউক চীনদেশীয় পর্য্যটকদিগের রচনায় ইহার স্থাননির্দেশের উপায় ছিল। সেই নির্দেশের অনুবর্ত্তী হইয়া ফরাসী পণ্ডিত মশো ফমার বর্ত্তমান পেশোয়ার নগরের পূর্বদিকে অবস্থিত কতকগুলি মৃত্তিকা স্তূপই ইহার ধ্বংসাবশেষ বলিয়া স্থির করেন। তাঁহার মতের অনুসরণ করিয়া আমরা ভূমিতলে এই প্রাচীন স্তূপের অবশেষসকল ব্যাপ্ত হই। প্রায় দুই বৎসর পূর্বে ডাক্তার স্পুনার এই

কার্য্য আরম্ভ করেন । কার্য্যারম্ভের পর কম মাস পর্যাণ্ত স্তূপের ভগ্নাবশেষ ব্যতীত আর কিছু পাইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া বোধ হয় নাই । তাহার পর ক্রমে ক্রমে বৃহৎ স্তূপের প্রস্তরগঠিত ভিত্তিপ্রাচীর পাওয়া গেল । ভিত্তিপ্রাচীরের আয়তন দেখিয়া বুঝা গেল, ভারতে এমন বিশাল স্তূপ আর ছিল না । অচ্ছাচ্ছ বিষয়েও চীনদেশীয় পর্য্যটকদিগের বর্ণিত স্তূপের বিবরণ মিলিতে লাগিল ।

ইহাই যে রাজ্য কনিঙ্কের সেই প্রসিদ্ধ স্তূপ সে বিষয়ে আর সন্দেহ রহিল না । তখন আমি ডাক্তার স্পুনারকে বলিলাম, এই স্তূপে বুদ্ধদেবের মরদেহাবশেষের এক অংশ রক্ষিত হইয়াছিল ; তাহার সন্ধান করা আবশ্যক । তখন বহু আয়াসে নিয়ন্ত্রণের মধ্যস্থল খনন করা হইল । প্রায় ২০ ফিট নিম্নে আমরা একটি ক্ষুদ্র প্রস্তরগঠিত কক্ষে উপনীত হইলাম ; তথায় আমরা প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্বে রাজ্য কনিঙ্করক্ষিত বুদ্ধদেবের দেহাবশেষের আধার প্রাপ্ত হইলাম ।

এই স্তূপেই যে রাজ্য কনিঙ্কের কীৰ্ত্তি এ সম্বন্ধে পূর্বে যদি বা সন্দেহের কোন কারণ থাকিয়া থাকে—এই কক্ষে প্রাপ্ত জব্যাদির পরীক্ষায় সে সন্দেহের আর অবকাশ রহিল না ;—পরন্তু সকল সংশয় দূর হইয়া গেল । এই আধারে যে রাজ্যমূর্ত্তি উৎকীর্ণ তাহার সহিত কনিঙ্কের মূর্ত্তায় মূর্ত্তিত মূর্ত্তির গৌসাদৃশ্য স্পষ্ট ; এই মূর্ত্তির নিম্নে খরস্ଥିতে তাঁহারই নাম লিখিত বলিয়া বোধ হয় । আবার আধার-পার্শ্বে—যেন সকল সংশয় দূর করিবার জন্মই কনিঙ্কের একটি মূর্ত্তা পাতিত ছিল ।

কাণ্ডেই এই স্তূপ যে কনিঙ্কের কীৰ্ত্তি হিউয়েন সাংএর এই উক্তি সত্য বলিয়াই বোধ হয় । এই স্তূপান্তরে যে বুদ্ধদেবের দেহাবশেষই সংরক্ষিত হইয়াছিল ইহাতেও সন্দেহ করিবার কারণ নাই । কনিঙ্কের রাজ্য উত্তর ভারতে ও আফগানিস্থানে বিস্তৃত ছিল । সুতরাং তাঁহার পক্ষে রাজ্যান্তর্গত কোন স্তূপ হইতে বুদ্ধদেবের দেহাবশেষসংগ্রহ সহজসাধ্যই ছিল । বিশেষতঃ তিনি যে স্বীয় রাজধানীতে স্বয়ং বুদ্ধদেব ব্যতীত আর কাহারও দেহাবশেষ রক্ষা করিয়াছিলেন বা আর কাহারও দেহাবশেষ রক্ষার্থে এইরূপ অভূতনীয় স্তূপ নির্মাণ করিয়াছিলেন—ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না ।

এই সকল কারণে মনে হয় হিউয়েন সাংএর উক্তিই সত্য এবং এই স্তূপমধ্যে প্রাপ্ত আধারে রক্ষিত দেহাবশেষ স্বয়ং বুদ্ধদেবের । তাঁহার দেহাবশেষ কুশীনারে পরিনির্বাণের পর অষ্ট ভাগে বিভক্ত ও পরে সম্রাট অশোক কর্তৃক আরও বহু ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল ।

সংগ্রহ।

—:~:—

সাহিত্য।

—o—

ভারতীয় ঐতিহাসিক সাহিত্য।

ভারতবাসীদিগের ইতিহাস-বিমুখতা অসিদ্ধ। “মহ্মদ কেহ নহে, মহ্মদ কোন কার্যেরই কর্তা নহে, অতএব মহ্মদের প্রকৃত কীর্তি বর্ণনে প্রয়োজন নাই”—“এই বিনীত মানসিক ভাব ও দেবভক্তি অস্বভাবিতর ইতিহাস না থাকার কারণ”—বন্ধিমচন্দ্র এই মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু যে জাতির ইতিহাস নাই, সে জাতির দুঃখের সীমা নাই। সে দুঃখ আমরা বিশেষ রূপ ভোগ করিয়াছি ও করিতেছি। ইংরাজ লেখকগণ ভারতের এই অভাব-মোচনে যে অধ্যবসায় দেখাইয়াছেন তাহাতে তাঁহারা ভারতবাসীমাজেরই কৃতজ্ঞতার পাত্র। ইংরাজ লেখকগণ যে ভ্রান্তগণ্ডার হেতু স্থানে স্থানে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন—যজ্ঞাতিপ্রীতি বশতঃ স্থানে স্থানে ভাবের ফেনপুঞ্জতলে সত্যের ক্ষীণ ধারা দেখিতে পায়েন নাই—এ কথা স্বীকার্য। কিন্তু তাঁহারা যাহা করিয়াছেন তাহাও সামান্য নহে। এই ইতিহাসের উদ্ধার কার্যের গুরুত্রে একাধিক ইংরাজ সত্য সত্যই প্রাণপাত করিয়া গিয়াছেন। কিটো, প্রিঙ্গিপ, কানিংহাম প্রভৃতির ত কথাই নাই, এল্‌ফিনষ্টোন, লেনপুল, স্মিথ, মিল, হার্টার হইতে মেকলে পর্য্যন্ত অনেক ইংরাজ লেখকই এ কার্যে সহায়তা করিয়া গিয়াছেন। কেহ বা প্রাচীন ভারতের কেহ বা মুসলমানাদিকৃত ভারতের, কেহ বা ইংরাজাধিকৃত ভারতের ইতিহাস রচনা করিয়া ঐতিহাসিক সত্যের উদ্ধার করিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে মেকলের কার্য কেবল “সেডুবন্ধনে কাঠবিড়ালের কার্যের” মত নহে।

মেকলের বিরূপ কীর্তি—ইংলণ্ডের ইতিহাস। কিন্তু ঐতিহাসিক হিসাবে তাঁহার স্থান

উচ্চ নহে, সম্মান সমাধিক নহে। তিনি কোবিদ ছিলেন। তাঁহার

মেকলে।

রচনা বিচিত্রশব্দকুসুমকুসুমা। তাঁহার রচনাশক্তি অনন্তসাধারণ।

তাঁহার ভাষা অতুলনীয়। কিন্তু পাণ্ডিত্য, রচনাকৌশল, বর্ণনাশক্তি—এইগুলিই ঐতিহাসিকের সর্বস্ব নহে। যে স্বল্প পর্য্যবেক্ষণশক্তি, যে দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টি ঐতিহাসিকের পক্ষে অত্যাৱশ্যক, মেকলের তাহা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ছিল না। বিখ্যাত লেখক হ্যারিসন বলিয়াছেন, মেকলের ইতিহাসের আদর্শই অজ্ঞাত নহে। তিনি ইতিহাসকে সত্যমূলক উপঢাঙ্গ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। সে কার্যে তিনি সফলপ্রসন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার ইতিহাস—সত্যমূল উপঢাঙ্গ। এরূপ পুস্তক সুখপাঠ্য হয়—এক শ্রেণীর পাঠককে ইতিহাসে আকৃষ্ট করে। কিন্তু ইহা ইতিহাস নহে। ইহাতে মানবসমাজে পারস্পর্য্য প্রদর্শন, ঘটনার কার্যকারণবিচার—এ সকলের অবকাশ হয় না। ইহা স্বল্প স্থানের আংশিক চিত্রমাত্র। ইহা কেবল বাহ্যিক বর্ণের বিকাশ লইয়াই ব্যস্ত। ইহাতে ব্যক্তির ও ঘটনার বিচারে ও

বর্ণনায়—কালক্রমগত পরিবর্তনের দিকে লেখকের মনোযোগ থাকে না। ইতিহাস মানব সমাজের অস্তিত্বের বিবরণ; ঐতিহাসিক উপগ্রাস তাহা নহে। মেকলে বলিয়াছিলেন, ইতিহাস কবিতার ও দর্শনের সংমিশ্রণ। কার্যকালে তিনি কবিতার স্থানে শব্দচিত্র ও দর্শনের স্থানে ব্যক্তিগত বিবরণ প্রদান করিয়াছিলেন। সুতরাং ঐতিহাসিক হিসাবে মেকলের স্থান উচ্চ নহে। ভারতবর্ষের ইতিহাসবিষয়ে তাঁহার কৃতিত্ব অধিক নহে। শব্দময় তাঁহার শিষ্য হাট্টারও বলিয়াছেন, ভারতবর্ষ তাঁহার প্রবল প্রতিভার অধিকারমধ্যে ছিল সত্য, কিন্তু এ দেশ তাঁহার অভিজ্ঞতা-সীমার বাহিরে ছিল। তথাপি ভারতের ইতিহাস-বিজ্ঞানে তাঁহার কার্য নিতান্ত নগণ্য নহে। সংগ্রহিৎ ইংলণ্ডে কোন সভাহলে সার আলফ্রেড জায়াল সেই কথার আলোচনা করিয়াছেন।

সার আলফ্রেড আরওই বলিয়াছেন, এশিয়াবাসীর লিখিত এশিয়ার ইতিহাস চিত্রা-
কর্ষক নহে; পরন্তু নিরুপ, তাহাতে রাজনৈতিক অস্তিত্বের আলো-
চনা নাই।

সার আলফ্রেড যাহাই বলুন, ভলটেয়ারের পূর্বে যুরোপেও রাজার ও যুদ্ধের কথাই ইতি-
হাসের আলোচ্য বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইত—জনসাধারণের কথা ইতিহাসে আলোচিত
হইত না। সুতরাং ভলটেয়ারের পূর্ববর্তী এশিয়াবাসী ইতিহাসলেখকদিগকেই দোষী
করা উচিত নহে। তাঁহারা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম নহেন—এই পর্য্যন্ত। ইহার পর
ভারতের রাজনৈতিক রক্ষমকে ইংরাজের আবির্ভাব, আর সঙ্গে সঙ্গে আত্ম-প্রাণীর
প্রাণীর পথে নূতন শিক্ষার, সভ্যতার ও আদর্শের আগমন। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ-
ভাগে ইংলণ্ডের গভর্ণমেন্ট ভারতের বিষয়ে মনোযোগ দান করেন। কিন্তু তখন ইংলণ্ডের
জনসাধারণ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অজ্ঞানতামিরে অন্ধ। তাঁহাদিগের নিকট অ্যারলোইডিয়ান
পুস্তক অপাঠ্য। এই প্রাচীন লেখকদিগেরও যে দোষ ছিল না এমন নহে। তাঁহারা
অভিজ্ঞতামাত্র লাভ করিয়াছিলেন; রচনা চিত্রাকর্ষক করিতে শিখেন নাই। কামেই
লোকে ভারতের কথা শুনিত না—জানিত না।

মেকলেই সর্বপ্রথম ইংরাজ জনসাধারণকে ভারতে ইংরাজের কীর্তির পরিচয় প্রদান
করেন। ক্লাইব ও হেষ্টিংস এই দুইজনের সম্বন্ধে তাঁহার প্রবন্ধে
মেকলের কৃতিত্ব। ইংরাজ পাঠক জানিতে পারেন যে, অমূল্য সিদ্ধপারে মুষ্টিমেয় ইংরাজ
বহু বাধা ও বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া রাজ্যশ্রুতি করিয়াছেন। সাধারণ পাঠক মেকলের মতই
অজ্ঞান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। মেকলে এই দুই জনের চরিত্রের উজ্জ্বল অংশই দেখাইয়া-
ছিলেন। লোকে তাহাই দেখিয়াছিল। বিশেষ্য তাঁহারা ইংলণ্ডের রাজ্যশ্রুতি করিয়াছিলেন,
সেই অল্প ইংরাজ জনসাধারণ তাঁহাদিগের দোষবিষয়ে অন্ধ হইয়াছিল—তাঁহাদিগের
কৃতকর্মের ফলভোগী হইয়া তাঁহাদিগের কার্যের ভালমন্দ বিচার করে নাই।

এই দুইটি প্রবন্ধে মেকলের অসাধারণ রচনাকৌশল অপ্রকাশ। মেকলে ইতিহাস রচনা-
কৌশলের উপযোগী বিবরণাদি বাছিয়া লইয়া আবশ্যক মত সাজাইয়া
রচনাকৌশল। তাহাতে জানিতে। তিনি নিপুণ শিল্পীর মত অল্প কথায় বহু কথা বিবরণ

চিত্তের মত স্পষ্ট ও সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিতে পারিতেন। ক্রাইবের সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে তিনি দুই পৃষ্ঠায় মোগলদিগের পতনের পরে দেশব্যাপী অশান্তির ও অরাজকতার যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। এই প্রবন্ধে তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইংরাজের অসাধারণ অজ্ঞতার অল্প দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা অ্যাংলোইণ্ডিয়ান লেখকদিগের যে দোষের উল্লেখ করিয়াছি, এই প্রবন্ধে তিনি সে দোষেরও উল্লেখ করিয়াছেন; এই প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন, ইংরাজবালক যুরোপের ইতিহাসের তুচ্ছ ঘটনার বিষয় অবগত আছে, কিন্তু ভারতবর্ষে সংঘটিত জাতব্য ঘটনার বিষয়ে একান্ত অজ্ঞ—ইহা আক্ষেপের বিষয়। ইহার অল্প ঐতিহাসিকগণও দোষী। মিলের উৎকৃষ্ট পুস্তক নিরস বলিয়া চিত্তাকর্ষক নহে। অর্গের পুস্তক স্কন্ধ বিচার ও বর্ণনাবাহুল্য হেতু অনাদৃত। মেকলে তাঁহার কোন বক্তৃতাতে বলিয়াছিলেন, ইংলণ্ডে অতি সামান্য তুচ্ছ ঘটনায় যেরূপ আন্দোলন হয় ভারতে তিনটি যুদ্ধেও সেরূপ আন্দোলন হয় না। তাই বোধ হয়, ভারতবর্ষের ইতিহাসের দিকে ইংরাজ জনসাধারণের মনোযোগ আকৃষ্ট করা মেকলের এই দুইটি প্রবন্ধ রচনার অত্যন্ত উদ্দেশ্য ছিল।

কিন্তু ইহাতে যে হিতে বিপরীত ঘটে নাই, এমনও নহে। তাঁহার রচনাকৌশলে মুদ্র পাঠকের নিকট অল্প সকল লেখকের রচনা-পাঠ ক্রেশকর হইয়া হিতে বিপরীত। উঠে। সাধারণ পাঠক মেকলের রচনা পাঠ করিয়াই সন্তুষ্ট হইত; আলোচ্য বিষয় বিশেষতঃ অ্যাংলোইণ্ডিয়ান লেখকদিগের রচনা তাহার নিকট বিরজিকর বোধ হইত। এমন কি মেকলের প্রবন্ধ প্রকাশে এল্‌ফিনষ্টোনের মত অভিজ্ঞ লেখকও আগনার রচনা-প্রকাশে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন। তিনি যখন ক্রাইব ও হেষ্টিংস এই দুই জনের চেষ্টায় বৃটিশ সাম্রাজ্য বৃদ্ধির নিবরণ লিপিতে আনন্ত করিয়াছেন, তখন মেকলের প্রবন্ধদ্বয় প্রকাশিত হইল। সেই প্রবন্ধদ্বয়ের অসাধারণ উজ্জ্বল্যে তিনি নিম্নিত—মুদ্র হইলেন। মিলের ও মেকলের রচনার পর আর এই বিষয়ক রচনার আবশ্যক নাই মনে করিয়া তিনি আরও কার্যে নিরন্ত হইলেন। কিন্তু অভিজ্ঞ পাঠককে আর বলিয়া দিতে হইবে না যে, এল্‌ফিনষ্টোনের এই সঙ্কল্প আমাদের পক্ষে দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। ভারতে ইংরাজের কার্যে মিলের বিমুখতা সহায়ভূতি ছিল না; মেকলে খুঁটিনাটি বাদ দিয়া—খানে খানে সত্য অতিক্রম করিয়া মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পর দেশব্যাপী অশান্তির চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিভা বিদ্বাদীপ্তির মত ভারতের রাজনৈতিক গগনে সঞ্চিত অজ্ঞতাকারে শোভা পাইয়াছিল। তাহাতে সে অন্ধকার বিলুপ্ত হয় নাই—হইতে পারে না। তবে মেকলে ভারতের ইতিহাসের প্রতি ইংরাজ জনসাধারণের ও ইংরাজ লেখকদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছিলেন তাহার ফলে ভারতের ইতিহাসের বহু অংশ বিশ্বস্তির অন্ধকার হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে। সুতরাং ভারতের ইতিহাস রচনা বিষয়ে মেকলের কৃত কর্ম নিতান্ত মগ্ন্য নহে; পরন্তু বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিবিধ ।

সিপাহি সীতারাম ।

গত মার্চ মাসের আরম্ভে লেফটেন্যান্ট কর্ণেল ফিলট কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির বৈঠকে সীতারাম নামক অটোনক সিপাহীর আত্মচরিতের আলোচনা করিয়াছিলেন। সীতারাম ইংরেজী ভাষা জানিতেন না; জীবনের সায়াহ্নে, মমরবিভাগে আটচল্লিশবৎসর কায় করিয়া অবসর গ্রহণের পর খ্রীঃ গৃহে একান্তে বসিয়া হিন্দি ভাষায় কেবলমাত্র স্মৃতির সাহায্যে এই কোতূহলোদ্দীপক আত্মকাহিনী লিখিয়াছিলেন। তাঁহার আত্মকাহিনীতে শিখিবার ও জানিবার বিষয় অনেক আছে। সেইজন্য আমরা সংক্ষেপে সেই আত্মকাহিনীর অল্পমাত্র আভাস প্রদান করিলাম।

১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যাপ্রদেশের কোন গও গ্রামে সীতারামের জন্ম হয়। সীতারামের পিতা গ্রামের মধ্যে নিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন—তাঁহার নিজের এক বিধা বাল্যজীবন।

জমি ছিল। সীতারাম ব্রাহ্মণসন্তান; বাল্যকালে অটোনক মন্ত্রল-খতাব পণ্ডিতের হস্তে তাঁহার শিক্ষার ভার অর্পিত হয়। হিন্দুস্থানে, বিশেষতঃ হিন্দিভাষা-ভাষীর দেশে,—ব্রাহ্মণ শিক্ষক 'পণ্ডিতজী' নামে অভিহিত। সীতারামের পণ্ডিতজী সীতারামকে মোটামুটি নীতিশিক্ষা দিয়াছিলেন। বৈচিত্র্যময় জীবনের অনেক সঙ্কটসময় সেই নীতিবাক্য স্মরণ করিয়া সীতারাম সন্তোষ ও সাধুতা লাভ করিতেন। সীতারামের এক মাতুল কোম্পানী বাহাদুরের পণ্টনে কায় করিতেন। তিনি মধ্যে মধ্যে ছুটি লইয়া গৃহে যাইবার সময় ডগিমীর গৃহেও যাইতেন। তথায় গ্রাম্যলোকের নিকট "সাহেব লোক" মিগের সম্বন্ধে তিনি অনেক বিষয়জনক গল্প বলিতেন। লোকে সেই সব গল্প শুনিয়া বিস্ময়ে মিস্ত্রীকৃত হইত। এই স্থানে বলা আবশ্যক, এই সময়ে অযোধ্যারাজ্য ইংরেজের শাসনাধীন হয় নাই। তখন অযোধ্যায় একজন নবাব ছিলেন। সীতারামের চুড়িতে তাঁহার মাতুল সেই নবাব অপেক্ষাও "মস্ত লোক" বলিয়া বোধ হইত।

এই সময় অযোধ্যা প্রদেশে "সাহেব লোক" দৃষ্ট হইত না। আশা অঞ্চল তখন যুরোপীয়মিগের পদরেণুস্পৃষ্ট হইয়াছিল। অযোধ্যা অঞ্চলের লোক সাহেব লোক।

তখন ইংরেজ ও অশান্ত খেতাবমিগের সম্বন্ধে অনেক "আমাদের গল্প" সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিত। তখন তথাকার গ্রাম্য লোকের বিশ্বাস ছিল যে, আমাদের দেশের লোক ঘেরপড়াই জন্ম গ্রহণ করে, যুরোপীয়গণ সেরূপে জন্মে না। কোন অল্পবয়সী লোকসমিবেশিত দেশে এক একরকম অদ্ভুত বৃক্ষে খেত ডিখ ফলিয়া থাকে। সেই ডিখ হইতে 'তা' দিয়া "সাহেব" শিশুমিগকে বাহির করা হয়। একবার সীতারামের সম্মুখে যখন "সাহেবদে"র উৎপত্তিসম্বন্ধে ঐরূপ গল্প হইতেছিল তখন তথায়, এক বৃক্ষ উপস্থিত ছিলেন। বৃক্ষ কিছু দিম আশায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "একথা সম্পূর্ণ সত্য, আশায় আমি ইহার প্রমাণ স্বয়ং দেখিয়াছি, তথায় এক 'সাহেব' ছিলেন। তিনি প্রত্যহ এক পরীত সহিত বেড়াইতেন। সে পরীত কান্তি মুদ্রফেনসজ্জ।

তাহার স্নান পালক ছিল। পাছে মে উড়িরা গলায়ন করে, এই জন্ত 'মাহেব' তাহার
জুড়ে হাত দিয়া তাহাকে ধরিয়া রাখিতেন।" মীতারাম পরে আশায় এই ইংরেজ
মহিলাকে দেখিয়াছিলেন। তিনি শিশুপুচ্ছবিনির্মিত অঙ্গাবরণ পরিধান করিতেন।
"মাহেবদের" মধ্যস্থ এইরূপ অনেক অজৌকিক গল্প শুনিয়া মীতারামের মন কোম্পানী
বাহাদুরের চাকরী করিবার জন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে।

অন্যর অনিচ্ছা, পণ্ডিতজীর নিষেধ প্রভৃতি সত্ত্বেও মীতারাম কোম্পানীর সিপাহী
হইবার জন্ত মাতুলের সহিত আশা যাত্রা করাই স্থির করিলেন।
আশাযাত্রা।

মীতারামের বয়স তখন সপ্তদশবর্ষমাত্র। যাইবার জন্ত পণ্ডিতজী
শুভদিন শুভলগ্ন দেখিয়া দিলেন, পিতা একটি টাটু ঘোড়া দিলেন, আর স্নেহিনী অননী
অশ্রুপূর্ণ নয়নে পুত্রের মঙ্গলকামনায় কত কথাই বলিয়া দিলেন। মীতারাম সিপাহী হইবার
জন্ত আশায় রওনা হইলেন।

এই সময়ে ভারতের সর্বত্রই ঠগী নামক দস্যুদলের অত্যন্ত উৎপাত ছিল। মাতুলের
সহিত আশায় যাইবার সময় মীতারাম পথে ঠগীদিগের হস্তে পতিত
ঠগী হস্তে।

হইয়াছিলেন। আশায় যাত্রাকালে, মীতারামের মাতুল পথে আর
দুই জন অবকাশপ্রাপ্ত সিপাহিকে সঙ্গে করিয়া লইয়াছিলেন। উহার মধ্যে একজন সিপাহি
তাহার ছোট ভাইকে পণ্টনে ভর্তি করিবার জন্ত আশায় লইয়া যাইতেছিলেন। একদিন
একদল বাদক পথে তাহাদের সহিত আসিয়া মিলিত হইল। তাহারা আসিয়া সিপাহি-
দিগকে বলিল যে, ঐ অঞ্চলে ঠগীর অত্যন্ত প্রচুর্ভাব; সেই জন্ত ভয়ে তাহারা সিপাহিদিগের
সঙ্গে লইতে আসিয়াছে। এক রাজিতে ঐ দলের কোন কার্য দেখিয়া মীতারামের মাতুলের
মনে সন্দেহের উদয় হয়। সেরাজিতে সকলে সতর্ক ছিলেন; পরদিন প্রাতে তাহারা ঐ বাদক-
দলকে বিদায় করিয়া দেন। ইহার কিছুদিন পরেই একদল মজুর আসিয়া এই সিপাহিদলের
সহিত মিলিত হয়। উহারা সংখ্যায় বারজন ছিল। তাহাদিগের নিকট বাঁশী প্রস্তুত করিবার
অনেক মল ছিল। প্রাতে মীতারাম বলিল,—এই কুলিদলের একটা লোকের সহিত সেই
পায়কদলের একটা লোকের বিলক্ষণ আকৃতিগত সৌসাদৃশ্য আছে। এই নবাগত দলস্থ
লোকের ডানা স্তম্ভ; ইহারা কুলি; সেই জন্ত কেহ বালকের কথা বিশ্বাস করিল না। যাহা
হউক সিপাহিরা একটু সতর্ক হইলেন, নিশীথে অকস্মাৎ একটা অশ্রুট শব্দে মীতারামের নিজা-
ভ্রম হইল, সে চীৎকার করিয়া উঠিল। চিৎকারে তাহার মাতুল জাগিয়া তরবারের আঘাতে
একজন কুলিকে দিগন্তিত করিয়া ফেলিলেন। অবশিষ্ট কুলিগুলি মল ফেলিয়া গলাইল।
মুহূর্ত্তমধ্যে এই ব্যাপার ঘটিল। কিন্তু তখন দেখা গেল যে, যে সিপাহিরা সককে তাহার
জাতা পণ্টনে ভর্তি করিবার জন্ত লইয়া যাইতেছিলেন তাহার গলদেশে রেশমের রজ্জুর
কাঁস লাগান রহিয়াছে,—প্রাণ দেহপিঞ্জর ছাড়িয়াছে এবং তাহার জাতা অচেতন অবস্থায়
পতিত রহিয়াছেন; মীতারামের মাতুলের স্বর্ণনির্মিত মালা অস্ত্রহিত হইয়াছে। নিকটেই
গঙ্গা; পরদিন সকলে শোকার্ত হৃদয়ে সেই উমেদার বালকের অস্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাহিত
করিয়া গঙ্গাব্য পথে অশ্রুপূর্ণ হইলেন। যথাসময়ে মীতারাম আশায় পৌঁছিলেন।

গীতারামের মাতুল এথমে তাঁহাকে এডুটেটের নিকট ও পরে ডাক্তার "সাহেবের" নিকট লইয়া যায়েন। ডাক্তার "সাহেবের" বাসায় যাইয়া গীতারাম সেনাপদে। দেখিলেন, ডাক্তারের ছইটি খেতাব শিশুক আয়া ডিম অভূতি খাওয়াইতেছে। দেখিয়া তাঁহার চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাঁহার পণ্ডিতজী বলিয়া- ছিলেন, খেতাবের চাকুরী করিলে তাহার জাতি রক্ষা করা কঠিন হইবে। জাতিনাশের ভয়ে সে অশ্রমনক হইয়া পড়িল। ডাক্তার "সাহেব" সেই সময় তাহার বক্ষস্থল পরীক্ষার্থ তাহাকে গাজবস্ত্র খুলিতে বলিয়াছিলেন। অশ্রমনকতাহেতু সে তাহা অনিতে পায় নাই। ছেলেরা অমনি বলিয়া উঠিল "ওনুতে পাচ্ছিমনে, গাধা, স্মার, পের্টা?" ডাক্তার সাহেবও বিরক্ত হইয়া তাহাকে "অপ্রজী" বলিলেন। তাহা শুনিয়া সেই ছইটি ছর্বি- নীত খেতাব শিশু বলিয়া উঠিল,— "নাবা ওটার গা কি লোমে ঢাকা?"

গীতারাম তাঁহার চিত্র আকাঙ্ক্ষিত সিপাহিপদে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু তখনও তাঁহার সেই গ্রাম্য সরলতা তাঁহাকে পারিত্যাগ করে নাই। তখনকার সিপাহি।

সিপাহিরা পণ্টনে ভর্তি হইলে "ড্রিল হাউজদার"কে ১৬ টাকা করিয়া প্রদান করিত। দলের যুরোপীয় সার্জেন্ট সেই টাকার কিয়দংশ পাইত। গীতা- রাম সেই টাকা প্রদান করেন নাই। সেই জন্ত তাহার তাঁহাকে দেখিতে পারিত না। তিনি ইহাতে বিস্মিত হইতেন। ঐ সময়ে প্রতি সেনাপদে এক জন করিয়া যুরোপীয় সার্জেন্ট থাকিতেন। ইহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ দেশীয় ভাষায় সুন্দর কথাবার্তা করিতে পারিতেন ও সিপাহিদিগের সহিত সদয় ব্যবহার করিতেন। আর কতকগুলি সার্জেন্ট সিপাহিদিগকে সহিত অসদ্যবহার করিতেন ও তাহাদিগকে খুঁগি মারিতেন। ইহাতে আর্য্যই নানা হাঙ্গামার উদ্ভব হইত। ঐ সময়ে সিপাহিরা তাহাদের দলের খেতাব কর্মচারী দিগের এক একটা নাম রাখিত। একজন সাহেবের খাড়া লম্বা পালোয়ান সাহেব।

ছিল বলিয়া পণ্টনের সিপাহিরা তাহাকে "উট সাহেব" বলিত। একজন খুব মদ্যবী মেজাজে চলিত বলিয়া তাহাকে সকলে "মদ্য সাহেব" বলিত। একজন সিপাহিদিগের সহিত অবাধে মিশিয়া তাহাদের সহিত কুস্তি করিত। সেই খেত পুরস্কাটি মৈথ্যে ৬ ফিট ০ ইঞ্চি ছিলেন। আকড়ার সকলেই তাঁহাকে সম্মান ও ভক্তি করিত এবং ভাল বাসিত। তাঁহাকে সিপাহিরা "পালোয়ান সাহেব" বলিত। ঐ সময় পণ্টনের খেতাব কর্মচারীরা সিপাহিদিগের সহিত অবাধে মিশিতেন, সিপাহিদিগের সহিত শিকারে যাই- তেন এবং সিপাহিদিগের চিত্ত-বিনোদের জন্ত নাচ দিতেন। গীতারাম লিখিয়াছেন "পাঞ্জি সাহেবদের পরামর্শে এখনকার 'সাহেবেরা' নাচ দেখে না। পাঞ্জি 'সাহেবেরা' বলেন, 'নাচ দেখে অশ্রয়'। ইহারাই 'সাহেব' দিগকে সিপাহিদিগের 'পর' করিয়া দিয়াছেন।" গীতারাম লিখিয়াছেন, "আমার কার্য্যকালের শেষকালে একজন সেনাধ্যক্ষ আমাকে বলিয়াছিলেন যে, সিপাহিদিগকে কি বলিতে হইবে তাহা তিনি জানেন না। আমি যখন ছোট ছিলাম, তখন সিপাহিদিগকে কি বলিতে হইবে, কি ভাবে তাহাদের সহিত কথা বার্তা বলিতে হইবে "সাহেবেরা" তাহা জানিতেন। এখন তাঁহারা মৃত্যু পরীক্ষা দিয়া

তাহাতে উজ্জীর্ণ হইলেন, সেই জন্ম কথা বলিতে পারেন না ।" সেকালের অশান্ত সিপাহির স্তায় সীতারামের অনেক "সাহেব" বন্ধু ছিল । তখন গোরা সেনা সিপাহিসেনার সহিত ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুত্ব করিত । ১৭ নং পদাতিক দল সীতারামের সেনাদলকে "ডাই" বলিত ; ১৬ নং লাঙ্গার দলের গোরারা প্রাণান্তেও সিপাহিদিগের চুল্লির নিকটে যাইত না ।

সীতারাম নেপাল যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন । সেনাপতি জিলেন্সি ও সেনাপতি অকটো-
নেপাল যুদ্ধে ।

লোঁনো এই যুদ্ধে সেনা পরিচালনা করেন । এই যুদ্ধে ৫৩ সংখ্যক পদাতিক দলের অনেক সেনা নিহত হয় এবং একটি দুর্গও শত্রু হস্তে পতিত হইয়াছিল । কিন্তু ইহাতে ইংরেজ সেনা ভয়োৎসাহ হয় নাই । তাহারা বার, বার, এই দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিল । এই যুদ্ধে "পালোয়ান সাহেবের" বন্ধুত্বে একটি তীর বিদ্ধ হয় । তিনি ইংলণ্ডে প্রেরিত হইলেন । সীতারাম 'পালোয়ান সাহেবের' জন্ম অত্যন্ত দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, "তাহার বিচ্ছেদ অসহ্য ।" এই যুদ্ধে নেপালীরা শেষে পরাজিত হইয়াছিল ; শত্রু পরাজিত হইলে ইংরেজরা আমুর তাপ্তাকে ইংরেজের উদারতা ।

অমেশে ফিট্রিয়া যাইতে দিয়াছিলেন । ইংরেজ জাতি বীরত্বের সম্মান করিয়া থাকেন । সীতারাম লিখিয়াছেন—"ইহা বড়ই বিষয়জনক । সাহসী লোকই ত জীতিজনক শত্রু । আমি ইংরেজদিগের চরিত্র বুঝিতে অক্ষম । আমি স্বয়ং তাহাদিগকে আহত শত্রুর জীবন রক্ষা করিতে দেখিয়াছি । একজন ইংরেজ সেনাপতি জন্মক আহত শত্রুর জীবন রক্ষা করেন । কিন্তু তিনি যেমন পশ্চাৎ ফিট্রিলেন, অমমই সেই আহত শত্রু তাহার গলদেশে গুলি করিল । আর একজন 'সাহেব' একজন আহত আফগানকে জল দিতে গিয়াছিলেন, সেই সময় সে তরবারের আঘাতে 'সাহেবের' পা কাটিয়া দিয়াছিল" । সীতারাম লিখিয়াছেন,—"ইংরেজ সেনা গোরা সেনা ।

পরাজয়কে গ্রাহ্য করেন না ; সেই জন্মই তাহারা অজয় । নেপাল যুদ্ধে এক দল ইংরেজ সেনার অনেক লোক ক্ষয় হইলে তাহারা হটিয়া আসিল ; কিন্তু আবার তাহারা প্রচণ্ড বিক্রমে শত্রু-সেনার উপর গিয়া পড়িল । পাঁচ বার এইরূপ হয় ; কিন্তু তাহাদের প্রথম আক্রমণ যেমন জীঘণ পঞ্চম আক্রমণও তরূপ । সেনাপতি নিহত হইলে তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে না । এক লোটা মদের জন্ম ইহারা দশটা যুদ্ধ করিতে পারে । ইহারা লুণ্ঠন করে বটে, কিন্তু এক বোতল জ্যাতির জন্ম ইহারা এক টুপি ভর্তি করিয়া টাকা দিয়াছে, ইহা আমি নিজে দেখিয়াছি ।"

সীতারাম পিণ্ডারী যুদ্ধেও উপস্থিত ছিলেন । এই যুদ্ধে আহত হইয়া তিনি জঙ্গলের মধ্যে ছায়াইয়া যান । নিকটে একটি বালিকা মহিষ চরাইতে-
পিণ্ডারী যুদ্ধে ।
ছিল । সে নিকটবর্তী কুপ হইতে জল আনিয়া তাহার মুখে দেয় ও তাহাকে আপনার কুটীরে লইয়া যায় । তাহাকে সেখানে কয়দিন রাখিয়া তাহার আত্মীয় স্বজনগণ তাহাকে এক বৈরাগীর নিকট রাখিয়া আসে । বৈরাগী তাহার চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করে । এই সময় পিণ্ডারীরা ছত্রভঙ্গ হইয়া এদিকে আসে । বৈরাগী তাহাকে সেই

সময় এক দুর্গকময় গোরের মধ্যে লুকাইয়া রাখে। তাহার পর কোম্পানীর সেনা সে মিকে আসিলে গীতারাম ইংরেজ সেনানিবাসে প্রেরিত হইয়াছিলেন।

এই যুদ্ধে গীতারামের আত্মা অত্যন্ত ভয় হইয়া পড়ে। তিনি অবকাশ লইয়া গৃহে গমন করেন। সেই সময় তাঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বে তাঁহার আত্মীয়গণ বিবাহ ও বিপদ।

তাঁহার বিবাহ দেন। গীতারাম “শশীকলা গম” কোম্পানী রমণীর পাণিগ্রহণ করিবেন—ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু যাহার সহিত তাঁহার বিবাহ হইল তাহার মুখগুণ বসন্তের লাজনে লালিত। গীতারাম শ্রিয়তমার মূলচক্ষে শশীকলার শোভার পরিবর্তে শশলাজনের আধিক্য দর্শনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন এবং অনিলক্ষে গৃহত্যাগ করিয়া নাগপুরে সেনাদলে আসিয়া যোগ দিলেন। এইবার আসিয়াই তাঁহার এক বিপদ ঘটিল। একটি দুর্গ দখল করিতে যাইয়া তিনি ভূপ্রাণ্ডিত বারুদের ক্ষুরে উৎক্লিষ্ট মৃত্তিকা মধ্যে প্রাণত্যাগ হইয়া যান। দুইজন গোরা তাঁহাকে অচৈতন্য অবস্থায় টানিয়া বাহির করে এবং “রাম” মদ্য পান করাইয়া তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করে। এই সময় তাঁহার মাতুল কোথায় উড়িয়া গিয়াছিলেন, তাহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। ইহার পর গীতারাম চিকিৎসার্থ হামপাতালে প্রেরিত হইলেন।

হামপাতাল হইতে ফিরিয়া আসিয়া গীতারাম এক নূতন সেনাদলে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন।

অনতিদিনেই তিনি এই সেনাদলের বেতন দাতা হাবিলদারের পদে পদচ্যুতি।

উন্নীত হইয়াছিলেন। তাঁহার হস্তে তখন সিপাহিদের বেতন দিবার ভার ছিল। সিপাহিরা তখন মাসে মাসে বেতন লইত না,—উহা হাবিলদারের নিকট গচ্ছিত রাখিত, শেষে দুটি পাইলে গৃহে যাইবার সময় উহা লইয়া দাইত। হাবিলদারগণ এ টাকা সেনা বিভাগের ইংরেজ কর্মচারীগণকে কর্জ দিত। গীতারাম সে সেনাদলে ছিলেন, সেই সেনাদলের অধীনক কর্মচারীর নৌকা ভাঙিয়া হইয়াছিল, সেই জন্য তিনি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন। তিনি গীতারামের নিকট হইতে সেই জন্য নিম্নর টাকা কর্জ লইয়াছিলেন। শেষে যখন সিপাহিদের দুটির সময় আসিল, তখন সেই সেনাদলের কাপ্তেন ও গীতারাম বহুচেষ্টা করিয়াও পাঁচশত টাকা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইলেন না। ১৩৭ টাকা অকুলান বহিয়া গেল। তদ্বিষয় তৎক্ষণাতঃ অভিযোগে গীতারাম সামরিক আদালতে দণ্ডিত হইলেন। তাঁহার এই পদ গেল। গীতারাম বলিলেন “যে কাম সকলেই করে, সকলেই বাহা জানে, তাহার জন্য আমার চাকরী গেল, সবকারের চমৎকার ব্যবস্থা।”

ইহার কিস্কদিন পরে মাহ সুলতানকে আফগান রাজ্যের সিংহাসনে অভিষিক্ত করিবার

অন্ত ইংরাজ আফগান রাজ্য সেনা প্রেরণ করেন। এই সেনাদলে আফগান যুদ্ধে।

হাবিলদার পদ পাইয়া গীতারাম আফগান রাজ্যে গমন করিয়া- ছিলেন। তথায় তিনি আহত ও শত্রুহস্তে পলী হইয়াছিলেন। শত্রুরা তাঁহাকে কানুলের বাধ্যনে কৃতদাগকপে বিক্রীত করেন। অনেক গোরাও তথায় বিক্রয়ার্থ মীত হয়। একজন ধনাঢ্য আফগান তাঁহাকে ২৪০ টাকা মূল্যে ক্রয় করেন। গীতারাম অনিলক্ষে পার্শ্ব-

তথায় শিখিয়া লইলেন। এদিকে ঐ অঞ্চলে ইংরেজ সেনা প্রেরিত হইল। তাহারা আফগানদিগকে পরাজিত করিয়া ফিরিয়া আসিল; কিন্তু কেহই গীতারামের সন্ধান পাইল না বা তাঁহাকে উদ্ধার করিল না। শেষে গীতারাম একজন আফগানকে পাঁচ শত টাকা পুরস্কার দিতে প্রতিক্ষিত হইয়া তাহার সহিত পলায়ন করিলেন। বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তিনি ইংরেজ শিবিরে উপনীত হইলেন। তথায় একজন সুবাদার তাঁহাকে চিনিতে পারিল। তখন সুবাদার ও ডেপুটী কমিশনার উভয়ে পাঁচশত টাকা দিয়া তাঁহার উদ্ধারসাধন করিলেন।

গীতারাম তাঁহার জীবন-কাহিনীতে আফগানদিগের বিশ্বাসঘাতকতার কথা, আফগান রমণীদিগের ঘোর চরিত্রহীনতার কথা ও আফগান যুদ্ধে ইংরেজ-আফগান চরিত্র।
দিগের বিপত্তির কথা বিশদ ভাবে লিখিয়াছেন।

গীতারামের বৈচিত্র্যময় জীবনের সকল কথা বলিবার স্থান আমাদের নাই। পর্য্যাপ্ত বৎসর কাল গণ্টমের কার্য্য করিবার পর তিনি জমাদারের পদে উন্নীত নানা কথা।
হইয়াছিলেন; তাঁহার শৈশবের স্বপ্ন সত্যে পরিণত হইয়াছিল।
কিন্তু তাঁহার অর্থাগম হয় নাই। সেনাবিভাগে কার্য্য করার চিরস্থায়ীতা তাঁহার সঙ্গে সাতটি অঙ্গলেশ ও চারিটি মেডেল ছিল। জমাদার হইয়া তিনি মুলতান অবরোধে ও চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। তাহার পর সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত পূর্বে তিনি ছুটি লইয়া দেশে গায়েন। সেই সময় অনেক সিপাহী অযোধ্যা অঞ্চলে গমন করিয়া লোকদিগকে উত্তেজিত করিতে থাকে। গীতারাম তাহাদিগকে ঐরূপ কার্য্য করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন বলিয়া তাহারা তাঁহার মুখে গলিত গীমা ঢালিয়া দিয়া হত্যা করিবার জন্য একখানি গাড়িতে তাঁহাকে লক্ষ্যে অভিযুগে লইয়া আসিতে থাকে। পথে একদল ইংরেজসেনা তাঁহাকে উদ্ধার করে।

এইবার গীতারামের জীবনে অত্যন্ত শোকাবহ ঘটনা ঘটিয়াছিল। লক্ষ্যে সহস্রের সান্নিধ্যে একটি গৃহে কতকগুলি বিদ্রোহী সিপাহী প্রভৃতি গড়া পড়ে। উহা-পূজাহত্যা।
দিগকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিবার আদেশ হয়। গীতারামের উপর ঐ গুলি চালান কার্য্যের নেতৃত্ব গ্রস্ত হয়। গুলি করিবার পূর্বে গীতারাম যুদ্ধাদেবে দণ্ডিত সিপাহীদিগের নাম, ধাম, রেজিমেন্ট প্রভৃতি লিখিয়া লইতেছিলেন এমন সময় সেই সময়ে তিনি তাঁহার নিকটস্থ পুত্রকে দেখিতে পাইলেন। বৃদ্ধ গীতারামের মস্তক ঘুরিয়া গেল, হৃদয় যেন স্পন্দন-রহিত হইল। তিনি সেনাধ্যক্ষকে বলিয়া ঐ কার্য্যভার অপরকে দিলেন এবং মস্তক গমনে শিবিরে আসিয়া সেই ভীষণ বন্দুকের শব্দ শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন। অল্পক্ষণ পরেই সেই শব্দ প্রত্যুত হইল। গীতারামের সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। বাহা হউক, তিনি তাঁহার পুত্রের সংকার করিবার অক্ষমতা পাইয়াছিলেন। অথ সকল বন্দীর মৃত দেহ শিবা শকুনির উদ্ভা হইয়াছিল।

ইহার ৪৮ বৎসর ঢাকারী করিয়া গীতারাম পেন্সন লইয়াছিলেন।

আমেরিকায় হিন্দুধর্ম ।

ধর্মমত বিষয়ে এমিয়ার গৌরব অল্প মকল ভূগণ্ডের গৌরব অপেক্ষা অধিক । এমিয়ার বিবিধ ধর্মমত উৎপন্ন হইয়াছে । বৈদিক (হিন্দু) ধর্ম, মহম্মদীয় ধর্ম, খৃষ্ট ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম—এমিয়ার উৎপন্ন হইয়া অগতের মর্মান শাস্তির ও মাস্তনান উৎস উৎসারিত করিয়াছে । আবার এমিয়ার মধ্যে ধর্মমত বিষয়ে ভারতবর্ষের গৌরব সর্বাপেক্ষা অধিক । এই ভারতবর্ষে বৈদিক ধর্ম বিস্তৃতমহাশাখ বৃহৎ বন্যপাতিম মত মানবসমাজকে আবাসিত ছায়াবানে প্রদা করিয়াছে । ইহারই, সিন্ধু ভাষায় উৎপন্ন ও বর্ধিত হইয়া বৌদ্ধধর্মমত হিমালয়ের অজাভেদী বিরাট বপু ও বারিষির তরঙ্গভঙ্গ অতিক্রম করিয়া তিব্বতে, চীনে, জাপানে ও কোরিয়ার ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে—শিল্প ও সাহিত্য বিষয়েও ভারতের প্রভাব বিস্তার করিয়া যে আশর্ষের সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা বহু শতাব্দীর রাজনৈতিক বিধব ও সামাজিক পরিবর্তন অবাধে উপেক্ষা করিয়া আজও বিদ্যমান রহিয়াছে । ইহারই আবাসিত ভাষায় অত্যাচারভাঙিত পারম্পরিক ধর্মমত আশ্রয়লাভ করিয়া আশ্রয়লাভ করিতে পারিয়াছিল । ইহারই উদার, আশর্ষে বিজয়-পার্বীকৃত মহম্মদীয় ধর্ম শাস্ত্রসমূহের মধ্য হইয়াছিল । ইহারই আশ্রয়ে মতমত খৃষ্ট ধর্ম আধিকার-সংরক্ষণে সমর্থ হইয়াছিল । ইহারই আদিশ্রম পণ্যমত পক্ষে বৈদিক ও মহম্মদীয় ধর্মমতসমূহের সংমিশ্রণে শিল্প ধর্মমত অগ্রগত করিয়া ভারতের ইতিহাসে এক নূতন শক্তির লীলা প্রকট করিয়াছিল ।

ধর্মই ভারতের গৌরব—ধর্মই তাহার প্রাণাশ্ব । ভারত ধর্মপ্রাণ । যে রোমের প্রবল প্রভাপে পৃথিবী কম্পিত হইত, সুদূর ভারতেও যাহার মৈনিকপদভার অমুভূত হইয়াছিল সে রোম আজ মৃত ; রাজপথে, দুর্গে, প্রাসাদে তাহার মস্ত্যভার শেখ চিহ্ন নরুমান । যে গ্রীসের বিজয়-লাভসা ভারতবর্ষকেও আশ্রয়লাভ করিতে উদ্যত হইয়াছিল—সে গ্রীস আজ মৃত ; শিল্প ও সাহিত্যে তাহার মস্ত্যভার ধ্বংসাবশেষমাত্র বিদ্যমান । যে মিশরের নূতন মস্ত্যভার সৃষ্টি করিয়া বাণিজ্যের বিজয় বৈজয়লী উভয় করিয়াছিল, সে মিশর আজ মৃত ; বিরাট পামাণ-ধূপে তাহার বিগত সমুদ্রের মাধ্যমাত্র রহিয়াছে । কিন্তু ভারতবর্ষ বহুশতাব্দীর বিজয় বাতায় পর্য্যাপ্ত হইয়াও জীবিত আছে ; তাহার আধ্যাত্মিকতাই তাহার এই অসাধারণ শক্তির কারণ ও কারণ । কিছুকাল অগতে অড়বাদের সমাদর ও আধ্যাত্মিকতার অমাদর ঘটয়াছিল । এখন ভারতের প্রাচীন ধর্মমতের প্রতি সৌকর্য্য দৃষ্টি পড়ে নাই । এখন সেই ভাঙ্গ মত বিবাকর-কিরণ-বিকাশে কৃষ্ণকটিকার মত অগম্য হইতেছে । তাই ভারতীয় ধর্মমত আবার সমাদৃত হইতেছে ; ভারতবর্ষ আবার অগতে যত্নের আগন অধিকার করিতেছে । আমেরিকায় বৈদিক ধর্মের প্রচার ইহাই সূচিত করিতেছে । ইহার মধ্যেই সাময়্যন্যমিকায় হিন্দুধর্মের সংস্থাপিত হইয়াছে । সংপ্রতি আমেরিকায় 'ইডান পোষ্ট' পত্র সেই মন্দিরের ও মন্দিরাধিকারীমণ্ডলের যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে সিন্ধে তাহার সার সংগৃহীত হইল :—

যে দর্শন শাস্ত্রাঙ্গগঠে সর্বাপেক্ষা পুরাতন, আমেরিকায় তাহাই নূতন । মস্ত্যভার আশ্রয় কাগে গজার ও সিন্ধুর প্রবাহপূত ভারতে যে তত্ত্বকথা আলোচিত ও আমেরিকায় হিন্দু মত । লিপিবদ্ধ হইয়াছিল—আমেরিকায় আজ তাহাই প্রচারিত হইতেছে ।

প্রাচ্য হইতে ধর্মের জ্যোতি প্রতীচ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এখন কালবশে আবার প্রাচ্য হইতে ধর্মালোক প্রতীচ্যে প্রতিকলিত হইতেছে।

প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ বৈদিক তত্ত্বকথা প্রচারের জন্ত আমেরিকায় সানফ্রানসিস্কো নগরে হিন্দু মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বলিকাতার বেলুড-হিন্দু মন্দির।

মঠের নামকরা প্রচার মণ্ডলীর চেষ্ঠায় এই মন্দির ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের এই এপ্রিল তারিখে প্রতিষ্ঠিত হয়। মন্দিরের স্থপতিকায়া বিভিন্ন ধর্মালয়ের বিশেষত্বব্যাঞ্জক। প্রবেশ পথের ছাতে মহাশয়ল পদ্যের প্রতিকৃতি। এই মহাশয়ল পদ্য মন্দিরের স্বরূপ—মনঃসংযোগে ও ধ্যানের ইহার বিকাশ। মন্দিরের উপর আমেরিকার জাতীয় চিহ্ন ঈগল পক্ষ বিস্তার করিয়া যেন অভয় দান করিতেছে। হিন্দুদিগের নিকট সকল কার্যেরই শুণ্ড উদ্দেশ্য বর্তমান—সকল বস্ততেই ভগবানের বিকাশ। হিন্দুদিগের নিকট ঈগল (গরুড়) অসীম শক্তি, অবিচলিত ভক্তি ও জ্ঞাত উন্নতি—এই তিনের চিহ্ন। মন্দিরের প্রতি স্তম্ভে কোন না কোন নিদর্শন সপ্রকাশ। মন্দিরের অলঙ্কার রূপে কলিত সূর্য্য, চন্দ্র, ত্রিশূল প্রভৃতি এক একটি ভাবের অভিব্যক্তি। মন্দিরটি ত্রিতল। নিম্নতলে শিক্ষাগার—এই সকল কক্ষে শিক্ষা প্রদান ও বক্তৃতা হয়। মধ্যতলে ছাত্রাবাস। সর্ব্বোচ্চে বিহার। দুইজন “স্বামী” মন্দিরে বাস করিয়া শিক্ষাদান করেন।

স্বামীদিগের শিষ্যগণ সকলেই আমেরিকান। ইহারা যে যাহার অবলম্বিত কায়া করিয়া উপার্জিত অর্থ বৈদান্তিক ধর্মের প্রচারকল্পে ব্যয় করেন। পর-শিষ্য।

ধর্মাবলম্বীকে স্বীয়ধর্মাবলম্বী করিবার চেষ্ঠা হিন্দুর স্বভাববিরুদ্ধ। ইহারা কেবল ধর্মপ্রচার করেন। যাহার ইচ্ছা—এ ধর্মগত গ্রহণ করিতে পারে। মঠে কয়জন মহিলাও বাস করেন। ইহাদিগের বাসস্থান স্বতন্ত্র। ইহারাও যে যাহার কার্য্য করিয়া থাকেন। ইহাদিগের জীবনযাপনপ্রণালী জাড়ম্বরবর্জিত—স্বতন্ত্রাৎ অত্যন্ত স্বাভাবিক। জীবনামে বীত-ম্পৃহা হেতু ইহারা ফলমূলহারী। শিষ্যদিগের মধ্যে একজন পূর্ব্ব মুক্তার ছিলেন—বর্তমানে তিনি মঠের সমস্ত মুক্তন কার্য্য করিয়া থাকেন।

মঠে প্রবেশ করিলে প্রথমেই মঠাধিকারী স্বামী ত্রিগুণাতীতের সহিত সাক্ষাৎ হয়। তিনি আগন্তকের সহিত করমর্দন করেন না। তিনি বলেন সখ্যীতি হৃদয়ে। মঠে। করমর্দন আধ্যাত্মিক সম্ভাষণ নহে।—ইহাতে পারে না। তাঁহার পাঠাগারে বহু-পুস্তক-সম্বিজত কক্ষটি শোভন ভাবে সম্বিজত। এয়ারসন, সোপেনহিউর, ম্যাক্সমুলার প্রভৃতির রচনার সহিত তাঁহার পরিচয় ঘনিষ্ঠ। তিনি কথা কহিতে কহিতে, কোন বিষয়ের আলোচনা করিতে করিতে তাঁহাদিগের গ্রন্থ বাহির করিয়া আপনার বক্তব্য বিষয় বুঝাইয়া দেন।

বেদান্ত সম্বন্ধে আলোচনাকালে স্বামী ত্রিগুণাতীত বলেন, ইহা কোন দর্শন বা সংহিতামাত্র নহে; পরন্তু সর্ব্বদর্শনসার—সর্ব্ববিজ্ঞানসার। ইহা কাহারও রচনা নহে। বেদান্ত।

পরন্তু নিত্যবস্তু—অনাদি—অনন্ত। মানুষ এই বিশাল বিষে আপনার স্থান নির্ণয়ে ব্যাকুল।—বেদান্ত সে স্থানের নির্ণয় করিয়া দেয়। যে সত্যসত্যই বেদান্তবাদী সে জগতে সকল বস্ততেই ভগবানকে দর্শন করে। সূর্য্য, ঘৃণা, লোভ আর তাহার হৃদয় স্পর্শ করিয়া কলুষিত করিতে পারে না। জগতে সকল ধর্মপ্রচারকই এই মঠের প্রচারক।

খামী ত্রিগুণাতীত বসেন, বাসনাবহি প্রতীঃ সমাজের সর্বনাশ করিতেছে। প্রতীচ্য
দরিদ্র মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্নের, মদ্যনিও ধনী ও ধনী অতিদমীর অনগ্র
বাসনা-বহি ।

পাইতে প্রায়সী—ব্যাকুল । এই বাসনাবহিতে তাহাদের মনুষ্যত্ব,
আধ্যাত্মিক জীবন ধ্বংস হইয়া যায় । ইহাতে দেহ ও মন উভয়ই ব্যাধিগ্রস্ত হয় । প্রকৃত
সভ্যতার মানুষ এই বাসনা-বাহুর দমনযোগ্য হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া আধ্যাত্মিক জীবনের
উন্নতি সংসাধন করিয়া চরম ও পরম গতি লাভ করে ।

এ অবস্থার প্রতীকারের উপায় কি ? খামীর মতে পথ প্রশস্ত । বাসনা-বাহিতে ইক্ষন দানেই
তাহার শতশিখা প্রবল হইয়া উঠে । বাসনার নিবৃত্তিতেই শান্তিলাভ
প্রতীকার ।

করা যায় । প্রতীচ্যে অনেকে পান, ভোজন ও বেশভূষা জীবনের চরম
উদ্দেশ্য মনে করে । তাহারা জ্ঞাত । তাহাদের জাতির অপনোদন আবশ্যক । জীবনে সরলতাই
চরম আদর্শ করিতে ইহনে । বিলাসবর্জিত জীবন গাপন করাই মনুষ্যের উদ্দেশ্য হওয়া
আবশ্যক । এতদপ আদর্শের অনুসরণের অর্থ গৃহস্থালয় ত্যাগ করিয়া বনবাস অনানন্ডক । আশ্র-
সংঘমেই এই উদ্দেশ্য সাধিত হয় । খৃষ্টধর্ম্মযাজকগণ প্রতীচ্যের বিলাসবর্জিত জীবনের আদর্শ
লইয়া প্রাচ্যে খৃষ্টের ধর্ম্মকথা প্রচার করিতে গমন করেন । তাহারা বুঝেন না যে, খৃষ্ট শ্রম
প্রাচ্যদেশমন্তুত, অনাড়ম্বর—সরল জীবনে অভ্যস্ত । প্রাচ্যধর্ম্মীরা তাহার সেই আদর্শ জীবনের
প্রতি প্রজ্ঞা প্রকাশ করিয়া থাকে । অগতে যুগে যুগে অধর্ম্মের ধ্বংস ও ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করে যে
সকল বেদান্তবাদী শিককের আবির্ভাব হইয়াছে, খৃষ্ট তাহাদের এক জন । হিন্দুধর্ম্ম সমুদ্রের
মত উদার । তাহার বিশাল বক্ষে সত্যমাজেরই স্থান আছে । যে যে উপায়েই মোক্ষ
লাভের চেষ্টা করুক না কেন—লক্ষ্য একই । 'প্রীত্য' জীবন ফলিয়াছেন :

“যে যথা মাতঃ প্রপদ্যন্তে তাঃ শুভৈব ভজ্যমাণম্ ।

মম বর্গীহুযর্ভন্তে মনুষ্যাঃ পার্শ্ব মধ্বনঃ ॥”

এই উদারতাই হিন্দুধর্ম্মের বিশেষত্ব । এই উদারতাহেতুই হিন্দুধর্ম্ম পরিবর্তনশীলনে ভাসিয়া
যায় নাহি, কালবক্ষে অঙ্গর জ্যোতি বিকাশ করিয়া আছে । যদি এই উদারতা অঙ্গুর রাশিয়া
আবার সত্যধর্ম্ম দেশে দেশে প্রচারিত হয় তবে তাহান গিফ জামায় নিবাদকোলাহল তুলিয়া
আবার মানবকুল শান্তি ভোগ করিতে পাইবে । আমেরিকার এই ধর্ম্মের আদর্শ কি সেইদিন
সুচিত করিতেছে না ?

খণ্ডগিরি।

—ঃঃ—

খণ্ডগিরির সহিত আমার প্রথম পরিচয় বঙ্গিমচন্দ্রের রচনায়। ‘সীতারামে’ খণ্ডগিরির সেই বর্ণনা আমার তরুণ হৃদয়ে অতীত-গৌরব-শ্রুতি-সমুজ্জ্বল একখানি মনোরম চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিল। তখন যাহা শ্রবণ ছিল এতদিনে তাহা বাস্তবে পরিণত হইল। পাঁচ মাইল পথ গোয়ানে অতিক্রম করিয়া দিবাবসানের কিছু পূর্বে খণ্ডগিরিতে আরোহণ করিলাম। ত্রয়োবিংশ শতাব্দী পূর্বে মানুষ কি ও বল ধর্ম-বিশ্বাসের উত্তেজনায় পাষণ কাটিয়া গুহা গঠিত করিয়াছিল! তাহারা কি অসাধারণ উৎসাহে ও উত্তমে আরব্ধ কার্য সম্পন্ন করিয়াছিল! কি অস্ত্রে,—কি কলাকৌশলে তাহারা পাষণবক্ষে আপনাদের মনোভাব স্থায়িক্রমে অঙ্কিত করিয়াছিল! প্রস্তরগঠিত সোপানের ভগ্নাবশেষের উপর দিয়া উঠিবার সময় এই সকল কথাই মনে হইতেছিল। আর মনে হইতেছিল, হয়ত এমনই এক দিনান্তে কলিঙ্গাধিপতি—প্রবলপরাক্রম খারবেল কোন মুণ্ডিতশীর্ষ বৌদ্ধ ভিক্ষুর নিকট অবনতমস্তকে মানবজীবনের নশ্বরত্ব স্বীকার করিয়া নির্বাণলাভকামনায় এই গুহামন্দিরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কে সেই বৌদ্ধ ভিক্ষু যিনি ধর্মের প্রভাবে স্পর্ধিতরাজগর্বে বিনয়াবনত করিয়াছিলেন? ত্রয়োবিংশ শতাব্দী পূর্বে তিনি নির্বাণ লাভ করিয়াছেন; তিনি আজ বিস্মৃত। হস্তীশৃঙ্খার পাষণপৃষ্ঠে ক্ষোদিত—বিশ্বতির অক্ষকারে সমাচ্ছন্নপ্রায় যুগের লিপির দুই চারিটি অক্ষর যদি দাখিত না থাকিত বা কালবশে মুছিয়া যাইত তাহা হইলে নৃপতি খারবেলের নামও কেহ জানিতে পারিত না। ত্রয়োবিংশশতাব্দীপূর্ববর্তীদিগের কীর্তির সহিত আজ আমার পরিচয়। আমার মনে হইতে লাগিল, যেন আমি আর কর্মকোলাহলময় বিংশ শতাব্দীর মানব নহি; আমি ত্রয়োবিংশ শতাব্দীপূর্ববর্তীদিগের সহিত নিভৃতে অনন্ত সমাধির আয়োজন করিতেছি। গুহা হইতে গুহান্তরে চলিলাম; শুভ্র, ধার, কারুকার্য, মূর্তি—সব দেখিতে লাগিলাম। কিন্তু দেখিয়া মনে যে ভাবের উদয় হইল, তাহা প্রকাশের ভাষা নাই।

খণ্ডগিরি ক্ষুদ্র পর্বত। ইহার সাক্ষদেশ হইতে চূড়া ১২৩ ফিট মাত্র উচ্চ। পর্বতের এক অংশের নাম—খণ্ডগিরি। এই অংশে কয়টি প্রাচীন গুহা বিস্তারিত। সাধারণতঃ সমগ্র গিরিমালাকেই খণ্ডগিরি বলা হয়। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন অংশের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। উত্তরাংশের নাম—উদয়গিরি। এই উদয়গিরিতে উৎকীর্ণ লিপিবহুল বহু গুহা আবিষ্কৃত হইয়াছে। দক্ষিণাংশের নাম—ধ্বলগিরি

বা খউলী । এইস্থানে মৌর্য সম্রাট অশোকের অক্ষুশাসনের শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে । এককালে যে এইস্থানে বৌদ্ধপ্রভাব ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই ।

এই সকল গুহার কালনির্ণয় লইয়া বিশেষজ্ঞদিগের মধ্যে মতাস্থির আছে । কিন্তু কিছুই স্থির হয় নাই ।* বর্তমান প্রবন্ধে সে বিচারে প্রবৃত্ত হইব না । তবে খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে—অর্থাৎ সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে যে এই প্রদেশে বৌদ্ধ ধর্মের প্রবল বশ্য বহিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । এই সকল গুহার স্থাপত্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ; কেবল সাঁচী গুপের স্থাপত্যের সহিত ইহার কিছু সাদৃশ্য লক্ষিত হয় । যাহারা এই সকল গুহা রচিত করিয়াছিল তাহারা পূর্ব হইতেই প্রস্তর স্থাপত্য জানিত কি না এবং কিরূপে তাহারা সে বিজ্ঞা শিক্ষা করে তাহা জানিতে অতঃই কোতূহল জন্মে । কিন্তু কোতূহলভূমির উপায় নাই ।

যে শিল্পী গুহাখননোদ্দেশে সর্বপ্রথম কম্পিতকরে খনিজ ধারণ করিয়া প্রস্তর ছেদন করিয়াছিল, সে তখন আপনার শিল্পচাতুরী-বিকাশ-চেষ্টায় চেষ্টিত ছিল, কি ভিক্ষুদিগের আবাসগৃহ নির্মাণ করিয়া দ্ব্য হইবার বাসনায় সে কাণ্ডে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহা কে বলিবে ? ফাশ্ব'সন প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, ভারতে প্রস্তরস্থাপত্য আলেকজান্ডারের সহচরদিগের বা তাহার পরবর্তী গ্রীক-দিগের প্রদত্ত শিক্ষার ফল । কিন্তু মৃত মহাত্মাদিগের এই সকল মহীমসী কীর্তি দেখিলে সে মতে আস্থা স্থাপন করিতে প্রবৃত্তি হয় না । অক্ষুশীলনে ও পরিচালনে

* পরলোকগত রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র তদীয় উড়িষায় প্রবৃত্ত ব্রহ্মবৈষ্ণব বিরাট গ্রন্থে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ঐর নামক নৃপতি এই সকল গুহা খনন করাইয়াছিলেন । মিত্র মহাশয়ের মতে এই নৃপতির রাজত্বকাল খৃঃ পূঃ ৩১৬ হইতে ৪১৬র মধ্যে । রাজার প্রতি-শ্রুতী মিত্রার ফাশ্ব'সন পণ্ডিত ইন্ডাঙ্গীর ও অধ্যাপক বুলারের মতের উপর নির্ভর করিয়া বলিয়া-ছিলেন, ঐ নৃপতির নাম খারবেল এবং তাহার রাজত্বকাল খৃঃ পূঃ ১৪৬—১৪৭ । তিনি অসামান্যক অসংখ্য ভাষায় বলিয়াছেন, মিত্র মহাশয় পালীভাষায় অসম্ভিজ্ঞতা হেতু ভ্রমশ্রুত ভ্রান্ত অশু-বাস্তবের অনুকরণ করিয়া ও কল্পনার আশ্রয় লইয়া এই ভ্রম করিয়াছেন । (Archaeology in India) মিত্রার ডিক্শনারি, তদীয় প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে ফাশ্ব'সনের গৃহীতমতই অবলম্বন করিয়াছেন । তাহাই অসত্য বলিয়া পরিচয় লইয়াছেন । (Early History of India) গ্রন্থে একটি কথা বলিবার আছে । মিত্র মহাশয়ের মতে ঐর মগধাধিপত্য সন্দেহ পরাক্রান্ত করেন ; সুতরাং তিনি তাহার সমসাময়িক । তাহা হইলে ঐরের রাজত্বকাল খৃঃ পূঃ ৩২৫ হইতে ৩৪০ ইহারই মধ্যে । ঐরাঙ্গীর ও বুলারের মতে রাজা খারবেল শিলালিপিতে নামের সামান্যভেদমাত্র করিয়াছেন ; শিলালিপি মৌর্যাকের ১৬৫ সালে অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ১৫৭ বা ১৫৬ সালে উৎকীর্ণ হইয়াছিল ।

পূর্ণতাপ্রাপ্ত কলাকৌশল ও আপনাব ক্ষমতায় প্রত্যক্ষ বাতীত কেহ এরূপ কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। এবং রাজা রাজেন্দ্রলাল যাহা বলিয়াছেন, তাহাই সমীচীন বলিয়া মনে হয়। তিনি বলেন, ভারতীয় স্থাপত্য যত দিনেরই হউক না কেন ইহা যে স্বতঃ-অভিব্যক্ত, সম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্র তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। ইহার নিয়ম স্বতন্ত্র, প্রকার স্বতন্ত্র। এই সকল গৃহাদি যাহারা নির্মিত করিয়াছিল ও যাহাদের অন্ত্র নির্মিত করিয়াছিল এই স্থাপত্য তাহাদিগের বিশেষজ্ঞব্যঞ্জক। ইহার দোষ ও গুণ ইহার নিজস্ব—উভয়ই বিদেশীপ্রভাববর্জিত। স্থানভেদে ইহার রূপভেদ হইয়াছে বটে, কিন্তু মূল বস্তুর একত্ববিষয়ে সন্দেহ নাই।

রাজা রাজেন্দ্রলালের পুস্তক প্রকাশের তিন বৎসর পরে ফাণ্ডার্সন রাজাকে ও সঙ্গে সঙ্গে “নব্য যুগকে” গালি দিয়া পুনরায় প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন যে, ভারতীয় প্রস্তরস্থাপত্য অমুকরণমাত্র। কিন্তু বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় নেপাল তেরাইয়ে কপিলাবস্তুর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তথায় শাক্যসিংহের সমসাময়িক বা পূর্ববর্তী কালের সৌধাদির ভগ্নাবশেষ ইষ্টক ও প্রস্তর এখনও বহিয়াছে। রাজেন্দ্রলালের মতে খণ্ডগিরির গুহাগুলি অশোকের পূর্ববর্তী কালের। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে—ঋগ্বেদে, রামায়ণে, মহাভারতে সৌদের উল্লেখ আছে। কানিংহাম রাজগৃহে আবিষ্কৃত জরাসন্ধের বৈঠকের কথায় বলিয়াছেন, এই প্রস্তরনির্মিত গৃহ হয়ত বুদ্ধের জন্মের পূর্বে নির্মিত—অশোকের আবির্ভাব কালের অন্ততঃ সার্ব্বদ্বী দুইশত বৎসর পূর্বের। * ইহার পর আর ফাণ্ডার্সনের মত অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস ও গ্রহণ করিবার উপায় নাই।

অয়োবিংশ শতাব্দী পূর্বে ভারতীয় স্থপতিগণ শিলাগাজে আপনাদের প্রতিভার ও কলাকৌশলের যে চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে তাহার প্রাচীনত্বের মধ্যে অতি অভিনব নূতনত্বের আশ্রয় পাওয়া যায়। উদয়গিরির রাণী গুম্ফার ও গণেশ গুম্ফার গায়ে তৎকালপ্রচলিত একটি গল্পের চিত্র ক্ষোদিত রহিয়াছে। দুই গুম্ফার ক্ষোদিত ঘটনাবলীতে সামান্য পার্থক্য থাকিলেও গল্পাংশ একই বোধ হয়। একজন রাজা পালকে শয়ন করিয়া কোন রমণীর (দুহিতা বা পত্নী—রাজেন্দ্রলাল বলেন, পত্নী) দ্বারা পদসেবা করাইতেছিলেন। এই সময় অন্ত্র একজন রমণী পূর্বোক্তা রমণীর প্রণয়াকাজক্ষী একজন যুবককে তথায় আনয়ন করেন। রমণী যুবককে অবজ্ঞাসহকারে প্রত্যাখ্যান করিলে দুইদলে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধে রমণীরাও

অঙ্গ ধারণ করিয়াছিলেন । যুদ্ধে জয়ী হইয়া আগন্তুক রমণীকে লইয়া কম্বুপুটে স্বস্থানে প্রস্থান করেন । রমণী প্রথমে বিষয় ভাবে দিনযাপন করিতে থাকেন ; পরে যুবকের প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া সুখে কালাযাপন করেন । ত্রয়োবিংশ শতাব্দী পূর্বেও মানুষ রমণীরূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইত ; তাহার জন্ত জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়া যুদ্ধ করিত । তখন রমণীরাও মতীশ্বের ও সম্মানের জন্ত অঙ্গ ধারণ করিতেন । তখনও মানুষ এখনকারই মত রিপুতাড়না ভোগ করিত, জীবন-প্রোতে ভাগিয়া কাম্য বস্তুর অন্বেষণ করিত । তখনও প্রেম সর্ব্বজয়ী ! এই প্রেম-শিল্প যেন অনন্তকালের জন্ত ঘোষণা করিতেছে, সৃষ্টির আরম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত মানুষের চিত্তবৃত্তি একই পথে পরিচালিত । যাহা চিরন্তন, যাহা মৃত্যু— তাহা অপরিবর্তনীয় ।

শুভাগাত্রে ক্ষোদিত চিত্র, বিলাসের, রূপের, ঐশ্বর্য্যের, ভোগের । আর এই শুভায় যাহারা বাস করিত তাহারা বিলাস ত্যাগ করিয়াছিল, রূপ তুচ্ছ জ্ঞান করিত, ঐশ্বর্য্য ঘৃণা করিত ; তাহারা ত্যাগী । তাহারা নিকরলাভপ্রায়সী । প্রভাতঅরুণালোকে যখন তাহারা ভিক্ষাতাণ্ড লইয়া পর্কতপদে গৃহস্থের দ্বারে উপনীত হইত, তখন গৃহী সমগ্রমে সেই ভিক্ষাতাণ্ড পূর্ণ করিয়া আপনাকে ধন্ত মনে করিত । তাহারা দীর্ঘ দিন ধর্ম্মালোচনায় ও সাধনায় অতিবাহিত করিত । দিনাবসানে শুভামুখে বসিয়া তাহারা মানস্বর্ত্য্যালোকপ্রাবিত পশ্চিম গগনে কোন্ অজ্ঞাতজগতের আভাস পাইত ? তাহা বুঝিবার শক্তি আমার নাই ।

দেখিতে দেখিতে খণ্ডগিরির উপর সম্মার দুগর অঞ্চল লুটাইয়া পড়িল । আমরাও বহিঃসংসারের সেই কথা মনে করিতে করিতে খণ্ডগিরি ত্যাগ করিলাম :—“পাথর এমন করিয়া যে পাণ্ডিত্য করিয়াছিল, সে কি এই আমাদের মত হিন্দু ? এমন করিয়া বিনা বন্ধনে যে গাঁথিয়াছিল, সে কি আমাদের মত হিন্দু ? আর এই প্রস্তরমূর্ত্তি সকল যে খোদিতাছিল—এই দিব্যপুষ্পমালাভরণভূষিত, বিকম্পিতচলাঞ্চলপ্রবৃত্তমোন্দর্য্য, সর্কাদম্পন্দরগঠন, পৌরুষের সহিত লাবণ্যের মূর্ত্তিমান সংমিশ্রনরূপ পুরুষমূর্ত্তি যাহারা গড়িয়াছে, তাহারা কি হিন্দু ? এই কোপপ্রোমগর্ভসৌভাগ্যকুরিতাধরা, চীনাধরা, তরলিতরঙ্গহারা, শীঘ্রমোহন-ভাবনতমেহা—

তুমি শ্রীমা শিবরদশনা পদবিধাধরোষ্ঠী

মধ্যে কামা চকিতহরিণীপ্রোক্ষণা নিম্ননাভি—

এই সকল স্ত্রীমূর্ত্তি যারা গড়িয়াছে, তারা কি হিন্দু ?”



প্রজ্ঞা পারমিতা ।

বিদুষী ।

১

অপরাজে আফিস হইতে ফিরিয়া ব্রজেন্দু আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কোটেব বোতাম খুলিতেছে এমন সময় দর্পণে পশ্চাতে দ্বারপথে প্রবেশমানা পত্নীর প্রতিবিম্ব দেখিয়া সে ঘুরিয়া দাঁড়াইল । ততক্ষণে রমা স্বামীর নিকটে আসিয়াছে । রমা যোড়শী—তাহার রূপসম্পদসম্পন্ন দেহে যৌবনের লাবণ্য চল চল করিতেছে ; যেন ভাঙ্গের ভরা নদীতে জুয়ার আসিয়াছে । তাহার অবগুষ্ঠন সরিয়া আসিয়া কালাপেড়ে কাপড়ের পাড় কবরীতে বাধিয়া ছিল ; দুই কর্ণে দুইখানি হীরক জলিতেছিল । ব্রজেন্দু যেন অত্যন্ত ভক্তি দেখাইয়া জীকে নমস্কার করিল । রমা যেন অত্যন্ত রাগ দেখাইয়া বলিল, “অমন করিলে আমি আর আসিব না ।” স্বামী যুবক—জী যোড়শী ; স্মৃতরাৎ প্রথম পক্ষের ভক্তি ও দ্বিতীয় পক্ষের রাগ কোনটাই যে প্রকৃত নহে, পরস্তু যৌবনশূলভ রহস্যপ্রিয়তার পরিচায়ক তাহা বলাই বাহুল্য ।

ব্রজেন্দু বলিল, “রাগ করিলে চলিবে কেন ? তোমাদিগের সম্মান না করিলে গৃহস্থের মঙ্গল নাই । মহর্ষি মনু বলিয়াছেন ;—

‘যত্র নার্যাস্ত পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ ।

‘যত্রৈতাস্ত ন পূজ্যন্তে সর্কাস্তজাকলাঃ ক্রিয়াঃ ॥’

অর্থাৎ, যে কুলে নারীগণের সম্যক সমাদর আছে, তথায় দেবতারা প্রসন্ন আছেন ; আর যে পরিবারে তাঁহাদিগের পূজা নাই সে পরিবারের ক্রিয়াকর্ম সবই বুথা ।”

রমা বলিল, “মনু বুঝি নারী অর্থে পত্নীর পূজার কথাই বলিয়াছেন ?”

ব্রজেন্দু বলিল, “নিশ্চয় । মনু বলেন, গৃহে শ্রীতে ও জীতে—অর্থাৎ লক্ষ্মীতে ও পত্নীতে প্রভেদ নাই ।”

রমার নয়নে যেন বিদ্যুৎ চমকাইয়া গেল । সে বলিল, “তুমি বুঝি ‘মনু-সংহিতায়’ আর কোন শ্লোক পাইলে না ? কেন মনুই ত বলিয়াছেন ;—

‘নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ্‌যজ্ঞো ন ত্রতং নাপ্যুপোষিতম্ ।

পতিং শুশ্রুষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে ॥’

অর্থাৎ, নারীদিগের স্বামী ভিন্ন পৃথক যজ্ঞ, ত্রত ও উপবাস নাই ; কেবল পতিসেবায় তাহারা স্বর্গে গমন করে ।”

এতক্ষণ দুই পক্ষেরই হাসিতে হাসিতে কথা হইতেছিল। কিন্তু অজেন্দু যখন দেখিল, রমা বিজ্ঞ উচ্চারণে সংস্কৃত শ্লোকের আবৃত্তি করিল, তখন যেন বাপারটা একটু জটিল বোধ হইল। এ কি ? রমা যখন শ্লোকের অর্থ বলিতেছিল, তখন অজেন্দু অস্থমনস্ক—আর কি ভাবিতেছে। যেন কি বিস্মৃত কথা তাহার চিত্ত চঞ্চল করিতেছিল।

রমা তাহা লক্ষ্য করিল। সে কক্ষ ত্যাগ করিল।

কিছুক্ষণ পরে রমা যখন স্বামীর অস্ত্র খাবার লইয়া আসিল, তখন বেশ পরিবর্তন করিয়া অজেন্দু আরাম কেদারায় বসিয়াছে। তাহার মুখে একটু চিত্তার ভাব লাগিয়া আছে। সেটি অজেন্দুর বসিনার ঘর, ঘরের একপার্শ্বে দুইটা আলমারী—পুস্তকে পূর্ণ; একপার্শ্বে একটা আয়নাওয়ালা ছোট দেওয়াল ও একটা আলনা; মধ্যস্থলে টেবুল, ঘরে আর একখানি আরাম কেদারা ও তিনখানি সাধারণ কেদারা। রমা দক্ষিণ হস্তে বৃত্ত গেলাসটি টেবুলে ব্লটিং প্যাডের উপর রাখিল, তাহার পর বামকরে বৃত্ত শ্বেত প্রস্তরের থালাখানি দক্ষিণ হস্তে লইয়া আরাম কেদারার একটা হাতার উপর রাখিল। তাহার পর সে গেলাসটি তুলিয়া সম্মুখে অধোনে তাহার গাত্র মুছিয়া কেদারার অপর হাতার উপর রাখিল।

রমা যাইতেছে দেখিয়া অজেন্দু জিজ্ঞাসা করিল, “কোণার পলাঠিতেছ ?”

রমা বলিল, “বড় গরম। পাখা আনিতে যাইতেছি।”

“না। আবশ্যক নাই।”

রমা ফিরিয়া আসিল।

অজেন্দু ফলাহার শেষ করিয়া মিষ্টান্নে হাত দিয়া বলিল, “তুমি সংস্কৃত জান ?”

রমা বলিল, “হাঁ।”

“কই আমি ত জানিতাম না।”

রমা হুট হাসি চাপিয়া বলিল, “আমি নিখিয়াছি।”

অজেন্দু বলিল, “এত উৎসাহ ?”

“তুমি লিখাপড়া জানা স্ত্রী ভালবাস বলিয়া।”

কথাটা উড়াইয়া দিবার অস্ত্র অজেন্দু হাসিয়া বলিল, “এ সংবাদটি কোথা হইতে সংগ্রহ করিলে ?”

রমার চঞ্চল নয়নে হুট হাসি ফুটিয়া উঠিতেছিল, সে বলিল, “ঠাকুরসি আমাকে সব বলিয়াছেন।”

অজেন্দুর ভগিনী পূর্ণমিনী জাতীর গৃহে আসিয়াছিল। সে একটা অকিঞ্চিৎকর

—বিশ্বতপ্রায়—অনাবশ্যক কথার উত্থাপন করাতে অজেন্দু মনে মনে জীবুদ্ধির অনেক নিন্দা করিল; মনে মনে বলিল, “মেয়েদের একটা কথা না বলিয়া থাকিবার ক্ষমতা নাই।”

কথাটা সে অকিঞ্চিৎকর ও অনাবশ্যক মনে করিল বটে, কিন্তু তাহারই উত্থাপনে তাহার মন কেমন চঞ্চল হইয়া উঠিল।

২

অগতে কোন কোন লোককে দেখিয়া মনে হয়, বেগবান্ রেলগাড়ী যেমন তাহারই অল্প নির্মিত বিঘ্নবিহীন পথে অবাধে দ্রুত চলিয়া যায়—তাহার তেমনই বিঘ্নবিহীন জীবন-পথে অগ্রসর হয়; অনৃষ্ট সময়ে ও সাগ্রহে তাহাদিগের পথ হইতে সকল বাধা বিঘ্ন সরাইয়া রাখেন। অজেন্দু সেই শ্রেণীর লোক। বিপদের ঝঞ্ঝাবাত, দারিদ্র্যের করকাণ্ডাত, অসাকল্যের অশনিপাত—তাহাকে কখনও সহ্য করিতে হয় নাই।

তাহার পিতা ছগলীতে ওকালতী করিতেন। অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। কিন্তু তাহারই মধ্যে তিনি যে সম্বল করিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার একমাত্র পুত্র অজেন্দুর দারিদ্র্য-দুঃখভোগের সম্ভাবনামাত্র ছিল না। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ববৎসর তিনি তাঁহার একমাত্র কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন।

পিতার মৃত্যুর পরবৎসর অজেন্দু প্রবেশিকা পরীক্ষা দেয় ও উত্তীর্ণ হয়। তাহার পর হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রি-পরীক্ষায় সে বরাবরই উত্তীর্ণ হইয়াছে;—কেবল উত্তীর্ণ হইয়াছে বলিলে যথেষ্ট হয় না, কারণ তাহার সাফল্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ সম্মানে ও পুরস্কারে ভাষাক্রান্ত ও সমুজ্জ্বল হইয়াছিল।

সে যখন বি. এ. পড়ে তখনই তাহার জননী তাহার বিবাহ দিবার অল্প ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। অজেন্দু পাঠ শেষ না করিয়া বিবাহ করিবে না বলায় তাহা হয় নাই। মা পুত্রের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাঁচ করিতেন না। এই মাতাপুত্রের স্নেহসম্বন্ধ যেন সাধারণ স্নেহসম্বন্ধ হইতেও নিবিড় ও মধুর হইয়াছিল।

সে বি.এ. পাশ করিয়া অধ্যয়ন শেষ করিবার অল্প কলিকাতায় আসিতে চাহিল। কিরূপ ব্যবস্থা করা যাইবে মাতাপুত্র সেই বিষয়ে পরামর্শ চলিতে লাগিল। শেষে অজেন্দু বলিল, “হয় আমি নিত্য কলিকাতায় গত্যাত করি, নহে ত কলিকাতায় একটা বাসা লই—তুগিও চল।”

মা বলিলেন, “তোমার নিত্য গত্যাত চলিবে না। অত পরিশ্রম করা অনাবশ্যক। আর আমিও নিত্য তোমার জন্য ঘর আর বাহির করিতে পারিব

না । বাড়ী ছাড়িয়া যাইলে অনেক ক্ষতি । কিন্তু আমি না যাইলে তোমার অসুবিধা হইবে । অতএব চল, একটা বাসা লইয়া দুইজনেই কলিকাতায় যাই ।”

বাড়ীর সম্মুখে গাড়ী থামিল ;—শুনিয়া মা বলিল, “বোধ হয় সুরমা আসিবে ।”

নিম্নে বালকঠে ধ্বনিত হইল,—“মাগা বাবু ।”

মাতাপুত্র নিম্নে যাইলেন ।

সেদিন রবিবার—ছুটি । ব্রজেন্দ্র ভগিনীপতি পত্নীপুত্রকর্তা লইয়া স্বশ্রমলয়ে আসিয়াছেন ।

৩

মাতাপুত্র কলিকাতায় যাইবার যে কথা হইয়াছিল মা জামাতা মহিমচন্দ্রকে তাহা বলিলেন ।

শুনিয়া মহিমচন্দ্র বলিলেন, “বাড়ীতে তালাবদা করিয়া যাইলে সব নষ্ট হইবে ।”

মা বলিলেন, “কিন্তু নিত্য গত্যাত বড় অসুবিধা ।”

“নিত্য গত্যাত করা কেন ? ব্রজেন্দ্র কলিকাতায় থাকিবে । শনিবারে শনিবারে সে বাড়ী আসিবে ; আবশ্যক হইলে অল্প দিনও আসিবে ।”

“কখন একা দূরে থাকে নাই ।”

“একা থাকিবে কেন ? আমি কলিকাতায় থাকিতে ব্রজেন্দ্র কি ‘মেমে’ যাইবে ?”

ব্রজেন্দ্র তথায় ছিল । মহিমচন্দ্র তাহাকে বলিলেন, “কি হে, আমার কি জাতি গিয়াছে যে, তুমি আমার বাড়ী যাইয়া থাকিবে না ?”

এ কথাটা ব্রজেন্দ্র বা তাহার মাতার মনে হয় নাই । মহিমচন্দ্রের কথায় উজ্জয়েই লজ্জা বোধ করিলেন । ব্রজেন্দ্র হাসিয়া বলিল, “নিমন্তন না করিলেই যাইব ?”

ইহার পর মহিমচন্দ্র ও সুরমা উভয়ে এ বিষয়ে এমন আন্দোলন উপস্থিত করিলেন ও সুরমা’র ও দাদার উপর এত অভিমান করতে লাগিল যে, ব্রজেন্দ্র বা তাহার মাতার কোনরূপ যুক্তিতর্কের অবকাশ রহিল না ।

সেইদিন সন্ধ্যাকালে মহিমচন্দ্র সপরিবারে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন । তাহারা ফিরিবার পূর্বে স্থির হইয়া গেল, ব্রজেন্দ্র কলিকাতায় আসিয়া ভগিনীর গৃহে অধিষ্ঠিত হইবে এবং মা বাড়ীতেই থাকিবেন ।

এদিকে বাড়ীতে সেইরূপ ব্যবহার আয়োজন হইতে লাগিল এবং মা’র নিকট থাকিবার জন্য কোন দূর আশ্রয়স্থান সন্ধান করা চলিতে লাগিল ।

যথাকালে ব্রজেন্দু ভগিনীর গৃহে উপস্থিত হইল এবং অধ্যয়নের ব্যবস্থা করিয়া লইল।

মা কল্হাজামাতাকে পুত্রের বিবাহসম্বন্ধ দেখিতে বলিয়া দিয়াছিলেন। সুরমাও ঘটকীদিগকে পাত্রীর সন্ধান আনিতে বলিয়াছিল। বলা বাহুল্য, সে ভ্রাতার জন্য ‘ডানা কাটা পরীষ’ সন্ধান করিতেছিল; তাই সহজে মনোমত সম্বন্ধ জুটিতেছিল না। ঘটকীদের গতায়াতে ব্রজেন্দু বিরক্ত হইয়া ভগিনীকে একদিন বলিল, “তুই কি করিতেছিস? আমি কিছুতেই এখন বিবাহ করিব না।”

সুরমা বলিল, “দাদা, মা ভোগার কথায় এতদিন জিদ করেন নাই। কিন্তু ভোগার ত বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যিক। মা’কে কে দেখে? আমি বিদেশে; সংসারে এমন দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই যে, দুই দিন যাইয়া মা’র কাছে থাকি। এই এখন—মা কেমন করিয়া একা আছেন, ভাবিয়া দেখ দেখি? আর ভোগার বিবাহ না করা চলে?”

ব্রজেন্দু ইহার কোন উত্তর দিতে পারিল না। সে বলিল, “আমি বিবাহ করিব না, এমন কথা বলি নাই—বলিতেছি না। আর একবৎসর হইলে আমার পঠদশার শেষ হয়; শেষ হইলে আমি বিবাহ করিব, তৎপূর্বে নহে।”

সুরমা বলিল, “কালহিত আর ভোগাকে বিবাহ করিতে কেহ বলিতেছে না। সম্বন্ধ দেখা চলুক। মনের মত সম্বন্ধ আসিলে তবে কথা হইবে।”

ইহার পর সুরমা দাদার জন্য পাত্রীর সন্ধান করিতে লাগিল। ব্রজেন্দু সে দিকে মন দিল না। সে আপনার অধ্যয়ন লইয়া ব্যাপ্ত রহিল। বাস্তবিক একরূপ ব্যাপার লইয়া অধিক বিচলিত হওয়া ব্রজেন্দুর স্বভাব-বিরুদ্ধ ছিল। সে জীবনে কখন চুশ্চিত্তার যাতনা, অসাফল্যের বেদনা—ভোগ করে নাই। তাহার স্বাস্থ্য অটুট, শরীর সবল, সাফল্য অনাহত; তাহার জননী স্নেহশীলা, ভগিনী স্নেহময়ী, ভগিনীপতি সহোদরোপম; তাহার আর্থিক অবস্থা উত্তম, সাংসারিক অবস্থা অনেকের জীর্ঘ্যের বিষয়, সে নিজগুণে সকলের প্রিয়। এ অবস্থায় তাহার পক্ষে জীবন সুখময়—কবিত্বময় মনে করাই স্বাভাবিক। অকারণে বা সামান্য কারণে সে অধিক বিচলিত বা বিব্রত হইবে কেন?

ব্রজেন্দু আপনার অধ্যয়ন লইয়া ব্যাপ্ত রহিল।

এমনইভাবে প্রায় এক বৎসর কাটিল।

৫

এই সময় একটা অত্যন্ত উৎসাহ উপস্থিত হইল। মহিমচন্দ্রের বাড়ীর ঠিক পার্শ্বের বাড়ীতে একজন নতুন ভাড়াটিয়া আসিলেন। মহিমচন্দ্রের গৃহ যে কক্ষে অজেন্দু থাকিত—পাশ্চবর্তী গৃহের যে কক্ষটি তাহার সম্মুখীন সেই কক্ষ একটি কিশোরী কর্তৃক অধিকৃত হইল। দুই কক্ষের মধ্যে দুইটি অলিন্দমাত্র ব্যবধান। অজেন্দু স্বাভাবিক ভদ্রতাহেতু সে কক্ষের দিকে চাহিত না; কিন্তু সময় সময় কিশোরীর মূর্তি যে তাহার নয়ন-পথের পথিক হইত না, এমন নহে। আর তাহার কক্ষে বসিয়া অজেন্দু শুনিতে পাইত, কিশোরী একাকী বিষম উচ্চারণে ‘ময়ূবংশ’ বা ‘কুমার-সম্ভব’, ‘রামায়ণ’ বা ‘শকুন্তলা’ পাঠ করিতেছে; তাহার সুমধুর কণ্ঠস্বর যেন সেই সকল রচনায় নবীন জীবন সঞ্চার করিতেছে। কখন বা সে শুনিত কিশোরী ইংরাজ শিক্ষয়িত্রীর নিকট টেনিসনের কবিতা পাঠ করিতেছে :—

“Woman is the lesser man, and all thy passions, match'd
with mine,
Are as moonlight unto sunlight, and as water unto wine.”—

নারী কণ্ঠ পুরুষের তুল্য নাহি হ'ল;
মোর বৃত্তি তুলনায় তব বৃত্তিচয়—
দিবাকরহুতি আর চাঁদের কিরণ,
অথবা মদিরা আর সলিল যেমন ।

অধ্যয়নে অসাধারণ অসুযোগ অজেন্দুকে কিশোরীর প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল। সেই অধ্যয়ন-অসুযোগ অজেন্দুর নিকট অপরিচিতাকে অপূর্ণ লাভণ্যে শোভিত করিয়া তুলিয়াছিল। অজেন্দুর কল্পনা তাহাতে সকল গুণের আরোপ করিত।

অজেন্দু সরলভাবে প্রকা প্রকাশ করিতে শিখিয়াছিল—মনের ভাব গোপন করিতে শিখে নাই। বিশেষ এই কিশোরীর অধ্যয়ন-স্পৃহায় প্রাশংসায় যে কেহ আর কোন ভাবের আরোপ করিতে পারে, সে তাহা মনেও করিতে পারে নাই। সে সুরমার নিকট কিশোরীর প্রাশংসা করিত। দুইচারিদিন জাতীয় মুখে কিশোরীর প্রাশংসা শুনিয়া সুরমা একদিন স্বামীকে সে কথা বলিল।

মহিমচন্দ্র পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিয়া পক্ষীর নিকট অজেন্দুর এই প্রাশংসার বিষয় সব অবগত হইলেন। তাঁহার মুখ গভীর হইল। তিনি বলিলেন “লক্ষণ ভাল নহে।”

সুরমা স্বামীর ভাব দেখিয়া কিছু শঙ্কিতা হইল ; জিজ্ঞাসা করিল “কেন ?”
মহিমচন্দ্র সে কথার উত্তর না দিয়া বলিলেন, “এখন যোগ কঠিন হইবার
পূর্বেই ঔষধ দিতে হইবে।”

সুরমা আরও শঙ্কিতা হইল ; বলিল, “কেন ? তোমার কি মনে হইতেছে ?
কি করিবে ?”

পত্নীর শঙ্কা দেখিয়া মহিমচন্দ্র হাসিয়া ফেলিলেন ; বলিলেন,—“যু-কের
কল্লনা-বিহগ অধিক দূর উড়িবার পূর্বে পরিণয়-ছুরিকার দ্বারা তাহার পক্ষ দুইটি
কাটিয়া দিতে হইবে, যুবক ভাবশ্রোতে ভাসিয়া যাইবার পূর্বে পরিণয়-রজ্জু দিয়া
তাহার গলদেশে পল্লীকূপ পূর্ণ কলস বাঁধিয়া দিতে হইবে।”

এবার সুরমাও হাসিল। সে বলিল, “অত ভয় কেন ?”

“ভরসাই বা কোথায় ? যে বয়সে মানুষ ভালবাসিতে ও ভালবাসা
পাইতে অভিলাম্বী হয়, অজেন্দু সে বয়স হইয়াছে। বিবাহটা দিগা ফেলিলেই
নিশ্চিত।”

“কিন্তু পরীক্ষা না দিয়া দাদা বিবাহ করিতে চাহে না।”

“পরীক্ষার ও বিশেষ বিলম্ব নাই। এখন এ উপসর্গটার কি করা যায় ?”

সেই দিন হইতে সুরমা ঘটকীদিগকে বিশেষ তাগাদা দিতে আরম্ভ করিল।

৬

যে উপসর্গের জন্য মহিমচন্দ্র চিন্তিত হইয়াছিলেন, সে উপসর্গ যেমন অপ্রত্যাশিত
ভাবে উপস্থিত হইয়াছিল তেমনই অতর্কিত ভাবে অন্তর্হিত হইল। পাশের
বাড়ীর ভাড়াটিয়াটি বাড়ী ত্যাগ করিয়া যাইলেন। তিনি যে তিন মাসের কিছু
অধিককাল সে পল্লীতে ছিলেন সে সময়ের মধ্যে কাহারও সহিত মিশেন নাই।
কায়েই কেহ তাঁহার গমনে হুঃখিত হইল না। কেবল অজেন্দু যেন কিসের অভাব
অনুভব করিল।

সুখের বিষয় তখন তাহার পরীক্ষার সময় সমাগত। সে অধ্যয়ন লইয়া
ব্যস্ত ; সে অভাব বিশেষ রূপ অনুভব করিবার সময় পাইল না।

৭

এদিকে একটি মনোমত পাত্রীর সন্ধান পাইয়া—পাত্রী দেখিয়া মহিমচন্দ্র
শাপুড়ীকে সে সম্বন্ধের কথা বলিয়া তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করিলেন।

শাপুড়ী বলিলেন, “তুমি যখন দেখিয়া পসন্দ করিয়াছ, তখন আমার আর অমত
কি ? আমার অমত কোন কথা নাই, কেবল মেয়েটি ভাল বংশের হয়।”

মহিমচন্দ্র বলিলেন, “সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিত থাকুন। একপ ঘর, একপ পরিবার সচরাচর দেখা যায় না।”

ব্রজেন্দ্র পরীক্ষা শেষ হইলে মহিমচন্দ্র একবার তাহাকে পাত্তী দেখিতে বলিলেন। ব্রজেন্দ্র বলিল, “তুমি কি আমাকে পাগল পাঠিয়াছ ?”

মহিমচন্দ্র বলিলেন, “কেন ? তাহাতে দোষ কি ?”

“দোষ না থাকিতে পারে; আবশ্যকও নাই। তুমি দেখিয়াছ; মা গত্ত করিয়াছেন; আবার কেন ?”

সে কিছুতেই পাত্তী দেখিতে সম্মত হইল না।

রমার সহিত তাহার বিবাহ হইয়া গেল।

বিবাহের কয়দিন পরেই পরীক্ষার ফল বাহির হইল—পরীক্ষায় ব্রজেন্দ্র সর্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। ইহার এক মাস পরে একটি বিশেষ পরীক্ষা দিয়া ব্রজেন্দ্র মাসিক দুইশত টাকা বেতনের একটি সরকারী চাকরী গ্রহণ করিল।

৮

ব্রজেন্দ্র বিবাহের ছয় মাস পরে একবার পিতৃালয়ে আসিয়া সুরমা বলিল “দাদা, তুমি মেয়েদের লিখাপড়া জানা ভালবাস; বৌর লিখাপড়া শিখিবার ব্যবস্থা কর।”

ব্রজেন্দ্র বলিল, “কে তোকে বলিল, আমি মেয়েদের বিদ্যাশিক্ষণ হইতে বলি ?”

“নহিলে আমাদের বাড়ীর পাশের বাড়ীর ভাড়াটিয়াদের সেই মেয়েটির অত প্রশংসা করিতে কেন ?”

“একটি ছোট মেয়ে, পড়িতে ভালবাসিত। তাহার প্রশংসা করিলে কি ইহাই বুলায় যে, আমার ইচ্ছা সকল জীলোক বিদ্যাচর্চায় মনোনিবেশ করিবে ?”

সুরমা আর দাদার সঙ্গে তর্ক করিল না বটে, কিন্তু কলিকাতায় ফিরিয়া সে রমাকে তাহার পিতৃালয়ে যে পত্র লিখিল, তাহাতে তাহাকে লিখাপড়া করিতে পরামর্শ দিল।

এদিকে ব্রজেন্দ্র ভগিনীকে যাহাই বলুক তাহার কথায় লজ্জিত হইল। সে যে একদিন অসম্ভব আদর্শের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল, এবং সেই আদর্শেই পুথলাভের আশা করিয়াছিল ইহাতে সে লজ্জিত হইল। তাহার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইবার সময় হইতেই সে সেই “অসম্ভব আদর্শ” পরিহার করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল।

সে আপনাকে আপনি বুঝাইয়াছে, গৃহই যাহার কর্মক্ষেত্র—তাহার পক্ষে জগতের বিশাল সাহিত্যের সহিত পরিচয় থাকে ভালই, না থাকে ক্ষতি নাই। তাহার জননী ও ভগিনী বিদূষী নহেন ; কিন্তু সেজন্ত দুই পরিবারে কখন কোন অসুবিধা ঘটে নাই। তবে সে কেন রমাব অভিপ্রায় না জানিয়াই তাহাকে বিদূষী করিবার চেষ্টায় “সুস্থ শরীর ব্যস্ত করিবে ?” তাহার এই চেষ্টা যে তাহার স্বনামে বিদূষীর আদর্শের অস্তিত্বজ্ঞাপক তাহা বলাই বাহুল্য।

৯

তাহার পর রমা স্বামীগৃহে আসিল। সে সহজেই শাশুড়ীর মেহ অধিকার করিয়া বসিল, এবং সংসারের সর্বকাৰ্য্যে তাঁহার সহকারী হইয়া উঠিল। ব্রজেন্দু আফিসে চলিয়া যাইলে সুদীর্ঘ দিন—সে শাশুড়ীকে ‘রামায়ণ’, ‘মহাভারত’, ‘হরিবংশ’ পড়িয়া শুনাইত ; দুইজনে কত গল্প—কত কথা হইত। অত্যন্তকালমধ্যে এমনই দাঁড়াইল যে, রমাও যেমন পিতৃালয়ে যাইয়া অধিক দিন থাকিতে পারিত না, তাহাকে ছাড়িয়াও তেমনই তাহার শাশুড়ী অধিক দিন থাকিতে পারিতেন না। ইহাতে ব্রজেন্দুর আনন্দের আর সীমা ছিল না। রমা যে তাহার জননীকে সুখী করিতে পারিয়াছে ইহাতে সে পরম পুলকিত হইয়াছিল।

এদিকে রমাকে ভালবাসিয়া ও রমার ভালবাসা লাভ করিয়া ব্রজেন্দু আর কোন অভাবই বোধ করিত না। তাহার মনে হইত, তাহার সুখে কোথাও কোন অসম্পূর্ণতা নাই।

সুসমা যখনই পিতৃালয়ে আসিত তখনই রমাকে লিখাপড়া করিতে বলিত। রমা শাশুরালয়ে আসিবার বর্ষাদিককাল পরেও একবার পিতৃালয়ে আসিয়া সুসমা সে কথা বলিলে মা বলিলেন, “সংসারের অর্ধেক কাটাইত রমা করে। আবার আমাকে পড়িয়া শুনায়। আর কখন লিখাপড়া করিবে ? আর ব্রজেন্দুও কোন দিন পড়ার কথা বলে নাই ?”

সেই দিন সুসমা তাহার বাড়ীর পার্শ্বের বাড়ীর ভাড়াটিয়া সেই কিশোরীর অধ্যয়নস্পৃহা সম্বন্ধে ব্রজেন্দুর প্রশংসার কথা বলিল।

তাহার ফলে পরদিন স্বামিজীতে যে কথোপকথন হইয়াছিল গল্পের আরম্ভে তাহার বিবরণ বিবৃত হইয়াছে।

১০

সেই দিন রাতিকালে ব্রজেন্দু আবার রমাকে জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি সংস্কৃত শিখিলে কবে ?”

রমা হাসিতে হাসিতে বলিল, “ঠাকুরাণি বলিয়াছেন, তাঁহাদের বাড়ীর পার্শ্বের বাড়ীতে একজন বিদ্বান কিশোরীর অধ্যয়নস্পৃহা লক্ষ্য করিয়া তুমি তাহাকে ভাল-বাসিয়াছিলে ; তাহা শুনিয়া আমি বিদ্বান হইবার চেষ্টা করিতেছি ।”

ব্রজেন্দ্র একটু চাঞ্চল্যব্যঞ্জক স্বরে বলিল, “আমি কখনও তাহাকে ভালবাসি নাই ।

রমা পূর্ববৎ হাসিতে হাসিতে বলিল, “তাহাকে ভালবাসিলেও ক্ষতি ছিল না । আর কাহাকেও ভালবাসিলে আমি ঈর্ষান জলিয়া মরিতাম ।”

রমার কথা ব্রজেন্দ্র নিকট প্রােহণিকার মত বোধ হইতে লাগিল । সে বিশ্বাসবিস্তারিত নয়নে পত্নীর মুখে চাহিল ।

রমা বলিল, “আমিই সেই ।”

ব্রজেন্দ্র বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “সে কি ?”

“বাবা স্বয়ং আমাকে সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও ইংরাজী পড়াইতেন । বাবা বদলী হইলে আমি কাকার কাছে বাঙ্গালা ও শিক্ষিত্রীর কাছে ইংরাজী পড়িতাম । সেই সময় আমাদের বাড়ীতে একটি ভূত্যের বসন্ত হইলে আমরা প্রায় তিন মাস ঠাকুরখির বাড়ীর পার্শ্বের বাড়ীতে ভাড়াটিয়া ছিলাম ।”

ব্রজেন্দ্র মুখ হইতে গাভীরোর ছায়া সরিয়া গেল । সে হাসিল । তাহার পর সে বলিল, “তখন বোধ হইত, অধ্যয়নই তোমার নেশা, এখন আর পড় না ?”

রমা হাসিয়া স্বামীকে দেখাইয়া বলিল, “তাহারপর যে নেশা জুটিল পূর্বের নেশার তুলনায় তাহা—*as moonlight unto sunlight* (চাঁদের মরগ আর দিবাকরজ্বাতি) ।” এবার ব্রজেন্দ্র আর সন্দেহ রহিল না । এম্বে সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর ।

ব্রজেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, “এখন আর বই ভাল লাগে না ?”

রমা বলিল, “না ।”

“তবে কি ভাল লাগে ?”

রমা স্বামীর মুখচূষন করিয়া বলিল, “তোমাকে ।”

ব্রজেন্দ্র হাসিতে হাসিতে চূষনের পর চূষনে রমার মুখ পানিত করিয়া দিল ; বলিল, “বিদ্বানী অপেক্ষা প্রেমসী অনেক ভাল ।”

শ্রীহেমেন্দ্র গঙ্গাধর ঘোষ ।

পাষণের কথা।

(২)

পরদিন প্রাতে, পূর্বে যে বৃদ্ধ ভিক্ষুর কথা বলিয়াছি, তিনি আসিয়া নগরের প্রধান ব্যক্তিগণকে প্রান্তরে সমবেত করিলেন। পরে ক্রমশঃ রাজা ও তৎসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণও তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ক্রমশঃ কথোপকথনের পর বৃদ্ধ সেই জনসমূহকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :—

“আমি ত্রিশাব্দ পূর্বে আমার জন্মভূমি মগধ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। বাল্যকালে আমি মহারাজ প্রিয়দর্শীকে রাজগৃহের পথে দেখিয়াছি ; কিন্তু সে কথা আমার ভাল স্মরণ হয় না। যে ধর্ম প্রচারের জন্ত তিনি আজীবন চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন ও যে ধর্মের জন্ত তিনি বৃদ্ধাবস্থায় গিরিজাজের বনমধ্যে বাস করিয়াছিলেন, সে ধর্ম তখন বিশেষ সমাদৃত। তখন পূর্বে প্রাগ্জ্যোতিষপুর হইতে পশ্চিমে কপিলা পর্য্যন্ত ও উত্তরে খশদেশ হইতে দক্ষিণে সমুদ্র পর্য্যন্ত সে ধর্মের প্রভাব অক্ষুণ্ণ। তাঁহার চেষ্টায় যে প্রবল ধর্মলিপ্সা সিদ্ধ হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত দেশবাসী জনসাধারণের মধ্যে দুর্দমনীয় হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারই জন্ত বিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রমকালে আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলাম। ধর্মশোকের মৃত্যুর পর দশরথ, সম্রত, শাসিনীক প্রভৃতি রাজগণ তাঁহার সম্বন্ধ-প্রতিষ্ঠিত ধর্মের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। উত্তর-পশ্চিমকোণে গান্ধার, উজ্জান, কপিলা, বাহ্লীক প্রভৃতি প্রদেশে এই ধর্মের এতদূর উৎকর্ষসাধন হইয়াছিল যে, বিজ্ঞতা যবনগণও আসিয়া তথাগতের ধর্ম দীক্ষিত হইয়াছিল। কয়েক বৎসর পূর্বে যে যবন রাজা অস্তর্বেদী অতিক্রম করিয়া সাকেত অবরোধ করিয়াছিলেন তাঁহার পূর্বপুরুষেরা শতবর্ষপূর্বে, স্বর্গগত চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শতবংশের অধীনে বাহ্লীক ও কপিলা শাসনকর্তা ছিলেন। যে আত্মীয়ক সপ্তসিদ্ধ বিজয় করিতে আসিয়া সৌভাগ্য সেনের নিকট হইতে পঞ্চশত সংখ্যক হস্তিযুথ প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে সৌভাগ্যবান মনে করিয়াছিলেন, তাঁহারই সময়ে ঐরাণে পারদগণ ও বাহ্লীকে বিদ্রোহী যবনগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিল। ক্রমে শক জাতির তাড়নায় ইহারা পূর্বদিকে আসিতে বাধ্য হইয়াছে। বাহ্লীকের যবনরাজ্যের অভ্যুত্থানের সহিত গান্ধারে ও উজ্জানে মৌর্য সাম্রাজ্যের মর্যাদাহানি আরম্ভ হইয়াছে। ইহাই মৌর্যরাজ-বংশের ও সদ্ধর্মের অবনতির সূত্রপাত। বাল্যে আমি হিরণ্যবাহুতীরে পাষণ-নির্মিত কুটপাদবিহারে বাস করিতাম। তখন শ্রমণাচার্যগণ ঐরাণ, বাবিল,

নৌনা ও যবনবীপপুঞ্জ পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন ; খাচা ও পাশ্চাত্য জগতে সন্ধর্মের মহিমা ঘোষিত হইয়াছে । তখন নগরে প্রতিদিন মহোৎসব হইত । সন্ধর্মের সেরূপ উন্নতির দিন আর বোধ হয় আসিবে না । ধর্মের এরূপ ছরবছা চিরকাল ছিল না, তাহাই প্রমাণ করিবার জন্ত আমি এই শতবর্ষের পুরাতন কাহিনীর পুনরবতারণা করিতেছি । তখন ভ্রমণ দেখিলে আবালবৃদ্ধ, উচ্চ নীচ সকলেই নতশীর্ষ হইত । পশ্চিমে নগরহায়, পুরুষপুর ও তক্ষশিলা, দক্ষিণে উজ্জয়িনী, বিদিশা, ও পূর্বে চম্পা, পুন্ড্র প্রভৃতি স্থান হইতে শিক্ষার্থীগণ পাটলীপুত্রে আসিত । আমি যৌবনে তাহাদিগের সহিত কাপোতিক, পারাবত, কুকুটপাদ, মহাকাশ্যপীয়, মহাশাশ্বিক প্রভৃতি বিহারে একত্র শিক্ষালাভ করিয়াছি । তখন ভ্রমণ ও ভিক্ষুগণ প্রবাসে ঘাইতে হইলে অন্ধকারের আশ্রয়ে বনাস্তুরাণের পথ গ্রহণ করিতেন না ; পরন্তু বজ্র হইতে শিখু পর্যন্ত রাজপথ বৌদ্ধগণের ব্যবহার্য ছিল । ইহা করনা নহে । যে ভ্রাজ্জগণ ধর্ম্মাশোকের শাসনকালে যজ্ঞকালীন পশুবন হইতে রাজভয়ে বিরত হইয়াছিল, তাহাদিগকে প্রিয়দর্শী দেবপদচূত করিয়াছিলেন, তাহারা ক্রমশঃ গোমশর্মন, শতযযা প্রভৃতি দুর্ব্বল রাজগণের রাজত্ব পুনরায় মস্তকোন্মোলন করিতে লাগিল । মোর্যমাত্রাজ্য ধ্বংসের অব্যবহিত পূর্বে সৈচ্ছমধ্যে অহিচ্ছজবাসী মিত্রোপাধিধারী স্তম্ভবংশ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল । অন্তর্বেদীর উত্তরস্থ প্রাচীন অহিচ্ছজনগরী ভ্রাজ্জপ্রধান স্থান । পুরুষপুরম্পরায় শুনিয়া আসিয়াছি যে, অহিচ্ছজনগরে বা মণ্ডলে বৈদিক ভ্রাজ্জগণের প্রভাব অল্প, তথায় তথাগতের ধর্মের স্থান নাই । স্তম্ভবংশীয়গণ ভ্রাজ্জগণের শিষ্য ও সন্ধর্মের বিরোধী । যে দিন পাটলীপুত্ৰনগরপ্রাকারের বাহিরে বিষাগলাতক পুথ্যামিত্র বঙ্গদর্শন ব্যপদেশে শেষ মোর্যরাজ্য বৃহদ্রথকে সংহার করিল, প্রাচীন ভিক্ষু বা যতিমাজেই সেই দিন বলিয়াছিলেন যে, এতদিনে সন্ধর্মের শুভদিনের অবসান ও দুর্দিনের সূচনা হইল । কে জানিত দশ বৎসরের মধ্যে মোর্য সাম্রাজ্যের সহিত মগধসম্ভবরও বিলোপ হইবে ? বৃহদ্রথের মৃত্যুর অন্তিমকাল মধ্যে দুই ভ্রাজ্জগণের প্ররোচনায় নাগরিকগণ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল । যে নাগরিকগণের উন্নত্তা ও শিক্ষার জন্ত আমরা আঁধার অতিবাহিত করিয়াছি, সেই বৃত্তদগণই আমাদিগের ধ্বংসসাধনে ওৎপন্ন হইল । যে কারণে আমি মাতৃভূমি ত্যাগ করিয়া—পুণ্ড্রদেশে মগধ ত্যাগ করিয়া—মহাকোশলের অরণ্যমধ্যে তোমাদিগের নিকটে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি, সেই কারণেই নগরহাসবাসী জনৈক ভিক্ষু তথাগতের শিক্ষাপাত্র লইয়া পুরুষপুর নগরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন । নাক্যরাজপুত্রের উর্ধ্বগম কোথায় গিয়াছে তাহার সমান

পাওয়া যায় না। সমস্ত-সংগৃহীত বুদ্ধদেবের ভাস্করাশি পাটলীপুত্রের রাজপথের ধূলি-রাশির সহিত মিশ্রিত হইয়াছে। কপোতিক সজ্জারামের মহাস্থবিরের ছিন্নশীর্ষ দক্ষিণনগরদ্বারে কীলকবদ্ধ হইয়া আছে।

মগধে সন্ধর্মের নাম—তথাগতের নাম লোপ পাইয়াছে। যাহারা এখনও বুদ্ধের নাম স্মরণ করিয়া থাকে, দশশীল বিশ্বত হয় নাই, ভিক্ষু ও শ্রমণগণকে ভক্তি করে তাহারাও প্রকাশ্যে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আশ্রয়ে আছে। সন্ধর্মের লোপের সহিত স্তূপ, গর্ভচৈত্যা, বিহার, সজ্জারাম প্রভৃতিরও লোপ হইতেছে। উপাসক-উপাসিকা, ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, স্থবির-স্থবিরীগণের সংখ্যা দিন দিন হ্রাস হইয়া ক্রমশঃ লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। তথাগতের ধর্ম সাধারণ লোকে ক্রমশঃ বিশ্বত হইতেছে, এখনও যাহাদের স্মরণ আছে তাঁহারাও মন্দিরবিহারাদির অভাবে যথারীতি উপাসনা করিতে পারেন না। মথুরা হইতে পাটলীপুত্র পর্যন্ত ও প্রাবস্তী হইতে বিদিশা পর্যন্ত বৌদ্ধ মন্দির, বিহার প্রভৃতির চিহ্নও দেখা যায় না। আমি বিংশতিবর্ষ-কল্য চেষ্টাকরিয়া এই নগরে বিদিশার সারীপুত্র ও মৌদগল্যায়নের ভাস্কর্য্যপুত্র অক্ষরূপ, একটি স্তূপ প্রতিষ্ঠার জন্ত অর্থ সংগ্রহ করিয়াছি। আমাদিগের সংখ্যার এত হ্রাস হইয়াছে যে একটি স্তূপ নির্মাণের ব্যয় সংগ্রহের জন্ত আমাকে পাটলীপুত্র হইতে বিদিশা পর্যন্ত সকল নগরবাসীরই সাহায্য প্রার্থনা করিতে হইয়াছে। যখন পুষ্পাসিত্তের অত্যাচারে মগধ ত্যাগ করিয়া মহাকোশলে আশ্রয় গ্রহণ করি, তখন তোমাদিগের বর্তমান রাজার পিতা অগরাজু সিংহাসনে অধীন ছিলেন। চিরকাল এই রাজবংশ তথাগতের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন, সন্ধর্মের এই দারুণ দুর্দিনেও হইঁদিগের বিশ্বাস অচল রহিয়াছে। চতুর্দিকের উৎপীড়িত প্রকৃত বিশ্বাসীদিগের একমাত্র আশ্রয় স্থল এই রাজ্যে এতদিন পরে স্তূপ ও মন্দির নির্মাণের উপায় হইল। 'শুনিয়াছি, মথুরায় সন্ধর্মের অক্ষরূপ একটি স্তূপ নির্মাণ করিতেছেন, তোমাদিগের রাজা ধনভূতি মথুরাবাসীদিগকেও অর্থ সাহায্য করিতেছেন ও সেই সাহায্যে স্তূপবেষ্টনীর করেকটি স্তূপ নির্মিত হইতেছে। মহারাজের আশুকুণ্ডে তোমাদিগের স্তূপের চতুঃপাশস্থ তোরণচতুষ্টয় নির্মিত হইবে। অবশিষ্টাংশের ব্যয় প্রকৃত বিশ্বাসিগণ বহন করিবেন। ভরসা করি সন্ধর্মের পুনরাধার ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের পতন হইবে। যে অশ্বরাশি সঞ্চিত হইয়াছে তাহাদ্বারা নির্মিত গগনস্পর্শী স্তূপ আচক্ষার্ক-গিতি-সমকাল সন্ধর্মের উন্নতির সাক্ষীরূপে বিরাজ করিবে।'

এই সময়ে নগরের দিকে রাজপথে ধূলি উখিত হইয়া কিয়ৎক্ষণ পরে দৃষ্ট

হইল জনৈক অখারোহী ক্রতবেগে আমাদিগের দিকে আসিতেছে । নিকটবর্তী হইলে জানা গেল সে ব্যক্তি একজন নগররক্ষী ; নগরে পশ্চিমদেশবাসী কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির আগমনসংবাদ রাজসমীপে নিবেদন করিতে আসিয়াছে । রাজা ও পূর্বোক্ত বৃদ্ধ, সংবাদ প্রাপ্তিমাতেই, নগরে প্রত্যাবর্তন করিলেন । দিনকরকরবৃদ্ধির সহিত প্রান্তরে জনসংখ্যার হ্রাস হইতে লাগিল ; দ্বিপ্রহরকালে বিশাল প্রান্তর অনশূন্য হইয়া গেল ।

পরদিন প্রত্যয়ে রাজা ধনভূতি বৃদ্ধ ধর্মযাজক ও নগরের কতিপয় প্রধান ব্যক্তি অভিনব পরিচ্ছদধারী চারিজন বিদেশীয়কে সঙ্গে লইয়া শিলাসঞ্চয়স্থলে উপস্থিত হইলেন । ইহার পূর্বে আর কখনও সে জাতীয় সমুদয় দেখি নাই । যবন-সমাগমে ভারতে যখন সর্ববিষয়ে পরিবর্তন সূচিত হইতেছিল, তখন আমি পশ্চিম-সামুদ্রদেশে—অর্ধজাগ্রত অবস্থায় । তাহাদের কথা আমি পরে শুনিয়াছি । সেই প্রথম যবন-দর্শনের দিনে তাহাদিগকে দেখিয়া যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহা বলিতেছি । দারিদ্র্যপীড়িত হইলেও আবণ্য যেমন উপলব্ধি করা যায়, ভ্রম্মাচ্ছাদিত হইলেও অগ্নির অস্তিত্ব যেমন বুঝা যায়, সেইরূপ ভারতীয় পরিচ্ছদ ও ভাষা সম্বন্ধে স্পষ্ট বোধ হইতেছিল যে, তাহারা বিদেশীরা । তাহাদিগের নাম ও রূপাকৃতি বাতীত তাহাদিগের যবনত্বের আর সমুদায় নিদর্শনই লুপ্ত হইয়াছিল । তাহাদিগের পরিচ্ছদ শীতপ্রধানদেশোপযোগী, তাহারা গাফার ও মজ দেশে ব্যবহৃত পশুলোম-নির্মিত বস্ত্র ও গাজাবরণ পরিধান করিয়াছিল ; তাহাদিগের বস্ত্র অতি মলিন, অত্যন্ত অপরিষ্কার ও দুর্গন্ধময় । প্রথম প্রহরে যখন সূর্যোস্তমি ক্রমশঃ প্রথর হইয়া উঠিতে লাগিল তখন তাহারা স্বেদপারশ্বত হইলে দুর্গন্ধের ভয়ে প্রাণা দূরে গমন করিলেন । তাহাদের নামগুলিও বিস্ময়কর যথা ;—কিলিকীয় মাথেতা, অলসমবাসী লিওনাত, উচ্ছানক থৈদোর এবং কপিলাবাসী আর্জিমিদর । পরে জানিয়াছি, অলসম নগরে শাক্যবিশ্বমী যবনরাজ মেনজ অমাত্রহণ করিয়াছিলেন । ইহাদিগের মধ্যে ক্ষোদিত ও তখন শিল্পের ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা হইত । তাহা হইতে ভারতীয় ও পশ্চাত্য শিল্পের সামান্য জ্ঞানলাভ হইয়াছিল । সে কথা পরে যথাসময়ে বলিব ।

রাজা আসিয়া তাঁহার চিরপোষিত আশা অমুসারে সেই প্রান্তরমধ্যে প্রবাহিত স্রুজ নির্বারণীতীরে স্তূপ নির্মাণের আঁজপ্রায় ব্যক্ত করিলেন । বৃদ্ধ ধর্মযাজক তাঁহার প্রস্তাব সমর্থন করিলেন । পরিশেষে যবনগণের পরামর্শ অমুসারে নদী হইতে অল্প দূরে স্তূপ নির্মাণ করাই স্থির হইল । তখন একে একে ছুইয়ে ছুইয়ে

মুণ্ডিতশীর্ষদীর্ঘধারী ভিক্ষুগণ, কোশেয় বস্ত্র পরিহিত, উপাসক ও উপাসিকা-
গণ নগর হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভিক্ষুগণ স্ববির ধর্মযাজকের
পশ্চাদ্দেশে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন, নগর হইতে আনীত সদ্যক পুষ্পবাশি
প্রান্তরে স্তূপীকৃত হইল। রাজা, রাণী ও রাজপুত্র বাধপাল, ধর্মযাজকের উপদেশা-
নুসারে ধরিজীকে পুষ্পাজলি নিক্ষেপে পূজা করিলেন। রাজবংশ নিষ্কিন্তু সেই পুষ্প-
মুষ্টির উপরে সমবেত জনসাধারণ ক্রমাগত পুষ্পবৃষ্টি করিয়া একটি ক্ষুদ্র স্তূপের সৃষ্টি
করিল। বুদ্ধ ধর্মযাজক তখন উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন যে, তথাগতের বাক্যানুসারে
সমুদয় স্তূপ ও গর্ভদেতাই অর্ধবৃত্তাকার ও তৎসমুদয়ের উচ্চতা নেমদৈর্ঘ্যের সমান।
তখন ধর্মযাজকেরা পুষ্প লইয়া সেই কুমুমস্তূপেব পার্শ্বে গোলাকার বেষ্টনী
পত্র ও পুষ্প দ্বারা নির্দেশ করিলেন ও পুষ্প, চন্দন ও জলদ্বারা স্তূপের
অর্চনা করিলেন। ইহার পর রাজা ধর্মযাজকগণপরিবৃত্ত হইয়া সপ্তবার
স্তূপ প্রদক্ষিণ করিলেন। ক্রমে সূর্য্যতাপতাড়িত হইয়া জনসমূহ নগরাভিমুখে
চালিত হইল। সেই দিন সন্ধ্যাকালে, অন্ধকারাগমের 'অব্যবহিত পূর্বে, ভীত—
চকিত পাদক্ষেপে, দুইজন লোক আশাদিগের সমীপে আসিল। তাহারা বিদেশীয়
নহে, ভারতীয় বটে; কিন্তু তাহারা যেন বহু জন্তর ত্রায় অন্ধকারের আশ্রয়ে ভ্রমণ
করে। তাহারা যেন মানবজাতির অধিকারচ্যুত হইয়া নিশাচরে পরিণত
হইয়াছে। তাহারা ব্রাহ্মণজাতীয়, ঈর্ষ্যায় তাহাদিগের কলেবর কম্পবান,
যোযে তাহাদিগের নেত্র রক্তবর্ণ। আশাদিগকে দেখিয়া তাহারা যেন
আর আশ-সম্বরণ করিতে পারিতেছিল না। তাহারা মুখের ভাবে ও কথোপকথনে
প্রকাশ করিতে লাগিল যে, তাহাদিগের আশা ভরসা, স্তূপ সম্পদ সকলই দূর
হইয়া গিয়াছে। সুদিন প্রত্যাবর্তনের যে আশা ছিল তাহাও যেন এই প্রস্তররাশির
আগমনে একেবারে লুপ্ত হইতেছে। অসহায় প্রস্তররাশির উপর নিষ্টিবন
ত্যাগ করিয়া ও পদাঘাত করিয়া তাহারা তাহাদিগের মনুষ্যপদলোপের পরিচয়
দিতে লাগিল। তাহাদিগের কথোপকথনে জানিলাম যে, বহু পূর্বে সে দেশে
ব্রাহ্মণের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। প্রিয়দর্শীর রাজত্বকালে ব্রাহ্মণের প্রথম মর্যাদাহানি
হয়, তাহার পর ব্রাহ্মণগণ আর কখনই পূর্বগৌরবলাভে সমর্থ হইয়া নাই। তবে
পুণ্যামিত্যের রাজত্বলাভের পর হইতে বৌদ্ধপ্রভাবের দ্বাস হইয়াছিল। কিন্তু সে
অত্যঙ্গ কালের জন্ত। পাটলিপুত্রবাসী বুদ্ধ ধর্মযাজকের আগমনকাল হইতে
ব্রাহ্মণগৌরব পুনরায় তিরোহিত হইয়াছে। তাহারা যতবার সেই বর্ষীয়ান
যাজকের নাম গ্রহণ করিল ততবারই ভূমিতে নিষ্টিবন ত্যাগ করিল, তাহারা যেন

আর কোন প্রকারে সম্যক্ স্থণা প্রকাশ করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না । কিয়ৎ-কাল পরে দূরে নগরসঙ্গীর পদশব্দ শ্রবণে তাহারা অক্ষকাবে মিলাইয়া গেল ।

পরদিন প্রভাতে যখন চতুষ্টয় অসংখ্য শ্রমজীবী সমভিব্যাহারে প্রান্তরে আসিয়া উপস্থিত হইল । শ্রমজীবীগণ তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল । এক ভাগ প্রান্তরসমূহ আচ্ছাদনের নিমিত্ত পর্ণকুটীর নির্মাণে প্রবৃত্ত হইল ; অপর ভাগ ভূমিতে গর্ত্ত খনন আরম্ভ করিল ও তৃতীয় ভাগ সঞ্চিত শিলাখণ্ডসমূহ আকারানুসারে শ্রেণীবিভাগ করিতে লাগিল । সেই দিন অপরাহ্নে একজন যখন মস্তক চর্ম্মখণ্ড, মসী ও লেখনী লইয়া চিত্রাঙ্কনে প্রবৃত্ত হইল । যথাসময়ে চিত্রাবলী প্রস্তুত হইলে স্থবির ধর্ম্মযাজক আসিয়া তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন । যখন গণ কোশলের ও উদ্যানের ভাষা মিশ্রিত করিয়া আপনাদের বক্তব্য তাঁহাকে বুঝাইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিল । যথাসময়ে অঙ্কিত চিত্র রাজার অঙ্গুসোদিত হইল । তখন বুঝিতে পারি নাই যে, আমাদেরই পণ্ডিত দেহসমূহ শতদা বিভক্ত হইয়া, মহত্ম পুতীক্ষ অস্ত্রাঘাত সহ্য করিয়া যেসকল শ্রেণীবিভাগে স্তম্ভ হইবে এই চিত্রাবলী তাহারই । যথাসময়ে পর্ণলাঙ্গা নির্ম্মিত হইল, আমাদের উৎসীড়ন আরম্ভ হইল । পায়ণ-দেহে যদি শোণিত থাকিত তাহা হইলে আমাদের শোণিত-প্রবাহে কোশল হইতে চোড়মণ্ডল পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগ প্রাবিত হইয়া সমুদ্রগর্ভে লীন হইত । পায়ণের যদি শ্রবণস্পর্শী আর্কটনাদের ক্ষমতা থাকিত তাহা হইলে আমাদের আর্কটনে হিমাচলের পদ কম্পিত হইত ; আর্য্যাবর্ত্ত হইতে দাক্ষিণাত্য পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগ শান্ত হইয়া উঠিত ; তোমরাও বহু পূর্বে আবিষ্কার করিতে যে, পায়ণেরও বেদনা অনুভব করিবার শক্তি আছে । জীবনের প্রারম্ভে সমুদ্র-সৈকতে যে শরাকি গরাকি বায়ুকাকণা একত্র মিলিত হইয়াছিলাম, তাহাদিগের সহিত লক্ষ লক্ষ বর্ষ সমুদ্রগর্ভে, পর্ব্বত-সামুদ্রেনে একত্র বাস করিয়াছি তাহাদিগের মধ্যে কত মহত্ম কণা পুতীক্ষ সৌদেহ আঘাতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে । তাহারা এখন সেই প্রান্তরে গাম করিতেছে । সে প্রান্তর এখন উর্ব্বর শস্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে, সে নদী শুষ্ক হইয়াছে ও তাহার জলজ্যোতঃ অত্র পথে প্রবাহিত হইতেছে । এখনও কোল ও মৃতা জাতি হলকর্ষণ-কালে আমাদের উৎসীড়কদিগকে অভিশাপ দিয়া থাকে ; কারণ, তাহাদিগের স্তম্ভই পরিজ্ঞ পার্শ্বত্যা জাতির হলফলক অকালে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।

বেদনা দূর হইলে দেখিয়াছি, অসম প্রান্তরশ্রেণী সমান্তরাগে স্থাপিত হইয়াছে, তাহা হইতে শুভ, শ্রুতি, আলম্বন, ভোরণ প্রভৃতি তোমরা যাহা কিছু দেখিয়াছ

তৎসমুদায় প্রাপ্ত হইয়াছে ; কেবল যথাস্থানে বিস্তৃত হইলেই হয়। দূরে রক্তবর্ণ প্রস্তরনির্মিত অর্ধবৃত্তাকার স্তূপ প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। আচ্ছাদন-খণ্ডসমূহের মার্জ্জনমাত্র অবশিষ্ট আছে। নগর হইতে প্রতিদিন দলে দলে নাগরিক ও নাগরিকাগণ যবনশিল্পীগণের তক্ষনচাতুর্য্য দেখিতে আসিত। পরিষদ চতুষ্পাঠি ভাগ করিয়া ছাত্রগণ, আয়তন হইতে শিল্পগণ সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্য্যন্ত সেই পর্ণকুটীরের অভ্যন্তরে বসিয়া থাকিত। সন্ধ্যাসমাগমে বিলাসিগণ রথারোহণে, হীনবিস্ত্র নাগরিকগণ পদব্রজে, দলে দলে, নব ক্লোদিত চিত্রাবলী দেখিতে আসিতেন। তাঁহাদিগের সহিত মিশ্র ভাষায় শিল্পীগণের কথোপকথন হইত, তাহা হইতে যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহাই বলিয়া যাইতেছি ;—

নাগরিকগণ বলিতেন যে, পারসীক-সমাগমের পূর্বে এতদ্দেশে মন্দির বা স্তূপ নির্মাণের প্রথা বা আবশ্যকতা ছিল না, কারণ ভারতীয় প্রথা অনুসারে দেব-র্চনার জন্য মন্দির বা স্তূপের প্রয়োজন হইত না। ব্রাহ্মণগণ পর্বতে, বনে বা নদীতীরে যাজন করিতেন, উন্মুক্ত আকাশই তাঁহাদিগের মন্দির ছিল। যখন কপিলা হইতে বাহ্লীক ও উজ্জান পর্য্যন্ত সমগ্র ভূমি পারসীক জাতির পদানত হইয়াছিল তখন তাহাদিগেরই চেষ্টায় এতদ্দেশে দেবায়তন-নির্মাণ আরম্ভ হয়। তখন হইতে মূলস্থানপুরে মিত্র দেবের মন্দির, বরুণ পর্বতে চন্দ্রের মন্দির প্রভৃতি নির্মিত হইতে লাগিল। অবশ্য ইহার বহু পূর্বে হইতেই এতদ্দেশে তক্ষন-শিল্প বহুলভাবে প্রচলিত ছিল, তবে ভাস্করগণ অপনাদের শিল্পচাতুর্য্য প্রাচীর, স্তম্ভ, দুর্গ, প্রাকার প্রভৃতির শোভা-সংবর্ধনে নিযুক্ত করিতেন। অতীত সেই প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্য্যপ্রথা স্তূপ ও মন্দিরবেষ্টনে শোভনকালে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পারসীকেরা বস্তুর বা বাবিরস ও নীনা দেশীয় শিল্প এতদ্দেশে আনিয়ন করেন। কিন্তু ভারতীয় ভাস্করগণ কখনই অবিমিশ্রভাবে বিদেশীয় ভাস্কর্য্য অবলম্বন করেন নাই। যখনই ভারতবাসীকে বিদেশীয় জাতির নিকট নতশির হইতে হইয়াছে তখনই বিদেশীয়গণ বর্কর হইলে পদানত জাতির অধীনতা স্বীকার করিয়াছে, কিন্তু সভ্য ও শিক্ষিত হইলে উভয় জাতির মধ্যে শিক্ষার আদান প্রদান চলিয়াছে। যবনগণ ইহার উত্তরে কহিতেন যে, তাঁহারা পূর্বপুরুষগণের নিকটে শুনিয়াছেন যে, আদিম যবনদেশে ভাস্কর শিল্পের এতদূর উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে যে, তাঁহারা পাষাণে মনুষ্যকৃতি যথাযথ ক্লোদিত করিতে পারেন। এই শিল্প তাঁহারা মিজাইম্ দেশ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহার পূর্বে কোন জাতি এতদূর দক্ষতার সহিত পাষাণে জীবিত মনুষ্যের রূপাকৃতি গঠনে সক্ষম হয়েন নাই। মিজাইম্

দেশবাসিগণও মূর্তিগঠনে এতদূর কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। কিলিকীয় মাথেতা কহিতেন যে, যবনধীপপুঞ্জ ও মিজাইগ্ দেশের মধ্যবর্তী সমুদ্রকূলে কিলিকিয়া দেশে তাঁহার বাস। যৌবনে তিনি মিজাইগ্‌বাসী ও আদিম যবনবাসী উভয় জাতিই দেখিয়াছেন ; কারণ, স্থলপথে যে পার্বত্যহরণ নিগমবদ্ধ হইয়া উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্যব্যপদেশে গমনাগমন করিতেন, তাঁহারা অধিকাংশ সময়েই তাঁহার জন্মভূমির মধ্য দিয়া গমন করিতেন, এতদ্ব্যতীত সহস্র সহস্র যবন কিলিকিয়া দেশে বাস করিয়াছিল। তাঁহার পূর্বপুরুষগণও তাহার মধ্যে অন্যতম। স্মৃত্যুৎসাহীক বা গাফারবাসী যবনগণ অপেক্ষা আদিম যবনদেশবাসী স্বজাতিগণ সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা অপেক্ষাকৃত অধিক। তিনি শুনিয়াছেন যে, অলীকশুদ্ধতার সহযাত্রীগণ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন তাহার অধিকাংশ অমূলক। তিনি দেশে শুনিয়াছিলেন যে, ভারতবাসীরা প্রস্তর ফোদনে নিপুণতার অভাবে দারুণ গৃহে বাস করে ও গৃহসমূহ কারুকার্যে শোভিত করে ; কিন্তু তিনি এ দেশে আসিয়া দেখিয়াছেন যে, এ দেশে বহু প্রাচীন প্রস্তর নির্মিত গৃহনগরাদি বিদ্যমান আছে ও ভারতবাসিগণ প্রস্তর-তুকনে বিশেষ নিপুণ। পঞ্চনদবাসিগণ কাষ্ঠ-ফোদনে অত্যন্ত নিপুণ এবং প্রস্তরানভাব স্ববেশে ফোদিত কারুকার্যময় কাষ্ঠ-নির্মিত গৃহ বহুল পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকে। নাগরিকগণ কহিলেন যে, পারসীক অধিকারকালে বাহুলীক হইতে পঞ্চনদ পর্যন্ত ভূখণ্ডে ক্রমান্বয়ে দেশীয় ভাস্কর্যের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে ও ক্রমে সমগ্র ভারতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। যে স্থাপত্য নির্মিত হইতেছে তাহার চারিটি ভৌগোলিক স্তরের শীর্ষদেশে যে সিংহচতুষ্টয় ফোদিত হইয়াছে তাহা পারসীক ভাস্কর শিল্প প্রভাবের অন্যতম ফল। কিলিকীয় মাথেতা ইহা স্বীকার করিয়া কহিলেন যে, স্তম্ভশীর্ষে জীব জন্তুর আকৃতির অলঙ্করণ প্রাচীন জাতি সমূহের মধ্যে ছিল না। প্রাচীন মিজাইগ্‌দেশীয়গণও স্তম্ভশীর্ষে প্রক্ষুটিত বা প্রক্ষুটোন্মূল পায়ের অলঙ্করণ করিতেন। অলমদবাসী লিঙ্গনাও কহিলেন যে, প্রাচীন ভারতে চতুর্কোণ বা অষ্টকোণ স্তম্ভ ব্যবহৃত হইত, অসম্ভব হয়। কারণ প্রাচীন হর্ম্যমাঠেই এইরূপ স্তম্ভ দেখা যায় ; গোলাকার স্তম্ভ অতীব বিরল। বাহুলীক নিনাসী যবনগণ যখন শকজাতির 'তাড়নায় পূর্ণাভিমুখে যাত্রা করিতে বাধ্য হইলেন, যখন প্রাচীন বাহুলীক রাজ্যটির কালের অন্ত ভারতীয়গণের হস্তচ্যুত হয়, তখন হইতেই ভারতে যাবনিক শিল্প প্রণালীর সূচনা হইয়াছে। কিন্তু ইহা অজাবদি সুবিস্তৃত নদীর দক্ষিণ তীরে প্রবেশলাভ করে নাই। কোন একজন বিশিষ্ট নাগরিক কহিলেন যে, তাঁহার

পিতা অনর্ন্ত দেশ হইতে পোতারোহণে সমুদ্র বিক্রয়ের জন্ত বড়ের নগরে গমন করিয়াছিলেন । তিনি এই বাণিজ্য যাত্রায় আরব দেশ অতিক্রম করিয়া ধূপ ও গন্ধ দ্রব্য আহরণের জন্ত মিশ্রাইম দেশের দক্ষিণস্থ রাফসগণের দেশে গিয়াছিলেন । সে দেশের অধিবাসিগণ দক্ষিণাত্যবাসিগণের জায় ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ও খর্চাকার । তাহারা মনুষ্য খাদক ও অত্যন্ত কুৎসিতাকার । মিশ্রাইম বাসিগণ এই দেশকে পু-আহিত নামে অভিহিত করেন ও ভারতবাসী বণিকগণ উহাকে অপভ্রংশ করিয়া পুণ্য নাম দিয়াছে । এইরূপ কথোপকথনে দিবস অতিবাহিত হইত । সন্ধ্যাকালে নিম্নী শ্রমজীবী ও নাগরিকগণ নগরে প্রত্যাবর্তন করিতেন । কেবল শান্তিদক্ষ-গণ ক্ষোদিত প্রান্তরের রক্ষণাবেক্ষণ জন্ত রাত্রিকালে প্রান্তরের মধ্যে বাস করিত । কারণ, একদা ব্রাহ্মণগণ ঈর্ষ্যা বশতঃ অগ্নিসংযোগে পর্ণশালা দগ্ধ করিয়া ভাস্করগণের বহু পরিশ্রমের ফল বিনাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল ।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ।

বর্ষা ।

এস স্নিগ্ধ, মধুর, শ্যাম, সুন্দর, মেঘ-অশ্বর লুটীয়ে ;
 এস কুটজ-শাখায় অমল ধবল কুসুম-সুঘমা ফুটীয়ে ;
 এস হরিৎ কপিশ কুসুম-গোলকে ভরি' কদম্ব কাননে ;
 এস তব আগমন পিয়াসী শিখীরে রঞ্জিত করি' বরণে ;
 এস ধরণীর ধূলি- মলিন অঙ্গ হরিৎ চুকুলে আবরি' ;
 এস বিরহশীর্ণা তাঁটনীর দেহে নব ঘোবন বিতরি' ;
 এস শীর্ণ তরুর রিক্ত শাখায় নব পল্লব সাজায়ে ;
 এস মেঘের গভীর স্নিগ্ধ নিনাদে শান্তি শব্দ বাজায়ে ;
 এস কৃষক-বধূর উজ্জল নয়নে হরষদীপ্তি জালিয়া ;
 এস ধরার দীর্ঘ হৃদয় সরসি' স্নিগ্ধ সলিল ঢালিয়া ;
 এস প্রিয়াভুজপাশে ফিরায়ে আনিয়া বাধিতে পতিরে প্রবাসী ;
 এস প্রিয়-বাহু-পাশে আনিতে প্রিয়ারে মেঘ গর্জনে তরাসি' ;
 এস প্রেম-হিম্মোলে পূর্ণ করিয়া ধরণী গগন হরষে ;
 এস চিরসুন্দর চিরমধুময় সরস করিয়া নিরসে ।

সমরক বেগম ।

জগতের ইতিহাসে অনেক সময় মানুষের অবস্থা-পরিবর্তনে বিশ্মিত হইতে হয় । দশা হইতে ক্রীতদাস পর্য্যন্ত অনেকে হীন অবস্থা হইতে অসাধারণ ক্ষমতা ও অসুকল ঘটনা হেতু উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে সমাক্রান্ত হইয়া—শেষে রাজবংশ-প্রতিষ্ঠা পর্য্যন্ত করিয়া গিয়াছেন । ভারতের ইতিহাসেও একপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে । অধিক দিনের কথা নহে—ভারতে ইংরাজ-রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভে একজন ক্রীতদাসী সামান্য অবস্থা হইতে যেরূপ সম্পদ, সম্মান ও শক্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন তাহা সাধারণ উপস্থাসিকেরও বিশ্বাস উৎপাদন করে । আমরা সেই সমরক বেগমের জীবনের ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া দিলাম । বেগমের জীবনের অনেক অংশ এখনও রহস্য কুহেলিকায় সমাচ্ছন্ন । তবে কম্পটন, কীন, স্লিম্যান, হেবার্ প্রভৃতি লেখকগণ অসুসন্ধানের ফলে যে সকল উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন এবং সিম্যানের গ্রন্থ-সম্পাদক প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডিনমেণ্ট্ স্মিথ্ বহু পরিশ্রমের ফলে যে সকল বিশ্বত ঐতিহাসিক ঘটনার উদ্ধার করিয়াছেন—সেই সকল হইতে বেগমের ঘটনাবল্লী জীবনের সাধারণ ইতিহাস গঠন করা অসম্ভব নহে ।*

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন ভারতে বাবরের বংশবলে প্রতিষ্ঠিত ও আকবরের রাজনীতিকৌশলে দৃঢ়ীকৃত মোগল সাম্রাজ্য শক্তি হীন হইয়া ধ্বংসোন্মুখ, তখন ভারতের নানা দিকে নানা লোক সাম্রাজ্য বা ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্রোতঃ সঞ্চার করিতেছিলেন । আর্য্যাবর্তে তখন সর্বদাই রণকোলাহলমুখারিত । সর্বত্র যড়যন্ত্র, সর্বত্র অবিশ্বাস, সর্বত্র রণসজ্জা । এই সময় অনেক ধনলোভী কান্ধী ইউরোপীয় কোন না কোন পক্ষের সেনাদলে প্রবেশ করিয়া সম্পদসঞ্চয়-চেষ্টায় চেষ্টিত হইয়াছিলেন । ইহাদিগের মধ্যে উচ্চবংশোদ্ভূত উদারহৃদয় বীরের একান্ত অভাব ছিল না সত্য ; কিন্তু অধিকাংশই যে নীচবংশসম্মত, নিরক্ষর সদসদবিচারবিমুখ সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই । ইহারা ধনলোভ্যতার পরিতৃপ্তির জন্য সাহসমাত্র সঞ্চল করিয়া যখন যে দিকে সুবিধা পাইত তখন সেই দিকে যাইত ।

* Compton—*Military Adventurers of Hindustan*.
Keene—*Hindustan under Free Lances*.
Sleeman—*Rambles and Recollections*.
Heber—*Journal*.

ধনভাণ্ডই ইহাদিগের চরম ও পরম উদ্দেশ্য ছিল। সে উদ্দেশ্য-সাধনের অহু ইহারা সবই করিতে পারিত। বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বেগম ইহাদিগেরই একজনের পত্নী।

ওয়ার্ণটার রেগার্ড জাতিতে জর্ম্মান। ইহার পিতা ব্যবসায়ে কশাই ছিলেন। রেগার্ড কোন ফরাসী জাহাজে কর্ম গ্রহণ করিয়া প্রথম ভারতে আইসে ও জাহাজ হইতে পলায়ন করিয়া ফরাসীসেনাদলে প্রবেশ করে। এই সময় আত্মগোপন চেষ্টায় সে সমাস নাম গ্রহণ করে। কিন্তু তাহার সুখশ্রীতে সৌন্দর্যের অভাবহেতু লোকে তাহাকে 'সম্মার' বলিতে আরম্ভ করে। সমরু তাহারই রূপান্তর বা বিকার কিছুদিন দক্ষিণ ভারতে কার্য্য করিবার পর সমরু বাঙ্গালায় আসিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয় কোম্পানীর অধীনে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় এবং সে কার্য্য ভাল না লাগায় তাহা পরিত্যাগ করিয়া চন্দননগরে ফরাসী সৈন্যদলে প্রবেশ করে। সে কার্য্যও তাহার প্রীতিপ্রদ না হওয়ায় সে সাধারণ সৈনিকরূপে মিরাজন্দোলার সেনাদলে প্রবেশ করে। সমরু এই সময় ইয়ুরোপীয় বেশের সঙ্গে সঙ্গে ইয়ুরোপীয় অভ্যাস বজ্জর্ন করিয়া এ দেশের বেশ ও আচার অবলম্বন করে। ইহার পর সমরু কিছুদিন "মেঘ ঘণা বাতাহত" ভাবে কাটাইয়া পুর্নিয়ায় শওকতজঙ্গের সেনাবিভাগে একটি ক্ষুদ্র সেনাদলের ভার লইয়া সেই দলকে পাশ্চাত্য প্রথায় শিক্ষিত করিতে আদিষ্ট হয়। অল্পদিন পরে শওকতজঙ্গ যুদ্ধে পরাভূত হইলে সমরু তাহাকে ত্যাগ করিয়া যায়।

* ইহার পর আমরা মীর কাশিমের সেনাদলে গুর্গন খাঁর অধীনে দুইটি সেনাদলের নায়করূপে সমরুর দর্শন পাই। মীর কাশিম তখন কোম্পানীর কর্মচারীদিগের ব্যবহারে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছেন। পাটনার হত্যাকাণ্ডে (৩রা অক্টোবর, ১৭৬৩) সমরুই নেতা ছিল। ইংরাজ বন্দীদিগকে হত্যা করিতে আদিষ্ট হইলে ভারতীয় সৈন্যগণ বলিল, তাহারা শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সম্মত; কিন্তু নিরস্ত্র শত্রুকে হত্যা করা কশাইয়ের কর্ম, তাহারা সে কার্য্য করিবে না। এই সময় সমরু প্রাণনাশের ভয় দেখাইয়া তাহাদিগকে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত করায় ও সহজে হত্যাকার্য্য সম্পন্ন করে। * ইহার পর মীর কাশিম ইংরাজের নিকট পরাজিত হইলে সমরু তাহার অধীনস্থ সেনাদলসমূহ অযোধ্যায় নবাবের সেনাদলে প্রবেশ করে। সে পূর্বেই বহু অত্যাচারে মীর কাশিমের নিকট হইতে

* Annual Registerএ প্রকাশ, ১৪৮ জন ইংরাজ হত হইয়াছিল। ডিম্বেস্ট, স্মিথ, ব্লেস, জীপুন্স বাসকবালিকায় প্রায় ২০০ ইংরাজ হত হইয়াছিল—সমরু স্বয়ং ইহাদিগের মধ্যে প্রায় ১০০ জনের জীবননাশ করিয়াছিল।

শ্রীয সেনাদলদ্বয়ের বেতন আদায় করিয়া পাইয়াছিল । ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে সমর চারিটি সেনাদলের নামক হইয়া উঠিয়াছিল । বন্ধার হিংস্রাজের নিকট নবাবের পরাজয় হইলে হিংস্রাজপক্ষ পাটনার হত্যাকাণ্ডের কথা স্মরণ করিয়া সমরকে তাঁহাদের করে সমর্পণ করিবার জন্য নবাবকে আদেশ করিলেন । উক্তের নবাব বলিলেন, সমরর অধীনে বহু সৈন্য থাকায় তাহাকে সমর্পণ করা সহজসাধ্য হইবে না ; বরং, হিংস্রাজ বলিলে, তিনি তাহাকে নিহত করিতে পারেন । হিংস্রাজ এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন । এ দিকে সমর এই সকল কথা অবগত হইয়া শ্রীয সৈন্যদলসহ অযোধ্যার বেগমদিগকে ও মীর কাশিমকে আক্রমণ করিয়া বহু অর্থ সংগ্রহ করিল । সেই অর্থে সৈন্যগণকে বশীভূত করিয়া সমর বোহিলাখণ্ডে গমন করিয়া রহমত আলির কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল ; তাহার পর বিজয়ী হিংস্রাজ সেনার সামিধ্য নিরাপদ নহে বুঝিয়া ভরতপুরে রাজার অধীনে কার্য্য স্বীকার করিল । কয়মাস পরেই সে কার্য্য ত্যাগ করিয়া সমর জয়পুরের রাজার কার্য্যে নিযুক্ত হইল । জয়পুরপতি সমরর চরিত্রকথা অবগত হইয়া অল্পদিন পরেই তাহাকে পদচ্যুত করিলেন । তখন সমর সৈন্যদল সহ মাসিক ৬৫০০০ টাকা বেতনে দিল্লীর সম্রাট শাহ আলমের মন্ত্রী, রক্ষক ও অভিভাবক নজফ আলি খাঁর অধীনে কার্য্য স্বীকার করিল । অল্পকালে বহু প্রভব সেবা করিয়া চঞ্চলচিত্ত সমর এইবার স্থায়ী কার্য্য গ্রহণ করিল । জীবনের শেষ পর্য্যন্ত সমর সম্রাটের কর্ম্মচারী ছিল এবং নবাবের নিকট হইতে দিল্লীর বিংশ কোশ উত্তরে মিনাটের নিকটে মার্কানা নামক জায়গীর পাইয়াছিল । এই জায়গীরের মোট ও বেগমের প্রভাবট এবার সমরর স্থির ভাবে সম্রাটের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবার কারণ ।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, চন্দননগরভাগের সঙ্গে সঙ্গে সমর ইউরোপীয় বেশ ও আচার ত্যাগ করিয়া ভারতীয় বেশ ও আচার গ্রহণ করিয়াছিল । এই সময় হইতেই সমর ভাগ্যপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আপনাব হাবেস বা শুদ্ধাঙ্গ সৃষ্টি করে ।

সমর বেগমের বংশ-পরিচয় সম্বন্ধে মতভেদ আছে । 'নর্থওয়েস্ট প্রভিন্স্ গেজেটিয়ারে' মিষ্টার অ্যাটকিন্সন বলেন, তিনি মিরাট জিলানিবাসী আমেদ খাঁ নামক জনৈক আরবের রক্ষিতার গর্ভজাত । এই স্থলে বলা আবশ্যক, মুসলমান সমাজে পরিণীতা পত্নীর ও রক্ষিতার গর্ভজাত সন্তানদিগের পদমর্য্যাদা প্রায় তুল্য । আমেদের মৃত্যুর পর তাঁহার পরিণীতা পত্নীর গর্ভজাত পুত্রের অত্যাচারে বেগম ও তাঁহার মাতা দিল্লীতে চলিয়া আইসেন । তথায় কক্ষা সমরর শুদ্ধাঙ্গ গমন করেন । ক্রমে তিনি শ্রীয বুদ্ধিবলে সমরকে করতলগত করেন ও সমর

সার্কানায় বাস করিতে আরম্ভ করিলে তাহার পরিণীতা পত্নীরূপে পরিগণিতা হইলেন। কাহারও কাহারও মতে বেগম সৈয়দকল্যা স্মরণে তাঁহার বংশগণ্যাদার অভাব ছিল না। আবার কেহ কেহ বলেন, তিনি কাশ্মীরী নর্তকী ছিলেন। সে যাহাই হউক সমরু যে তাঁহাকে ক্রয় করিয়া লইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

বেগমের জন্মকাল সম্বন্ধেও মতভেদ বিদ্যমান। কিন্তু এ বিষয়ে অ্যাটকিন্সনের মতই প্রামাণ্য বোধ হয়। তাঁহার মতে, বেগম ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

সমরুর সহিত বেগমের বিবাহ ব্যাপারও বিশেষত্ববর্জিত নহে। তাঁহাকে বিবাহ করিবার সময় সমরু খৃষ্টান বলিয়া পরিচিত, অথচ তাহার মুসলমান মতে পরিণীতা এক উন্মাদরোগগ্রস্তা পত্নী ও বর্তমান। সুতরাং বেগমের সহিত তাহার কোন মতে বিবাহ হইয়াছিল, তাহা স্থির করা দুষ্কর। সে যাহা হউক, উত্তর কালে তিনি সমরুর পরিণীতা পত্নী ও সমরুর মৃত্যুর পর তাহার বিধবা বলিয়াই পরিচিতা। এই উন্মাদিনীও পূর্বে সমরুর রক্ষিতা ছিলেন।

১৭৭৮ খৃষ্টাব্দের ৪ ঠা মে তারিখে আগ্রায় সমরুর মৃত্যু হয়। তখন তাহার উন্মাদরোগগ্রস্তা পত্নী ও তাহার গর্ভজাত এক পুত্র বর্তমান। সমরুর মৃত্যুর পর দিল্লীশ্বরের নির্দেশমতে বেগমই সার্কানা জায়গীরের উত্তরাধিকারী হইলেন। পূর্বে তাঁহার ধর্মমত যাহাই থাকুক না কেন সমরুর মৃত্যুর তিন বৎসর পরে— ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে ৭ই মে তারিখে তিনি সপত্নীপুত্রসহ খৃষ্টধর্মে দীক্ষিতা হইলেন। তখন তিনি জোয়ানা নাম গ্রহণ করেন ও পবে তাহাতে ‘নোবিলিস’ যোগ করেন।

১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে সম্রাট শাহ আলম বিজোহী নাজফ কুলীকে শাসন করিবার জন্য যুদ্ধযাত্রা করিলে বেগম স্বয়ং স্বীয় সৈন্যদল অর্জু টমাসের সহিত সৈন্যে সম্রাটের সেনাদলে যোগ দেন। ৫ই এপ্রিল মোগল সৈন্য নাজফ কুলীর প্রধান আশ্রয় গোকুলগড় অবরোধের চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহারা তথায় উপস্থিত হইবামাত্র শত্রুরা তাহাদিগকে আক্রমণ করিলে মোগল সেনাদল এই অতর্কিত আক্রমণে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পলায়নোদ্ভূত হইল। শত্রুরা সম্রাটশিবিরে প্রবেশ করিয়া সম্রাটের পটাগার আক্রমণের উত্তোষ করিলে বেগম শিবিকারোহণে স্বরিতে টমাসের সঙ্গে সৈন্যে যাইয়া সম্রাটকে উদ্ধার করিতে উদ্যোগী হইলেন। শত্রুরা তাঁহার পাশ্চাত্যপ্রথায় সুশিক্ষিত সেনাদলের আক্রমণ সহ করিতে অক্ষম হইল। এই সময় একদল অশারোহী মোগলসেনা আসিয়া পড়ায় শত্রুদল পরাজিত ও শত্রুর

ছুর্গ অধিকৃত হইল । সেইদিন অপরাহ্নে প্রকাশ্য দরবারে সম্রাট বেগমকে আপনার উদ্ধারকর্তা বলিয়া সম্মান করেন ও তাঁহাকে জেব-উন-নিম্মা উপাধি দান করেন । এই সময় বেগমের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাহাতে বোধ হয়, বেগম জুলাঙ্গী ও গৌরবর্ণী ; তাঁহার নয়নদ্বয় নিম্নত ও চঞ্চল । জাতিতে মুসলমান ও বেশে প্রাচ্য হইলেও তিনি কতক পরিমাণে পাশ্চাত্য আচারব্যবহার অবলম্বন করিয়াছিলেন । তিনি স্বীয় সেনানায়কদিগের সহিত একত্র অনবশুষ্ঠিতা হইয়া আহার করিতেন । *

এই সময় বেগমের সেনাদলে প্রায় তিন শত ইংরোপীয় ছিল । ইহাদিগের মধ্যে অনেকেই গোলামজ বা অল্পরূপ নিয়পদস্থ । সম্রাটের এই অভিযানে গোকুলগড়-বিজয় ব্যতীত আর কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই । তিনি প্রাসাদে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া গোলাম কাদেরকর্তৃক নৃশংসরূপে নির্ম্মাণিত হইলেন । গোলাম কাদের ২৯শে জুলাই হইতে ১০ই আগষ্ট পর্য্যন্ত গুপ্তধনের সন্ধানে প্রাসাদের হর্ম্মভাগ খনন করিয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়া শেষে বৃক সম্রাটের ও পুরাজনাগণের প্রতি অত্যাচার করিতে লাগিল । মহিলারা প্রাসাদ হইতে রাজপথে বিতাড়িতা হইলেন । পরিশেষে শেষোক্ত দিবসে প্রবল মোগল শক্তির ক্ষণ অবশেষ শাহ আলম সিংহাসনে উপবিষ্ট গোলামকাদেরের নিকট গীত হইলেন এবং পুনরায় গুপ্তধন বাহির করিয়া দিতে আদিষ্ট হইলেন । তিনি যখন বলিলেন যে, তাঁহার আর কিছুই নাই তখন সিংহাসন হইতে উঠিয়া আগিয়া কাদের সম্রাটকে ভূপাতিত করিয়া অস্ত্রে ছুরিকা-দ্বারা তাঁহার নয়নদ্বয় দৃষ্টিহীন করিল । ইহাতেও পিশাচের তৃপ্তি হইল না ; সে সম্রাটকে উপহাস করিয়া বলিল, “এখন কি দেখিতেছি?” সম্রাট গাঙ্গৌর্য্য সহকারে উত্তর করিলেন, “তোমার ও আমার মধ্যে ঈশ্বরের বাক্য দেখিতেছি ।” আশ্চর্য্য পূর্বে “ঈশ্বরের বাক্য” কোরাণ স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, সে সম্রাটকে রক্ষা করিবে ও তাঁহার কার্য্য করিবে । এই ভীষণ অত্যাচারের সংবাদ পাইয়া বেগম সসৈন্যে সম্রাটের সাহায্যার্থ আগমন হইয়া কিছু দিনের অল্প তাঁহাকে নির্ম্মাণন হইতে রক্ষা করেন । বেগমের প্রত্যাবর্তনের পর গোলাম কাদের

* কীল তমীয *Hindustan under Free Lances* গ্রন্থে বেগমের যে চিত্র দিয়াছেন তাহাতে বেগমকে পর্বাকৃতি বলিয়া মনে হয় । উহা বেগমের অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সের চিত্র । উহা সাক্ষ্য প্রাসাদ হইতে আনীত ও বর্তমানে এলাবাবাদে গভর্নমেন্ট হাউসে রক্ষিত চিত্রের প্রতিলিপি । সিম্যানের ও বস্পটনের গ্রন্থে বেগমের যে ক্ষুদ্র চিত্র আছে, তাহা স্পষ্ট নহে ।

ইসমাইল বেগের সহিত পুনঃ প্রত্যাবর্তন করিয়া আবার সন্ধ্যার উপর অত্যাচার আরম্ভ করে। তখন তাহাদিগের সৈন্যসংখ্যার আধিক্যেহেতু বেগম আর সন্ধ্যাকে রক্ষা করিতে পারেন নাই।

ইহার পর চার বৎসর বেগমের কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে বেগমের সেনানায়ক টমাস তাঁহার কার্য ত্যাগ করেন এবং তৎপদাভিযুক্ত লুভাসুলত নামক জনৈক ফরাসী বেগমের পাণিগ্রহণ করেন। এই বিবাহ গোপনে রোমান্ ক্যাথলিক মতে সম্পন্ন হয়। বিবাহ গোপনে নিষ্পন্ন করা যে অত্যন্ত অবিবেচনার কার্য্য হইয়াছিল, তাহা পরে দেখা যাইবে। তবে লুভাসুলত শ্রীয সৈন্যদলের বার্নিয়ার ও সালুর নামক দুইজন কর্মচারীকে সাক্ষী রাখিয়াছিলেন। কীনের বিশ্বাস টমাস বেগমের পাণিপ্রার্থী ছিলেন এবং ব্যর্থমনোরথ হইয়া তাঁহার কার্য্য ত্যাগ করেন। লুভাসুলত কিছু উদ্ধতপ্রকৃতির লোক ছিলেন; কিন্তু নিরক্ষর ছিলেন না। বেগমের অপর সেনানায়কগণ মুখ ও বর্কর ছিলেন। লুভাসুলত আদেশ করিলেন, তাঁহারা আর তাঁহার ও বেগমেব সঙ্গে পূর্ব্বৎ একত্র আহার করিতে পাইবেন না। ইহাতে তাঁহারা অত্যন্ত অপমান বোধ করিলেন। তাঁহারা বেগমের বিবাহের কথা অবগত ছিলেন না। সুতরাং, নূতন সেনাপতিকে বেগমের প্রণয়প্রার্থীমাত্র ভাবিয়া তাঁহার এই ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। সুযোগ বুঝিয়া বেগমের সপত্নীপুত্র তাঁহাদিগকে আরও উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। এই যুবক কিছুদিন হইতে দিল্লীতে বাস করিতেছিলেন। তিনি ভারতীয় রীতিনীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন ও নবাব জাফর ইয়াব খাঁ মজফ্ফর উদ্দীন নামে পরিচিত ছিলেন। এই কার্য্যে লেজোয়া নামক একজন কর্মচারী তাঁহার দক্ষিণহস্ত স্বরূপ হইয়া উঠেন।

এদিকে বেগমের ভূতপূর্ব্ব সেনাপতি টমাস স্বতন্ত্র সেনাদল সংগঠিত করিয়া মেবাতিগণের নিকট এক বৎসরের রাজস্ব প্রদানের অঙ্গীকার করাইয়া লইলেন এবং তিজারা ও ঝাঝার নামক দুইটি স্থান অধিকার করিলেন। তিনি বাহাদুরগড় আক্রমণে অগ্রসর হইলে সংবাদ পাইলেন, লুভাসুলত, বেগমের সৈন্যদলসহ তাঁহাকে আক্রমণের চেষ্টা করিতেছেন। মুষ্টিমেয় অধ্বনিগ্নিত সৈন্য লইয়া সুশিক্ষিত বহু-সেনার সহিত সংগ্রাম বিপজ্জনক বুঝিয়া টমাস তিজারায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। লুভাসুলত মেবাতিগণের নিকট যথাসাধ্য অর্থ আদায় করিয়া ঝাঝার আক্রমণ করিলেন। এই সময় তিনি সংবাদ পাইলেন, সার্কানায় বিদ্রোহ অবশ্যস্তাবী ও আসন্ন। এই সংবাদ পাইয়া তিনি পত্নীর রক্ষার্থ সার্কানায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

যে মাসে বেগমের সৈন্যদলের যুরোপীয় কর্মচারীদিগের নিকট এক অঙ্গী-
কার পত্র লইগেন যে, তাঁহারা জাফর ইয়্যাবেদর আদেশমত কার্য্য করিবেন । এই
পত্র লইয়া তিনি দিল্লীতে গমন করিলেন । এই পত্রের আশ্রয়কারীরা প্রায় সকলেই
সিরক্ষর বলিয়া “চেরা সহি” করিয়াছিলেন । এই আকস্মিক বিপদের আভাস
পাইয়া বেগম ও তাঁহার স্বামী ইংরাজের আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন এবং অল্প-
সহরে যাইয়া আশ্রয় লইতে আনিষ্ট হইলেন । এই সকল ব্যবস্থায় প্রায়কাল অতি-
বাহিত হইল । এই সময় মাধোজী সিদ্ধিয়া দিল্লীখবরের প্রতিনিধি ও আর্যাবর্তের
ভাগ্যবিধাতা । বেগম দিল্লীখবরের সৈন্যসাহায্যার্থ প্রদত্ত আয়গীর ভোগ করিতে-
ছিলেন । সুতরাং তাঁহাকে স্থানত্যাগের জন্য সিদ্ধিয়ার অহুমতি লইতে হইল ।
এদিকে আবার ইংরাজরাজ্যে প্রবেশ করিবার জন্য বেগমকে ইংরাজ শাসনকর্তার
অহুমতি লইতে হইল । কায়েই বিলম্ব অনিবার্য্য ।

বেগম ইংরাজ সরকারের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিলে গভর্নর জেনারেল সার
জন শোর সিদ্ধিয়ার দরবারে তাঁহার হইয়া অহুরোধ করিবার জন্য ইংরাজ দূত
পামারকে উপদেশ দিলেন । সিদ্ধিয়া বলিলেন, বেগম দ্বাদশ লক্ষ টাকা দিলে
তাঁহাকে দিল্লীখবরের কার্য্যত্যাগের অহুমতি দেওয়া যাইতে পারে । উত্তরে বেগম
ঐ টাকা দিতে অস্বীকার করিলেন, এবং সমরুর ও তাঁহার প্রদত্ত অস্ত্রাদির মূল্য
ব্যবদ চার লক্ষ টাকা দাবী করিলেন । বহু কষ্টে তিনি কার্য্যত্যাগের অহুমতি
পাইলেন । স্থির হইল, বেগম স্থানান্তরে চন্দননগরে বাস করিবেন, সিদ্ধিয়ার
একজন সৈনিক কর্মচারী সার্কানার সৈন্যদলের ভার পাইবেন এবং সমরুর পুত্র
মাগিক দুই সহস্র টাকা বৃত্তি পাইবেন ।

অক্টোবর মাসে একদিন প্রত্যুষে বেগম পাখীতে ও লুভাসুলুত অশ্বারোহণে
সার্কানা ত্যাগ করিলেন । তাঁহারা সঙ্গে প্রচুর অশ্বার সম্পত্তি ও অর্থ লই-
লেন । তাঁহারা তিন মাইল পথ অতিক্রম না করিতেই পশ্চাতে ধূলি দেখিয়া
অহুসরণকারী শত্রুদিগের আগমন অহুমান করিলেন । তখন পতিপক্ষী এই
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন যে, একজনের মৃত্যু হইলে অশ্রুজন আশ্রয়ভী হইবেন ।
লুভাসুলুত অর্থবাহকদিগকে জ্ঞাত হইবার জন্য তাড়না করিতে লাগিলেন । কিন্তু
অহুসরণকারীরা অল্পকাল মধ্যেই আসিয়া শিবিকা অবরোধ করিল । বেগম স্বীয়
অঙ্গে অজ্ঞাত করিলেন । একজন কর্মচারী বেগমের একখণ্ড বক্ষসিক্ত বস্ত্র লুভা-
সুলুতের নিকট আনিলে তিনি বেগমের মৃত্যু হইয়াছে মনে করিয়া পিণ্ডলের গুলিতে
আত্মহত্যা করিলেন । বেগমের আঘাত গুরুতর হয় নাই । শত্রুরা তাঁহাকে বন্দী

করিয়া ধনসম্ভার লইয়া সার্কানায় প্রত্যাবর্তন করিল। বেগম সপত্নীপুত্রের নিকট বন্দী হইলেন।

লুভাসুলুতের মৃতদেহ সার্কানায় নীত হইয়া তিন দিন পথিপার্শ্বে পতিত রহিল। কেহ তাঁহার সংকার করিল না। শব পশুপক্ষীর খাদ্য হইল ও অবশিষ্ট অংশ পয়ঃপ্রণালীতে নিক্ষিপ্ত হইল। বেগম বন্দিভাবে সাতদিন অনশনে কামানে বদ্ধ রহিলেন। তাঁহার অপমানের ও নির্যাতনের অন্ত রহিল না। কোন বিশ্বস্তা পরিচারিকা গোপনে মধ্যে মধ্যে কিছু আহাৰ্য্য ও পানীয় না দিলে বেগমের মৃত্যু হইত। জনরব, স্বামীর ব্যবহারে সৈন্তদলে বিজোহ অনিবার্য্য দেখিয়া বেগম এই আত্মহত্যাচেষ্টার যড়যন্ত্র করেন। স্টিম্যানের পুস্তকের সম্পাদক ভিনসেন্ট স্মিথ এই জনরবে বিশ্বাস করিলেও স্টিম্যান স্বয়ং ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করেন নাই। স্টিম্যান যখন এ দেশে ছিলেন, তখনও বেগম জীবিতা; স্টিম্যান এই অসাধারণ মহিলার দর্শনের আশায় যাত্রা করিয়াছিলেন; কিন্তু বেগমের মৃত্যুতে তাঁহার সে ইচ্ছা ফলবতী হয় নাই। এ অবস্থায় স্টিম্যানের কথাই বিশ্বাস-যোগ্য বিবেচিত হয়। কীনও এই জনরব সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন না। কম্পটন যদিও বলেন, বেগম অনিচ্ছায় ছুরিকা লইয়া আপনার বক্ষে সামান্য আঘাত করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি এই যড়যন্ত্রের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করেন নাই।

পূর্বেই বলিয়াছি লুভাসুলুতের সহিত বেগমের বিবাহের সাক্ষিব্যয়ের মধ্যে সালুর অন্ততর। সালুর বেগমের বিরুদ্ধে বিজোহে যোগ দেন নাই। এক্ষণে বেগমের দুর্দশায় ব্যথিত হইয়া তিনি টমাসকে সংবাদ দিলেন। টমাস পূর্বব্যবহার বিশ্বৃত হইয়া বেগমকে উদ্ধার করিতে প্রস্তুত হইলেন। এদিকে বেগমের বিজোহী যুরোপীয় সেনানায়কগণ তাঁহার সপত্নীপুত্রকে সার্কানার সিংহাসনে বসাইয়া আয়োদে মত্ত ছিলেন। টমাস তাঁহাদিগকে সংবাদ পাঠাইলেন যে, বেগমের সপত্নীপুত্রকে একান্ত অকর্মণ্য জানিয়া সিফিয়া শীঘ্রই সার্কানায় সেনাদলকে বিদায় দিবেন ও জায়গীর বাজেয়াপ্ত করিবেন। তাহা হইলে তাঁহাদেরই কর্ম ঘাইবে। এই কথায় তাঁহাদের চৈতন্যোদয় হইল। আবার টমাসও সসৈন্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন আবার বেগমকে প্রভু স্বীকার করিয়া প্রায় তিন শত যুরোপীয় কর্মচারী এক অঙ্গীকার পত্রে স্বাক্ষর করিলেন। সালুর ব্যতীত আর সকলেই “ঢেরা সহি” করিলেন। সালুরই সেনাপতি নিযুক্ত হইলেন। সিফিয়ার যে কর্মচারী সেনাদলের ও জায়গীরের ভার লইতে আসিয়াছিলেন, তিনি সার্কানায়

লক্ষ টাকা লইয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন । এই উপলক্ষে টমাসের প্রায় তিন লক্ষ টাকা ব্যয় হয় ; তিনি এ টাকা আর ফিরায়া পানেন নাই ।

সমস্ত পুত্র জাফর ইয়াব বন্দিরূপে দিল্লীতে প্রেরিত হইলেন । তথায় ১৮০৩ (কীনের মতে ১৮০১) খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয় । তিনি কোন যুরোপীয় মহিলাকে বিবাহ করিয়াছিলেন । তাঁহার একমাত্র কন্যাকে বেগমের সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক ডাইম বিবাহ করেন । তাঁহাদের পুত্র ডাইম সম্ভার বেগমের সম্পত্তি পাইয়াছিলেন ।

সালুয়ের অধীনে বেগমের সৈন্তসংখ্যা বর্ধিত হইয়া সেনাদল ছয় দলে বিভক্ত হয় । ইহার মধ্যে পাঁচ দল সালুয়ের অধীনে সিদ্ধিয়ার দাক্ষিণাত্য-অভিযানে যোগ দেয় ও এসাই যুদ্ধে মহারাজীয় পক্ষে ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে । ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে আর্য্যাবর্তে লেক ও দাক্ষিণাত্যে ওয়েলেসলী মহারাজীয়দিগকে বিধ্বস্ত করিলে বেগমও ইংরাজের আত্মগত্য স্বীকার করিলেন । এই বৎসর ভারতের ইতিহাসে বিশেষ স্মরণীয় । এই বৎসর মহারাজীয় শক্তির বিনাশ ও ইংরাজশক্তির বিকাশ হয় ; এক কথায় এই বৎসর ভারতবর্ষ প্রকৃত পক্ষে ইংরাজের অধীন হয় ।

দিল্লীর প্রসিদ্ধ ফিনার বংশের প্রতিষ্ঠাতা জেম্‌স্ ফিনারের কনিষ্ঠ সবার্ট এই সময় বেগমের সেনাদলে প্রবেশ করিয়াছিলেন । তিনিই লর্ড লেকের নিকট বেগমের আত্মগত্যস্বীকারপ্রস্তাব উপস্থিত করেন । বেগম যখন আত্মগত্য স্বীকার করিবার জন্য লর্ড লেকের শিবিরে উপস্থিত হইলেন তখন সেনাপতি সায়মাশান্তে গীধুপানে প্রকৃত । তখন অতি নগণ্য রাজার আত্মগত্য স্বীকারও ইংরাজের নিকট বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা বলিয়া বিবেচিত হইত এবং আত্মগত্য-স্বীকারার্থীকে যথেষ্ট সম্মান করা হইত । বেগমের আগমন সংবাদে সেনাপতি শিবিরের বাহিরে আসিলেন এবং গোলমালে অতিথি পুরুষ কি জীলোক তাহা বিস্মৃত হইয়া তৎকালপ্রচলিত প্রাচ্য প্রণা অঙ্গুসারে বেগমকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাকে চুম্বন করিলেন । পরক্ষণেই স্বীয় ভ্রম বুঝিয়া সেনাপতি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইলে প্রত্যুৎপন্নমতি বেগম স্বীয় অঙ্গুচরবর্গকে বলিলেন, “খৃষ্টীয় ধর্ম্মমাজক ক্রমে জাস্ত কন্যাকে গ্রহণ করেন, দেখ ।” সৈনিক বেশধারী পুরুষকে ধর্ম্মমাজক বলা অভিজ্ঞের নিকট হাস্যোদ্দীপক হইলেও বেগমের অঙ্গুচরগণ তাঁহার কথাই বিশ্বাস করিল ।

এই সময় বেগমের ছয়টি পদাতিক সৈন্তদল, একদল গোলন্দাজ সৈন্ত ও প্রায় ৪০০ অশ্বারোহী সৈন্ত—সর্বসমেত ৩৩৭১ জন সৈন্ত ও সেনানায়ক এবং ৪৪টি

কামান ছিল। এতদিন তাঁহার প্রাসাদের সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র দুর্গ মধ্যে একটি সুসজ্জিত অঙ্গাগার ও কামান ঢালাইয়ের ব্যবস্থা ছিল। এই সকলে তাঁহার বার্ষিক চার লক্ষ টাকা ব্যয় পড়িত। তাঁহার জায়গীরের বিচার ও শাসন বিভাগের ব্যয়ও এক লক্ষ টাকা ছিল। তাঁহার নিজ ব্যয়ও ঐ পরিমাণ হইত। এই সমস্ত ব্যয়ই সার্কানার জায়গীরের আয় হইতে নির্বাহ হইত। ইহার পর দেশে শান্তি-সংস্থাপনের ফলে এক দিকে যেমন তাঁহার আয়বৃদ্ধি হয়, অপর দিকে তেমনই প্রায় ত্রিশ বৎসরকাল তাঁহাকে আর সৈন্ত রাখিতে হয় নাই। এই আয়বৃদ্ধিতে ও ব্যয়সঙ্কোচে তিনি অসাধারণ ধনী হইয়া উঠেন এবং বিশেষ সম্মান সন্তোগ করেন। ইংরাজ মৈনিক কর্মচারীরা প্রায়ই তাঁহার সার্কানাস্থ প্রাসাদে ও মিরাতে গৃহে অতিথি হইতেন। অত্যাশ্চর্য ইংরাজ রাজকর্মচারীরাও সে অঞ্চলে যাইলে বেগমের আতিথ্য গ্রহণ করিতেন।

বেগম মৃত্যুকালে নগদ প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা রাখিয়া যান। ইহার অধিকাংশই তাঁহার গপ্তীপুত্রের দৌহিত্র ডাইস সম্বার পাইয়াছিলেন। বেগম ইহার দুই ভগিনীকেও প্রচুর অর্থ দিয়াছিলেন। ডাইস সম্বারের বার্ষিক আয় প্রায় তিন লক্ষ টাকা ছিল। বেগম মৃত্যুর পূর্বে বহু সংকল্পে অর্থদান করিয়াছিলেন। তিনি সার্কানায় একটি গির্জার প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার সংস্কার ও অত্যাশ্চর্য আবশ্যক ব্যয় নির্বাহের জন্য এক লক্ষ টাকা, স্থানীয় দরিদ্রদিগের সাহায্য ভাণ্ডার সংস্থাপনের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা, ভারতে রোমানক্যাথলিক ধর্মপ্রচারকদিগের শিক্ষার জন্য এক লক্ষ টাকা, রোমে পোপকে তাঁহার ইচ্ছামত কোন সংকল্পে ব্যয়ের জন্য সার্ব্বিক লক্ষ টাকা, কোন সংকল্পে ব্যয়ের জন্য ক্যানটারবেরির আর্চ বিশপকে পঞ্চাশ হাজার টাকা, কলিকাতার দরিদ্র প্রোটেষ্ট্যান্ট বালকদিগের শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য কলিকাতার বিশপকে পঞ্চাশ হাজার টাকা, কলিকাতার দুই শ্রমীদিগের উদ্ধার জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা, মাদ্রাজ, বোম্বাই ও কলিকাতার রোমানক্যাথলিক প্রচার মণ্ডলীর জন্য এক লক্ষ টাকা, আগ্রায় রোমানক্যাথলিক প্রচার মণ্ডলীর জন্য ত্রিশ হাজার টাকা, মিরাতে একটি রোমানক্যাথলিক গির্জা সংস্থাপন করিয়া তাহার আবশ্যক ব্যয় নির্বাহের জন্য ষাট সহস্র টাকা, মিরাতে প্রোটেষ্ট্যান্ট গির্জা সংস্থাপন জন্য দশ সহস্র টাকা দিয়াছিলেন। ভিন্সেন্ট স্মিথ বলেন, তিনি হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের হিতার্থেও অর্থদান করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সে সকল দানের বিশেষ বিবরণ দেন নাই।

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে ২৬শে জানুয়ারী তারিখে বেগমের মৃত্যু হইলে সরকার জায়গীর

বাৎসরিক ঋণে। তাঁহার উত্তরাধিকারী সরকারের সহিত মোকদ্দমা করিয়া শেষে প্রাসাদ ও প্রাসাদসংলগ্ন ভূমি পাইয়াছিলেন। পরে রোমানক্যাথলিক বিশপ এই প্রাসাদ জয় করিয়া ভারতীয় ধর্মযাজকদিগের শিক্ষাগারে পরিণত করিয়াছেন। ষাঁহার বেগমকে দেখিয়াছিলেন, এরূপ বহু লোকের নিকট শ্রীমান শুনিয়াছিলেন, বেগমের মত গভীরপ্রকৃতি লোক সচরাচর দেখা যায় না। ইংরাজের সহিত সখ্যসংস্থাপনের পবন হইতে বেগম যুরোপীয় আচারব্যবহার অবলম্বন করেন। তিনি অশারীরোগে, গজপৃষ্ঠে বা শিবিকায় সাধারণের সম্মুখে বাহির হইতেন এবং অতিথিদিগের সহিত এক সঙ্গে আহার করিতেন।

শেষ জীবনে প্রদেশখাজার ব্যবস্থা করিবার জন্য কলিকাতায় আসিবার সময় বেগমের ভূতপূর্ব কর্মচারী ও জীবনরক্ষক টমাস শ্রী পল্লীকে, পুত্রকে ও কন্যাদ্বয়কে বেগমের নিকট রাখিয়া আসিয়াছিলেন। পথে বহরমপুরে টমাসের মৃত্যু হয়। বেগম তাঁহার পরিবারবর্গকে সম্বন্ধে রাখা করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র বেগমের কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সার্কানার প্রাসাদে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের অতিক্রান্তির মধ্যে তাঁহার অতিক্রান্তি দেখিয়া মনে হয়, বেগম তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। তিনি টমাসের নিকট আপনার ঋণের বিষয় বিশ্বস্ত হয়েন নাই।

বেগম ভুক্তভোগ শাসনজ্ঞা সময় সময় অত্যন্ত অত্যাচার করিতেন সত্য ; কিন্তু সে সময়ের প্রচলিত প্রথাই সেইরূপ ছিল। তখন বেগমের সম্মানের অস্ত ছিল না। গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেটিক কর্মত্যাগকালে বেগমকে “সমাদৃত বন্ধু” বলিয়া সম্বোধন করিয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে বেগমের বদাঙ্গতার ও পরোপকার বৃত্তির বিশেষ প্রশংসা ছিল।*

তিনি লিখিয়াছিলেন :—

To Her Highness the Begum Sumroo.

My esteemed Friend, I cannot leave India without expressing the sincere esteem I entertain for your highness's character. The benevolence of disposition and extensive charity which have endeared you to thousands, have excited in my mind sentiments of the warmest admiration; and I trust that you may yet be preserved for many years, the solace of the orphan and widow, and the sure resource of your numerous dependants. To-morrow morning I embark for England; and my prayers and best wishes attend you, and all others who, like you, exert themselves for the benefit of the people of India.

I remain,

With much consideration,

Your sincere friend

(Signed) M. W. Bentinck

Calcutta, March 17th, 1835.

বেগমের উত্তরাধিকারী—তদীয় সপত্নীপুত্রদোহিত্র ডাইস সম্ভার—লর্ড সেন্ট-ভিন্সেন্টের কন্যাকে বিবাহ করেন। তিনি প্যারিসে প্রাণত্যাগ করিলে তাঁহার বিধবা লর্ড ফবেষ্টারকে বিবাহ করেন। তাঁহার কোন সন্তান ছিল না।

কোন সত্যই বলিয়াছেন, ক্রীতদাসীর এই বিচিত্র জীবনকথা বহুনাশ্রুত কাহিনীকেও পরাজিত করে।

শ্রীদেবেজপ্রসাদ ঘোষ।

কীটগুতত্ত্ব।

(ইতিহাস ।)

প্রায় অর্ধশতাব্দী হইল ব্যাবির সহিত কীটগুর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নির্ণীত হইয়াছে। সেই সময় হইতে কীটগুতত্ত্ব চিকিৎসা-বিজ্ঞানে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে ও নানাস্থানে কীটগুতত্ত্বের আলোচনাকল্পে গবেষণাগৃহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জার্মানী, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে এই আলোচনার অঙ্গ অর্থব্যয় হইতেছে, এই কার্যে সুধীরা জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। ভারতবর্ষে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে একটি গবেষণাগৃহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ডাক্তার রজার্স ইহার অধ্যক্ষ। কলিকাতা মিউনিসিপালিটির গবেষণাগৃহে ডাক্তার হাফকিন বিস্মটিকার টীকার রোগরস আবিষ্কার করেন। বোম্বাই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত গবেষণাগৃহে গৌগের তত্ত্বানুসন্ধান হইত; এখানে তাহা প্রাদেশিক গবেষণাগৃহ বলিয়া পরিচিত। ডাক্তার হাফকিন প্যারিসে পাস্তুর গবেষণাগৃহে শিক্ষালাভ করিয়া ডাক্তার সিমসনের সহিত ভারতে আইসেন ও কলিকাতায় কার্য করিবার পর বোম্বাইয়ে গৌগতত্ত্বানুসন্ধান গৃহের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। বর্তমানে ইনি ভারত সরকারের জীবতত্ত্ব গবেষণাগৃহের অধ্যক্ষ। আগ্রায় গবেষণাগৃহ অধ্যাপক হান্-কিনের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। মাজাজে রোগপ্রতিষেধ ঔষধাগারে মানুষের সংক্রামক ব্যাধির প্রতিষেধক টীকার জন্ম রোগরস প্রস্তুত করা হয়। শিমলার সম্মিষ্টে কাশোলীতে ও মাজাজে কুমুরে জলাতঙ্ক রোগের চিকিৎসার্থ পাস্তুর গবেষণাগৃহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই দুই স্থানে অল্পস্বত চিকিৎসাপ্রণালী ডাক্তার পাস্তুরের আবিষ্কৃত। নাইনিতাল অঞ্চলে মুক্তেশ্বর দেশে ভারতসরকারের

গবেষণাগৃহে অশ্ব ও গোজাতির সংক্রামক ব্যাধির টীকার ব্যবস্থা হয়। এই গবেষণাগৃহ ৭৫০০ ফিট উচ্চে অবস্থিত ; এনিময়ে ইহার প্রতিদ্বন্দী নাই। ডাক্তার লিঙ্গার্ড সপ্তদশবর্ষ কার্য্য করিয়া অবসর গ্রহণ করায় ক্যাপ্টেন হোগ্‌স্‌ ইহার তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইয়াছেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে এই গবেষণাগৃহের জন্ত স্থান নিরূপিত হয়। গৃহের উপকরণ এদেশে সংগৃহীত ও যজ্ঞাবলী বৎসর বৎসর বিদেশ হইতে আনীত হয়। এই জন্ত ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত ইহা কার্য্যোপযোগী হয় নাই। পর বৎসর অগ্নিদাহে তিন ঘণ্টায় ছয় বৎসরের পরিশ্রমের ফল ভস্মীভূত হইয়া যায়। কলিকাতার উপকণ্ঠস্থ বঙ্গীয় পশু চিকিৎসালয় সংলগ্ন কীটানুসন্ধান গৃহ বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার কক বিস্মৃটিকার কীটানুর সন্ধানে ভারতে আসিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে ভারতে কীটানুতত্ত্বের আলোচনা সূচিত হয়। তাহার পর ডাক্তার হাফকিন কর্তৃক বিস্মৃটিকার টীকার রোগরস আবিষ্কারের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। ইহার পর ভারত সরকারের বিশেষ অগ্ররোধে ডাক্তার কক আর একবার ভারতে আসিয়াছিলেন। পরে মালেরিয়ার কারণ-নির্ণয়ের জন্ত ডাক্তার ক্লোফার ও ডাক্তার টীফেন্স্‌ এবং গোগ কমিশনসম্পর্কে ইটালীয়ান্‌ ও জার্মান পণ্ডিতগণের আগমন।

কীটানুতত্ত্বের ইতিহাস লিখিতে হইলে প্রথমেই ফরাসীদেশীয় পণ্ডিত পাঙ্করের নাম করিতে হয়। তিনিই প্রথমে সেপ্টিসিমিয়া অ্যানথ্রাক্স, চিকেন কলেরা প্রভৃতি ব্যাধির পরীক্ষাদ্বারা কীটানুর সহিত সংক্রামক ব্যাধির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রতিপন্ন করেন। তাহার পর লিটার “অ্যান্টিসেপ্টিক” অঙ্গ চিকিৎসার আবিষ্কার দ্বারা চিকিৎসাশাস্ত্রে নবযুগের প্রবর্তন করেন। এই আবিষ্কার লিটারকে অক্ষয় যশে যশস্বী করিয়াছে। ইহার পর জার্মান ডাক্তার কক বিবিধ সংক্রামক ব্যাধির—বিশেষতঃ বিস্মৃটিকার ও যক্ষার—কীটানু আবিষ্কার করিয়া সভ্য জগতে কীটানুতত্ত্বের আলোচনায় নূতন উৎসাহ সঞ্চারিত করেন।* প্রায় সার্বদিশতাব্দী পূর্বে কারচার এই মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে, সংক্রামক ব্যাধিগমুহ কীটানুকর্তৃক উৎপাদিত। তিনি বিবিধ পণ্যদ্রব্যে বহু কীটানু দেখিয়াছিলেন। সে সকল কীটানু চক্ষুর অগোচর—অনুবীক্ষণসাহায্যে দৃষ্টিগোচর হয়। কারচার কোন কোন ব্যাধির কীটানুসন্ধান করিয়া ব্যর্থশ্রম হইয়াছিলেন। বোধ হয়

* গত ২৪শে মে বেডেন-বেডেনে স্বরূপে এই অসাধারণ পণ্ডিতের মৃত্যু হইয়াছে।

তঁাহার অন্বেষণ এই সকল কীটাণু দেখিবার উপযুক্ত শক্তিশালী ছিল না। কিন্তু তঁাহার অসাফল্যেই এই মত অত্যন্তকালের অল্প বৈজ্ঞানিক জগতে প্রতিপত্তি লাভ করিয়া পুনরায় অনাদৃত ও উপেক্ষিত হয়।

ডেনমার্কবাসী অ্যাণ্টনী ডন লেময়েনহক বাণ্যাকাল হইতে কাচ পরিষ্কার কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি অবসর সময়ে পরকলা পরিষ্কার ও অন্বেষণ নির্মাণ করিতেন। তিনি কীটাণু সম্বন্ধে নানারূপ পরীক্ষা করিয়াছিলেন, এবং সেই জন্তই তঁাহার নাম অন্বেষণবিদগণের মধ্যে সুপরিচিত। তঁাহার তৎকালের কার্যাবিবরণ রয়াল সোসাইটীর কার্যাবিবরণীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে তিনি বুষ্টির জলে, কুপোদকে, তৃণমর্জিত সলিলে, লালায় ও দস্তাচ্ছাদনীয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটাণু দেখিয়াছিলেন। তিনি এই সকল কীটাণুর আকার, পরিমাণ ও গতিবিধি নির্ণয়ে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে তঁাহার এই সকল আবিষ্কারের চিত্র (কাঁঠফলকে ক্ষোদিত) প্রকাশিত হয়। এই সকল চিত্রের সাহায্যে কীটাণুগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। ইহারা লিপটোথ্রিক্স, ফিলামেন্টস্, ভিট্রিস্ ও স্পিরা দলভুক্ত। চিত্র না দেখিয়া কেবল বর্ণনা পাঠ করিয়াও ইহাদিগকে কীটাণু বলিয়া বুঝা যায়। ইহাদিগের গতিবিধি এত জ্ঞাত যে ইহারা ঘূর্ণমান পাটিমের মত বিচরণ করে। ইহারা এত ক্ষুদ্র যে, স্নাতক ভাবে একটিকে লক্ষ্য করা কষ্টসাধ্য। একত্র অবস্থিত কীটাণুপুঞ্জকে মশকের ঝাঁকের মত বোধ হয়। ১৬৯২ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রকাশ করেন যে, তিনি কীটাণুর পরিমল নির্ণয়ে সক্ষম হইয়াছেন। তিনি স্থির করেন, একটি কীটাণু একটি বায়ুকণার অপেক্ষা একসহস্রগুণ ক্ষুদ্র। যেগুলি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ তাহাদের গতিবিধি ও অদ্ভুত কার্য দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করে। লেময়েনহক মানবশোণিতে এই সকল কীটাণুর অস্তিত্ব বিশ্বাস করিতেন না। কিন্তু তঁাহার আবিষ্কারের পর বহু চিকিৎসক স্বীকার করেন যে, কীটাণুই ব্যাধির কারণ। এই সকল চিকিৎসকের মধ্যে নিকোলাস অ্যাণ্ড্রি নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি এই বিষয়ে একখানি পুস্তক রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

১৭১৮ খৃষ্টাব্দে লান্সিসি প্রচার করেন যে, ম্যালেরিয়াপ্রধান স্থানের দূষিত বায়ু কীটাণুপূর্ণ; এবং ১৭২১ খৃষ্টাব্দে টুর্ণোর ও মাসেলের প্লেগ কীটাণুকর্তৃক উৎপাদিত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। বাহা হউক, তৎকালে বিজ্ঞানবিদগণ সর্ববিধ ব্যাধিই কীটাণুকর্তৃক উৎপাদিত বলিয়া লোকে কীটাণুবিজ্ঞানকে উপহাস করিতে লাগিল। কিন্তু এইরূপ উপহাস সত্ত্বেও কীটাণুর সহিত সংক্রামক রোগের ঘনিষ্ঠ

সম্বন্ধ একরূপ প্রতিপন্ন হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ প্রাণীতত্ত্ববিৎ লিনেকাস এ কথা স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি লেময়েনহকের আবিষ্কৃত কীটগুণগুলিকে সংক্রামক জ্বরের ও পচন ক্রিয়ার কারণ বলিয়া তাহাদিগকে “কেয়স” শ্রেণীভুক্ত করেন। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি সংক্রামক ব্যাধির ও পচনশীল জ্বরের সহিত কীটগুর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তিনি এই মতের বিশেষ প্রমাণ সংগ্রহ করিতে না পারায় এই মত পুনরায় অনাদৃত হয়।

কিন্তু কিছুদিন “যে তিমিরে সে তিমিরে” থাকা সত্ত্বেও এই মতের আলোচনা চলিতে লাগিল। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে ব্যারন গ্রেসেন উদ্ভিজ্জ পচনশীল জ্বরের কতকগুলি কীটগুর সচিত্র বর্ণনা প্রকাশ করেন এবং জ্যাবলট্, লেসর, রুম্বার, হিল ও অস্কাফ বিজ্ঞানবিৎ এই বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। হিল বলেন, পৃথিবীতে কোন স্থান কীটগু-শূন্য নহে; এক বিন্দু জলে শত সহস্র কীটগু দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। কিন্তু ইহারা নিত্য নূতন কীটগুর আবিষ্কারচেষ্টায় ব্যস্ত থাকায় আবিষ্কৃত কীটগুগুলির পরীক্ষায় ও শ্রেণীবিভাগে মনোযোগী হইলেন নাই। কায়েই কীটগু-বিজ্ঞানেরও বিশেষ উন্নতি হয় নাই। তাহার পর কোপেনহেগেনের বিখ্যাত পণ্ডিত মূলারের আবির্ভাবে কীটগুবিজ্ঞানে যুগান্তর উপস্থিত হয়। তিনি ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে পূর্ববর্তী বিজ্ঞানবিদগণের নিত্য নব কীটগুর আবিষ্কারস্পৃহার প্রতিবাদ করিয়া আবিষ্কৃত কীটগুগুলির গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া ও বিশেষত্ব নির্ণয় করিয়া তাহাদিগকে স্তিম স্তিম শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে লাগিলেন। তাহার অধ্য-
বসায়, পরিশ্রমে ও গবেষণায় কীটগুতত্ত্ব বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হইল।

ইহার পর বিজ্ঞানবিদগণ কীটগু, অতঃশ্রুতি কি পূর্ববর্তী কীটগু এই বিষয়ের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই অতঃশ্রুতি মতবাদের ফলে কীটগুর জীবনের ইতি-
হাস ও ব্যাধির সহিত কীটগুর সম্বন্ধ বিষয়ে অনেক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে।

শ্রীগোত্বজনাথ মিত্র।

মৃত্যু-মিলন।

—:~:—

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—:~:—

রানী।

—~—

রাজি এক প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। দারুণ গ্রীষ্ম। মধ্য মধ্য যে দুই এক পশলা বৃষ্টি হয়, তাহাতে ধরনী শীতল হয় না। অন্তঃপুরসংলগ্ন উদ্যানে রানী ও উমা একখানি আসনে উপবিষ্টা। সম্মুখে সরসীর সচ্ছ সলিলে শশধরের প্রতিবিম্ব শোভা পাইতেছে। বাতাসের অভাবে সরসী-সলিল অকম্পিত—স্থির, যেন মস্তক কাচখণ্ড মাজ। সরোবরের চারিদিকে সোপানশ্রেণী তীর হইতে জলে নামিয়াছে। তীরে কারুকার্যখচিত প্রস্তরস্তম্ভের উপর ছাত—টাদিনী। উত্তরদিকে টাদিনীতে রানী ও উমা উপবিষ্টা। রানীর মুখ গম্ভীর—যেন তিনি চিন্তা-বিষ্টা। তাঁহার সৌন্দর্য্যে কোমলতার কমনীয় ভাবের কিছু অভাব। নয়নে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি—প্রথর বুদ্ধির পরিচায়ক। অধরে দৃঢ়তা আত্মপ্রকাশ করিতেছে। মুখ-ভাবে উদ্যম ও বিরক্তি সপ্রকাশ—যেন তাঁহার ভালবাসিবার, আশা করিবার, আকাজক্ষার কোন বস্তুই নাই; যেন সুখ বা দুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করে না। তাঁহার সৌন্দর্য্যও সেইরূপ। তিনি অনিন্দ্যসুন্দরী; কিন্তু সে সৌন্দর্য্য ভাবের লেশ-মাত্র নাই। সে সৌন্দর্য্য স্থির—স্থায়ী। যেমন কোন ভাবের আতিশয্যে তাঁহার স্থির হৃদয় চঞ্চল হয় না, তেমনই কোন কারণে তাঁহার সৌন্দর্য্য ক্ষুণ্ণ বা ক্ষীণ হয় না। মাতৃস্বের বিকাশে সে হৃদয় সরসতায় বা সে সৌন্দর্য্য কোমলতায় শোভিত হইবার অবকাশ পায় নাই। তিনি যেন নিপুণ ভাস্করের সার্বক স্বয়ং—সৌন্দর্য্যের আদর্শ—রূপের প্রতিমা; কেবল তাহাতে প্রাণ নাই।

আজ এই উদ্যানমধ্যে বসিয়া রানী কি ভাবিতেছিলেন। উদ্যান চক্ষালোক-বোধিত। চক্ষালোকে সৌন্দর্য্যহীনকেও সুন্দর দেখায়—সুন্দরকে আরও সুন্দর দেখায়। আজ চক্ষালোকে উপবনখানি চিত্রবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। উদ্যানে ড় গাছ নাই। পাতায় পাতায়—ফুলে ফুলে স্নিগ্ধ আলো; গাছের তলে তরল স্নককার। মধ্য মধ্য কুঞ্জ—কুঞ্জমধ্যে আলোকসুচিবিহীন অন্ধকার, গাঢ় মনে, কেতু স্নিগ্ধ। নানা জাতীয় কুসুম বিকশিত হইয়াছে; কিন্তু পবনে বজলীগন্ধায়

প্রথমে সৌরভ ও যুথিকার শিখ গন্ধই আসিয়া বেড়াইতেছে । বাম হস্তের বন্ধ মুষ্টি উপর মস্তকের ভার সংস্থাপিত করিয়া উর্ধ্বমুখে চাহিয়া রাণী ভাবিতেছেন । আকাশে উজ্জল তারকার মত তাঁহার ক্রয় কেশে কখনো কখনো হীরক চত্রকরে জ্বলিতেছে ।

উমা রাণীর পার্শ্বে বসিয়া আছে । তাহার নয়ন ক্রমে নিদ্রা-বিজড়িত হইয়া আসিতেছে ।

কিছুক্ষণ পরে রাণী উমাকে বলিলেন, “উমা, তুমি গৃহে যাও ।”

উমা জিজ্ঞাসা করিল, “আপনি যাইবেন না ?”

“আমার যাইবার বিলম্ব আছে ।”

“আমার থাকিতে কোন বাধা আছে কি ?”

“কিছু মাত্র না । রাজি অনেক হইয়াছে । তোমার নিজার সময় অতীত হইয়া গিয়াছে । তাই তোমাকে যাইতে বলিতেছি ।”

“আপনি কি আরও জাগিয়া থাকিবেন ?”

“আমার নিজাকর্ষণ হইতেছে না । ঘরে বড় প্ররম । এ স্থানে বায়ু একটু শীতল বোধ হইতেছে ; তাই যাইতে ইচ্ছা হইতেছে না ।”

উমা যাইবে কি থাকিবে স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না, এমন সময় একজন পরিচারিকা রাণীর নিকটে আসিল ।

পরিচারিকা রাণীকে জানাইল,—“শঙ্কর সিংহ বিশেষ আবশ্যক কার্য্যে এখনই এই উপবনে আসিতে চাহেন ।”

রাণী বিস্মিতা হইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, “এই নিমীথে এ উদ্যানে শঙ্কর সিংহের কি প্রয়োজন ?”

“আমি তাহা জানি না ।”

“যাও, জিজ্ঞাসা করিয়া আইস ।”

পরিচারিকা জানিয়া আসিয়া বলিল, “তিনি বলিলেন, তিনি রাজকাৰ্য্যে এ উদ্যানে আসিতে চাহেন ।”

রাণী বলিলেন, “নিমীথে—অন্তঃপুরের উদ্যানে রাজকাৰ্য্য ।” তাহার পর তিনি পরিচারিকাকে বলিলেন, “তাঁহাকে লইয়া আইস ।”

পরিচারিকা শঙ্কর সিংহের সঙ্গে ফিরিয়া আসিল ।

শঙ্কর সিংহ রাণীকে বলিলেন, “আমি রাজকাৰ্য্যে বাধ্য হইয়া আপনাকে বিরক্ত করিলাম । আমাকে ক্ষমা করিবেন ।”

রাণী বলিলেন, “এখন এ উদ্যানে কি প্রয়োজন?”

“আমি রাজার কার্যে আসিয়াছি। আপনি যে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত এ উদ্যানে থাকিবেন—ইহা আমরা জানিতাম না। জানিলে—”

“জানিলে কি হইত?”

“জানিলে অল্প ব্যবস্থা করিতাম।”

“কিসের অল্প ব্যবস্থা?”

শঙ্কর সিংহ নীরব রহিলেন।

রাণী বলিলেন, “শঙ্কর সিংহ, নিশীথে অস্তঃপুরে রাজার সূত্রদের কি প্রয়োজন, আমার কি তাহা জানিবার অধিকারও নাই?”

রাণীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। শঙ্কর সিংহ ভাবিলেন, রাণী বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। তিনি বলিলেন, “আপনি আদেশ করিলে আমি সে কথা অবশ্যই বলিব। কিন্তু পরিচারিকার সমক্ষে সে কথা বলা বোধ হয় রাজার অভিশ্রুতি নহে।”

নারীজনসুলভ কোতূহল তখন রাণীর ব্যাকুলতা বর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়াছে। তিনি ক্রমশঃপাশে পরিচারিকাকে অপস্থত হইতে আদেশ করিলেন। পরিচারিকা চলিয়া গেল।

শঙ্কর সিংহ বলিলেন, “রাজা আমাকে মধ্য রাত্রিতে এই উদ্যানে থাকিতে বলিয়াছেন।”

রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন?”

“রাজা এই উদ্যানের দ্বারপথে প্রাসাদে প্রবেশ করিবেন।”

রাণীর বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নের দৃষ্টি শঙ্কর সিংহের মুখে স্থাপিত হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “রাজা প্রাসাদে নাই?”

শঙ্কর সিংহ ধীরভাবে বলিলেন, “না।”

“তিনি কোথায়?”

“বাহিরে গিয়াছেন।”

“কেন?”

শঙ্কর সিংহ মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, “প্রজার অবস্থা-পর্যবেক্ষণের ও তাহাদের মনোভাব জানিবার উদ্দেশ্যে।”

রাণীর নয়নে উজ্জল দীপ্তি দেখা দিল। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “তাঁহার এ পথে প্রাসাদে প্রবেশ করিবার কারণ কি?”

“পরিচয় না পাইলে প্রহরীরা তাঁহাকে প্রবেশ করিতে দিবে না। পরিচয়

দিলে, এ কথা প্রকাশিত হইয়া পড়িলে—ভবিষ্যতে তাঁহার পক্ষে আর আত্মগোপন সম্ভব হইবে না ।

“আর কেহ এ কথা জানে না ?”

“না ।”

“কেহ তাঁহাকে চিনিতে পারে না ?”

“তিনি ছদ্মবেশে গমন করেন ।”

“ছদ্মনেশো ! কেহ সঙ্গে থাকে না ?”

“প্রথম কয় দিন আমি সঙ্গে ছিলাম ; এখন আর আমাকে সঙ্গে লইয়া যান না ।”

রানী কি ভাবিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, “কখন রাজার ফিরিবার সম্ভাবনা ?”

শঙ্কর সিংহ বলিলেন, “বোধ হয় শীঘ্রই ফিরিবেন ।”

রানী উঠিয়া পশ্চাতে ঘরের দিকে চলিলেন । শঙ্কর সিংহ বলিলেন, “ঘরে পাঁচ বার ঘূরু করাঘাতশব্দ শুনিবে বুঝিবেন, রাজা আগিয়াছেন । তখন আমাকে ডাকিবেন ।”

রানী যাইয়া ঘরের নিকটে একখানি আসনে বসিলেন, উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন ।

মাথার উপর হইতে চজ্র ক্রমে পশ্চিম দিকে চলিয়া পড়িল, রজনীর শুকতা যেন খনীভূত বোধ হইতে লাগিল । রানী বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন । সেই জ্যোৎস্না-লাক—সেই কুসুমসৌরভ কিছতেই তাঁহার কোন আকর্ষণ নাই ।

উমা রানীর নিকটে আসিয়া বসিয়া রহিল, শঙ্কর সিংহ কিছু দূরে রহিলেন ।

রাজি বাড়িতে লাগিল । চজ্র পশ্চিম দিক্‌চক্রবালের দিকে আরও অগ্রসর হইল । রানী অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । আজ এই নিশীথে চারি দিকে যে সিন্ধু শান্তি তাহার সহিত তাঁহার হৃদয়ের ব্যাকুলতার কি প্রভেদ ! আজ বসিয়া বসিয়া তিনি কত কি ভাবিতে লাগিলেন ।

সহসা রানী উঠিয়া দাঁড়াইলেন । ঘরে ঘূরু করাঘাত শব্দ শ্রুত হইল । রানী শঙ্কর সিংহকে ডাকিলেন না ; স্থির হইয়া শুনিলেন । শব্দ মিলাইয়া গেল ।

তাহার পর আবার পাঁচ বার শব্দ শ্রুত হইল ।

রানী স্বয়ং যাইয়া ঘরের অর্গল মোচন করিলেন ।

ছদ্মবেশে রাজাকে চিনিতে পারা হুঃসাধ্য । ঘর মুক্ত করিয়া—তাঁহাকে দেখিয়া রানী সহজাতসংকারহেতু হুই পদ পিছাইয়া আসিলেন ।

রাণীকে সম্মুখে দেখিয়া রাজার বিশ্বয়ের অন্ত রহিল না। তিনি ভাবিলেন, এ আবার কি দুর্ভেদ্য রহস্য ।

রাজা বিস্মিত ভাবে বলিলেন,—“রাণী ।”

রাজা দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া ফিরিতে না। ফিরিতে রাণী বলিলেন—“এই নিশীথে একাকী বাহিরে যাওয়া কি একান্ত আবশ্যক ?”

রাজা ভাবিলেন, বুঝি রাণীর প্রেমহীন, কঠিন হৃদয়ও সন্দেহ-দংশন হইতে অব্যাহতি পায় নাই। তিনি বলিলেন,—“একান্ত আবশ্যক কার্য্যে আমাকে যাইতে হয় ।”

রাণী বলিলেন, “কিন্তু ইহাতে কি বিপদ ঘটিতে পারে না ?”

দৃঢ় বিশ্বাস ক্রমে সংকারে পরিণত হইলে মাহুবেয় হৃদয়ের সকল বৃত্তিকে আপনার বর্ণে রঞ্জিত করে। রাজা রাণীর কণ্ঠস্বরে আকুলতার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন, “বিপদ ঘটা অসম্ভব নহে। কিন্তু সে আশঙ্কাকে ঘনীভূত করিয়া আমাকে কর্তব্যচ্যুত করিতে পারে আমার এমন কোন আকর্ষণ নাই। আমার বিপদে, সম্পদে, স্মৃতি, দুঃখে কাহারও ত কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই ।”

রাজার কণ্ঠের তীব্র তিরস্কার রাণীর হৃদয়ে শেলসম বিদ্ধ হইল ।

শঙ্কর সিংহকে রাণীর উদ্যানে অবস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিতে করিতে রাজা উদ্যান ত্যাগ করিলেন ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

ব্যথিতা ।

রাজা উদ্যান হইতে নিষ্কান্ত হইলেন । যত দূর দেখা গেল, রাণী তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া সেই আসনে বসিয়া পড়িলেন । তাঁহার হৃদয়ে তুমুল ঝটিকা বহিতেছিল ।

রাণী কিছুক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন ; তাহার পর—যেন অসহনীয় বেদনায়—ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । আশ্রয় গিরি যত দিন পারে কঠোর শিখার বন্ধনে তাহার হৃদয়স্থিত দুঃসহ তাপ রুদ্ধ করিয়া গোপন রাখে ; কিন্তু শেষে এক

দিন তাহার শিলাবন্ধ কমলপত্রের মত অসার প্রাণিগণ করিয়া সে তাপ জ্বালাময়ী গৈরিক নিশ্রাবে—লেলিহান অনলশিখায়—জ্বীভূত সংহারাজে আশ্রয়-প্রকাশ করে। রাণী এত দিন অন্তরে যে ভাব গোপন রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সে ভাব আজ তাঁহার অভ্যন্তর অবিচলতা অনায়াসে অবহেলা করিয়া সদর্পে বাহিরে আসিল।

উমা রাণীকে কখনও এমন বিচলিত দেখে নাই। সে বিষয়ে মুক্ হইয়া রহিল। আর সেই বিকশিত উপবনে অটুট-গাভীর-গর্জ্জিত রাণী বেদনা-বাণিতা বাণিকার মত আকুল ভাবে রোদন করিতে লাগিলেন। রোদনোচ্ছ্বাসে তাঁহার দেহ পবনবিচলিত কুম্ভমভারনয়ন অতিকার মত কম্পিত হইতে লাগিল। উমা ভাবিল—এ কি? সে কয় দিন হইতে রাণীর অভ্যন্তর গাভীরের মধ্যে বিলয়-ভূষিষ্ট নিছাতের মত যে চঞ্চলতা লক্ষ্য করিতেছিল, তাহা বুঝি এই প্রলয়-ঝটিকার পূর্ব-লক্ষণ! কয় দিন হইতে রাণী কেমন অন্তমনকা—তিনি যেন চেষ্টা করিয়া তাঁহার অভ্যন্তর গাভীর্য্য নিবিড়তর করিয়া তুলিতেছিলেন—সে বুঝি ঝটিকার অব্যবহিত পূর্ববর্তী নিঃস্পন্দ স্থিরভাব? কিন্তু এ ঝটিকার কারণ কি? সরলা—সংসার-জ্ঞানানভিজ্ঞা যুবতী, কোথায়—কত দিনে—কি কারণে ঝটিকা উৎপন্ন হয়, তাহা কে বলিতে পারে? সে যখন সাজান বাগান শ্রমশান করিয়া চলিয়া যায়, তখন আমরা ভাবিয়া মরি—আর আমাদের অক্ষমতা উপলব্ধি করি।

আজ বিবাহিত জীবনের সকল কথা একে একে রাণীর মনে পড়িতে লাগিল। রক্তমূর্ত্ত নিদাঘের তীব্র তপনতাপে যখন ধরাপৃষ্ঠ রসজেশশূন্য, শুষ্ক, কঠিন হইয়া পড়ে তখন শম্পাস্তরণ শুকাইয়া যায়; তখন ধূলি-ধূসর, দীর্ঘ ধরাপৃষ্ঠে চাহিয়া কেহ বুঝিতে পারে না যে, ধরণী সমাজে সেই সৌন্দর্য্যের বীজ সংরক্ষণ করিয়াছে—তাহাকে মুক্ত হইতে রক্ষা করিয়া নূতন জীবনের আনন্দে ও আগ্রহে সম্পূর্ণ ও সর্বাঙ্গসুন্দর করিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু নিদাঘের পর যখন শিথল গভীর ভেরীনাগে বনভূমি বিকম্পিত করিয়া,—উজ্জলতাপতায় গগন মেঘজালে শিথল—সরস করিয়া পয়োদজ্জালবাহীপবনসহচর বর্ষা দেখা দেয়, তখন—যখন গিরি-কন্দর শিথিনৃত্যে মনোরম ও পঞ্চল ভেককলরবে মুখরিত হইয়া উঠে—বর্ষার প্রথম বারিধারা ধরাবন্ধ সরস করিতে না করিতে ধরণী সেই সমস্তসংরক্ষিত বীজ হইতে নূতন শম্পাস্তরণ বিস্তৃত করিয়া দেয়। তেমনই আমরা জীবনের যে সকল ঘটনা বিশ্বত হইয়াছি মনে করি, যে সকল ঘটনার কথা দৈনন্দিন জীবনের অল্পসংখ্য ঘটনার মধ্যে—সংসারের নিত্য প্রবহমান ঘটনার স্রোতে—দেখা দেয় না, শ্রুতি

সে সকলকে, সমস্তে রক্ষা করে। সে তাহাদের ভুলে না—ফেলে না। কিন্তু যে দিন—যখন যে মুহূর্তে সে সন্যোগ পায় সেই মুহূর্তেই সে অতীতের আবরণে সুরক্ষিত সেই সকল ঘটনা নূতনের উৎসাহে ও আশ্রয়ে, আনন্দে ও আকুলতায় আনিয়া উপস্থিত করে। অজ্ঞ শ্রুতি রাণীর বিবাহিত জীবনের সকল ঘটনা তেমনই ভাবে আনিয়া উপস্থিত করিতেছিল।

রাণীর মনে পড়িতে লাগিল, বিবাহের সময় সখীদল বিবাহিত জীবনের কত আশার কথা তাহার কর্ণমূলে গুঞ্জন করিয়াছিল। সেই সকল আশা লইয়া তিনি প্রথম স্বামীগৃহে আসিয়াছিলেন। পিতালয়ে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তাহার মুগ্ধ হৃদয় সেই আশার আলোকে রঞ্জিত কল্পনার সুখস্বপ্নলোকে বাস করিতে লাগিল। সেই স্বপ্নলোকে জীবনে দুঃখ নাই, কুসুমে কটক নাই, হৃদয়ে বেদনা নাই, অগতে অন্ধকার নাই। সে স্বপ্নলোকে সর্বত্র সুখের উৎস উৎসারিত। তাহার সহিত দুঃখশোকতাপপূর্ণ মরলোকের কোন সাদৃশ্য নাই। প্রেম প্রেমিকপ্রেমিকাকে সেই স্বপ্নলোকে লইয়া যায়—তথায় অব্যাহত সুখ ভোগ করিতে দেয়। প্রেম হৃদয়ের অন্ধকার দূর করে—জীবনের সৌন্দর্য বিকশিত করে। তাই প্রথম-প্রথম স্পর্শে হৃদয় প্রজাপতির পক্ষে আরোহণ করিয়া কল্পনাকুসুমসৌরভসুরভিত সুখলোকে বিচরণ করে।

রাণীর হৃদয় তখন সেই সুখলোকে বিচরণ করিতেছিল। আর তাহার কল্পনা তখন স্বামীকে বেষ্ঠন করিয়া ফিরিতেছিল।

এই ভাবে কয় বৎসর গেল। তখন রাজপুতানায় দুর্দিনার ছায়াপাত হইতেছে, কুটবুদ্ধি আকবর দিল্লীর সিংহাসনারোহণকালেই স্থির করিয়াছিলেন, ভারতে মোগল-প্রভুত্ব যাহাতে বন্ধমূল হয়, তাহার চেষ্টা করিবেন। পিতার লাঞ্চার কথা তিনি ভুলিতে পারেন নাই। তিনি ছলে, বলে, কৌশলে ভারতে মোগল-প্রভুত্ব স্থায়ী করিবার চেষ্টায় ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। তাহার দীর্ঘজীবন সেই চেষ্টাতেই ব্যয়িত হইয়াছিল। হিন্দুকে বিবাহবন্ধনে বদ্ধ করিয়া তাহার সহায়তা লাভ করা, হিন্দুকে উচ্চ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার স্বতন্ত্র্যসংরক্ষণসঙ্কল্প নষ্ট করা, হিন্দুকে মিষ্ট ব্যবহারে ভুষ্ট রাখিয়া তাহাকে তাহার প্রকৃত অবস্থা বিচারে অন্ধম করা,—এই সকলই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। আর এই উদ্দেশ্যই তাহার রাজনীতি গঠিত করিয়াছিল। বীরভূমি রাজপুতানা তাহার শ্রোম-দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই। তিনি রাজপুতদিগকে মোগল সিংহাসনে বদ্ধ করিবার চেষ্টায় চেষ্টিত ছিলেন। সংগ্রামে, সমাজবন্ধনে, সখ্যতায়—কেহ কেহ মোগলের সহায় হইতেছিলেন।

রাণীর পিতা প্রবীণ রাজপুত্র । তিনি রাজপুত্রদিগের এইরূপ ব্যবহারে অত্যন্ত ব্যথিত হইতেছিলেন । তিনি তাঁহাদের কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া যে সকল রচনা রচিত করেন—চারুগগন তাহা গান করিয়া ফিঙ্গিত । রাজপুত্রানার হাঁত-হাসে সেই সকল বীরত্ব-উদ্দীপক রচনার বিশেষ উল্লেখ আছে । রাণী বাণিকা-বয়সে সেই সকল রচনা শুনিতেন ; পিতার নিকট রাজপুত্রের অতীত গৌরব ও বর্ত্তমান অধঃপতনের কথা শুনিতেন ; পিতার মতে আকুল হইতেন । বাণিকা-হৃদয়ে রাজপুত্র-গৌরব সমুজ্জ্বল রাখিবার বাসনা ক্রমে বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল ।

এই অবস্থায় তিনি স্বামীর 'ঘর করিতে' আসিলেন । তখন তাঁহার উন্মেষো-গুথ হৃদয়ে বাসনা—তিনি স্বামীকে রাজপুত্রগৌরবসংরক্ষণে সচেষ্ট করিবেন ; তাঁহার দ্বারা রাজপুত্রানা একান্ত্রবে বন্ধ করিয়া রাজপুতকে মোগলের বন্ধুত্ববন্ধনে—অর্থাৎ দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে দিবেন না ; ভারতে রাজপুতশক্তি মধ্যাহ্ন ভাস্করের মত প্রাদীপ্ত শোভায় সমুজ্জ্বল করিবেন । তরুণ হৃদয়ের কল্পনা সেই বাসনাকে বর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়াছিল । তিনি তখন সেই বাসনার প্রভাবে প্রভাবিতা—তাহার অশ্রু বাকুলা ।

সেই প্রবল বাসনা লইয়া তিনি স্বামীর 'ঘর করিতে' আসিলেন ; আসিয়া প্রথমেই স্বামীর একটি কার্য্য স্বামীর প্রতি তাঁহার ভালবাসা ভক্তিতে, পরিণতি-প্রাপ্ত হইল ।

কুলপ্রথা অল্পসারে রাণীর সহিত কয়জন সখী আসিয়াছিল । এইরূপ সখীরা রাজ-অস্ত্রপুত্রেই থাকিয়া যাইত ; আমাত্যর অশ্রুই তাহারা প্রেরিত হইত । রাজা তখন যুবরাজ । তিনি এই প্রাচীন প্রথার বিরোধী হইলেন । তিনি পক্ষীর সখীদিগকে ফিরাইয়া পাঠাইলেন ; কিন্তু সে কার্য্য এমনভাবে সম্পন্ন করিলেন যে, তাহাতে অশিষ্ঠাচারের ছায়াস্পর্শও হইল না । বলা বাহুল্য পক্ষীর উন্মেষোগুথ হৃদয়ে ইহাতে আনন্দের গীমা রহিল না । তিনি বিষ্ময়ে, পুলকে, প্রেমে ও প্রকাশ আকুল হইয়া উঠিলেন । এ কার্য্যে যুবরাজ যে দৃঢ়তা ও যে সাহস দেখাইলেন, তাহাতে তাঁহার পক্ষীর হৃদয়ে আশা জগিল—রাজপুত্রের গৌরব-রক্ষা তাঁহা হইতেই সম্ভব হইবে । তিনি সেই আশায় উৎফুল্ল হইলেন ।

কিন্তু যুবরাজ পক্ষীর সে ভাব বুঝিতে পারিলেন না । তিনি তখন প্রেমস্বপ্নে বিভোর । পক্ষী রাজ্যের কথা—প্রজার কথা—মোগলের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিলেন, সে সকল বিষয়ে পতির মনোযোগ নাই । তিনি বড় আশায় হতাশ হইলেন ।

তাঁহার পর মোগলের অত্যাচারের কথা অস্ত্রপুত্রেও পৌছিতে লাগিল । পক্ষী

দিন দিন ভাবিতে লাগিলেন, পতি শোণ্যবীণ্যহীন—জড়বৎ জীবন যাপন করিতেছেন। তাঁহার প্রেম প্রথমপ্রবাহপথে হতাশার শিখাখাটীতে প্রতিহত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইল। তাহার পর তিনি শুনিতে লাগিলেন, অন্তঃপুরে কেহ কেহ বলাবলি করিতে লাগিল—যুবরাজ পত্নীর অল্প রাজকার্য্য বিসর্জন করিয়াছেন। কি লজ্জা! কি আক্ষেপ! তিনি কি চাহিয়া কি পাইলেন। তাঁহার প্রতিহত প্রেম তাঁহার হৃদয়েই রক্ষা রহিয়া হৃদয়কে পীড়িত করিতে লাগিল।

তাঁহার পর একপ অবস্থায় যাহা হয়, তাহাই হইল; উভয়ের মধ্যে ব্যবধান বাড়িতে লাগিল। প্রেমের প্রভাত-কিরণে জীবন সমুজ্জ্বল হইতে না হইতে হৃদয়ে ঔদাসীন্তের গাঢ় ছায়া পড়িল। প্রেমের প্রবাহে যদি ঔদাসীন্তের বাধা পড়ে তবে তাহা ক্রমেই বাড়িয়া চলে।

যুবরাজ রাজ্যশাস্ত করিলেন। কিন্তু রাজ্যের দিকে তাঁহার দৃষ্টি নাই। রাণী বুদ্ধিতে পারিলেন না,—প্রেমের প্রথম উচ্ছ্বাস অপগত হইলে তিনিই শক্তিসঞ্চার করিয়া রাজাকে কর্তব্য-সাধনে সমুৎসুক করিতে পারিতেন। তিনি বুদ্ধিতে পারিলেন না,—তাঁহারই ব্যবহারে রাজার আর কোন বিষয়ে উৎসাহ নাই, তাই—তিনি রাজকার্য্যেও মনোযোগ দান করেন না।

এই ভাবে এত দিন কাটিতেছিল।

এখন রাজার ভাবান্তর দেখিয়া রাণীর হৃদয়ে সেই সঞ্চিত প্রেমরাশি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তিনি আপনাকে দিক্কার দিলেন;—হায়, তিনি কি অন্ধ! যাহার এত গুণ, তাঁহার গুণবিষয়ে তিনি অন্ধ হইয়াছিলেন। যিনি সর্ব্বতোভাবে রাজগুণে বরেন্য, তিনি তাঁহাকে অসার মনে করিয়াছেন।

রাণী কান্দিতে লাগিলেন। হায়, তিনি কি ভ্রান্তিবশে কি অমূল্য রত্ন হারাইয়াছেন।

বহুক্ষণ কানিয়া মনের ভার লবু হইলে রাণী উঠিলেন। তখন চন্দ্র পশ্চিম দিক্চক্রবাল স্পর্শ করিতেছে—দিবালোক ফুটে ফুটে। সেই স্নিগ্ধমধুর আলোকে—সেই দিবা ও নিশার সন্ধিস্থলে উমার মনে হইল, যেন রাণীর রূপরাশি কোমলতায় স্নিগ্ধ হইয়াছে—তাঁহাকে শিশিরস্নাত কুসুমের মত দেখাইতেছে।

রাণী মুখ তুলিয়া উমাকে দেখিলেন; উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলেন, “উমা, আমি কি ভ্রান্ত!” রাণীর হৃদয়ে প্রবল বাসনা জন্মিল, রাজার কাছে সকল কথা বলিবেন। তিনি উচ্ছান ত্যাগ করিয়া প্রাসাদে রাজার শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন। রাজা সে গৃহে নাই।

প্রজ্ঞাপারমিতা ।

‘আর্য্যাবর্ত্তে’ প্রজ্ঞাপারমিতা দেবীর যে মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা প্রকাশিত হইল, তাহা মালদহ ও রাজসাহীর সংযোগস্থলে গাজুর গ্রামে এক মৎস্যজীবীর গৃহে বহুকাল বিরাজ করিতেছিল। গ্রাম এক বৎসর হইল ইহা আমার হস্তগত হইয়াছে। গাজুর গ্রাম সম্ভবতঃ কোন সময়ে পাল রাজ্যগণের রাজধানী ছিল। এখানে বিবিধ প্রকারের বুদ্ধমূর্ত্তি ও অসংখ্য দেবদেবীর মূর্ত্তি বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে এবং ভগ্ন প্রাসাদেরও নানারূপ চিহ্ন বিদ্যমান আছে। গাজুর নাম আমাদের নিকট সুপরিচিত। বেহলা স্বামীর শব লইয়া গাজুর নদীতে ভাসিয়া গিয়াছিলেন। এই গ্রাম কি সেই নদীর তীরে অবস্থিত ছিল ?

মূর্ত্তিসম্বলিত সমগ্র প্রস্তরখানি ৩১ ইঞ্চ দীর্ঘ এবং ১৫ ইঞ্চ প্রশস্ত। কেবল মূর্ত্তিটি ১৮ ইঞ্চ দীর্ঘ এবং ১২ ইঞ্চ প্রশস্ত। প্রস্তর ফলকের নিম্নে একটি কৌলক আছে। মূর্ত্তির দক্ষিণে হস্তীব এবং বামভাগে তারা। পাদপীঠে দক্ষিণ দিকে দুইটি ভক্ত। উর্দ্ধে পঞ্চাঙ্গানী বুদ্ধ এবং মূর্ত্তির দক্ষিণে ও বামে প্রস্তরফলকে ভূজঙ্গধর সচক্ষু শিখী এবং সিংহ ও অশ্ব উভয়ের আকৃতিযুক্ত জন্তু বিশেষের চিত্র ক্ষোদিত। উর্দ্ধতম ধ্যানী বুদ্ধের নিম্নে সিংহমুখ। ইহা দেবীর অভিযেক-নিমিত্ত ফোয়ারা স্বরূপে কল্পিত হইয়া থাকিবে। প্রজ্ঞাপারমিতা দেবী বিকশিত শতদলে আসীনা। ইনি দ্বিজ্ঞা—এক হস্ত ত্যাগ ও বরদানের সঙ্কেত অর্দ্ধ প্রসারিত। অপর হস্তটি ভগ্ন হইয়াছে কিন্তু তাহা যে গম্ভীর্ণ বিকাশোন্মুখ পদ্ম কুম্মটি ধারণ করিয়াছিল, তাহা দৃষ্ট হইতেছে। দেবীর কিরীট ভগ্ন হইয়াছে কিন্তু তদীম শিরের জ্যোতির্ময় পরিবেষ্টন রহিয়াছে।

বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে যাহারা এই মূর্ত্তিটি দেখিয়াছেন, তাহারা অনুমান করেন, ইহা খৃষ্টীয় অষ্টম কি নবম শতাব্দীতে নির্মিত হইয়াছিল। ইহা মগধ কলা-শিল্প-পন্থী কিন্তু মূর্ত্তির গড়দেশে,জয়গে ও ওষ্ঠাধরে চীন শিল্পাদর্শের কিছু কিছু চিহ্ন বিদ্যমান। ভারতীয় পরবর্ত্তী যুগের মূর্ত্তিগুলির সঙ্গে এই প্রাচীন মূর্ত্তির একটু বিভিন্নতা আছে। পরবর্ত্তী ভারতগণ কিছু অলঙ্কারপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহারা বিগ্রহের কণ্ঠাবলম্বী হার, বাহুর অঙ্গন, কটির মেখলা ও পরিধেয় বস্ত্রের নানা অপূর্ণ ভঙ্গী ক্ষোদিত করিতে যেরূপ যত্ন প্রদর্শন করিতেন, বিগ্রহের দেবতাব রক্ষা করিতে ততটা প্রয়াসী হইতেন না। ভারতীয় কলা-শিল্পের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, শিল্পি-গণ ধ্যামের ভাব ধারণা করিতে পারিতেন। তাহারা বিগ্রহে কেবল মনুষ্যের

আকার দিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না ; পরন্তু সেই বিগ্রহ যে দেবতা এবং উপাত্ত, তাহার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বিশেষতঃ মুখমণ্ডলে সেই ভাবের অভিব্যক্তিসাধনে প্রয়াসী হইতেন। এই জন্তই সেই গ্রাচীন বিগ্রহগুলির বাহু গঠনে যদি কিছু অসামঞ্জস্য বা দোষ থাকে, আমরা তাহা ভুলিয়া যাই। যে মহেশ্বর ছটা বিগ্রহের ললাট ও অধরোষ্ঠে বিচ্ছুরিত, যে ধ্যানের ভাব সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও করাসুঙ্গীর সংক্ষেপে প্রকটিত, তাহাই আমাদের চিত্তকে ভক্তির ও নিশ্চয়ের ভাবে পরিপ্লুত করে।

গাঙ্গার ভাস্কর্যের নিদর্শনগুলি ভারতীয় মিউজিয়ামের কাছে বিরাজ করিতেছে। বুদ্ধের বিচিত্র মূর্তি তথায় দর্শনীয়। এই শিল্পশালায় কোথাও বা বুদ্ধ প্রচার করিতেছেন, দীর্ঘশাস্ত্র বুদ্ধ মুগ্ধ হইয়া তাহা শুনিতেছে, বালক ও রমণীগণ বুদ্ধের উপদেশ শুনিবার জন্ত আগ্রহসহকারে তাঁহার চতুর্দিকে দাঁড়াইয়াছে। কোথাও বা বুদ্ধ মৃত্যুশয্যায় শায়িত ; সমুখে উৎকৃষ্ট শিষ্যবর্গ। গাঙ্গার শিল্পশালায় মূর্তিগুলি অনেকটা গ্রীক আদর্শে বিরচিত। মগধ মূর্তির বাহুগঠনের ক্রটি গাঙ্গার ভাস্কর্যে দৃষ্ট হয় না ; সুতরাং প্রথম দৃষ্টিতে গাঙ্গারের আদর্শই ভারতীয় ভাস্কর্যের পরাকাষ্ঠা বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু যাহারা প্রকৃতরূপে ভারতীয় শিল্পমহিমা জানিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিয়াছেন, গাঙ্গারের আদর্শে ধ্যান নাই। তাহাতে বাহিরের আকার আছে, ভারতীয় দেব-ভাব নাই ; তাহা মানুষের অঙ্গকরণ, কিন্তু স্বর্গকে সাধকের চক্ষুতে প্রতিভাত করে না। বুদ্ধদেব প্রচার করিতেছেন,—সেই দৃশ্য গাঙ্গারবাসী ভাস্কর সাধারণ ঘটনায় পরিণত করিয়া ফেলিয়াছেন, প্রচারক ও শ্রোতার কোন বিশেষত্ব নাই। এদিকে অজন্তার চিত্রে বুদ্ধ ভিক্ষায় বাহির হইয়াছেন, নগরের রমণী ও বালক ভিক্ষা দিতে যাইয়া তাঁহার রূপ দেখিয়া ভিক্ষা দিতে ভুলিয়া গিয়াছে ; সহসা দেবতা দেখিলে মানুষের যেরূপ বিহ্বল হইয়া পড়িবার কথা, চিত্রকর তাহাই আঁকিয়া দেখাইয়াছেন ; বুদ্ধের রূপসুধা পান করিয়া ভিক্ষাপ্রদানোচ্ছত বালকের ও নারীর চক্ষু ধ্যানের ভাবে উজ্জ্বল হইয়াছে। অজ্ঞ দেশের চিত্রকর এই ভাবটি চিত্রে আঁকিয়া বুঝাইতে পারিতেন না।

মগধ কলা-শিল্প ও তৎপণাবলম্বী চিত্রাদর্শের ইহাই বিশেষত্ব। সেই মকল বিরাট দেবদেবীর মূর্তির পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আমরা বিম্বিত হইয়া পড়ি। ভাস্কর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গঠন করিয়াছেন, কিন্তু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গঠনের প্রতি তিনি কতকটা উদাসীন। তাঁহার দৃষ্টি উচ্চতর-লক্ষ্য-বদ্ধ। আত্মার যে প্রশান্ত ভাবকে যৌগলগ

নির্ঝাণ ও হিন্দুরা যোগ আখ্যা প্রদান করেন, যাহাতে অবস্থিত হইলে মাক্ষয় দেবতা হয়, মাগধ ভাস্কর সেই মহাশক্তির ভাব বিগ্রহে আনিতে চেষ্টিত। এই চেষ্টায় প্রাচীন কালের অসমগঠন বিরাট প্রস্তরখণ্ডগুলি মহিমাষিত দেববিগ্রহে পরিণত হইয়াছে। সেই সকল সিংহবৎ তেজস্বী অথচ মায়াযুক্ত, বিঘাটিকায় অথচ নিষ্কল্লাপবৎ প্রশান্ত আদর্শ-পুরুষ মূর্তি দেখিলে অল্প সৰ্ব প্রকার চিত্র বা প্রস্তর মূর্তি আগাদের চক্ষুতে ক্ষুদ্র হইয়া পড়িবে। মগধ হইতে কপিলাবন্ত বহু দূরে অবস্থিত নহে। মাগধ ভাস্কর কপিলাবন্তর ভিক্ষুরাজকে যথাযথ গঠন করিবেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? তিনি যে তাঁহারই করুণাকে জীবন্ত করিবার অভিপ্রায়ে প্রজাপারমিতার রূপ প্রাপ্তবে ক্ষোদিয়াছিলেন, ইহাতে সন্দেহ নাই।

এই প্রজাপারমিতা মহাযানপন্থী বৌদ্ধগণের প্রদান দেবতা। ইনিই ধর্ম, — জীর্ণপা। দয়া ইহার প্রদান লক্ষণ। আলোচ্য মূর্তিখানি নিরঞ্জন ভীষ্মচার্য্যের ক্ষতিচক্ৰ ধারণ করিতেছে; কিন্তু তথাপি ইহার ওষ্ঠাধরে যে সর্বজনমনোহর হাস্যের একটু বিকাশ আছে, তাহা অনিন্দ্য দেবহাস্য, নরজগতে ইহার উদাহরণ বিরল। মুগ্ধ শিশুর হাস্যের সঙ্গে এই হাসির একটু সাদৃশ্য আছে। হস্তের ভঙ্গী ও অবয়বের প্রতি দৃষ্টি করুন, ইনি যেন শরীরী হইয়াও অশরীরী। দেহে পূর্ণযৌবনলক্ষণ বিজ্ঞমান, কিন্তু ইহার শরীর যেন করুণার ছায়ামাত্র। ইনি চিন্ময়ী প্রতিমা। বরপ্রদায়ী হস্তের ভঙ্গীতে স্বপ্নের করুণা আভাসে ব্যক্ত হইতেছে। মুখমণ্ডল ও সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা যেন ভাস্কর করুণাকে জীবন্ত করিতে প্রয়াসী। তিনি বিগ্রহকে উপলক্ষ করিয়া যেন স্বর্গীয় ভাবটিকে শরীরে পরিণত করিয়াছেন। সেই ভাব দেবীর রাতুল পদযুগলে, সক্রমণ দৃষ্টিতে, স্নেহামধুর হাসিতে ও সমস্ত অবয়ব-ভঙ্গীতে যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে। যুবতী নারী বিশ্বমাতৃরূপে প্রকাশ পাইয়াছেন।

গাজুর গ্রামের, এই বিগ্রহ কোন্ পাল রাজা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়া কতকাল পূজা পাইয়াছিলেন, কে বলিতে পারে? স্বাধীন বঙ্গনৃপতির শিরস্থিত গণি-মুকুটের জ্যোতিতে কতবার ইহার চরণনখর উজ্জ্বল হইয়াছে, কে বলিতে পারে? কত নরনারীর আনন্দ-কোলাহলে, কত পুরোহিতের কন্মুগত দীপালীতে ইহার আরাতি হইয়াছে, কে বলিবে? নির্মল কুমুম ঘেরূপ ছিন্নদল হইয়াও তাহার স্বর্গীয় সুষমাটুকু রক্ষা করে, উন্নত মুসলমানের রূপাণে বিক্ষত হইয়াও সেইরূপ এই মুখমণ্ডলের অপূর্ণ দেবহাস্যটুকু এখনও সম্যক্ লোপ পায় নাই। মাগধ-কলাশিল্পী যে দেবভাব আয়ত্ত করিয়াছিলেন, সেই হাসিটুকু তাহারই ইতিহাস

রক্ষা করিয়াছে। যে দিন নিরঞ্জন শর্মা কালাপাহাড় রূপ ধারণ করিয়া গাছুর ধ্বংসের জন্ত উপস্থিত হইয়াছিলেন, সে দিন কত না ভক্তের প্রাণ এই বিগ্রহের জন্ত বিদীর্ণ হইয়াছিল? ইহার অঙ্গ ক্ষত করিবার পূর্বে ভিন্নধর্মীর অসি কত ভক্তের হৃদপিণ্ডনিঃসৃত তপ্ত রক্তে রঞ্জিত হইয়াছিল?

এই মূর্তির উর্ধ্বে যে পঞ্চাখ্যানী বুদ্ধ-মূর্তি আছে, ইহার সঙ্গে আমাদের একটু বিশেষ সম্পর্ক আছে। প্রজ্ঞাপারমিতার মূর্তি ব্যতীত অপরাপর বৌদ্ধ দেবমূর্তিরও শিরোর্ধ্বে বুদ্ধমূর্তি দৃষ্ট হয়। অবশ্যোক্তেশবের মূর্তির মুকুটের উপরও অক্ষোভ্য বুদ্ধের ধ্যানী মূর্তি অনেক সময় দৃষ্ট হয়। বৌদ্ধ চণ্ডী বিগ্রহের নীর্ঘেও তুঙ্গপ মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। আমাদের ছুর্গা প্রতিমার শিরোর্ধ্বে যে ক্ষুদ্রকায় মহাদেব-মূর্তি দৃষ্ট হয়, তাহা সেই অক্ষোভ্য বুদ্ধের একটি সংস্করণমাত্র। হিন্দুগণ তাঁহাকে শুধু মহাদেবে পবিত্র করিয়া ছাড়েন নাই; পরন্তু তাহার শ্বশুরালয়-যাত্রার একটা কাব্য কথার ও সৃষ্টি করিয়া বৌদ্ধ মন্ত্রবের প্রাচীন তত্ত্ব একবারে লোপ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের দেশের চিত্রকর ও ভাস্কর দেবপ্রতিমা মঞ্চকে একবার যাহা নির্মাণ করিয়াছে, পুরুষানুক্রমে তাহাই করিবে, স্মৃতবাং, চণ্ডীর মূর্তি গড়িতে যাইয়া সে অক্ষোভ্য বুদ্ধটিকে বাদ দিতে সম্মত হয় নাই, পুরোহিতের অনুরোধে ধ্যানী বুদ্ধের মূর্তিটির কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিয়া মহাদেব গড়িয়া দিয়াছে, এইমাত্র।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

সিন্ধু-জলে।

(হায়েন)

জলিছে সাগরবারি রবির কিরণ,	সিন্ধুরে বেসেছি ভাল আঁকুল প্রণয়ে।
গলিত কাঞ্চন যেন তায়।	ওই দ্বিধা প্রবাহমালায়
জীবনের জ্যোতিঃ যবে নিবিবে মরণে,	শান্তিধারা ঢালিয়াছে এ দক্ষ হৃদয়ে;
সিন্ধু-জলে ভাগ্যে আমায়।	বদ্ধ তাই মোরা দু'জনায়।

সমালোচনা ।

রাণী ভবানী ।*

—ঃঃ—

কিছুদিন পূর্বে অধ্যাপক ম্যাসন ইংরাজী উপন্যাসগুলিকে আয়োজন শ্রেণীতে বিভক্ত করিবার কথা বলিয়াছিলেন । নব্য বঙ্গ ইংরাজী উপন্যাসের আদর্শ উপন্যাস রচিত হইয়াছে ও হইতেছে । সেই জন্য অধ্যাপক ম্যাসন যে আয়োজন শ্রেণীর উল্লেখ করিয়াছিলেন—তাহার মধ্যে কয়েক শ্রেণীর উপন্যাস বাঙ্গালাতেও দৃষ্ট হইবে । ঐতিহাসিক উপন্যাস ইংরাজীতে আছে, বাঙ্গালাতেও হইয়াছে । ‘রাজসিংহের’ ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, “আমি পূর্বে কখন ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখি নাই । দুর্গেশনন্দিনী বা চন্দ্রশেখর বা মীতারাণিকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যাইতে পারে না ।”—অর্থাৎ এই গ্রন্থদ্বয়ে তিনি সর্বত্র সর্বতোভাবে ইতিহাসের অনুগমন করেন নাই । তাহা না করিলেও যে হিসাবে ইংরাজী সাহিত্যে থ্যাকারের ‘এসমণ্ড’ ঐতিহাসিক উপন্যাস সে হিসাবে এই গ্রন্থদ্বয়ও, ভাল হউক আর মন্দ হউক, ঐতিহাসিক উপন্যাস, বলা যাইতে পারে । আগা-নিগের আলোচ্য ‘রাণী ভবানী’ ও ঐতিহাসিক উপন্যাস । বরং ইহাকে ঐতিহাসিক উপন্যাস না বলিয়া ইতিহাস ও উপন্যাস বলিতে ইচ্ছা করে । আগাদের দুঃখ এই যে, লেখক ইতিহাসের ও উপন্যাসের সন্নিধান না করিয়া কেবল ইতিহাস লিখেন নাই ।

ইংরাজী সাহিত্যে থ্যাকারের ‘এসমণ্ড’ ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শ । আলোচ্য গ্রন্থ পাঠকালে আগাদের পুনঃ পুনঃ ‘এসমণ্ডের’ কথা মনে পড়িয়াছে । কতকগুলি বিষয়ে দুই পুস্তকে সাদৃশ্য সপ্রকাশ । উভয় পুস্তকেই ঘটনার প্রাচুর্য্য আছে ; কিন্তু আখ্যানবস্তুর অত্যন্ত দীর্ঘ—সুসংবদ্ধ নহে । উভয়েরই গল্পাংশ স্বতঃবিকশিত নহে ; পরস্তু ঘটনাবহুলকালসুন্দর ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গতি ; এই সকল ঘটনা নদীর স্রোতে একের পর অপর তরঙ্গের মত উপস্থিত হইয়াছে—দুইটির মধ্যে কোথাও অবকাশ নাই । উভয় পুস্তকেই ঐতিহাসিক চিত্র । সাদৃশ্য এই পর্য্যন্ত । কিন্তু যে স্থানে ‘এসমণ্ড’ ইংরাজী সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শ, সে স্থান ‘রাণী

* রাণী ভবানী—শ্রীহর্গদাস লাহিড়ী প্রণীত । ৩৮২, ভবানীচরণ চক্ৰবর্ত্তী স্ট্রীট, কলিকাতা ।
—‘বঙ্গবাণী’ কার্যালয় হইতে প্রকাশিত ।

ভবানীতে' সর্বত্র ফুটে নাই। সমালোচক ব্রজলী বলিয়াছেন, ঐতিহাসিক উপ-
স্থাপন লেখকদিগের কতকগুলি বিপদ আছে; তাঁহারা অনেক সময় উপকরণ
গোপন রাখিতে পারেন না, যে কোশলে তাঁহারা অতীত চিত্র চিত্রিত করেন সে
কোশল প্রকাশিত হইয়া পড়ে, বর্তমানের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহারা
অতীতের বিচারে ও বিবেচনায় প্রবৃত্ত হইয়া পড়েন। থাাকাতে এই সকল বিপদ লঙ্ঘন
করিতে পারিয়াছিলেন, তাই 'এসমণ্ড' ইংরাজী সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপস্থাপনের
আদর্শ। 'রাণী ভবানী'র গ্রন্থকার সর্বত্র সেই সকল বিপদ লঙ্ঘন করিতে
পারেন নাই। ইহা সর্বত্র অক্ষমতাবশতঃ নহে; পরস্তু স্থানে স্থানে ইচ্ছাকৃত।
সেই অল্প আশ্রয়ের দুঃখ, তিনি ইতিহাস লিখেন নাই—ঐতিহাসিক উপস্থাপন, বা
ইতিহাস ও উপস্থাপন লিখিয়াছেন।

দুর্গাদাস বাবু এই গ্রন্থে নবাব আলীবর্দী খাঁর সময় হইতে “ছিয়াস্তরের
মহাস্তর” পর্যন্ত অনতিদীর্ঘ কালের বাঙ্গালার রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের
আভাস দিয়াছেন। বাঙ্গালার ইতিহাস এই সময় অত্যন্ত ঘটনাবল্লভ; এই সকল
ঘটনার সম্যক আলোচনায় বাঙ্গালীর শিক্ষা হইতে পারে। এই সময় বাঙ্গালার
রাজনৈতিক অত্যাচারী মুসলমানের হস্তচ্যুত হইয়া ইংরাজের হস্তগত হইয়াছিল; এই
সময় সঙ্কীর্ণস্বার্থপরবশ কর্মচারীদিগের দোষে বাঙ্গালার হাহাকার উঠিয়াছিল;
এই সময় বাঙ্গালার জামীদারদিগের প্রতাপতপন মধ্যগগন হইতে ক্রমে অস্তাচল-
মুখগামী হইয়াছিল; এই সময় “বর্গীর হাঙ্গামায়” বাঙ্গালার রাজনৈতিক ও সাম-
াজিক চিত্র পরিবর্তিত হইয়াছিল; এই সময় পর্যন্ত বাঙ্গালা পুরাতন ও পরিচিত
পূর্বপুরুষামুখ্যত পথের পথিক। দুর্গাদাস বাবু যেরূপে এই সময়ের ভাবে অনু-
প্রাণিত হইয়া এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন; তিনি যেরূপ সময়ে এই সময়ের
ইতিহাসের উপকরণ একত্র করিয়াছেন; তিনি যেরূপ সাগ্রহে যে কিম্বদন্তীর
ফেনপুঞ্জমধ্যে ঐতিহাসিক সত্যের নীর্ণধারা লুকায়িত থাকে তাহার সংগ্রহ করিয়া-
ছেন—তাহাতে তিনি উপস্থাপন না লিখিয়া ইতিহাস রচনায় শক্তি নিয়োগ
করিলেই ভাল হইত। যদি ভ্রমবিমুক্ততা তাঁহার উপস্থাপন রচনার কারণ হয়,
তবে বলিতে পারি, তিনি আত্মশক্তির পরিমাণ বুঝিতে পারেন নাই।

- বাস্তবিক তিনি এত ঐতিহাসিক উপকরণ একত্র করিয়াছেন যে, সেই
সকলের ব্যবহার-চেষ্টাতেই উপস্থাপনের ক্ষমতা লব্ধ গতি বিঘ্নপ্রাপ্ত হইয়াছে, অবাস্তব
প্রসঙ্গের উত্থাপন হইয়াছে। তিনি এত কিম্বদন্তী সংগ্রহ করিয়াছেন যে, বিশেষ
চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি সর্বত্র অতিরঞ্জনবর্জিত সত্যের উদ্ধার করিতে পারেন নাই।

আমাদের প্রথম মন্তব্যের দৃষ্টান্ত স্বরূপে “সত্যী,” “সহমরণে,” “পূর্বস্থিতি” প্রভৃতি অংশের ও দ্বিতীয় মন্তব্যের দৃষ্টান্তস্বরূপে বদরগঞ্জের ঘাটে হাঙ্গরের গ্রাসে কুস্তিভাসের আত্মবিসর্জনে-চেষ্ঠার উল্লেখ করা যাইতে পারে । কিম্বদন্তী যে অঞ্চলে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল বলিয়া রটনা করিয়াছে—সে অঞ্চলে হাঙ্গরের আবির্ভাব অসামান্য ঘটনা ।

চুর্গাদাসবাবু যে সকল উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, সে সকলের যথেষ্ট সম্যাবহারও করিয়াছেন । স্মরণ্য উপস্থাসের হিসাবে পাঠকের যাহা লোকসান, ইতিহাসের হিসাবে তাহা লাভ । লাভ লোকসান খতাইলে মোটের উপর কিছু লাভই থাকিয়া যায় । আর পাঠকের সর্বোপেক্ষা অধিক লাভ, আদর্শ হিন্দুরমণীর পুণ্য চরিত্রের বিবরণ পাঠে । রাণী ভবানীর নাম বঙ্গে সর্বত্র সুপরিচিত । তিনি পুণ্যবতী হিন্দু বঙ্গনারীর আদর্শ ; তাঁহার জীবন পরার্থে উৎসৃষ্ট ; তিনি ভোগের মধ্যে, থাকিয়াও ত্যাগী ; মর্কোপকারকম গৃহস্থাত্মমে থাকিয়া তিনি পুণ্য জীবনের যে আদর্শ দেখাইয়াছে তাহাঃ—

“যতনে রাখিবে বঙ্গ মনের ভাণ্ডারে

রাখে যথা স্মৃগামৃতে চত্রের মণ্ডলে ।”

এই গ্রন্থমধ্যে একটি কিম্বদন্তীর উল্লেখ আছে ।—তাঁহাতে প্রকাশ, রাণী ভবানীর পৌষপুত্র সাধক রামকৃষ্ণ ভবানীধামে সাধনা করিতেন । “ভবানীপুরের পীঠস্থানে একদিন তিনি ভবানীর সাধনায় তন্ময় হইয়াছিলেন । দেবী স্বয়ং আবিভূতা হইয়া তাঁহাকে উপদেশ দিলেন,—‘তুমি আমার আরাধনা কি করিতেছ ? তোমার মাতা ভবানী আমার অংশরূপিনী । যদি আমার অমুকম্পা পাইতে চাও, জননীর চরণে শরণাপন্ন হও ।’ এই প্রত্যাদেশ শুনিয়াও সাধনা পরিত্যাগ না করায়, মহারাজ রামকৃষ্ণ ভবানীপুর হইতে নিমিষ্ট হইয়াছিলেন । কে যেন আসিয়া তাঁহাকে উত্তোলন করিয়া, দক্ষিণের দিকে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিল । পরদিন প্রভাতে পাকুড়িয়ার সেতুর নিকট মূর্ছিতাবস্থায় রাজাকে দেখিতে পাওয়া যায় । পাকুড়িয়ার ঠাকুর মহাশয়দিগের যত্নে তাঁহার মুচ্ছাভঙ্গ হইলে, মহারাজ তাঁহাদিগকে বলেন,—‘আপনারা আমাকে অবিলম্বে আমার মাতার নিকট পৌছাইয়া দেন ।’ রঘুমণি ঠাকুর এবং ভোলানাথ ঠাকুর প্রভৃতি মিলিত হইয়া বড়নগরে মহারাজী ভবানীর নিকট তাঁহাকে পৌছাইয়া দেন । সেখানে পৌছিয়া, ত্রিরাত্রি গঙ্গাবাসের পর, গঙ্গাজলে মাতার পাদপদ্মে মস্তক রাখিয়া মহারাজ রামকৃষ্ণ দিব্যধামে গমন করেন ।”—এই কিম্বদন্তী হইতেই বুঝা যায়, দেশের লোক রাণী ভবানীকে মূর্তিমতী দেবী বলিয়াই মনে করিত ।

তাহাদের সেরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ ও ছিল। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় সর্বপ্রথম রাণী ভবানীর পুণ্য জীবনের বিস্তৃত বিবরণ বিবৃত করেন। তিনি সত্যই বলিয়াছেন—“রাণী ভবানীর জীবন-কাহিনী আমাদের দেশের অর্ধ শতাব্দীর সুখদুঃখের বিস্তৃত কাহিনীর সঙ্গে একরূপ ভাবে জড়িত হইয়া রহিয়াছে যে, সমসাময়িক ইতিহাসের আলোচনা না করিলে, তাঁহার জীবন-কাহিনীর প্রকৃত মৌল্য অমূল্য করিবার উপায় নাই।” লোকে রাজার ও রাজনৈতিক বিপ্লবের কথা বিস্মৃত হয়, কিন্তু জনহিতকর অমুষ্ঠানের প্রমাণ বহুদিন বর্তমান থাকে। তাই বাঙ্গালার রাজনৈতিক ব্যাপারে রাণী ভবানীর সংগ্রাম ও কার্য লোকে বিস্মৃত হইয়াছে; কিন্তু তাঁহার পুণ্য কীর্তিব কথা আজও সর্বত্র সুপরিচিত। তৎকালে বাঙ্গালার জমিদারদিগের অসাধারণ সম্পদ ও সম্মান ছিল। সম্পদ ও সম্মানে নাটোররাজ বাঙ্গলার জমিদারদিগের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। হলওয়েল লিখিয়াছেন, রাণী ভবানীর অধিকৃত রাজসাহীর রাজ্য ঘুরিয়া আসিতে ৩৫ দিন লাগিত। গ্রান্টের মতে এত বৃহৎ জমিদারী ভারতে আর কোথাপি ছিল না। তখন রাজসাহী, নদীয়া, যশোহর, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান—এই কয় জিলার অধিকাংশ স্থান এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাণী ভবানী এই বিশাল রাজ্যের বিপুল আয় জনহিতকর অমুষ্ঠানে ব্যয় করিতেন। অক্ষয়বাবু লিখিয়াছেন,—“রাণী ভবানীর যে সকল পুণ্য কীর্তি এখনও একেবারে বিস্মৃত হয় নাই, তন্মধ্যে তাঁহার জলাশয়গুলিই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত অনেক দেব-মন্দিরের উচ্চ চূড়া ধূলিবিবলুষ্ঠিত হইয়াছে, তাঁহার সংস্থাপিত অনেক অতিথিশালার ভিত্তিমূল পর্য্যন্ত ও তিরোহিত হইয়া গিয়াছে, তাঁহার বহুব্যয়গর্ভিত অনেক রাজপথ কণ্টকবনে সমাচ্ছন্ন হওয়ায় লোকচলাচল রহিত হইয়া গিয়াছে;—কিন্তু তিনি যে সকল দীর্ঘিকা ও সরোবর খনন করাইয়া দিয়া দরিদ্রের জলকষ্ট নিবারণ করিয়াছিলেন, তাহার অচ্ছ সলিলে তাঁহার পুণ্য কীর্তি এখনও প্রতিবিম্বিত হইতেছে। তিনি কোথায় কত সরোবর খনন করাইয়া দিয়াছিলেন, পরোক্ষভাবে কত স্থানে জলাশয় খননের উৎসাহদান করিয়াছিলেন, এখন আর তাঁহার সংখ্যা-নির্ণয় করা সহজ নহে। একবার দুর্ভিক্ষসময়ে রাঢ়দেশের দুর্দশার অবস্থা স্বচক্ষে পরিদর্শন করিবার জন্য স্বদেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রীষ্মকালের প্রথমে রোজতাপে অশ্বারোহণে দীর্ঘ পথ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, যেখানেই এক একটি প্রসন্নসলিলা বিস্তীর্ণ দীর্ঘিকা দেখিয়া জলাদাতার নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, সেখানেই লোক ছুই হাত তুলিয়া রাণী ভবানীর নাম

করিয়া আশীর্বাদ করিয়াছে । কেহ যদি এখন ও পুরাতন রাজসাহী রাজ্যেব সকল স্থান পরিভ্রমণ করিতে পারেন, তবে এইরূপ শত শত জলদান ভাণ্ডের কীৰ্ত্তি-স্তম্ভে রাণী ভবানীর সহস্রদয় শাসননীতির পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন ।” কেবল বাণীশায় নহে, তৎকালে দুর্য্যোগ্য কান্দীতে ও গয়াক্ষেত্রেও তাঁহার পূণ্য কীৰ্ত্তি বিদ্যমান । লোকহিতকল্পে হিন্দুর পবিত্রতীর্থ—মোকদ্দাম কান্দীর সৌমানন্দারণ রাণী ভবানীর কীৰ্ত্তি । এই জনহিতৈষণার—এই আত্মত্যাগের—পূর্ণ পরিণতি “ছিন্নাত্মের মনস্তরঙ্গ” সময় পরিলক্ষিত হইয়াছিল । তখন স্রোতস্বতী যেমন দিগন্তবিস্তৃত মরুভূমি নিধন ও উর্ব্বর করিবার প্রাণান্ত চেষ্টায় আপনার সর্ব্বদান করে, রাণী ভবানী তেমনই দেশব্যাপী দারুণ হাহাকার নিবারণ করিবার চেষ্টায় আপনার অতুল সম্পদ দান করিয়াছিলেন । সেবার তিনি সত্য সত্যই আপনার সর্ব্বদান করিয়া বিশ্বজিৎ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন ।

আলোচ্য পুস্তকে পাঠক রাণী ভবানীর এই সকল পূণ্য কীৰ্ত্তির বিবরণ পাইবেন ।

এই স্থলে পুস্তকের আর একটি বিশেষত্ব উল্লেখ করিব । যে চিরনবীন চঞ্চল প্রেম অধিকাংশ উপন্যাসের মেরুদণ্ড এ গ্রন্থে তাহার স্থান নাই । রাণী ভবানী এই গ্রন্থের নায়িকা । বলিয়াছি, দেশের লোক তাঁহাকে মূর্ত্তিমতী দেবী বলিয়া মনে করিত ; তিনি মাতৃরূপিনী । সেই অল্প তাঁহার দাম্পত্যজীবনে লেখক চঞ্চল প্রেমের অনাবিল প্রকার পরিণতিই দেখাইয়াছেন । প্রেম জীবনের স্বপ্ন—শ্রদ্ধা জীবনের সাধনা ; প্রেম সুখ—শ্রদ্ধা শাস্তি । প্রেমের চিরচঞ্চল গানান্তিমিত্তিতা দ্বিত্ব প্রবাহে বৈচিত্র্য বিকশিত হয় । কিন্তু শ্রদ্ধার অচঞ্চল গাভীর্য্য ব্যতীত সংসারিক বা আধ্যাত্মিক উন্নতি অসম্ভব । এ অবস্থায় গ্রন্থকার যে চঞ্চল প্রেমের চটুল সৌন্দর্য্য বর্ণনার প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়াছেন, ইহা তাঁহার কৃতিত্বেরই পরিচায়ক ।

এখন পুস্তকের কয়টি ক্রটির উল্লেখ করিব । প্রথম, ছাপার ভুল । গ্রন্থে ছাপার ভুল অত্যন্ত অধিক । বিবামচিহ্ন, উদ্ধার চিহ্ন প্রভৃতির ভুল এত অধিক যে, মনে হয় প্রাক্ষ সংশোধন হয় নাই—বা ভাল করিয়া হয় নাই । ৯ পৃষ্ঠায় “জরীদারের” স্থানে “জড়িদার”, ২৩ পৃষ্ঠায় “দেউড়ীর” স্থানে “দেউরী”, ৩৯ পৃষ্ঠায় “সাস্থনা দান করিয়া” স্থানে “সাস্থনা করিয়া”, ১১৪ পৃষ্ঠায় “জিহ্বা লেহন”, ১১৫ পৃষ্ঠায় “নানির শাহের পাযাণ হৃদয়ের” স্থানে “পাযাণ নানির শাহের হৃদয়,” ১১৭ পৃষ্ঠায় “হৃদয়ের” স্থানে “হৃদয়ে হৃদয়ে,” ১৩৬ পৃষ্ঠায় “কলরবে” স্থানে “কলরবে,” ১৫৬ পৃষ্ঠায় “কর্ণের” স্থানে “কর্ণে কর্ণে,” ২৫৮ পৃষ্ঠায় “মড়কিওয়ালার” স্থানে “মরকিওয়ালার,” ২৬৪ পৃষ্ঠায় “খেত-শুভ্র” প্রভৃতি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে । ২৯৯ পৃষ্ঠায়

প্রোঢ়ান সঙ্গিনীর উক্তির কতকাংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয়, ভাষার কথা। গ্রন্থমধ্যে লেখক মহাশয় “রাজে” ও “চক্ষে” বহুবার ব্যবহার করিয়াছেন। চলিত ভাষায়—কথোপকথনে অনেক সময় “রাজির” স্থানে “রাজে” ও “চক্ষুত্তর” স্থানে “চক্ষে” ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু সে ব্যবহার শুদ্ধ—সুতরাং অসিদ্ধ। যে ‘বঙ্গবাসী’ কার্যালয়ের চেষ্টায় ‘রামায়ণের’ ও ‘মহাভারতের’ বৰ্জমান রাজবাটী হইতে প্রকাশিত বিস্তৃত অনুবাদ বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে স্থান পাইয়াছে, ‘শান্তপ্রকাশ’ যে ‘বঙ্গবাসী’ কার্যালয়ের বিরাট অক্ষয় কীর্তি, সেই ‘বঙ্গবাসী’ কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকে—ভূর্ণাপাস বাবুর মত প্রবীণ লেখকের রচনায় একরূপ অপাংক্ত্যম শব্দের সমাদর একান্তই দুঃখের কারণ। লেখক মহাশয় “তখন” শব্দের প্রয়োগে অকারণ কার্পণ্যপ্রকাশ করিয়াছেন। ৪৬ পৃষ্ঠায় আছে,—“এই বলিয়া, কীর্তি-বাস তাহাদিগকে যখন তাড়াইয়া দিবার উদ্যোগ করিল, তাহারা ধীরে ধীরে আপন আপন বঁটি সংযত করিয়া গজ গজ করিতে করিতে মাছ কুটিতে বসিয়া গেল।” এস্থলে “তাহারা” শব্দের অব্যবহিত পূর্বে বা পরে “তখন” শব্দ পরিত্যক্ত হইয়াছে। একরূপ দৃষ্টান্ত গ্রন্থমধ্যে অনেক আছে। লেখক লিপি-কুশল, ভাষাসম্পদের অধিকারী; কাষেই তাহার পক্ষে এ সকল ত্রুটি ইচ্ছাকৃত বলিয়া মনে হইয়, এবং সেইজন্যই আমরা এত কথা বলিলাম।

তৃতীয়, অশ্লীল কথা। লেখক গ্রন্থমধ্যে “গেট” ও “বাবু” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। সমালোচনার প্রারম্ভে আমরা ঐতিহাসিক উপস্থাপন লেখকদিগের যে সকল বিপদের কথা বলিয়াছি, বর্ণিতকালে অপ্রচলিত ও পরবর্তী কালে প্রচলিত শব্দের ব্যবহার সেই সকলের মধ্যে একটি। এই গ্রন্থে বর্ণিত কালে “গেট” শব্দ প্রচলিত ছিল না; “বাবু” শব্দ প্রচলিত ছিল, কিন্তু গ্রন্থকার যেরূপ স্থলে তাহার ব্যবহার করিয়াছেন সেরূপ স্থলে ব্যবহৃত হইত কি না মনে হইল। রানী ভবানীর বিবাহে তদীয় পিতা “গৌরী দান” করিয়াছিলেন—ইহাই কিম্বদন্তী। লেখকও এই মত গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু ১৩ পৃষ্ঠায় ও ৪৫ পৃষ্ঠায় তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে এ সম্বন্ধে মনেহের অবকাশ থাকে। সে অবকাশ না থাকিলে ভাল হইত। মানসিক চাঞ্চল্য অনেক সময় শারীরিক চাঞ্চল্যে আত্মপ্রকাশ করে সত্য, কিন্তু মানসিক চাঞ্চল্যে শারীরিক-চাঞ্চল্য-বাহুল্য হয় না। “চিন্তাতরঙ্গ” শীর্ষক পরিচ্ছেদে এই অনাবশ্যক শারীরিক-চাঞ্চল্য-বাহুল্য সপ্রকাশ। ১৯৫ পৃষ্ঠায় রাসকান্ত বলিয়াছেন, “শুভ্র মহাশয়কে তো আমিই জিদ করে’ বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছি।” কিন্তু ২৫৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশ তিনি

চণ্ডীদাস শিরোমণি মহাশয়ের পঞ্চাশোর্ধ্বে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সিরাজ-দৌলার সহিত তৈজসী কথোপকথন বাঙ্গালাতে হইতে হইতে সহসা অকারণে হিন্দীতে হইয়াছে। ইহাতে রসভঙ্গ হইয়াছে। ৩৮৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশ, “কুন্তি-বাসের একটি পুত্র, পুত্রবধু, দুইটি কন্যা ও স্ত্রীমাতা এখন তাহার সংসারে বিদগ্ধমান আছে।” ১৭ পৃষ্ঠায় কুন্তিবাস বলিয়াছিল, “সংসারে ছয়টি পোয়া।” একটির বিয়োগকথা গ্রন্থে নাই। লেখক একই স্থানে সংস্কৃত ও প্রচলিত শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন,—“আমার স্বামিপুত্রের কি অসাবধানতা ছিল? রাজার সংসার, রাজভৃত্যগণের পরিচর্যা; রাজবৈজ্ঞানিক নিয়ত মুখপানে চাহিয়া ছিল; কিন্তু তাঁহাদিগকেও ত কৈ রাখিতে পারিলাম না। তবে আর কেন? ভগবানের যা মনে আছে, তাই হবে।” “ভবানী সহমরণে যাইবেন, অনেকদিন চাইতেই মনস্থ করিয়াছিলেন”—লেখকের এই উক্তিভেদে আমাদের সর্বপ্রধান আপত্তি। যে হিন্দুরমণী স্বামীর মৃত্যুতে স্বেচ্ছায়—মানন্দে চিতানলে দেহত্যাগ করিতেন সেই হিন্দুরমণীর আদর্শ স্থানীয়া রাণী ভবানীর পক্ষে স্বামিবিয়োগের পূর্ক হইতেই সহমরণে যাইবেন মনস্থ করা অস্বাভাবিক। স্বামীর মৃত্যুকে তাঁহার পক্ষে সহমরণে যাইবার আকাজকা স্বাভাবিক, তখন তাঁহার স্মৃতিপথে মুর্শিদাবাদে মহারাজীয়া মহিলার সহমরণের কথা স্মৃতিত হওয়াও স্বাভাবিক; কিন্তু তাঁহার পক্ষে পূর্ক হইতেই কল্পিত বৈধব্যের কর্তব্য-নির্ধারণে তাঁহার গৌরব ক্ষুণ্ণ হয়।

যাহা সুন্দর তাহার সামান্য ক্রটি সহজে দৃষ্ট হয়—ইংরাজ কবি বলিয়াছেন, ভুয়ারের উপর ক্ষুদ্রতম দাগটিও দৃষ্ট হয়। তাই এই গ্রন্থের এই সকল সামান্য ক্রটি সহজে লক্ষিত হইয়াছে; তাই এ সকলের উল্লেখ করিলাম। আশা করি ভবিষ্যৎ সংস্করণে এ সকল ক্রটি থাকিবে না।

যাহারা এই গ্রন্থ পাঠ করিবেন—তাঁহারা ইহার বহু গুণেও লেখকের চিত্র ও চরিত্রাঙ্কনক্ষমতায় মুগ্ধ হইবেন। ইহাতে পাঠক অর্ধ শতাব্দীর বাঙ্গালার রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস ও সঙ্গে সঙ্গে আদর্শ হিন্দুরমণীর জীবনব্যাপী পুণ্য কার্যের বিবরণ জানিতে পারিবেন। একপ পুস্তকের আদর অবশ্যস্তাবী। দুই সপ্তাহ মধ্যে যে দুই সহস্র পুস্তক বিক্রীত হইয়াছে ইহা আমাদের গর্ব করিবার বিষয়। আশা করি, এই গ্রন্থের প্রচারফলে বাঙ্গালার গৃহে গৃহে আবার রাণী ভবানীর আদর্শ অনুপ্রাণিতা গৃহলক্ষীর আবির্ভাব হইবে, এবং তাহারই ফলে বাঙ্গালার জীবন পুণ্যময় ও সুখময় হইবে।

ব্রজাঙ্গনা ।

সুদূর ঘাপর হ'তে প্রেমলীলা তব
মধুর স্বপন সম আসে অনিবার,—
পুলকিত প্রেমলীলা নিত্য অভিনব,
পুষ্পিত যৌবনকুঞ্জে মধুপ-বক্ষার ।
তব প্রেম-অনুরাগে ধরায় বসন্ত আগে ;—
ললিতা, বিশাখা, রাধা কুরঙ্গ-নয়না ;—
অয়ি, ব্রজাঙ্গনা ।

বিরহ-ব্যথিতা তব নয়ন-ধারায়
এখনো যমুনা বহে করুণ বিলাপে ;
রঞ্জিত বিচিত্র তব আশা নিরাশায়—
এখনো গগন শোভে চারু ইন্দ্রচাপে ;
এখনো নিশীথ যবে তোমার মঞ্জীর-ববে
মুখরিত কুঞ্জ-পথ—শঙ্কিত-চরণা—
অয়ি, ব্রজাঙ্গনা ।

স্বরভিত দীর্ঘশ্বাস বহিয়া তোমার
এখনো মলয়বাঘ দেয় ফুলে ফুলে ;
মধুর মিলনে তব আনন্দে অপার
এখনো কদম্ব ফুটে যমুনার কুলে ;
মিলন-মধুর হাসি তোমারি মে আসে ভাসি
মেঘহীন চন্দ্রালোকে—হে স্মিত-আননা,
অয়ি, ব্রজাঙ্গনা ।

জাগরণারণ তব কমল নয়ন
এখনো রঞ্জিত করে তরুণ দিবস ;
এখনো সঁঝের তারা মলিন-কিরণ
হেরি' কুঞ্জ-দ্বারে তোমা বিরহ-বিবশ ;
প্রভাতে তমালশাথে কোকিল তোমায় ডাকে
কিশলয় শয্যা'পরি মিলন-মগনা—
অয়ি, ব্রজাঙ্গনা ।

এখনো বাঁশরী স্বর যমুনা-পুলিনে
 তোমায় খুঁজিয়া ফিরে আকুল আশায় ;
 তোমারি মালার লাগি এখনো বিপিনে
 কুসুম ফুটিয়া উঠে, বিয়াদে শুকাইয় ;
 জলদে বিজলী-রেখা এখনো গগনে লেখা—
 তোমারি মিলন-স্মৃতি জাগে, স্মরণোচনা—
 অয়ি, ব্রজাধনা ।

এখনো তমাল-শাখে মাধবী জড়ায়,
 প্রেমের সৌরভ ভাসে যুথিকার বাসে ;
 তোমারি প্রেমের মত পলিত শোভায়
 তরল করণ ফুটে শুভ্র স্নিত হাসে ;
 এখনো কানন-মধ্যে পলাসে শোনিমা রাজে
 তোমারি মিলন-লাঞ্জে—রক্তিম-বরণা,—
 অয়ি, ব্রজাধনা ।

এখনো সলিলে তব জলজীলা স্মরি'
 পলকে যমুনা-বারি উঠিছে উছলি'
 এখনো যমুনা-জলে ভরিতে গাগরি
 কিনারীর কর্ণে পশে অশ্রুট কাকলি';
 এখনো তোমার তরে পিয়ালের মাথা প'রে
 পথপানে চেয়ে আছে শিখা আনমনা ;—
 অয়ি, ব্রজাধনা ।

তোমারি প্রেমের লীলা ধরনী-গগনে ;
 তোমারি প্রেমের স্মৃতি ভুলোকে ছালোকে ;
 এখনো মিলন-স্মৃতি, বিরহ-বেদনে
 হৃদয় ভরিয়া উঠে আধারে আলোকে ;
 স্মৃতি, দুঃখ, অভিমানে এখনো মানব-প্রাণে
 অক্ষয় প্রণয় জাগে, তোমারি গাথনা,—
 অয়ি, ব্রজাধনা ।

ভারতীয় অরণ্যানী।

—*—

মার্কিন প্রাদেশ উপনিবেশ-প্রতিষ্ঠা-কামনায় ইংরাজগণ যখন তথায় উপস্থিত হইয়া দেশ স্থাপন-সকল-অরণ্য-সমাকুল দেখেন, তখন তাঁহারা তরুণাত্মকেই শত্রু জগে বিনষ্ট করিয়াছিলেন। সভ্যতা বিস্তারের ও লোক সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশ ক্রমশঃ অরণ্য-বিরল হইতেছে। লোকাবাস-নির্মাণ-কারণে অনেক নিবিড় ও হিম্মজীবজন্তু-পরিপূর্ণ অরণ্য নগরে পর্য্যবসিত হইয়াছে। অরণ্য-সংরক্ষণে মানব সমাজের কি পরিমাণ হিতসাধন হইয়া থাকে, লোকের কি পরিমাণ উপকার হইয়া থাকে, সে বিষয়ে জনসাধারণের চিত্ত অত্যন্ত দিন হইতে আকৃষ্ট হইয়াছে। ভারতে এখনও সাধারণ কৃষকগণ বা জনসাধারণ অরণ্য-সংরক্ষণে প্রকৃতির কি বিচিত্র নিয়ম অশুধ থাকে, তাহা বুঝিতে অসমর্থ। দেশে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অরণ্যের উপর নির্ভর করে। বায়ু-বাহিত জলীয় বাষ্প ও পৃথিবীর মৃত্তিকাস্থিত রসে উদ্ভিদের পরিবর্দ্ধন হয়। অরণ্যে বন্যার জলোচ্ছ্বাসের প্রতিবন্ধকতা জন্মে এবং গিরিগাত্রে অরণ্যানী উৎপন্ন হইয়া তত্ক্ষণাত্ মৃত্তিকাকে অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষিত করে। প্রকৃতির এই প্রকার প্রয়োজন-সংসাধনই অরণ্যানীর কেবল মাত্র উপযোগিতা নহে। এতদ্ভিন্ন অরণ্যজাত ফল, মূল, ওষুদি মানবের নানা প্রকার প্রয়োজনে আসিয়া থাকে। অরণ্য জব্যের ব্যবসায় দেশের বিলক্ষণ লাভ হয়। দুর্ভিক্ষে অরণ্য ফল, মূল ও তৃণ সহস্র সহস্র ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা করে।

অধুনা বৈজ্ঞানিক উপায়ে অভিনব পন্থায় আবশ্যক তত্ত্বাবধানে সকল সভ্য দেশেই অরণ্য সংরক্ষিত হইয়া থাকে, কিন্তু এই অভিনব পন্থাবলম্বনের পূর্বে, লোকে বহি ও কুঠার সংযোগে অরণ্যের উচ্ছেদ সাধন করিত। সেই জন্ত যে দেশে প্রাচীনকাল হইতে সভ্যসমাজের বসবাস হইয়াছে সে দেশে বন বা জঙ্গলের পরিমাণ অল্প। আর সেই জন্ত সেই সকল দেশবাসিগণ আবশ্যক অরণ্য জব্যের অভাবে অনেক অশুবিধা ভোগ করিয়া থাকে। অরণ্যজাত কাষ্ঠ হইতে গৃহ-স্থালীর কত আসবাব, সাজ, সরঞ্জাম প্রস্তুত হইয়া থাকে তাহার ঠিক নিরূপন করা নিতান্ত সহজ নহে। কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষে কেবল কাষ্ঠের জন্ত অরণ্যানী সংরক্ষিত হয় না; পরন্তু এদেশে অরণ্য সাধারণ লোকের নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অভাব পূরণ করিয়া মানব সমাজের প্রচুর হিতসাধন করিয়া থাকে। ভারবাহী শকট নির্মাণের জন্ত কাষ্ঠ ও বংশ, লাঙ্গলাদি কৃষির উপকরণের কাষ্ঠাদি,

আবাসস্থল নির্মাণোপযোগী কাষ্ঠ, তৃণাচ্ছাদনের জন্য তৃণপত্রাদি, রজ্জুর উপকরণ, মাতুর নির্মাণের কাটি, চর্ম পরিষ্কারের নিমিত্ত বৃক্ষত্বক, ক্ষেত্রের উর্বরতা পল্লিবর্ধক ঘুফের পত্র, বিভিন্ন প্রকার রং, গালা, ধূনা, গৃহস্থের ব্যবহারোপযোগী তৈলাদি, বিবিধ প্রকার ফল, মূল, ফুল, মধু প্রভৃতি মানবের নিত্য প্রয়োজনীয় আশেযবিধ সামগ্রী এই স্বাভাবিক অরণ্য হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকে । সেগুন, মেহগিনি, চন্দন, আবলুস প্রভৃতি কাষ্ঠ কারুকার্যে ও গৃহসবজীয়ে ব্যবহৃত হয় । এতদ্ভিন্ন প্রায় সকল জাতীয় কাষ্ঠই লোকে “জালানী” রূপে ব্যবহার করিয়া থাকে । আবীর হরিডকী, বয়ড়া, অনন্তমূল, মাজুফল, টৌরী প্রভৃতি আরণ্য জন্য ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানী হইয়া থাকে । এতদ্ভিন্ন বনে গুটী, লাঙ্গা প্রভৃতিও প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় । ফল কথা, অরণ্য-সংরক্ষণে কেবল স্থানীয় লোকের বা জনকয়েক ব্যবসায়ীর সুবিধা নহে, পরন্তু সমগ্র দেশের উপকার ।

ভারতীয় অরণ্যবিভাগের ইনস্পেক্টর জেনারেল মিঃ উইলমট সম্প্রতি একটি সম্মুখে ভারতীয় অরণ্য-সংরক্ষণ সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছেন । ভারতবর্ষে সরকার হইতে অরণ্য-সংরক্ষণ বিষয়ে যথেষ্ট মত্ন ও অর্থব্যয় হইয়া বিলক্ষণ সফল লাভ ঘটিতেছে । নিবিড় অরণ্যে মানবের আবশ্যক যে যে সামগ্রী পাওয়া যায়, তাহা সংগ্রহ করিয়া সরকারী পক্ষ হইতে কলিকাতার সংগ্রহ-শালায় সে সকলের বিবরণ, প্রাপ্তিস্থান প্রভৃতি জাতীয় বিষয় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে । ডাক্তার ওয়াটের অভিধানেয় (Dictionary of Economic Products, of India) অধিকাংশ ভাগ কেবল আরণ্য জীব্যের বিবরণে পূর্ণ ।

যে আরণ্য জব্য বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে তাহার পরিমাণ অতি সামান্য । তাহার কারণ, দেশের লোক সে সকলের ব্যবহার সম্বন্ধে এক্ষণে অনভিজ্ঞ যে, অধিকাংশ জব্যই দেশে পড়িয়া পচিতে থাকে । এতদ্ভিন্ন আরও অনেক অসুবিধা আছে । অরণ্য হইতে লোকালয়ে জব্য বিক্রয়ার্থ অনিবার্য পথ তাদৃশ সুগম নহে ; আর সেই পথ সুগম করিতে কিম্বা আরণ্য জব্যসমূহ বহন করিয়া আনিতে যে ব্যয় পড়ে, তাহাও সামান্য নহে । অযোধ্যার এবং মধ্য প্রদেশের অরণ্যে তুলনা করিলে ইহা বুঝিতে পারা যায় । অযোধ্যার অঙ্গলের সন্নিকটে লোকালয় থাকিতে তথায় প্রতি বর্গ-মাইলে প্রায় তিনশত টাকা কর আদায় হইয়া থাকে । কিন্তু মধ্য ভারতের অঙ্গল হইতে প্রতি বর্গমাইলে পঞ্চাশ টাকা আয় হয় না ; কারণ, এই স্থানে অঙ্গল পরিষ্কার করিবার জন্য কাষ্ঠ কাটাইতে কাঠুরিয়াকে সমস্ত কাঠ বিনামূল্যে দিতে হয় । নিকটে লোকের বসতি থাকিলে এক্ষণে হইত না ।

কৃষিকর্মের সহিত অরণ্য-সংরক্ষণের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। বর্তমান ভারতের কৃষকের কুটীর অরণ্যজাত বংশ, তৃণ ও রজ্জুর সমাবেশমাত্র। সুতরাং প্রত্যেক কৃষক বহু পরিমাণে অরণ্য জব্য ব্যবহার করিয়া থাকে। আবার কৃষিকার্যের জন্য লাঙ্গল প্রভৃতি ও ভারবহনোপযোগী পাকট নির্মাণ করিবার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ বংশ ও কাষ্ঠের ব্যবহার হইয়া থাকে। কৃষিকার্যের সহিত অরণ্যের আরও একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান। অরণ্যের উদ্ভিদ্রাজি জলদ্রাণ আকর্ষণ করিয়া বর্ষা আনয়ন করিয়া থাকে। সেই জন্য দেশমধ্যে যে প্রদেশ অরণ্য-বিহীন সে প্রদেশে অনাবৃষ্টি বা স্বল্পবৃষ্টিহেতু শস্তের ক্ষতি হয়। ভারতের অধিকাংশ অধিবাসী কৃষিজীবী; সুতরাং এ দেশে অরণ্যের সংরক্ষণ বিশেষ উপকারী। অরণ্য যেমন কৃষিকার্যের সহায়তা করিয়া থাকে তেমনই কৃষককুলের সাহায্যে অরণ্যের পরিপুষ্টি সংসাধিত হইয়া থাকে। অরণ্য জব্য বিক্রয়জাত আয়ের প্রায় অর্দ্ধাংশ অরণ্যের সংরক্ষণে ও পরিপোষণে ব্যয়িত হইয়া থাকে, আর এই অর্থের অধিকাংশই সাধারণ কৃষকের নিকট হইতে পাওয়া যায়।

সরকারী পক্ষ হইতে প্রায় ২৪০০০০ বর্গমাইল পরিমাণ বিস্তৃত ভূমিখণ্ড ব্যাপী অরণ্য অভিনব প্রণালী সংরক্ষিত হইয়া থাকে। মিত্র ও করদ রাজ্য ধরিলে সর্বশুদ্ধ সমগ্র ভারতের প্রায় একচতুর্থাংশ ব্যাপিয়া অরণ্য রহিয়াছে। এই অরণ্য প্রদেশ কোথাও কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে আবার কোথাও বিরল অবস্থায় বিদ্যমান। যে স্থানে লোকালয় বহুদিনের সে স্থানে অরণ্যের পরিমাণ অল্প; কারণ, পূর্বে লোকে কুঠার ও বহি সাহায্যে অরণ্যের উচ্ছেদ সাধন করিত।

বৈজ্ঞানিক উপায়ে আমাদিগের দেশে অরণ্যানী সংরক্ষিত হইয়াছে বলিয়া অধুনা আমরা কিছু লাভবান হইয়াছি। খাল খনন দ্বারা যেমন কৃষিকার্যের যথেষ্ট উপকার হইয়াছে, নিয়মিতরূপে অরণ্য সংরক্ষণ দ্বারা তেমনই জল সরবরাহের বহুবিধ সুবিধা হইয়াছে। কিন্তু সিং উইলমট জুংথ করিয়া বলিয়াছেন যে, পুর্ন কমিশনের বিবরণে ইহার উল্লেখও নাই। ১৯০৬—৭ খৃষ্টাব্দে অরণ্যজাত জব্যের মূল্যে প্রায় ৬৬ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছিল এবং তের কোটি গৃহ পালিত পশু অরণ্যে বিচরণ করিতে পাইয়াছিল; আর প্রায় তেত্রিশ লক্ষ টাকার কাষ্ঠ ও অন্যান্য অরণ্য জব্য স্থানীয় কৃষক বা বহু জাতির অরণ্য-সংরক্ষণজনিত পরিশ্রমের পারিতোষিকরূপে দিতে হইয়াছে। এই বৎসরে মোট আয় প্রায় ২ কোটি ৬ লক্ষ টাকা আয় ও মোট ব্যয় প্রায় ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা হইয়াছে।

দাবানল অরণ্য-সংরক্ষণের প্রধান অন্তরায়। যাহারা দাবানল না দেখিয়াছেন,

উঁহাদের পক্ষে ইহার ভীষণতা স্বদয়ঙ্গম করা দুঃসাধ্য । শান্তের পর শ্রীশ্রীর প্রাজ্ঞ-
ভাবে বৃক্ষের পত্র শুষ্ক হইয়া দারুণ উষ্ণ বায়ু সংযোগে বা বৃক্ষের ঘর্ষণে অথবা
ঐশ্ব্যতিশায়ে দাবানলের উৎপত্তি হয় । ৪০ বা ৫০ ফিট উচ্চ হইয়া অগ্নিশিখা
ধু ধু করিয়া সমস্ত বৃক্ষরাজি অঙ্গারে পরিণত করিয়া থাকে । আরণ্য জীব-
জন্তু উত্তাপে প্রাণত্যাগ করে । কেবল হস্তী এবং ভল্লুক দূর হইতে দাবা-
নলের আশ্রয় পাইয়া জল ছড়াইয়া চারিদিক আর্জ করিয়া স্ব স্ব প্রাণ রক্ষা
করিয়া থাকে । অমীর উর্ধ্বরতাপরিবর্দ্ধনের জন্য বা শীকারের সুবিধার জন্য
অথবা হিংস্র জন্তুর আবাসগৃহবরের উচ্ছেদ সাধনের নিমিত্ত লোকে পূর্বে যে অগ্নি-
কাণ্ডের ব্যবস্থা করিত বা এখনও করিয়া থাকে তাহা হইতে লোককে বিরত
করা সহজ নহে । ১৯০৬-৭ খৃষ্টাব্দে ৪৪৪০০ বর্গ মাইল বহু দেশ বিশেষ সাব-
ধানতা ও তত্ত্বাবধানের সহিত সংরক্ষিত হইয়াছিল । অগ্নিসংলগ্ন হইবামাত্র
তাহা নির্ক্ষিপিত করিবার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও সে বার শতকরা ৬৬াগ অগ্নি দাবা-
নলে বিনষ্ট হইয়াছিল । অনেক সময় অরণ্য-প্রান্তরে ও অরণ্যের সন্নিহিতে গ্রাম
বসাইয়া সুফল লাভ ঘটিয়াছে । ১৮৯৬ সালের ছুভিক্ষের সময় প্রায় ১১৫ প্রকার
আহার্য্য অরণ্য সামগ্রী যুক্তপ্রদেশের দুইটি জিলায় লোকের বুদ্ধিক্ষা নিধারণ
করিয়াছিল । লোকে অরণ্য জব্যের যথাযথ ব্যবহার বা কার্য্যকরী গুণাগুণ জানিলে
অরণ্য জব্যের মূল্য ও আদর অনেক অধিক হইত ।

অধুনা দেবদ্বীপে অরণ্য বিভাগস্থাপিত হইয়াছে । এই দেবদ্বীপ বিদ্যা-
লয়টিকে কলেজে পরিণত করিয়া শীঘ্রই কতিপয় প্রাদেশিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত
হইবে, এইরূপ প্রস্তাব হইয়াছে । গত ১৯০৬ সালে Forest Research
Institute স্থাপিত হইয়াছে । তথায় বিশেষজ্ঞগণ অরণ্য জব্যের গুণাগুণ
পরীক্ষা করিতেছেন । এতদ্ভিন্ন জীবগু ও কীটের দংশনে বৃক্ষের যে ক্ষতি হইয়া
থাকে তাহা হইতে কিরূপে পরিরোধ পাওয়া যাইবে তাহারও উপায় উদ্ভাবিত
হইতেছে । ফল কথা যে ভাবে আমাদিগের দেশে অরণ্য-সংরক্ষণের চেষ্টা
চলিতেছে তাহাতে অস্বাভাবিক সত্য দেশের স্থায় আমাদিগের দেশেও অদূর ভবিষ্যতে
সুফল লাভ ঘটিবে, আশা করা যায় । প্রায় অষ্টাবংশ বৎসর পূর্বে সার রিচার্ড
টেম্পল বলিয়াছিলেন যে, “ভারতে আমরা যে প্রকারে অরণ্য-সংরক্ষণ বিভাগের
অনুষ্ঠান করিয়াছি এবং তাহাতে বৈজ্ঞানিক, ব্যবহারিক ও কার্য্যকরী জ্ঞানার্জীজন
যেক্রমে পরিচালিত হইতেছে তাহাতে আমার মনে হয় যে, কোন দেশের সহিত
তুলনায় আমাদিগের এই বিভাগ কোন অংশে ন্যূন নহে ।” আমরাও তাঁহার
কথায় পুনরাবৃত্তি করিয়া ভবিষ্যতে সুফললাভের অপেক্ষা করিতেছি ।

শ্রীকালীকুমার দত্ত ।

সংগ্রহ।

শিল্প।

ভারতীয় ললিতকলা।

ভারতীয় স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রবিদ্যা সম্বন্ধে যুরোপীয় সমালোচকসমাজে মতের নিম্নরূপ পরিবর্তন হইয়াছে। এক সময় যুরোপীয়দিগের বিশ্বাস ছিল, ভারতে প্রকৃত স্থাপত্য গ্রীকদিগের প্রদত্ত শিক্ষার ফল; এখন সে মত পরিত্যক্ত হইয়াছে। এক সময় ভারতীয় ভাস্কর্য নিকট বলিরা উপেক্ষিত হইত, এখন ভারতে বহু উৎকৃষ্ট ভাস্কর্যকার্যের আবিষ্কারে সে মত আর গ্রহীত হয় না। পূর্বে যুরোপীয় পণ্ডিতদিগের বিশ্বাস ছিল, ভারতে চিত্রশিল্পের কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই; এখন সে মত পরিত্যক্ত হওয়াতে ভারতে প্রাচ্য চিত্র শিল্পের পুনরাবির্ভাব যে একদল চিত্রকরের আবির্ভাব হইয়াছে তাহাদিগের চিত্র দেখিয়া ‘রাভসিংহের’ রূপনগরের অন্তঃপুরবর্ণনা মনে পড়ে—‘যরের দেওয়ানে গাদা পাতরের অসম্ভব গঙ্গী সকল অসম্ভব রকমে, অসম্ভব লতার উপর বসিয়া, অসম্ভব জাতির ফুলের উপর পুচ্ছ রাখিয়া, অসম্ভব জাতীয় ফল ভক্ষণ করিতেছে।’ সংপ্রতি ইংলণ্ডে রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটীর অধিবেশনে মিষ্টার ভিনসেন্ট গ্রিথ ভারতীয় ললিতকলাসম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে এই সকল কথার আলোচনা করিয়াছেন। আমরা নিম্নে তাহার প্রবন্ধের সার সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

লেখক আরম্ভে বলিয়াছেন, ভারতীয় ললিতকলা সম্বন্ধে মতভেদ আছে। সারসংক্ষেপ

বার্ডউড বলেন, ভারতে ভাস্কর্য ও চিত্রবিদ্যা ললিতকলা নামের উপ-
আলোচনা।

যুক্তই ছিল না। আর একজন ইংরাজ লেখক বলেন, ভারতীয় ভাস্কর্য অত্যন্ত অভূত। আবার কেহ বলেন, ভারতে ভাস্কর্যের কোন উন্নতিই হয় নাই। এ দিকে আবার মিষ্টার হ্যাভেল ও ডাক্তার কুমারস্বামী বলেন, ভারতীয় শিল্পের তুলনা নাই। যাহা হউক, এখন ভারতীয় ললিতকলা আর উপেক্ষিত নহে। এক্ষণে ভারতীয় ললিতকলার যথেষ্ট আলোচনা হইতেছে; এ সম্বন্ধে কয়খানি উৎকৃষ্ট পুস্তক রচিত হইয়াছে ও আরও কয়খানি রচিত হইতেছে। লেখকের মতে, ভারতীয় ভাস্কর্য ও চিত্রে দেবদেবীর প্রতি-

কৃতি অনেক স্থলেই অভূত, কোথাও কোথাও ভীষণ, বিরক্তিকর।
পরিচয়।

তবে ভারতীয় ভাস্কর্য ও চিত্রে উৎকৃষ্ট উদাহরণও আছে। লেখক ভারতীয় শিল্প বলিতে বংশপরম্পরাগত শিল্পকীর্তির কথা বলেন নাই; পরন্তু শিল্পীর ব্যক্তিগত প্রতিভার মঙ্গল কথাই বলিয়াছেন। ভারতীয় ললিতকলা যে স্থাপত্যের অঙ্গমাত্র ইহাতে সন্দেহ নাই। ফাউসন দেখাইয়াছেন, ভারতীয় স্থাপত্য অসাধারণ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। লেখক ভারতীয় ললিতকলা হিন্দু ও মুসলমান এই দুই ভাগে

বিভক্ত করিয়াছেন। বৌদ্ধ ও জৈন শিল্প হিন্দু শিল্পেরই অন্তর্গত। তিনি বলেন, পুন্না-পদ্ধতির প্রভেদ না থাকিলে সর্ববিধ হিন্দু মন্দির একই প্রকার আদর্শে রচিত হইত। সে আদর্শ প্রাদেশিক। আমরা যে সকল প্রাচীন হিন্দু শিল্পকীর্তি প্রাপ্ত হই, তাহা বৌদ্ধ-শিল্পের উদাহরণ। হিন্দু শিল্পীর জীব ও উদ্ভিদ রচনা গ্রীক শিল্পীর রচনা হইতে উৎকৃষ্ট উপহৃত উপাদান হইতে খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে সম্রাট অশোকের শাসনকাল পর্য্যন্ত ভারতীয় শিল্পের ইতিহাস রচিত হইতে পারে। সানর্থে প্রাপ্ত অশোকস্তম্ভের চূড়া গ্রীক শিল্পিকর্তৃক রচিত—মিষ্টার মার্শাল এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন। লেখক বলেন, ভারতীয় শিল্পে বিদেশীয় প্রভাবের আভির্ভাষ সম্বন্ধে প্রচলিত মত অজান্ত নহে। ভারতীয় শিল্পীর বিদেশীয় আদর্শকে এমন ভাবে আত্মসাৎ করিতে পারিত যে, তাহা নিজস্বই করিয়া লইত। তাহারা বিদেশীয় আদর্শের অঙ্করণে যে সকল রচনা রচিত করিত তাহাতে অঙ্করণের পরিবর্তে মৌলিকতার দিব্য দীপ্তি শোভা পাইত। মৌলিকতা না থাকিলে কেহ বিদেশীয় আদর্শ এক্রপে নিজস্ব করিতে পারে না। সুতরাং, ভারতীয় শিল্পের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। তবে উপকরণের অভাবে এই শিল্পের প্রায়শ্চকাল নির্ণয় এখনও অসম্ভব।

পূর্বে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমাতে প্রাপ্ত গ্রীক-বৌদ্ধ ভাস্কর্যকীর্তি ভারতীয় ভাস্কর্যের সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন বলিয়া বিবেচিত হইত ; এবং অভিজ্ঞগণ বলিতেন, গ্রীক ও হিন্দু। এই আদর্শের ভারতীয় আদর্শে পরিণতি শিল্পের হিসাবে ভারতের ও অগতের পক্ষে শোচনীয় ঘটনা। কিন্তু বর্তমান কালে হার্ভেলএমুথ সমালোচকগণ বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, এই সকল ভাস্কর্য-কীর্তিই ভারতীয় শিল্পের নিকৃষ্ট উদাহরণ। ইহারা মধ্য যুগের প্রাকৃত্য শিল্পকেই উৎকৃষ্ট বলিয়া থাকেন এবং এই মত ব্যক্ত করেন যে, বেদান্ত না বুঝিলে ভারতীয় শিল্প বুঝিবার উপায় নাই, ভারতীয় শিল্পে ভারতীয় ধর্মবিভাগ সপ্রকাশ। লেখক বলেন, এই সকল সমালোচকের চেষ্টায় লোকের মধ্য যুগের প্রাকৃত্য শিল্পনিদর্শনের মধ্যে উৎকৃষ্ট অগৃহ্য বিচারের সর্মম হইয়াছে এবং লোকে বুঝিয়াছে যে, দেবমূর্তির দেহের অস্বাভাবিক মন্থনতা হিন্দু শিল্পীর অজ্ঞতা বা অক্ষমতার পরিচায়ক নহে ; পরন্তু ধর্ম-নির্দেশের ফল। তাই হিন্দু শিল্পী মূর্তির হস্ত ও পদ রচনায় শ্রীর কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিত। কিন্তু এই সকল সমালোচক যে বলেন, বিকৃত ও অস্বাভাবিক মূর্তিও হিন্দুধর্ম আবশ্যক ও উৎকৃষ্ট, তাহা স্বীকার করা যায় না। যাহা অস্বাভাবিক তাহা সুন্দর হইতে পারে না ; যাহা সুন্দর নহে, তাহা সজ্জনায়বিশেষের হইতে পারে, কিন্তু সমস্ত অগতের নহে ; যে শিল্পকীর্তি সমস্ত অগতের উপভোগযোগ্য নহে— তাহা উৎকৃষ্ট বলা যায় না। লেখক এ স্থলে যে মত ব্যক্ত করিয়াছেন, বহুদিন পূর্বে অম্যাপক স্নেহে সেই মত প্রচার করিয়াছিলেন। রাজা রাজেন্দ্রলাল তাহার যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহার পর এ বিষয়ের আলোচনা অসম্ভব। প্রাচীন গ্রীকগণ প্রত্যয়ে যে সকল "অস্বাভাবিক" কল্পনার বিকাশ করিয়াছিলেন, তাহা আজও অগতের বিস্তারের বিঘ্ন। হিন্দুশিল্পে ও বৌদ্ধ শিল্পে প্রভেদ পরিষ্কৃত। বৌদ্ধ শিল্পে মানবীয় ভাব সপ্রকাশ ; কারণ বৌদ্ধধর্ম মানবের স্বাধীনবর্জনে মতে। প্রাকৃত্য ধর্ম অস্বরূপ ; তাই হিন্দু শিল্পে মানবীয় ভাবের

একান্ত অভাব। লেখকের এই মতের সহিত অনেকেরই মতের ঐক্য নাই—থাকিতে পারে না। যুরোপে দেবতার কল্পনা মানবকে অতিক্রম করিতে পারে নাই—তাই মিল্টনের ঈশ্বর পিউরিট্যান্ নৃপতিমাজ ; টেন সে কথা বুঝাইয়াছেন। কিন্তু ভারতে ভাবুকের ও শিল্পীর দেবতার কল্পনা মানবকে অতিক্রম করিয়াছিল। সেই জন্য ছই দেশের দেবকল্পনা ও শিল্পাদর্শ ভিন্ন।

লেখকের মতে ভারতীয় চিত্রবিদ্যার ইতিহাসের পর্যাপ্ত উপাদান নাই। বর্তমানে কেবল খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত উড়িয়ার গুহা শিল্পের চিত্র।

চিত্র ও ত্রীতীয় শতাব্দীতে রচিত অজন্তা গুহাশিল্পের চিত্র ও পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত সিংহলে সিজিথির চিত্র ব্যতীত উল্লেখযোগ্য উপাদানের একান্ত অভাব। অজন্তার চিত্রের পর ষোড়শ শতাব্দীতে আকবরের উৎসাহে উন্নতিপ্রাপ্ত ভারতীয়-পারসিক চিত্রেরই উল্লেখ করিতে হয়। এই ছই চিত্রের মধ্যে বহু শতাব্দীর ব্যবধান। ভারতীয়-পারসিক শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শনগুলি শিল্পের হিসাবেও বিশেষ প্রশংসনীয়। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রতীচ্য বিশেষজ্ঞগণ এই শিল্পের আলোচনা করিতেন। পরে ক্রমে এই শিল্প অনাদৃত ও উপেক্ষিত হয়। লওনে, প্যারিসে ও ওয়াশিংটনে চিত্রশালায় এই শিল্পনিদর্শন আজও বিদ্যমান। কর্ণেল হানা যে সকল চিত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশই আমেরিকায় গিয়াছে। এই ভারতীয়-পারসিক শিল্প রাজসরকারের স্বেচ্ছা লাভিতপালিত হইয়াছিল ; বাদশাহের ও রাজকর্মচারীদের উৎসাহে উন্নতিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। এই শিল্প ধর্মসংক্রিষ্ট ছিল না। লেখক মহাশয় ইহার কারণ নির্দেশ করেন নাই ; কিন্তু অভিজ্ঞদিগকে আর বলিয়া দিতে হইবে না যে, প্রতিরূপিত রচনার বিরুদ্ধে মুসলমান ধর্মের অস্বাভাবিক ইহার কারণ। এই অস্বাভাবিকতাহেতু আও-রাজের বহু শিল্পকীর্তি নষ্ট করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, হিন্দুনা ধর্মসংক্রিষ্ট শিল্পে এই ভারতীয়-পারসিক শিল্পের আদর্শও যথাসম্ভব গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালায় নুতন চিত্রকর সম্প্রদায়ের কার্য উল্লেখযোগ্য ; কিন্তু তাঁহারা যে অন্তরীক্ষিত প্রশংসা পাইয়াছেন—তাঁহাদের চিত্র যে তাহার উপযুক্ত নহে, সে বিষয়ে সন্দেহমাজ নাই।

মিষ্টার হাভেল যে বলিয়াছেন, ভারতে হিন্দু সামাজিক অবস্থায় ধনী দরিদ্র সকলেই সমভাবে শিল্প উপভোগ করিয়া থাকেন, সে কথার প্রতিবাদ করিয়া মতভেদ।

লেখক বলিয়াছেন, ভারতে শিল্প সর্বব্যাপী নহে, পরন্তু একান্ত বিরল। তিনি সার পার্ডন ক্রার্কের কথা উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, ভারতীয় শিল্প ভারতের ও ভারতবাসীর পক্ষে উপযোগী, কিন্তু উচ্চাঙ্গের নহে। এই স্থানে লেখকের এই কথার অসঙ্গতি প্রতিপন্ন করিবার আবশ্যক নাই। তবে লেখক মহাশয়কে এই সহজ সত্য স্মরণ করিতে বলি যে, ভারতীয় শিল্প স্থায়ী গুণে বলীয়ান না হইলে তাহা বিদেশী আদর্শ অনায়াসে আত্মসাৎ করিতে পারিত না,—বিদেশী-আদর্শ-প্রাণিত দেশে বহুগুণ্যাপী অমাদর গড়া করিয়াও ও স্থায়ী হইত না।

ইতিহাস ।

শাজাহান-ছহিতা ।

বক্ষিমচন্দ্র তাঁহার শেষ উপাখ্যাসে লিখিয়াছিলেন,—“ভারতবর্ষীয় মহিষারা রাজ্য-শাসনে স্তম্ভক নথিয়া বিখ্যাত । পশ্চিমে, কদাচিৎ একটা জেনোনিয়া, ইসাবেলা, এলিজাবেথ, বা ক্যাথারাইন পাওয়া যায় । কিন্তু ভারতবর্ষের অনেক রাজকুলজারাই রাজ্যশাসনে স্তম্ভক । যোগল সম্রাটদিগের কল্যাণ এ বিষয়ে বড় বিখ্যাত । কিন্তু যে পরিমাণে তাহারা রাজনীতিবিশারদ, সেই পরিমাণে তাহারা ইন্দ্রিয়পরনশ ও ভোগবিলাসপরায়ণ ছিল । ঔরঙ্গজেবের দুই ভগিনী, জাঁহানারা ও নৌশাবারা । জাঁহানারা শাহজাঁহান বাদশাহীর প্রধান সহায় । শাহজাঁহান তাঁহার পরামর্শ ব্যতীত কোন রাজকার্য্য করিতেন না ; তাঁহার পরামর্শের অমূল্যতা হইয়া কার্য্যে সফল ও যশস্বী হইতেন । তিনি পিতার বিশেষ হিতৈষিনী ছিলেন । কিন্তু তিনি যে পরিমাণে এ সকল গুণবিশিষ্টা ছিলেন, ততোহধিক পরিমাণে ইন্দ্রিয়পরায়ণা ছিলেন । ইন্দ্রিয় পরিত্যক্তির জন্য অসংখ্য লোক তাঁহার অঙ্গুষ্ঠীত পাত ছিল । সেই সকল লোকের মধ্যে ইউরোপীয় পণ্টকেতা এমন ব্যক্তির নাম করেন, যে তাহা লিখিয়া লেখনী কলুষিত করিতে পারিতাম না । নৌশাবারা পিতৃদেয়িনী, ঔরঙ্গজেবের পক্ষপাতিনী ছিলেন । তিনিও জাঁহানারার মত রাজনীতিবিশারদ এবং স্তম্ভক ছিলেন, এবং ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে জাঁহানারার স্থায় বিভারশূন্য, বাধাশূন্য এবং তৃপ্তিশূন্য ছিলেন । যখন পিতাকে পদচ্যুত ও অবরুদ্ধ করিয়া, তাঁহার রাজ্য অপহরণে ঔরঙ্গজেব প্রবৃত্ত, তখন নৌশাবারা তাঁহার প্রধান সহায় । ঔরঙ্গজেবও নৌশাবারার বড় বাধ্য ছিলেন । ঔরঙ্গজেবের বাদশাহীতে নৌশাবারা দ্বিতীয় বাদশাহ ছিলেন ।”

বক্ষিমচন্দ্রের এই মতই শাজাহানের ছহিতাদিগের সম্বন্ধে প্রচলিত মত । এই মত বার্নিয়ারের সাফ্য হেতু প্রচলিত হইয়াছিল । বাজালায় একাধিক লেখক এই মত গ্রহণ করিয়াছেন ; তাঁহাদের মধ্যে ইতিহাসাত্তিক রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য । কিন্তু বার্নিয়ারের কথা যে বিশেষ প্রামাণ্য এমন ও নিশ্চয় বলিবার উপায় নাই । যোগল স্বজ্ঞানের শুণ্ডবর্ত্তা বাহিরে প্রকাশ হওয়া সহজ ছিল না । যাহা রচিত তাহা কতটা সত্য—কতটা মিথ্যা তাহা নিশ্চয় নির্ণয় করা কঠিন কার্য্য । সংপ্রতি ‘হিন্দুস্থান রিভিউ’ পত্র জীযুক্ত দেবীপ্রসাদ দোবে শাজাহানের ছহিতাদিগের কথার আলোচনা করিয়াছেন । বর্ত্তমান অবধি দোবে মহাশয়ের সেই প্রবন্ধের সার সংগৃহীত হইল । প্রবন্ধটি স্বস্বায়ত্তম হইলেও মনোহর ।

সকল দেশের ইতিহাসেই দেখা যায়, দেশের শাসনকার্য্যে পুরাঙ্গনাগণের প্রভাব প্রসূত । ভারতে যোগল-শাসনকালেও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই । আকবরের রাজত্বকালে যোদ্ধা নাই, জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে সুরজাহান, শাজাহানের রাজত্বকালে মমতাজ মহল ও আরঙ্গজেবের রাজত্বকালে তাঁহার ভগিনীগণ অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন । শাজাহানের তিন কন্যা ; সকলেই সুশিক্ষিতা, সুন্দরী, বুদ্ধিমতী । জ্যেষ্ঠা জেহানারাকে

‘বেগম সাহেব’ বা ‘পাদশাহ বেগম’ বলা হইত। তিনি উৎসাহশীলা, অন্নমরী, স্নেহশীলা, উদার ও পিতার বিশেষ স্নেহের পাজী ছিলেন। মধ্যমা রোশিনারা সৌন্দর্য্য-সম্পদে জ্যেষ্ঠার সমান না হইলেও বুদ্ধির আধর্য্যে ও যড়যন্ত্র-সামর্থ্যে তাঁহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠার চরিত্রের সহিত পিতা শাজাহানের চরিত্রের ও মধ্যমার চরিত্রের সহিত জাতা আরজজেবের চরিত্রের নিম্নে সাদৃশ্য ছিল। জ্যেষ্ঠা শাজাহানের ও দারার প্রতি এবং মধ্যমা আরজজেবের প্রতি অম্লরক্তা ছিলেন। কনিষ্ঠা গহরারা মুদ্রস্থতান সম্পন্ন—সুশীলা ছিলেন। তিনি রাজনীতির আবির্ভাব অবর্ত্তে জীবন-ভরী ভাসান নাই।

মোগল রাজ-কন্য়ারা অবিবাহিতা থাকিতেন। তাহার একাধিক কারণ ছিল। সম্রাট কাহাকেও কন্য়ারা অর্পণের উপযুক্ত বিবেচনা করিতেন না, আবার কলঙ্ক-কথা। কেহ ইচ্ছা করিয়া রাজকন্য়ারাকে বিবাহ করিতেও চাহিতেন না।

বিশেষ মোগলদিগের মধ্যে উত্তরাধিকারের কোন নিয়ম না থাকায় রাজ-জামাতার পক্ষে রাজ্য-লাভ-চেষ্টার সম্ভাবনা ও যে ছিল না, এমন নহে। রাজকন্য়ারা বিলাসে পালিতা ও অবিবাহিতা বলিয়া তাঁহাদিগের সম্বন্ধে অনেক কলঙ্ক-রটনা হইত। বিধাত ফরাসী পর্য্যটক বার্নিয়্যার জেহানারা ও রোশিনারা সম্বন্ধে কলঙ্ককথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, জেহানারা একজন পদমর্য্যাদাহীন যুবককে দীর্ঘ কক্ষে আনাইতেন। এই কথা অবগত হইয়া শাজাহান একদিন সহসা কন্য়ারা কক্ষে গমন করেন। যুবক ইতবুদ্ধি হইয়া বৃহৎ কটাহ্মধ্যে লুকায়িত হয়। সম্রাট তাহা বুঝিয়া কথার কথার কন্য়ারাকে স্নান করিতে বলেন। খোজারা কটাহ্মতলে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে ;—তাহাতেই যুবকের মৃত্যু হয়। বার্নিয়্যার আরও বলেন জনপ্রিয় ভাঙারী নাজীর খাঁ ও জেহানারার প্রণয়-পাজ ছিলেন। শায়েরা খাঁ তাঁহার সহিত রাজপুত্রীর বিবাহের প্রস্তাব ও করিয়াছিলেন। সম্রাট সে প্রস্তাবে সম্মত হইয়া নাই, পরন্তু দরবারে তাঁহাকে একটি পান দিয়া সম্মানিত করেন। পান বিধাক্ত ছিল ; সেই নিম্নে নাজীরের মৃত্যু হয়। বার্নিয়্যার জেহানারার প্রতি সম্রাটের অবৈধ প্রণয়ের পাপ কথারও উল্লেখ করিয়াছেন। বার্নিয়্যার রোশিনারার সম্বন্ধে ও এইরূপ কলঙ্ক-কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলেন, একবার রোশিনারা কয়দিন ছই জন যুবককে অস্ত্রপুর্বে রাখিয়া এক দিন নিশীথে দাসী-দিগকে একজন যুবককে প্রাসাদ-বাহিরে রাখিয়া আসিতে বলেন। তাহারা তাহাকে উচ্চানে রাখিয়া আইসে। সে তথায় ধৃত ও আরজজেবের সমক্ষে নীত হয়। সম্রাটের প্রশ্নের উত্তরে সে বলে, সে পুরপ্রাচীর উত্তর করিয়া আসিয়াছিল। সম্রাট তাহাকে সেই পথে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বলায় রক্ষিণ তাহাকে প্রাচীরের উপর হইতে ফেলিয়া দেয়। অপর যুবক যে দ্বারপথে আসিয়াছিল সেই দ্বারপথেই বাহির হইয়া যায়। আরজজেব রক্ষীদিগের দণ্ডবিধান করেন। কিন্তু বার্নিয়্যারের কথা কি প্রামাণ্য? তিনি অস্ত্রপুর্বে কোন ‘কিরীমী’ দাসীর মুখে এই সব কথা শুনিয়াছিলেন। মেয়ুক্ষী এই সব কথা বিশ্বাস করেন নাই। কাফী খাঁ এই সকলের উল্লেখমাত্র করেন নাই। এই কথা সত্য হইলে কি আরজজেব যুবকদ্বয়কে মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত করিতেন না? এল্‌ফিন্‌ষ্টোন, কীন প্রভৃতি ঐতি-

হাসিকগণ এই কথার আশা স্থাপন করেন নাই। লেন-পুল কেবল বলিয়াছেন যে, পক্ষীর মৃত্যুর পর শাজাহান ঘোষ্ঠা কথার প্রতি এত অস্বস্তি হইয়া পড়েন যে লোকের নানা কথা বলিত ।

যাহা ইউক শাজাহান সে ঘোষ্ঠা কথাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই ।

জেহান্নারাকে উপঢৌকনে তুলে না করিলে সজাটের নিকট কাহারও পিতা ও কথা ।

জাৰ্ণমা পূর্ণ হইত না । কায়েই জেহান্নার অত্যন্ত ধনী হইয়াছিলেন ।

ট্যাডার্নিয়ার বলিয়াছেন, একজন আমীর সিন্ধু দেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়া অত্যন্ত অত্যাচার করেন । সজাট তাঁহার ব্যবহারে প্রচার আর্জনাগে অথমে কর্ণপাত করিতেন না ; শেষে তাঁহাকে আনিয়া উচ্চতর পদে প্রতিষ্ঠিত করেন । তিনি সজাটকে পক্ষাংশ হাফার ও জাহান্নারাকে বিশ হাফার আসরফি উপহার দিয়াছিলেন । জেহান্নার তত্ত্বাবধানে পিতার আহার্য প্রস্তুত হইত । কতেবাদের যুদ্ধে দারার সিংহাসন ভাঙের ও শাজাহানের ক্ষমতা প্রাপ্তির আশা নির্মূল হইলে জেহান্নারাই আনন্দজৈবের কার্যের প্রতিবাদ করিয়া-
ছিলেন । ইহার পর শাজাহান পুত্রের করে বন্দী হইলে জেহান্নার স্নেহানুগত সকল স্নেহ
জ্ঞাপন দিয়া দীর্ঘ আট বর্ষকাল পিতার শুশ্রূষা করিয়াছিলেন । তিনি পিতার সঙ্গী ও
সহায়-সাধনা ও স্নেহ ছিলেন । পিতার মৃত্যুর পরও আনন্দজৈব তাঁহার প্রতি কোনরূপ
কুব্যবহার করেন নাই । তাঁহার ইচ্ছায় তাঁহার সমাধির উপর কেবল তৃণাশ্রয় আবৃত
হইয়াছিল । সেই তৃণমণ্ডিত সমাধির শিরদেশে যেত সর্গরক্ষকে তাঁহার শেষ ইচ্ছা
উৎকীর্ণ । নবীনচন্দ্র তাহার এইরূপ অস্বাভাবিক করিয়াছিলেন ;—

“বহুমূল্য আবরণে

করিও না স্মৃদ্ধিত

কবর আমার ।

জ্বলন্ত জ্বলন্ত

গীত-আজা জেহান্নার

সজাট কথার ।”

রোশনারা জাতা আনন্দজৈবের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন । জাতার সিংহাসনভাঙ-

চেষ্টাকালে তিনি তাঁহাকে প্রাণাদেয় সকল সংবাদ দিতেন । তাঁহার
রোশনারা ।

সাধারণ ব্যতীত আনন্দজৈবের ভাগ্যে সিংহাসনভাঙ ঘটিল কি না

সন্দেহ । শাজাহান যখন দারাকে বহু অর্থ দিয়া দিল্লীতে যাইতে উপদেশ দিয়া আনন্দজৈবকে
তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলেন, তখন রোশনারাই জাতাকে সংবাদ দেন যে, পিতার
সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে তিনি তুর্ক সন্ন্যাসীদের হস্তে বন্দী হইবেন । দারা মৃত
হইয়া দিল্লীতে প্রেরিত হইলে দামেশম্ম নী প্রভৃতি অসংখ্য তাঁহাকে গোয়ালিয়ার দুর্গে
চিরবন্দী রাখিতে বলেন । রোশনারা জানিতেন, দারা লোকপ্রিয় ; তাই তিনি তাঁহার
মৃত্যুও বিদায় করিতে বলেন । আনন্দজৈবও তাহাই করেন । আনন্দজৈব সজাট হইলে
বান্দশাহের মোহর রোশনারার নিকটে থাকিত । কিন্তু আনন্দজৈব তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস

করিতেন না,—তাই যে থলিতে সে মোহর থাকিত তাহা তিনি আর একটি মোহর দিয়া বন্ধ করিতেন। সে মোহর তাঁহার হস্তে বন্ধ থাকিত। এই অবিশ্বাসের কারণ ছিল। ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে আরম্ভের অত্যন্ত পীড়িত হইলেন। চারিদিকে ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল। কেহ শাহজাহানকে সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে, কেহ বা আরম্ভের কোন পুত্রকে সিংহাসনে বসাইতে সচেষ্ট হইলেন। রোশনারা রোগীর কক্ষে আর কাহাকেও প্রবেশাধিকার দিলেন না।—রোগীর প্রকৃত সংবাদ পুরাঙ্গনারাও জানিতে পারিলেন না। তিনি আরম্ভের পুত্র আকবরকে সিংহাসনে বসাইতে সচেষ্ট হইলেন। আকবর বালক—তাহার নাবালক অবস্থায় স্বয়ং ক্ষমতা পরিচালনের আশাই এ চেষ্টার কারণ। কিন্তু কিছুই হইল না। আরম্ভের মৃত্যু হইলেন। সামান্য মৃত্যু হইয়াই তিনি মোহরের থলি আনিয়া পরীক্ষা করিলেন; বুঝিলেন, রোশনারা মোহর ব্যবহার করেন নাই। কিন্তু তিনি শেষে সকল কথা শুনিলেন। জাতীয় ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া রোশনারা স্বতন্ত্র গৃহে বাস করিবার অস্বস্তি প্রার্থনা করিলেন। আরম্ভের বুঝিলেন, সেই কার্য্যে সম্মতিমান সমীচীন হইবে না। তাই তিনি তাঁহার কন্যাদিগের শিক্ষার তত্ত্বাবধানভার ভগিনীকে দিয়া তাঁহাকে প্রাসাদেই রাখিলেন। ইহার পর রোশনারার জীবনে আর কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা ইতিহাসে নাই।

—•—

বিবিধ।

—:~:—

হেষ্টিংশের বন্ধু।

—•—

যে সময় হেষ্টিংস প্রমুখ যুদ্ধির ইংরাজ বাণিজ্য-প্রসার হইতে ক্রমে এদেশে রাজ্য সংস্থাপন করিতেছিলেন, সে সময় বহু ইংরাজ কোম্পানীর কার্য্যে বা ব্যবসায়িকরূপে এই দূর ও দূরমিগম্য দেশে—অজ্ঞানবিরহিত অবস্থায় আগত্যাগ করিয়াছিলেন। দুই একজন সুদান ব্যতীত কেহ তাঁহাদিগের মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে উপস্থিত থাকেন নাই; অদেশে তাহাদের অঙ্গদগণ বছদিন পরে তাঁহাদের মৃত্যু-সংবাদ পাইতেন। অনামদত্ত ওয়ারেন হেষ্টিংশের বন্ধু চার্লস ক্রফট এইরূপে এ দেশে দেহত্যাগ করেন।

এান্টের বাজালায় পল্লীজীবন সম্বন্ধীয় মনোজ্ঞ পুস্তকে “সুখসাগর” গৃহের একখানি চিত্র আছে। এই গৃহ সম্বন্ধে এান্ট লিখিয়াছিলেন, এই গৃহ ওয়ারেন হেষ্টিংস ও আর তিন জন যুরোপীয় কর্মচারীর অর্থ নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল। এই গৃহসংলগ্ন ভূমিতে তাঁহারা কফি প্রভৃতি চাষের পরীক্ষা করিতেন। চব্বিশ পরগনায় ইহাই যুরোপীয় ব্যক্তিবিশেষের সর্বপ্রথম অধিকার, তৎকালে কোম্পানী ইংরাজ-

দিগকে সাজানায় ভূমি জয় করিতে দিতেন না। এই সম্পত্তি পরে কলিকাতার বিখ্যাত ধনী ব্যাংকটোর হস্তগত হয়। ব্যাংকটো এই গৃহে অত্যন্ত আঁকজমকের সহিত বাস করিতেন। তিনি এই স্থানে নিজ পরিজনবর্গের ব্যবহারার্থ একটি ক্ষুদ্র গির্জাও নির্মাণ করাইয়াছিলেন। পরে এই গৃহ জ্যারালেটো নামক একজন স্প্যানিয়ার্ডের হস্তগত হইলে তিনি ঐ গির্জায় মাছতদিগের বাসের ও মোরগ রাখিবার ব্যবস্থা করেন। "সুখসাগর" কলিকাতা হইতে অদূরে গঙ্গাতীরে অবস্থিত ছিল। এখন গঙ্গার গতিপরিবর্তনে এই গৃহ নদীগর্ভগত। আজ এই উপবনবেষ্টিত গৃহের চিহ্ন মাত্র বিদ্যমান নাই। তখন দার্জিলিং অনাবিষ্কৃত, শিমলা দূরবিগম্য। রাজ্য-সংস্থাপনের ও দেশব্যাপী অশান্তির ছন্টিস্তায় কাতর হইয়া হেষ্টিংস এতদ্ভিত্তি সময় সময় বিশ্রামলাভের জন্য কলিকাতার উপকণ্ঠে এই "সুখসাগর" গৃহে গমন করিতেন। ক্রফ্ট এই গৃহের গৃহস্থামী ছিলেন। আজও চট্টগ্রামে তাঁহার সমাধি বিদ্যমান। সংগ্রহিত 'বেঙ্গল পাষ্ট অ্যান্ড এসেট্' পত্রের সম্পাদক মিষ্টার কানিংহাম ক্রফ্টের জীবনের বিবরণ বিবৃত করিয়াছেন।

১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ক্রফ্ট কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়মে সহকারী খাজান্দার ছিলেন। ১৭৭৭

খৃষ্টাব্দে তিনি রাজস্ব বিভাগের প্রধান আয়ব্যয় পরীক্ষক নিযুক্ত
পরিচয়।

হয়েন। এ্যাণ্ড তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন, হেষ্টিংসের সহিত বাস কালে তাঁহারা প্রায়ই সপ্তাহশেষে জলপথে ভ্রমণে যাইতেন :—কখন বা গুরুটিতে করানী গজবনের গৃহে, কখন বা পরলোকগত মিষ্টার ক্রফ্টের গৃহে অতিথি হইতেন। ক্রফ্ট তাঁহার গৃহসংলগ্ন ভূমিতে ইক্ষুর চাষ করিতেন। আনিতে পারা গিয়াছে, ক্রফ্ট ওড় হইতে "রাম" মত প্রস্তুত করিয়া জাহাজের ব্যবহারার্থ সরবরাহ করিতেন। হেষ্টিংসের পক্ষে মনে হয়, এই গৃহ প্রথমে হেষ্টিংসের থাকিলেও পরে ক্রফ্টের সম্পত্তি হয়।

হেষ্টিংসের সহিত ক্রফ্টের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। হেষ্টিংস অসুস্থ হইয়াছেন, একবার
বন্ধুত্ব।

অসুস্থ হইয়া তিনি "সুখসাগরে" গমন করিয়াছিলেন এবং তথায় মষ্টে
স্বাস্থ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডে হেষ্টিংসের বিচারণাকালে তাঁহার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ ছিল যে, তিনি কোম্পানীর বন্দন কিনিবার পূর্ব-প্রচলিত ব্যবস্থা নাকচ করিয়া তাঁহার বন্ধু ক্রফ্টের সহিত যে নুতন চুক্তি করেন—তাঁহা একান্ত অসঙ্গত ও অচ্যায়। হেষ্টিংস ক্রফ্টকে তাঁহার পক্ষীয় সম্পত্তির তদারকরক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইহাতে ক্রফ্টের বিপদ ঘটে। হেষ্টিংসের পক্ষীয় স্বদেশে প্রত্যাগমন কালে তাঁহার ও তাঁহার সঙ্গীদিগের ভাড়া বাবদ জাহাজের অধ্যক্ষকে ৫০০০ পাউণ্ড দিতে হয়। ক্রফ্ট অধ্যক্ষকে বগদ টাকা না দিয়া মসলিম দেয়, কথা হয়, অধ্যক্ষ ঐ বস্ত্র বিক্রয় করিয়া অর্থ লইবেন। ক্রফ্টের দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ বস্ত্রবিক্রয়ে লাভ না হইয়া ৬০০ পাউণ্ড লোকসান হয় এবং অধ্যক্ষ ক্রফ্টকে ঐ টাকার অর্থ দায়ী করেন। তৎকালে ক্রফ্টের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় দাঁড়াইয়াছে। ফরেষ্টার বলেন, এই গৃহে ক্রফ্ট মসলিম প্রস্তুত করাইতেন এবং রেশম প্রস্তুতের ব্যবস্থাও করাইয়াছিলেন। তাঁহার মত প্রস্তুত করাইবার কথা পূর্বেই বলিয়াছি।

১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে হেষ্টিংশ প্রদেশে প্রত্যাগমন করেন। হেষ্টিংশের প্রত্যাগমনের কিছু দিন
 চট্টগ্রামে পরে জফ্ট চট্টগ্রামে কোম্পানীর প্রধান কর্মচারী হইয়া গমন
 করেন। কটন বলেন, তিনি অসুস্থতানিবন্ধন কলিকাতা ত্যাগ
 করিয়া চট্টগ্রামে গমন করেন। চট্টগ্রামে তাঁহার আর এক বিপদ উপস্থিত হয়।
 তখন এই প্রদেশের ব্যয় সম্বন্ধে অল্প সেনাদলের ও রাজস্ব গমিতির অল্প আবশ্যক অর্থ-
 মাত্র রাখিয়া অবশিষ্ট অর্থ সময়ে পাঠাইতে হইত ; অত্যাশ্রয় কর্মচারীদিগের বেতন প্রদানও
 অসম্ভব হইত। সুদীর্ঘ তিন বৎসর এই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। ইহাকে যে দক্ষিণ জফ্টকে
 বিশেষ বিপন্ন হইতে হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। চট্টগ্রামে মার উইলিয়াম জোন্স
 একবার সঙ্গীক জফ্টের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। কটন স্বীকার করিয়াছেন, চট্টগ্রামে
 জফ্টের কায তাঁহার মত অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ কর্মচারীর উপযুক্ত না হইলেও নিম্নমীয় নহে।
 বোধ হয়, স্বাস্থ্যভঙ্গহেতুই তাঁহার কার্য আশানুরূপ হয় নাই। চট্টগ্রামে গমনের এক বৎসর
 পরে তথায় জফ্টের মৃত্যু হয়।

ভারতী।

এস, মা, রেখেছি চিত-সরোজ-আমন পাতি ;
 উজলি উঠুক তা'র তোমার রূপের ভাতি ।
 কুমুদকুসুমজিনি বিমল চরণশোভা,
 তুমারধবল পদে শোণিমা লোচনলোভা ।
 নথরে ভাসিছে কত নিরমল-ইন্দু-ছায়া ।
 শিথিল কুন্তলে আজ, শ্বেতবাসে শ্বেতকায়া ।
 চাহ, মা, এ মুখ পানে বসি ভক্তহৃদি' পরে,
 নীলাজ নয়নে তব—কি স্নেহ—করাণা করে ।
 ছুটাও নিষার সম জ্ঞান বিষ্ঠা যুগ ধারা,
 ভাসিব মনের স্রুথে, হইব আপনা হারা ।
 সিত ভক্তি প্রেমফুলে যতনে গাঁথিয়া হার,
 রাজীবচরণে দিহু ; লহ, দেবি, উপহার ।

যে ফুলে পুজিছে, মাতঃ । তোমা'র চরণতল ।
 শুকা'তে দিব না কভু থাকিতে নয়নে জল ।
 মানস মঞ্জলে মাগো উঠুক মঞ্জীরব,
 শ্রবণ জুড়াই শুনি' কঙ্কনশিঞ্জন তব ।
 রক্তিম অধরে আধ হাসিয়া স্বর্গীয় হাসি,
 ঢাল এ জীবনকুঞ্জে অগাধ অমিয়রাশি ।
 বিজলী চমকি যা'ক অমানিশা অন্ধকারে,
 ফুটিয়া উঠুক দীপ্তি হৃদয়ের চারিদারে ।
 মিশাও সমীর সনে সুরভি নিখাস তব,
 মোদিত হইবে ধরা সুধাগন্ধে অভিনব ।
 রেখ না রেখ না মাতঃ । তব বীণা অচেতন,
 রাগিনীসত্তার যার' করে বিশ্ববিমোহন ॥
 কোমল কমলকরে পরশি' বীণার তার ।
 আগাও নিদ্রিত হৃদি মধুর বাধারে তা'র ॥

শ্রীলালগোপাল মল্লিক ।

আমামে আহোম ।

আহোম । পশ্চিমোত্তর ভারতবর্ষে মানব জাতির মঙ্গোলীয় শাখাত্ত শক
 ছনপ্রভৃতি জাতিরা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রবেশ করিয়া স্ব স্ব আদিপত্য
 বিস্তার করিয়া বেরূপে ভারতীয় হইয়া গিয়াছে, পূর্বে প্রাপ্তেও এক জাতির সম্বন্ধে সেইরূপ
 ঘটিয়াছে । এই জাতি খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে উত্তর প্রদেশে শানপ্রদেশান্তর্গত *
 পার হইতে আমামে আগিয়াছিল । ক্রমদ্বারা এই গণ, ইহাদিগের নায়ক চুকাফা ১০০০
 শান, ২টি হস্তী এবং ৩০০ ঘোটক সহ ১২১৫ খৃষ্টাব্দে মোঙ্গল ত্যাগ করিয়া সুদীর্ঘ ত্রয়োদশবর্ষ

* The paramount kingdom, the home of the main branch of the tribe, was known to themselves as Mungman and as Pong to the Monipuris. Gai's *History of Assam*, p. 67.

কাল পাতকৈ পার্বত্য প্রদেশে পল্লভ্রমণের পর ১২২৮ খ্রীষ্টাব্দে থামজাংএ উপনীত হইয়া-
ছিলেন। ইহাদিগের আকৃতি ও ভাষা পরীক্ষা করিলে ইহারা যে শান সে বিষয়ে আর সন্দেহ
থাকে না। এই শানেরা অতিশয় বীর্যবান ছিল বলিয়া স্থানীয় অধিবাসীরা ইহাদিগকে
“অসম” বলিত। এই অসম হইতে অহম—অহোম এবং আসাম নামের উৎপত্তি। বর্তমানে
ইহাদিগের সংখ্যা ১৭৮০৮০।

ভাষা। ইহাদিগের স্বতন্ত্র লিখিত ও কথিত ভাষা ছিল। কিন্তু এখন
উহা বিলুপ্ত। এখন ব্রহ্মপুজোপত্যকার প্রচলিত বঙ্গভাষাই

উহাদিগের মাতৃভাষা। তবে দেওধাই—(দেও—দেব, ধাই—ধাত্রী) পুরোহিতদিগের
মধ্যে স্থানে স্থানে সেই ভাষা এখনও প্রচলিত আছে।

ধর্ম। চুকাফা শান প্রদেশে বৌদ্ধ ধর্ম প্রবেশ করিবার পূর্বাঙ্কে

শান ভ্যাগ করিয়াছিলেন। সেইজন্য পরবর্তী কালে যে সকল
শান—খাম্ভি কাকিয়াস, আয়োটোনিয়া, তুরদ এবং খামজান প্রভৃতি সম্প্রদায়
আসিয়াছিল তাহারা সকলেই বৌদ্ধ; আর চুকাফার সহচর ধর্মহীন শানেরা—(আহো-
মেতা) হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দু হইয়াছে। ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী
শান্তিপুর সমিহিত মালিপোতা নামক গ্রামের ৮ কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য্য রাজা চুড়ানথাকে হিন্দু
ধর্মে দীক্ষিত করেন। কৃষ্ণরামের বংশধরেরা আসামে “পার্বত্যীয়া” গোত্রাধী নামে খ্যাত।
আহোমেতা হিন্দু হইয়া অনেক দেবদেবীর মন্দির স্থাপন, জলাশয় প্রভৃতি খনন, ব্রহ্মোত্তর ও
দেবোত্তর দান করিয়াছে।

পাটকই পার্বত্যের দক্ষিণ-মীমাংস-ভাগে ও ব্রহ্মপুজোপত্যকার
ব্রহ্মপুজোপত্যকা। উত্তর-পূর্ব প্রান্তস্থিত সমতল ক্ষেত্র অঞ্চলে (খামজানে) ১২২৮
খ্রীষ্টাব্দে যখন শানেরা চুকাফার নায়কত্বে মীত হইতেছিল তখন নাগা প্রভৃতি পার্বত্য
জাতিরা তাহাদিগের গতিরোধ করিতে অসমর্থ হইয়া তাহাদিগের বশতা স্বীকার করিয়া-
ছিল। সে সময় এই উপত্যকার পূর্ব ভাগে আর্য্য হিন্দু ছিল না। তবে এই উপত্যকার
মধ্য ভাগে আর্য্য শাখার কলিতা জাতি ছিল। ইহারা চতুর্দিকস্থ বর্বর জাতির সংঘর্ষে সেই
সময় হীনবীর্য্য ও ধ্বংসোন্মুখ হইয়া পড়িয়াছিল। কায়েই আহোমগণ অনায়াসে ক্রমশঃ শিব-
সাগর অঞ্চলে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মপুজ নদের দক্ষিণ তটস্থ কাছারী, মিরি, মিকির, গোয়ং
প্রভৃতি স্থানে আধিপত্য ও রাজ্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু উত্তর তট ভোট,
আকা, ডাফলা, মিশমি প্রভৃতি শক্তিশালী জাতিদিগের শাসনাধীন ছিল বলিয়া আহোম-শক্তি
সে দিকে অগ্রসর হইতে সাহসী হয় নাই।

ইহারা ১২২৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮১০ পর্য্যন্ত ৫৮২ বৎসর রাজত্ব
হিন্দুর প্রচার বৃদ্ধি।

ভোগ করে। ইহাদিগের ৩৬ জন রাজার উল্লেখ আছে। এই সুদীর্ঘ
কাল এই উপত্যকা ইহাদিগের হস্তে থাকায় উপত্যকাবাসী হিন্দুদিগের প্রচার-বৃদ্ধি হইয়াছে,
মতেও অসংখ্য পার্বত্য জাতির সহিত সংঘর্ষে হিন্দুদিগের স্বাভাব্য সংরক্ষণ অসম্ভব হইত।

এই পার্শ্বাভ্যাস-ব্রাহ্মসমাজে উপত্যকায় অসত্য-প্রতিষ্ঠিত শাসননীতির ভারত-
আহোম শাসন । ম্যাজুমারী স্থাপন আহোমদিগের প্রতিষ্ঠিত । তাহা যে তাহাদের
গৌরবের বিষয় তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই ।

আসাম বুরঞ্জীর (বুরঞ্জী শব্দটি শান অর্থ ইতিহাস) ২৮ পৃষ্ঠায় ৮ খণ্ডাভি নাম বড়ুয়া
আসামদিগের লাভ । বাহাদুর লিখিয়াছেন "ইহতর অনেক হিন্দুধর্ম গ্রহণ করি বড় নিষ্ঠাপন
হিন্দু হইছে ।" বাস্তবিক জাঠ প্রভৃতি জাতিগণ ভারতীয় হওয়াতে
আমাদের যে লাভ হইয়াছে, এই উপত্যকায় উক্ত মঙ্গোলিয় শাখাভুক্ত শানেরা হিন্দু
আহোম হওয়াতেও আমরা সেইরূপ লাভবান হইয়াছি । কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ কাল
কোন কোন বিজ্ঞ আহোমের মত "হিন্দু ধর্মের লগতে এই আত্মসম্মান আর বংশাভিমানই
যে আহোম সফলতর অভ্যন্তরিত মূল ।" এই মত বিস্তারলাভ করিলে ভবিষ্যতে যে সাম্প্রদায়িক-
কতার আবির্ভাব ও সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় বন্ধন শিথিল হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই ।

শ্রীমদেবেন্দ্রনাথায়ণ শোষ ।

আর্য্যাবর্ত ।

(খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী ।)



প্রসিদ্ধ চীন দেশীয় পরিব্রাজক হিউয়েন সাং যখন ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তখন ভারতবর্ষ বহু খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত। তিনি তাঁহার সমসাময়িক প্রায় সকল রাজ্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বুদ্ধের জন্মভূমি—পূণ্য তীর্থ ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়া যাহা যাহা দেখিয়াছিলেন ও শুনিয়াছিলেন সে সকলের বিস্তৃত বিবরণ তাঁহার পুস্তকে লিখিত হইয়াছে। এই কারণে তাঁহার ভ্রমণকাহিনী পাঠে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আর্য্যাবর্তের অবস্থা আমাদের মানসনয়নসমক্ষে সমুজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত ও স্পষ্ট হইয়া উঠে।

হিউয়েন সাংএর ভারত-ভ্রমণ-কালে উত্তর ভারতে নানাধিক পঞ্চবিংশতি সংখ্যক রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সকলের মধ্যে কাশ্মীরের অবস্থাই সর্বাপেক্ষা উন্নত ও সমৃদ্ধ ছিল। তখন দ্বিতীয় শিলাদিত্য এই রাজ্যে প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহার বাহ্যলে বহু নৃপতি পরাজিত ও কাশ্মীর রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ভারতলগ্নভূত মথুরা, স্থানেশ্বর, অযোধ্যা প্রভৃতি রাজ্য সুর্য্যপ্রতিষ্ঠিত। হিউয়েন সাংএর গ্রন্থে উত্তর ভারতে এই সকল প্রসিদ্ধ রাজ্যের বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে হিমালয়ের পাদস্থিত কতিপয় পার্বত্য জাতির বিবরণও লিপিবদ্ধ আছে। হিউয়েন সাং হিমালয় প্রদেশে ব্রহ্মপুত্র নামক এক রাজ্য পরিদর্শন করিয়াছিলেন। এই দেশ বর্তমান সময়ে গাড়োয়াল ও কুমায়েন নামে পরিচিত। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে একজন রমণীর হস্তে এই রাজ্যের শাসনভার লাভ ছিল। হিউয়েন সাং লিখিয়াছেন, “বহুকাল হইতে রমণীরাই এই দেশের রাজকার্য্য নির্বাহ করিয়া আসিতেছেন। ইহার ফলে এই দেশ জৌরাজ্য নামে খ্যাত। শাসনকর্ত্তীর স্বামী ‘রাজা’ উপাধি লাভ করিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু তিনি রাজ্যের অবস্থা বা শাসনকার্য্য সম্বন্ধে কিছুই অবগত নহেন। পুরুষগণ কেবল যুদ্ধ ও ভূমিকর্ষণ করেন।”

হিউয়েন সাং উত্তর ভারতের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা নানা কথায় পূর্ণ এবং কোতূহলোদ্দীপক। আমরা নিম্নে তাঁহার লিখিত কতিপয় রাজ্যের বিবরণের অনুবাদ প্রদান করিলাম।

মথুরা ।

মথুরা-রাজ্য চক্রাকারে প্রায় ৫ হাজার লি বিস্তৃত । রাজধানী মথুরা নগরীর বিস্তার প্রায় ২০ লি । মথুরা-রাজ্যের ভূমি উর্বর এবং ফলশস্যপ্রসূ । মথুরা-বাসীরা আমলকীর উৎপাদনে সনিশেষ যত্নশীল । এই দেশে এক প্রকার উৎকৃষ্ট কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুত হয় । মথুরা-রাজ্য উষ্ণপ্রধান দেশ । ইহার অধিবাসীরা কৌমল-স্বভাব ; সন্তোষ তাহাদিগের চরিত্রগত গুণ । তাহারা গুণগ্রাহী ও বিস্তার উৎসাহদাতা ।

মথুরা-রাজ্যে বিংশতি সংখ্যক মন্দিরাম ও পাঁচটি দেবমন্দির আছে । মন্দিরাম-সমূহে দুই সহস্র শ্রমণ এবং দেবালয়গুলিতে সর্গ শ্রেণীর লোক বাস করিয়া থাকেন । বৎসরের প্রথম, পঞ্চম ও নবম মাসে এবং প্রত্যেক মাসের নির্দিষ্ট উপবাস দিনে শ্রমণগণ বৌদ্ধ গুপ সমীপে একা প্রদর্শন ও উপহার প্রদান করেন । তখন মণিসুক্রাখচিত পতাকা উড্ডান করা হয়, বহুমুখ্য ছত্তে চারিদিক আচ্ছাদিত হয়, ধূপধূনার গন্ধে আয়োদিত ধূম গগনমার্গে উথিত হয়, সকল স্থান কুসুমাস্তৃত হয় । দেশের রাজা ও বিশিষ্ট অমাত্যবর্গ এই ধর্মোৎসবে সোৎসাহে যোগদান করিয়া থাকেন । এই সময় শ্রমণগণ স্ব স্ব সম্প্রদায়ের আদর্শ পুরুষের মূর্তি-দর্শন করিয়া থাকেন । অভিদর্মশাস্ত্রপাঠীরা সার্বপুঞ্জের-দ্যান পরায়ণগণ মৌদগল্য-পুঞ্জের এবং বিনয়শাস্ত্রপাঠীরা উপানীর শ্রুতির উদ্দেশে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন । ভিক্ষুগীরা আনন্দের, শ্রমণসম্প্রদায়প্রবেশার্থীরা বহুলের ও মহাযান-শাস্ত্রপাঠীরা বোধিসত্ত্বের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করেন ।

ধানেশ্বর ।

ধানেশ্বর-রাজ্য চক্রাকারে প্রায় ৭ হাজার লি ও ধানেশ্বর নগর চক্রাকারে প্রায় ২০ লি বিস্তৃত । এই দেশের জলবায়ু প্রীতিপ্রদ, ভূমি উর্বর ও শস্যশালী । কিন্তু এই দেশের অনগণ বিলাসপরায়ণ, সর্বজনতাহীন, নিরুৎসাহ । তাহারা যাহুবিষ্ঠার বিশেষ অহুরাগী । তাহাদের অধিকাংশই ব্যবসায়বাণিজ্যে লিপ্ত । পৃথিবীর নানাস্থান হইতে বহুমূল্য ও দুর্লভ পদার্থাদি ধানেশ্বরে নীত হয় । এ দেশে কৃষি-স্রীবীর সংখ্যা অতি অল্প এবং তিনটি মাত্র মন্দিরাম বিদ্যমান । এই সকল মন্দিরামে ৭০০ হীনদান মতাবলম্বী শ্রমণ বাস করেন । এদেশে শতাব্দিক মন্দির আছে ।

প্রাচীন যুদ্ধক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র রাজধানী ধানেশ্বর হইতে অদূরে অবস্থিত ।

কুরুক্ষেত্রা ধর্মক্ষেত্র নামে পরিচিত। পুরাকালে আর্য্যাবর্তে দুইজন নৃপতি রাজত্ব করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে সর্ষদাই যুদ্ধ হইত। শেষে সেইরূপ লোকক্ষয়-নিবারণকল্পে তাঁহারা স্থির করেন, উভয় পক্ষের কতিপয় মৈত্র রণক্ষেত্রে শারীরিক ধ্বংসে বিবাদের মীমাংসা করিবেন। কিন্তু জনগণ এ প্রস্তাবে সন্মত হইল না। তখন নৃপতিদ্বয়ের একজন সম্বল-সাধনোদ্দেশ্যে এক অভিনব উণায় অবলম্বন করেন। তাঁহার নির্দেশে একজন মহাজ্ঞানী ব্রাহ্মণ একখানি ধর্মগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া পর্ব্বত-গহবরে লুকাইয়া রাখেন। অনন্তর নৃপতি স্বপ্নে ঐ গ্রন্থের সম্বন্ধে পাইয়াছেন, এইরূপ রটনা করিলে পর্ব্বত-গহবরে ঐ গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয়। এই গ্রন্থ পাঠে লোকের বিশ্বাস জন্মে যে, রণক্ষেত্রে দেহপাত করিলে স্বর্গলাভ হয়। তখন জনগণ যুদ্ধার্থ প্রবুদ্ধ হইয়া উঠে। তখন ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং মৃত-দেহ যষ্টির মত স্তম্ভীকৃত হয়। সেই সময় হইতে অद्याপি এই যুদ্ধ-প্রান্তর নরকক্ষেপে আবৃত রহিয়াছে। *

শ্রবণ রাজ্য ৭।

এই রাজ্যের পূর্ব প্রান্তে গঙ্গা প্রবাহিতা, উত্তরে হিমালয় অবস্থিত। শ্রবণ রাজ্যের পরিমাণফল ৬ হাজার লি। ইহার রাজধানী চক্রাকারে প্রায় ২০ লি বিস্তৃত। ইহার পূর্ব পার্শ্বে যমুনা প্রবাহিতা। শ্রবণ রাজ্যের লোক সত্যপ্রিয় ও সরলস্বভাব। এই রাজ্যে সম্ভারারামের সংখ্যা পাঁচ, এবং শ্রমণের সংখ্যা এক সহস্র। শ্রমণগণ প্রায় সকলেই হীনমান-মতাবলম্বী; অল্প মতাবলম্বীদিগের সংখ্যা অতি অল্প। এই রাজ্যে এক শত দেবমন্দির বিস্তারিত।

যমুনার পূর্ব দিকে ৮ শত লি দূরে গঙ্গা প্রবাহিতা। গঙ্গার জল নীলাভ এবং তাহার তরঙ্গ সাগরোর্মির মত আবর্তিত। ভারতীয় শাস্ত্রগ্রন্থে গঙ্গা ধর্ম্মনদী নামে অভিহিত। এই নদীর জলে স্নান করিলে সর্ষপাপ নষ্ট হয়। যাহারা জীবনে বীতশ্রু, তাহারা গঙ্গাজলে জীবন বিসর্জন করিলে অক্ষয় স্বর্গ লাভ করে, এবং তাহাদের আত্মা পরলোকে পরম সুখ ভোগ করে। কাহারও মৃত্যুর পর তাহার অস্থি গঙ্গাজলে অর্পিত হইলেও তাহার আত্মার সঙ্গতি হয়। মায়াপুর নগরে গঙ্গার উৎপত্তিস্থান অবস্থিত।† মায়াপুর (বর্তমান হরিদ্বার) চক্রাকারে

* হিউয়েন সাং দীর্ঘকাল ভারতবর্ষে অবস্থান করিয়া সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সেই প্রকৃতি তাহার পুস্তকে মহাভারতের এইরূপ বিকৃত বিবরণ দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

† পুরাকালে শ্রবণ দেশে কুরুবংশীয় নৃপতিদিগের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল।

ম্যনাসিক ২০লি বিস্তৃত এবং জনাকীর্ণ। মায়াপুরের চারিদিকে স্বচ্ছসলিলা গঙ্গা প্রবাহিত। মায়াপুর হইতে অদূরে গঙ্গাতীরে বিরাট দেবমন্দির দণ্ডায়মান। এই স্থানে বহুবিধ অলৌকিক কার্য্য সাধিত হয়। ইহার মধ্যভাগে একটি সুদৃশ্য ভড়াগ ইহার শোভাসংবর্দ্ধন করিতেছে। ইহা কৃত্রিমসন্নিবোধে গঙ্গাজলে পূর্ণ। এই স্থানে পাপক্ষয় ও পুণ্যসঞ্চয় হয়। বহু দূরদেশ হইতে শত সহস্র যাজী গঙ্গাস্নানের জন্ত এই স্থানে সমবেত হয়। বদান্ত রাজগণ মায়াপুরে পুণ্যশালা সংস্থাপিত করিয়াছেন; সেই সকলের বায়নির্বাহার্থ আবশ্যক পরিমাণ ভূমিও উৎসৃষ্ট হইয়াছে। এই সকল পুণ্যশালায় বিধবা, শোকাতুর, অনাথ, শিশু ও দীন দরিদ্রগণ সুখাচ্ছ ও ঔষধ প্রাপ্ত হয়।

কান্ধকুজ ।

কান্ধকুজ রাজ্য চক্রাকারে ৪ হাজার লি বিস্তৃত। ইহার রাজধানী শুকপরিখাবেষ্টিত এবং একাদিক সুদৃঢ় ও অম্লমত দুর্গদ্বারা সংরক্ষিত। কান্ধকুজ নগরের (রাজধানীর) সর্বত্র পুষ্পোচ্ছান, বৃক্ষবাটিকা ও দর্পণের স্থায় স্বচ্ছসলিলা দীর্ঘিকা দৃষ্ট হয়। কান্ধকুজ বাণিজ্যস্থান। এই স্থানে বহুমূল্য পণ্যদ্রব্য বিপুল পরিমাণে আমদানী হয়। এই রাজ্যের অধিবাসীরা ধনশালী ও সন্তোষসুখে সুখী। তাহাদিগের বাসগৃহ সুগঠিত ও সুসজ্জিত। এ রাজ্যের সর্বত্র ফুল ও ফল যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। এই স্থানের প্রকৃতিগঞ্জ যথাগময়ে ফোলাকর্ষণ ও শস্যকর্ষণ করিয়া থাকে। কান্ধকুজ রাজ্যের জলবায়ু প্রীতিপ্রদ ও অধিবাসীদিগের আচার ব্যবহার সরল ও চায়াচুগত। তাহাদিগের আকৃতি সুন্দর ও আনন্দবর্দ্ধক। তাহারা কার্য্যকাণ্ডিত উজ্জ্বল বস্ত্র পরিধান করে। কান্ধকুজবাসীরা অধ্যয়নশীল ও ধর্ম্মালোচনার অনুরাগী। তাহাদের বিস্তৃত ভাষার ব্যাতি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। কান্ধকুজ রাজ্য বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদিগের ও অজ্ঞধর্ম্মাবলম্বীদিগের সংখ্যা সমান। এ রাজ্যে শতাধিক সম্ভারাম ও দশ সহস্র ভ্রমণ বিদ্যমান। রাজ্য-মধ্যে দুই শত হিন্দুদেবমন্দির আছে।

আমাদিগের বর্ণিত এই রাজ্যের রাজধানীর প্রাচীন নাম কুসুমপুর। বর্ত্তমান নাম—কান্ধকুজ; 'তদনুসারে রাজ্যের নামও কান্ধকুজ হইয়াছে। কুসুমপুর নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া কান্ধকুজ নাম প্রবর্ত্তিত হইবার কারণ নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

† হিউয়েন সাং লিখিয়াছেন, মায়াপুর এখন রাজ্যের পানবত্তী মতিপুর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

পুরাকালে গজাতীরে একজন ঋষি বাস করিতেন। তিনি শ্রুদীর্ঘ কাল সমাধিস্থ ছিলেন। তৎকালে কোনরূপে তাঁহার স্বপ্নে স্মারগ্ৰোধ (স্মারগ্ৰোধ ৭) বৃক্ষের বীজ পতিত হয় ও বৃক্ষ জন্মে। এই জন্ত তিনি লোকসমাজে মহাবৃক্ষ ঋষি নামে পরিচিত ছিলেন। শ্রুদীর্ঘ কাল পরে ঋষির সমাধি ভঙ্গ হয়। একদা তিনি নদীতীরে পারভ্রমণকালে কুসুমপুর-সিংহাসনাধিপতির নৃত্যপরা শত কন্যাকে দেখিয়া তাঁহাদিগের রূপলাবণ্যদর্শনমাত্র মোহিত হইয়া পড়েন ও রাজা ব্রহ্মদত্তের নিকট একজন কুমারীর কর প্রার্থনা করেন। কিন্তু একে একে সকল কুমারীই সেই জড়ভাবাপন্ন ঋষিকে পতিভে বরণ করিতে অস্বীকার করেন। ইহাতে রাজা ব্রহ্মশাপভয়ে ত্রিষ্মাণ হইলে তাঁহার সর্ব্ব কনিষ্ঠা কন্যা ঋষির বাসনা পূর্ণ করিতে সম্মত হইলেন। ততঃপর রাজা ব্রহ্মদত্ত কনিষ্ঠা কন্যাকে সঙ্গে লইয়া ঋষির নিকট গমন করিলেন। ঋষি সর্ব্বকনিষ্ঠা কুমারীকে অবলোকন করিয়া অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং তাঁহার শাপে অবশিষ্ট কুমারীরা কুজ্ব প্রাপ্ত হইলেন। তদবধি কুসুমপুর কুজা রাজকুমারীদিগের বাসস্থান বলিয়া কাশ্যকুজ আখ্যা লাভ করিয়াছে।

কাশ্যকুজ রাজ্যের বর্ত্তমান অধিপতির নাম—শিলাদিত্য। তাঁহার পিতার নাম প্রভাকর বর্দ্ধন। প্রভাকরবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ রাজকুমার বাজ্যবর্দ্ধন পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অচিরকালমধ্যেই কর্ণ-সুবর্ণের অধিপতি নশাঙ্কের হস্তে পরাজিত ও নিহত হইলেন। তখন মল্লিগণ মিলিত হইয়া রাজ্যবর্দ্ধনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষবর্দ্ধনকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেই সংবাদ প্রচার করেন। হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্য নাম গ্রহণ করিয়া রাজকাণ্ডে প্রবৃত্ত হইলেন। শিলাদিত্য পরাক্রমশালী। তিনি রাজ্যের নষ্ট গৌরবের পুনরুদ্ধারে সফলপ্রম হইলেন। তাঁহার বাহুবলে বহু নরপতি পরাজিত হইয়াছেন এবং কাশ্যকুজ রাজ্যের প্রসারবৃদ্ধি হইয়াছে। শিলাদিত্য বৌদ্ধ ধর্ম্মের পক্ষপাতী। তিনি জীবহত্যা সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন এবং নানা স্থানে স্তূপ নির্মাণ করাইয়াছেন। তাঁহার আদেশে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র প্রশস্ত রাজপথের পার্শ্বে চিকিৎসালয় নির্মিত হইয়াছে। এই সকল চিকিৎসালয়ে চিকিৎসকগণ চিকিৎসা-কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন।

পঞ্চবর্ষের ব্যবধানে শিলাদিত্য ধর্ম্ম-সন্মিলনী আহ্বান করেন; এবং সেই সময় মুক্তহস্তে ধনদান করেন। তৎকালে দানের অযোগ্য অঙ্গাদি ব্যতীত আর সকল জবাই বিতরণত হয়।

একবার মহারাজ শিলাদিত্য পরিদর্শন উপলক্ষে গঙ্গাতীরবর্তী কজিনদর নামক এক ক্ষুদ্ররাজ্যে গমন করিয়াছিলেন। তৎকালে আমি নানন্দার বিহারে অবস্থান করিতেছিলাম। তখন কামরূপের অধিপতি কুমাররাজও নানন্দার বিহারে বাস করিতেছিলেন। মহারাজ শিলাদিত্য আমাদিগকে তাঁহার সমীপে গমন জ্ঞাত কুমাররাজকে আদেশ করিয়াছিলেন। এই কারণে আমি কুমাররাজের সমভিব্যাহারে তাঁহার সকাশে গমন করি। তিনি আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া চীনদেশ সম্বন্ধে নানা বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। আমার উত্তরে তিনি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। শিলাদিত্য শ্রীয রাজধানীর অভিমুখে যাত্রার প্রাকালে ধর্মসম্মিলনী আহ্বান করেন এবং শত সহস্র লোক সমভিব্যাহারে গঙ্গার দক্ষিণতীরবর্তী পথে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। এই বিপুল জনসত্ত্ব নবতি দিবস পরে কান্তকুজে উপনীত হইয়াছিল।

অতঃপর শিলাদিত্যের আমন্ত্রণে বিংশতি দেশের অধিপতিরা স্ব স্ব অধিকারের বিশিষ্ট লাক্ষণ ও প্রামগণের সহিত আগমন করেন। শিলাদিত্যের আমন্ত্রিত ধর্মসম্মিলনী উত্তর ভারতে রাজকীয় মহোৎসবস্বরূপ ছিল। মহারাজ শিলাদিত্য এই স্মরহৎ জনসত্ত্বের বাসজ্ঞাত গঙ্গার পশ্চিম দিকে একটি বিরাট সজ্জারাম ও পূর্বদিকে একটি এক শত ফিট উচ্চ দুর্গ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। সজ্জারামের ও দুর্গের মধ্যস্থলে বুদ্ধদেবের পূর্ণকায় স্বর্ণমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বসন্তকালের দ্বিতীয় মাসের প্রথম দিবস হইতে আরম্ভ করিয়া একাবংশ দিবস পর্য্যন্ত এই মহোৎসব সম্পাদিত হয়। এই মহোৎসবকালে শিলাদিত্য ভ্রাজ্ঞ ও ভ্রামণ উভয় সম্প্রদায়কেই সমান সমাদর করিয়া নানাবিধ স্নাত্তে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। সজ্জারাম হইতে প্রাসাদ পর্য্যন্ত সমগ্র স্থান বহুসংখ্যক পটমণ্ডপে পারিশোভিত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে মধ্যে নহবতের জ্ঞাত সংস্থাপিত উচ্চ মঞ্চ হইতে সুরমধুর বাজধ্বনি উদ্ভিত হইত। মহোৎসবকালে একদিন বুদ্ধদেবের মূর্তিগহ শোভাযাত্রা হইয়াছিল। এই সময় সুরজ্জিত হস্তীর পৃষ্ঠে বুদ্ধদেবের ক্ষুদ্র মূর্তি সংস্থাপিত করিয়া তাহার বাম পার্শ্বে ইঞ্জের ছায় পরিচ্ছদ-পরিহিত শিলাদিত্য ও দক্ষিণ পার্শ্বে কুমাররাজ অবস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের সঙ্গে বক্ষিরূপে পাঁচশত বগহস্তী ছিল। এতদ্ব্যতীত বুদ্ধমূর্তির পুরোভাগে এক শত হস্তী গমন করিয়াছিল। শোভাযাত্রাকালে শিলাদিত্য কর্তৃক মণি, মুক্তা, নানাবিধ মূল্যবান জব্য এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যনির্মিত কুশুম বিতরিত হইয়াছিল। অতঃপর বুদ্ধদেবের মূর্তি দোত করা হইয়াছিল। তাহার পর শিলাদিত্য সেই মূর্তি শ্রীয ক্ষেত্রে বহন করিয়া পশ্চিমে

দুর্গে গমন করেন এবং তথায় তাহা মহার্ঘ পরিচ্ছদে ও অলঙ্কারে ভূষিত করেন। এই সকল ক্রিয়া পরিসমাপ্ত হইলে বিপুল আড়ম্বরে ভোজন হয়, এবং তাহার পর বিদ্বান্‌গণী সমবেত হইয়া স্নগভীর পাণ্ডিত্যসহকারে ধর্ম্মালোচনা করেন। সন্ধ্যাকাল সমাগত হইলে মহারাজ বিশ্রামলাভার্থ স্বীয় প্রাসাদে গমন করেন। *

অযোধ্যা ।

অযোধ্যারাজ্য চক্রাকারে প্রায় ৫ হাজার লি এবং ইহার রাজধানী প্রায় ২০ লি বিস্তৃত। এই দেশে ফুল ও ফল প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এ দেশের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ—প্রীতিপদ। অযোধ্যাবাসীরা ধর্ম্মচর্চ্চাতৎপর এবং বিদ্যানুশীলনে অনুরাগী। এই দেশে ন্যূনাদিক এক শত সন্ত্কারাম এবং দশটি দেবমন্দির আছে। অযোধ্যারাজ্যে শ্রমণের সংখ্যা তিন সহস্র। তাঁহারা মহাযান ও হীনযান উভয়-মতানুগত শাস্ত্র-গ্রন্থই অধ্যয়ন করেন। অযোধ্যা রাজ্যের দেবমন্দিরে যে সকল অপধর্ম্মাবলম্বী বাস করেন, তাঁহারা নানাসম্প্রদায়ভুক্ত। তাঁহাদিগের সংখ্যা অধিক নহে।

প্রয়াগ ।

প্রয়াগরাজ্য চক্রাকারে প্রায় ৫ হাজার লি বিস্তৃত। এই রাজ্যের রাজধানী গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। এই দেশে শস্তাদি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এবং ফলবৃক্ষ ক্ষত বর্দ্ধিত হয়। এ দেশ উষ্ণ। ইহার অধিবাসীরা মৃদুস্বভাব। তাহারা বিজ্ঞানুরাগী। এ দেশে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা অল্প এবং দুইটি মাত্র সন্ত্কারাম আছে। কিন্তু অপধর্ম্মাবলম্বীরা বহুসংখ্যক।

প্রয়াগরাজ্যের রাজধানীতে একটি সুন্দর মন্দির আছে। অপধর্ম্মাবলম্বীদিগের পুরাণেতিহাসে এই দেবমন্দিরের মাহাত্ম্য পরিকীর্তিত হইয়াছে; তাহাদিগের শাস্ত্রে কথিত আছে, জীবমাত্রেরই এই স্থানে সহজে পুণ্যসঞ্চয় করিতে পারে।

* মহারাজ শিলাদিত্য ভারতবর্ষের অশ্রুতম ঐতিহ্য নরপতি ছিলেন। তদীয় বীরত্ব, বিজ্ঞানুরাগ, ধর্ম্মপরায়ণতা ও দানশীলতা কবদন্তীতে পরিকীর্তিত হইয়া আগিয়াছে। তাঁহার সভা কোদিনবুদে পরিমোদিত থাকিত। বিখ্যাত বাণভট্ট তাঁহার সভাসদ ছিলেন। শিলাদিত্য খ্যাত সংস্কৃত-রচনায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার রচনা ভাবের মাধুর্য্যে ও ভাবের প্রাচুর্য্যে সংস্কৃত সাহিত্যে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। ‘রত্নাবলী’ ও ‘নাগানন্দ’ তাঁহার রচনা বলিয়া ঐতিহ্য। কথিত আছে যে, ‘নাগানন্দের’ অভিনয়কালে শিলাদিত্য খ্যাত ক্রীমুত্তবাহনের ভূমিকা গ্রহণ করিতেন।

যদি কেহ এই মন্দিরে সাগাথ অর্থদান করে, তবে অমৃত সহস্র মুক্তাদান করিলে যে ফল লাভ হয়, সে সেই ফল প্রাপ্ত হয় । যদি কেহ জীবন তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া এই মন্দিরে প্রাণত্যাগ করিতে পারে, তবে পরকালে তাহার আত্মার অক্ষয় সুখ-লাভ ঘটে । আগাদিগের বর্ণিত এই দেবমন্দিরের সম্মুখে একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ দণ্ডায়মান, দেখিতে পাওয়া যায় । *

গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে প্রত্যহ শত শত লোক স্নান করে ও প্রাণত্যাগ করে । এ দেশের লোকের বিশ্বাস, স্বর্গকামীর পক্ষে ওড়ুল কণামাজ ও গ্রহণ না করিয়া উপবাসে নদীজলে জীবন বিসর্জন করা আবশ্যিক । তাহাদিগের বিশ্বাস, গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমে স্নান করিলে সর্বপাপ বিনষ্ট হয় । এই জন্ত বহুদূর হইতে এবং নানাস্থান হইতে বহুলোক এই স্থানে সমাগত হইয়া সপ্তাহকাল উপবাস করিয়া জীবনান্ত করে ।

গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমস্থানের সম্মুখে একটি স্তম্ভ আছে । অপধর্মা বলস্বী সম্রাসীরা স্বর্গান্তকালে এই স্তম্ভে আরোহণ করিয়া এক পদে দণ্ডায়মান হইয়া স্বর্গের স্তুতি ও বন্দনা করিয়া থাকেন ।

এই স্তম্ভ হইতে অদূরে নদীতটে দানবেদী নির্মিত আছে । তথায় রাজকুলবর্গ ও সম্রাটবংশীয়গণ দানকার্য্য সম্পাদন করেন । বর্তমান সময়ে শিলাদিত্য পূর্বপুরুষগণের আচরণে পাঁচ বৎসর অন্তর এই স্থানে পাঁচ বৎসরের সঞ্চিত ধনরত্ন বিতরণ করিতেছেন । তিনি প্রথমে বুদ্ধদেবের মূর্তি অঙ্গজিত করিয়া সেই মূর্তিকে মহার্ঘ রত্নাদি প্রদান করেন ও পরে স্থানীয় আচার্য্যগণকে দান করেন । ইহার পর দূরগত আচার্য্যগণের পর্গায় উপস্থিত হয় । তৎপরে ক্রমে বিখ্যাত কোবিদগণ ও স্থানীয় অপধর্মা বলস্বীরা ধনরত্ন লাভ করেন । সর্বশেষে দরিদ্র, নিরাশ্রয়, পিতৃমাতৃহীন ও আত্মীয়বন্ধুবর্জিত ব্যক্তিদিগকে ধন বিতরণ করা হয় । এইরূপ দানে রাজভাণ্ডার শূন্য হইলে রাজা শ্রীম যুকুট ও অম্বাঙ্গ রত্নাভরণ দান করেন । এই অদৃষ্টপূর্ব দানে শিলাদিত্য অবিচলিত থাকেন এবং দানশেষে সানন্দে ঘোষণা করেন—“সমস্ত কার্য্য সুনির্কীর্ণিত হইয়াছে । আমার গত ধন সম্পদ ছিল, সবই অপাপবিক্র—অক্ষয় কোষে নীত হইয়াছে ।” তৎপরে কনক-রাজগণ স্ব স্ব রত্ন ও পরিচ্ছদ শিলাদিত্যকে প্রদান করেন, এবং তাহাতে উদীয় রাজকোষ পুনরায় পূর্ণ হইয়া উঠে ।

গর্জপতিপুর (গার্জিপুর) ।

গর্জপতিপুর রাজ্য চক্রাকারে প্রায় ২ হাজার লি বিস্তৃত। ইহার রাজধানী গঙ্গাতীরবর্তী এবং ইহার পরিধি প্রায় ১০ লি। এই রাজ্যের অধিবাসিবর্গ ধনশালী। এই স্থানে নগর ও পল্লীসমূহ পরস্পর সংলগ্ন। এ রাজ্যের ভূমি উর্বর ও তাহাতে যথারীতি কৃষিকার্য্য হইয়া থাকে। এ দেশেব অলবায়ু প্রীতিকর, প্রকৃতিপুঞ্জ নির্মলচরিত, গ্রামাশ্রয়ী কিন্তু উগ্রস্বভাব। এ দেশে সত্যধর্মাবলম্বী এবং অপধর্মাবলম্বী উভয়বিধ লোকই দেখা যায়।

বহুকাল পূর্বে হিমাশ্রয় পর্ব্বতের উত্তর পার্শ্বে তুরগা দেশে দুই কি তিন জন শ্রমণ বাস করিতেন। তাঁহারা জ্ঞানানুরাগী ছিলেন। তাঁহারা বৌদ্ধধর্মকীর্তি-রাজি দর্শনের অভিপ্রায়ে ভারতবর্ষে আগমন করেন। কিন্তু ভারতীয়গণ অপরিচিত বিদেশীয় বলিয়া তাঁহাদিগকে আশ্রয়দানে পরাজুথ হইয়াছিল। সেই জন্ত ইঁহারা বহু কষ্ট ভোগ করেন। তাঁহারা অনাহারে বা অর্দ্ধাহারে এবং রৌদ্র-বৃষ্টিতে শুষ্কায় হইয়া পড়েন। এই অবস্থায় তাঁহারা গর্জপতিপুর রাজ্যের রাজধানীতে উপনীত হইলেন। এক দিন পরিভ্রমণকালে রাজা তাঁহাদিগকে দেখিতে পান এবং কৌতূহলপরবশ হইয়া তাঁহাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। তাঁহাদিগের দুর্দশার কাহিনী শ্রবণ করিয়া তিনি ব্যথিত হইলেন এবং তাঁহাদিগের বাসের জন্ত একটি সজ্জারাম নির্মাণ করাইয়া দেন। এই সজ্জারাম অত্যাশি বিদ্যমান। ইহার প্রাচীরগাড়ে নিম্নলিখিত অমরশাসন-লিপি উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায় :—
বুদ্ধের, ধর্ম্মের ও সত্ত্বের অলৌকিক কৃপায় আমি দেশাদিপতির পদ লাভ করিয়াছি এবং মনুষ্যমধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠব্যক্তিরূপে সম্মানিত হইয়াছি। আমি মনুষ্যজাতির শাসনাধিকার লাভ করিয়াছি, এই জন্ত বুদ্ধদেব ধার্মিক ব্যক্তিগণেরই বক্ষণের ও সন্তোষ-বিধানের দায়িত্ব আমার ক্ষম্বে গৃহ্য করিয়াছেন। আমি বিদেশীয়দিগেব আশ্রয়ের জন্ত এই সজ্জারাম নির্মাণ করিলাম।

শ্রীরামপ্রাণ শুভ।

বিশুদ্ধ জলের অভাব ।

আমাদের বাঙ্গালাদেশে বিশুদ্ধ জলের অভাবে দিন দিন বাড়িতেছে । এই জলাভাব দ্বিবিধ কারণে ঘটিতেছে । প্রথম মানবের অনবধানতা, দ্বিতীয় নৈসর্গিক কারণ ।

মানবের অনবধানতা বাঙ্গালা দেশে জলাভাবের এক প্রধান কারণ । বাঙ্গালায় দীর্ঘকালসমূহের ইতিহাস এখনও লিখিত হয় নাই । গালবন্দীয়া রাজাদিগের দীর্ঘিকার পর, অতঃপ্রকাণ্ড দীর্ঘিকা, বোধ হয়, এ প্রদেশে আর খনিত হয় নাই । পরবর্ত্তী কালের দীর্ঘিকাকুলির মধ্যে জগুরার মহারাজাদিগের দীর্ঘিকা, বিষ্ণুপুরের রাজাদিগের দীর্ঘিকা, গীতারাম রায়ের দীর্ঘিকা প্রধান । তাহার পর কৃষ্ণচন্দ্রের দীর্ঘিকাগরের দীর্ঘিকা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল । আধুনিক কালের মধ্যে মহতাপচন্দ্রের দ্বারা সংস্কৃত বর্জ্জমানের বিশাল সরোবরগুলির পর আর মেকপ কোন দীর্ঘিকা বাঙ্গালাদেশে হইয়াছে বলিয়া আমরা অবগত নহি । এই গুলি ব্যতীত বাঙ্গালার প্রায় সর্ব্বত্রই বড় বড় পুষ্করিণীর অস্তিম দশা দর্শন করা যায় । কোন কোন প্রাচীন পুষ্করিণীর গর্ভে কৃষিকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে । কোন কোনটিতে গ্রীষ্মকালে দেড়হাতের অধিক জল থাকে না । মানবের অনবধানতা এই সকল পুষ্করিণীর ধ্বংসের কারণ ।

মধ্যে মধ্যে পুষ্করিণীসমূহের আমূল সংস্কার আবশ্যক ; নাহিলে সেগুলি শুষ্ক হইয়া দেওয়া উচিত । পুষ্করিণী নিম্ন স্থান, চারিপার্শ্ব হইতে বৃষ্টির জল জমি ধুইয়া উহাতে আসিয়া সঞ্চিত হয় । এই বৃষ্টির জল বিশুদ্ধ অবস্থায় পুষ্করিণীতে পৌঁছিতে পারে না । উহা মৃত্তিকা ধুইয়া, মৃত্তিকাসংলগ্ন লবণাক্ত পদার্থ এবং জমির উপরি-দেশে অবস্থিত ঐশ্বর ও উদ্ভিদ পদার্থ লইয়া পুষ্করিণীতে উপনীত হয় । তদাতীত জানার্থী অনগণের গাজনিঃসৃত মল, রাজকের ঘোত বস্ত্রের মল, বায়ু ও পক্ষী প্রভৃতি জীবের দ্বারা আনীত বিবিধ উদ্ভিদের বা জীবের বীজ বা দেহাবশেষাদি ইত্যাদি দূষিত পদার্থও পুষ্করিণীতে দিন দিন অস্বাভাবিক পরিমাণে সঞ্চিত হইয়া ক্রমে ক্রমে উহার জলের বিশুদ্ধি বিনাশ করে । এইরূপ জল ক্রমে ক্রমে, বিবিধ পচন জিয়া ও রোগের উৎপাদক আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদসমূহের আবাস ভূমির উপযুক্ত হয় ; এবং কালক্রমে উহা এমন অবস্থায় উপনীত হইতে পারে যে, উহার জল বা উহার অবস্থান, নিকটস্থ নগরের বা গ্রামের স্বাস্থ্যহানির প্রধান কারণ হইয়া উঠে ।

তবে প্রকৃতির ভাঙারে পুষ্করিণীর জলের বিশুদ্ধি রক্ষা করিবারও কতকগুলি

উপায় আছে। এগুলি অনন্ত কাল না হউক বহুদিন পৃথিবীর জলের বিশুদ্ধি রক্ষার চেষ্টা করে। এই সকল উপায়ের মধ্যে সূর্য্যকিরণ এবং বায়ুই প্রধান। আমাদের অনিষ্টকারী যে সকল আণবিক উদ্ভিদের (Bacteria) কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহারা আলোক এবং বিশুদ্ধ বায়ুকে বড় ভয় করে। আলোক এবং বায়ুস্থ অম্লজান তাহাদের পক্ষে বিষবৎ কার্য্য করে। তাহারা একটু নিম্নবিজি, অন্ধকারময়, দূষিতবাস্পপূর্ণ, সোঁতা স্থানে জৈব এবং উদ্ভিজ্জপদার্থ থাইয়া সহজে পুষ্ট হইতে এবং বংশ বৃদ্ধি করিতে পারে। দীর্ঘিকায় জলের অভাব নাই। কিন্তু অধিকাংশ দীর্ঘিকাই যথেষ্ট আলোক ও বাতাস পায়। বাতাস অম্লজানের সাহায্য ব্যতীতও উদ্ভিজ্জাণু-গণের অনিষ্ট করে। উহা সরোবরের জলকে আন্দোলিত করে। স্থির জল না হইলে উদ্ভিজ্জাণুগণ (Bacteria) সস্তান উৎপাদন করিতে পারে না। স্রোতস্থিত জলের প্রবল আন্দোলনের জন্মই উহাতে উদ্ভিজ্জাণু জন্মিতে পারে না। ভাগীরথীর প্রবল স্রোতই উহার জলকে উদ্ভিজ্জাণুরকবল হইতে রক্ষা করে। বায়ু এবং সূর্য্য-লোক ব্যতীত মৎস্ত এবং পক্ষিগণ পৃথিবীর জল বিশুদ্ধ রাখিবার চেষ্টা করে। উহারা সন্নিবেশিত মল ও বহুবিধ ক্ষুদ্র জীব ভক্ষণ করিয়া পৃথিবীর দেহজ (Organic) পদার্থের মাত্রা কমাইয়া দেয়। অতএব উহারা উদ্ভিজ্জাণুর খাণ্ডের মাত্রা কমাইয়া দেয় এবং অনেক সময়ে উহাদিগকেও ভক্ষণ করে। মৎস্তগণ জলের মধ্যে যাতায়াত করিয়া—জল আন্দোলিত করিয়া উহাদের বংশবৃদ্ধিরও অসুবিধা ঘটায়। পক্ষীর এবং মৎস্যের এই সকল এবং অন্যান্য উপকারের কথা স্মরণ করিয়া যাহাতে দেশমধ্যে মৎস্ত ও পক্ষিবংশ নির্মূল না হয়, বরং যাহাতে তাহাদের সংখ্যা-বৃদ্ধি হয়, এরূপ চেষ্টা করা কর্তব্য। মানুষের জ্ঞানের সময়, জল আলোড়িত হইয়া তদ্বারাও উদ্ভিজ্জাণুর বংশ-বৃদ্ধির কতকটা অসুবিধা হয় এবং তাহাদের গাত্র-পরি-ত্যক্ত সর্বপট্টেলের জীবাণুনাশক শক্তিদ্বারাও উহাদের কতকটা অনিষ্ট হয়। কিন্তু প্রকৃতির এইরূপ ব্যবস্থা সত্ত্বেও দিন দিন পৃথিবীতে দেহজ (Organic) পদার্থের মাত্রা বাড়িতে থাকে এবং কিছুকাল পরে এই সকল পদার্থের মাত্রা এত বাড়িয়া উঠে যে, পূর্বোক্ত উপায়গুলিও আর দীর্ঘিকায় জলের বিশুদ্ধি রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না।

ডোবাগুলিতে, উদ্ভিজ্জাণু, জন্মিবার পক্ষে যে সব সুবিধার আবশ্যক, সে সবই আছে। উহা বৃক্ষাদির দ্বারা বেষ্টিত এবং ক্ষুদ্র বসিয়া আলোক ও বাতাস অতি অল্প মাত্রায় এবং পত্রাদি দেহজ (Organic) পদার্থ অত্যধিক মাত্রায় পায়। উহাদের স্রোতহীন, অন্ধকারময়, মৎস্তাদিশূন্য প্রচুর জৈব ও উদ্ভিজ্জ

পদার্থাবশেষগুণ্ড অঙ্গ উদ্ভিজ্জাবাসেব পক্ষে বিশেষ উপযোগী । অতএব ভোনা গুলি দেশের পরম শত্রু; উহাদের বিলোপেব অল্প সকলের বন্ধপনিকর হওয়া আবশ্যক ।

কেবল মানুষের গনবধানতাই যে বিপুল অঙ্গের অভাব ঘটাতেছে, এমন নহে ; অনেক সময় সে স্বয়ং লোভবশতঃ উক্ত অনিষ্ট উৎপাদন করিতেছে । বাঙ্গালার সকলত্রই দেখা যায় যে, লোকে অতি প্রাচীন নদীতে বা খালে আল বাঁদিয়া চাষের জমি বা পুকুরিণী কনিয়া জোত একবারে বন্ধ করিয়া দিয়াছে । পাটের দ্বারা যে কত স্থানে বিপুল অঙ্গ দূষিত হয়, তাহার পরিমাণ কে করবে ? উহার দ্বারা যে পরিমাণ অঙ্গ দূষিত হয়, যে পরিমাণ মৎস্য বিনষ্ট হয়, যে পরিমাণে লোকের স্বাস্থ্য-হানি ও প্রাণহানি হয়, এই সমুদায় হিসাব করিয়া দেখিলে পাটের চাষ অতি মাত্রায় বাড়াইলে দেশের আর্থিক লাভও বিশেষ হয় কি না, সন্দেহ ।

এখানে আগরা নৈসর্গিক উপায়ে, বিপুল অঙ্গপ্রাণীর ক্রিয়াজনিত অশ্রুবিধা ঘটিতেছে, তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব । ঐ কারণ দ্বিবিধ :—প্রথম অলাশয়ের লোপ, দ্বিতীয় বৃষ্টির অস্বাভাব ।

যে কারণ মানবকৃত পুকুরিণীকে মাঠে পরিণত কবে, সেই কারণই নদী, হ্রদ প্রভৃতি স্বাভাবিক অলাশয়গুলির লোপ করিতেছে । বৃষ্টির ফোঁটাগুলি সবেগে ভূমির উপর পতিত হইয়া উহাকে কতকটা কর্ষণ করিয়া মৃত্তিকা শিথিল করিয়া দেয়, পরে ভূমির উপর সঞ্চিত বৃষ্টির অঙ্গ মৃত্তিকাসংগ্রহ করিয়া ঘোলা হইয়া, পয়ঃপ্রণালী বহিয়া নিম্নস্থানের অশ্রুস্রবানে গমন করে । অনেক সময়ে উহা হ্রদ, পুকুরিণী, ডোবা প্রভৃতি দেশমধ্যস্থ অলাশয়েই বিশ্রাম করিবার স্থান পায় । তথায় কয়েকদিন বিশ্রামের পর উহার মৃত্তিকাবানি গির্জাটয়া পুকুরিণীর তলদেশে একটি স্তর নির্মাণ করে—এইরূপে পুকুরিণীটি ক্রমশঃ ভরাট হইতে থাকে । বৃষ্টির অঙ্গ দেশমধ্যে বিশ্রাম করিবার সুযোগ না পাইলে, দেশ দ্রুত করিয়া নদীতে নিপতিত হয় । নদী সেই বিশাল অঙ্গরাশি বহন করিয়া লইয়া সমুদ্রে ফেলে । কিন্তু কখন কখন নদী সেই অঙ্গরাশি-বাহিত মৃত্তিকা, বালুকা ও শিলাখণ্ড বহনে ক্লান্ত হইয়া সেগুলিকে আপনার গড়ের স্থানে স্থানে সঞ্চিত করিয়া আপনার মতুর পথ পরিষ্কৃত করিয়া দেয় । সঞ্চিত পদার্থগুলি কিছুকাল পরে চড়ারূপে এক একটি ফোঁটকে পরিণত হয় । অনেক নদী এই ফোঁটকের প্রভাবে প্রাণ-ভ্যাগ করিয়াছে ; কচিং মানুষ বিপদ বুঝিয়া ফোঁটকে অজ্ঞাধাত করিয়া নদীকে বাঁচাইয়াছে । অগভীর নদীর অঙ্গ বর্ষায় সময় দেশ প্রাবৃত্ত করে বটে, কিন্তু

গ্রীষ্মের সময় উহার খাতেব উপর শুক বাণুকা ধু ধু করিতে থাকে। বাগালা দেশেব অধিকাংশ নদীই সমরনের পথে চলিয়াছে। এমন যে পদ্মা, তাহারও আর সে প্রথর তেজ নাই।

আরও একটা কাবণে পৃথিবীর অনেক স্থানে বিশুদ্ধ জলের মাত্রা কমিয়া যাইতেছে। পঞ্চাশ হাজার বৎসর পূর্বে যে হ্রদের জল বিশুদ্ধ—সুপেয় ছিল, এখন তাহার জল লবণাক্ত—অপেয় হইয়াছে। কেন? বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া নিকটবর্তী দেশ ধৌত করিয়া বৃষ্টিব জল উহাতে পড়িয়াছে। প্রতি বৎসর মাটি হইতে উহা অনেক লবণাক্ত পদার্থ লইয়া গিয়াছে। কাষেই হ্রদটি প্রতি প্রতি বৎসর লবণ ও জল পাইয়াছে। জল শুকাইয়া বাষ্প হইয়া গিয়াছে, কিন্তু উহার সহিত আনীত লবণ যুগ যুগ ধরিয়া সঞ্চিত হইয়া হ্রদটির জল লবণাক্ত করিয়াছে।

কথা হইতেছে এই যে, যে সকল জলস্রোতের তেজে এককালে এই সকল বিশাল নদী সৃষ্ট হইয়াছিল, এখন কি তাহারা আপনাদেব তেজে নদীগুলিকে পুনরায় গড়িয়া লইতে পারে না?

কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা যাইতেছে যে, নদীগুলিব তেজ কমিয়া গিয়াছে। প্রাচীন-গগন বলেন, ২০১০ বৎসর পূর্বে এদেশে যেরূপ বৃষ্টিপাত হইত এখন তদপেক্ষা অনেক অল্পপরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়। কথাটা অনেক সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন এবং অনেকে ভাবেন, কতকগুলি অরণ্যের উচ্ছেদই এই বৃষ্টির অল্পতার কারণ। এক্ষণে সেই অল্প অরণ্যরক্ষার সুবন্দোবস্ত আরম্ভ হইয়াছে।

অরণ্যের উচ্ছেদ ব্যতীত বৃষ্টির অল্পতার কি অন্য কোন কারণ আছে? পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে বর্তমান কালের অপেক্ষা অল্প বারিপাত হইত কি না, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। তবে নিম্নলিখিত কারণগুলির আলোচনায় অনুমিত হইবে যে, প্রাচীন কালে বর্তমান সময়ের অপেক্ষা অধিক বৃষ্টিপাত হইত এবং আরও পাঁচ হাজার বৎসর পরে বর্তমানকালের অপেক্ষা অনেক অল্প বৃষ্টিপাত হইবে।

কারণগুলি এই :—

(১) সূর্য্যের তাপ দিন দিন কমিতেছে। কাষেই সূর্য্যের জল শোষণ করিবার ক্ষমতাও দিন দিন কমিতেছে।

(২) সমুদ্র হইতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মাত্রায় বাষ্প উত্থিত হইয়া মেঘ নির্মাণে সহায়তা করে। সমুদ্রের জল দিন দিন অধিক মাত্রায় লবণাক্ত হইয়া যাইতেছে।

পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে উহাতে যে পরিমাণ জল ছিল, এখন তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে জল আছে এবং পাঁচ হাজার বৎসর পরে জলের পরিমাণ আরও অধিক হইবে। বিপুল জল হইতে যত সহজে বাষ্প উত্থিত হয়, জলশূন্য জল হইতে তত সহজে বাষ্প উত্থিত হয় না। অতএব সমুদ্র-জলের বর্তমান সময়ের জলশাখিক্য বশতঃ উহা হইতে পূর্বে যে তাপে যে মাত্রায় বাষ্প উত্থিত হইত, এখন সেই তাপে তদপেক্ষা অল্প মাত্রায় বাষ্প উত্থিত হইবে।

(৩) সমুদ্র-জল হইতে শুধু বাষ্প উত্থিত হইলেই বৃষ্টি হয় না ; বৃষ্টি উৎপাদনের পক্ষে দেশের পর্বতরাশি বিশেষ উপকারী। হিমালয় ও অন্যান্য পর্বতমালা না থাকিলে ভারতবর্ষ এক বিশাল মরুভূমিতে পরিণত হইত ; বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরের বাষ্পরাশি হিমালয় ও তাহার সহযোগিবর্গের গাত্রসংলগ্ন হইয়া ভারত-বর্ষের অল্প বৃষ্টি এবং নদী সৃষ্টি না করিয়া হয়ত কোন স্রুণ মেরুপ্রদেশে উপনীত হইয়া জমিয়া বরফ হইত। কিন্তু ভারতবর্ষের অগ্নিদাতা হিমালয় আপনার বিশাল বক্ষ প্রসারিত করিয়া ভারতভূমির জলরাশি এই দেশে রাখিয়া আপনার কণ্ঠকে বক্ষা করিতেছেন।

কিন্তু পাহাড়গুলিও অক্ষয় নহে ; তাহারাও ব্যোমবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যেন দিন দিন বৃদ্ধি হইয়া গড়িতেছে। যে বিশাল শক্তি এককালে উহাদিগকে উচ্চ উৎকৃষ্ট করিয়াছিল, সে শক্তি আর উহাদিগকে সাহায্য করিতেছে না। কিন্তু যে মাধ্যাকর্ষণশক্তি উচ্চ ও নীচকে সমান করিবার অল্প বাধা—সেই মহাশক্তি এক দিনও পর্বতের দণ্ড দেথিয়া ভুলে নাই। সে পর্বতের অগ্নিনিহিত হইতেই উহাকে এককালে সমভূম করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া আপনার কার্য আরম্ভ করিয়াছে। সে দিন দিন বায়ু, বৃষ্টি, বরফ ও পশুপক্ষীর সাহায্যে পর্বতগাঁও একটু একটু করিয়া ক্ষয় করিয়া নদীর সাহায্যে পৃথিবীর নিম্নস্থানসমূহে লইয়া ফেলিতেছে। এখনও তাহার কার্য শেষ হয় নাই—আরও কত যুগযুগান্তের পর শেষ হইবে কে জানে ? তবে ইহা নিশ্চয় যে, ভাগ্যতিক ঘটনাবলী যদি এইরূপ ভাবেই নিয়ন্ত্রিত হয়, তবে এককালে—অবশ্য সে কাল বহুদূরবর্তী—পর্বতগুলি সমভূম হইবেই। শুধু পর্বতগুলিই বা বলি কেন, সমগ্র ভূভাগ সমতল হইয়া এক বিশাল সাগরের দ্বারা আবৃত হইবে।

বর্তমানে সে সময়ের কথা ভাবিবার প্রয়োজন নাই; কারণ, তখন মানুষই থাকিবে না। তবে পর্বত সমভূম হইবার বহু পূর্বেও যে বৃষ্টির অঙ্কতা নিবন্ধন মানুষ অনেক কষ্ট পাইবে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

বাঙ্গালাদেশে প্রকৃতি এবং মানুষ উভয়েই যথেষ্ট মাত্রায় বিশুদ্ধ জলের অভাব ঘটাইবার চেষ্টা করিয়াছে। উপরে যে অনাবৃষ্টির ভবিষ্যদ্বাণী করা হইল, তাহা লইয়া কাহারও আহ্বাননিজা ত্যাগ করিবার প্রয়োজন নাই। কারণ, সে এত দূরের কথা যে, সে জন্ত আমাদের চুন্নিস্তাগ্রস্ত হইবার আবশ্যক নাই। মানুষ আপনার চেষ্টায় প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুগ্ম করিয়া অনেক হিত করিয়াছে এবং করিতে পারে। বাঙ্গালার যে বিশাল শক্তি—বুধা চেষ্টায়, আলস্যে, অকর্মে ও কুকর্মে ব্যয়িত হইতেছে, যদি কোন ঐশী মহিমার প্রভাবে সেই শক্তি নিয়ন্ত্রিত হইয়া ভূমি-খননকার্যে ব্যয়িত হইত।

মানবসৃষ্ট সুন্দর পদার্থনিচয়ের মধ্যে দীর্ঘ দীর্ঘিকা একটি প্রধান স্থান অধিকারের যোগ্য। বিশাল পুষ্করিণীর অভাবে ভুবনেশ্বরের মন্দিরের সৌন্দর্য্য অর্ধেকেরও অধিক অল্প হইয়া যাইত। বর্তমান সহরের যাহা কিছু সৌন্দর্য্য, তাহার বিশাল গায়রগুলির জন্ত। শুনিয়াছি, রাজ-সমন্দের জন্তই উদয়পুরের অপূর্ণ সৌন্দর্য্য। দক্ষিণাবর্ত্তযাত্রিগণ নিশ্চয়ই টেপাকুলমের সৌন্দর্য্য জীবনে ভুলিতে পারিবেন না।

এখন পল্লীগ্রামের অনেক জমিদার পাশ্চাত্য প্রথায় পল্লীনিবাস রচনা করিতে অস্বস্ত অর্থব্যয় করেন। যদি কোন কবি বা চিত্রশিল্পী তাঁহাদিগকে কুমুদ-কল্লার-পদ্মশোভিত, নীলজল, বিশালসরোবরতীরস্থ অট্টালিকার অপূর্ণ সৌন্দর্য্যের কথা বুঝাইয়া দিতেন।

বাঙ্গালা অতি প্রাচীন দেশ। কিন্তু এ দেশের নিজস্ব কোন প্রাচীন কার্য স্থাপত্য বা শিল্পের নিদর্শন একান্ত বিরল। এ দেশে লোহও নাই, পাতরও নাই; তাই বহুসংখ্যক স্থায়ী শিল্পনিদর্শন গঠিত হয় নাই। এ দেশের মৃত্তিকাও বোধ হয় পুরীর ও ভুবনেশ্বরের মন্দিরের মত বিশাল অট্টালিকা বহন করিবার উপযুক্ত নহে। তাই এদেশে স্থায়ী অট্টালিকাও নাই। এ দেশে ছিল শুধু জলের সৌন্দর্য্য। এ দেশে প্রাচীন স্থাপত্য বিস্তার একমাত্র স্থায়ী নিদর্শন আছে প্রাচীন পুষ্করিণীতে। মহী-পালের নাম এখনও প্রসিদ্ধ। লোকের এখনও বিশ্বাস, বাঙ্গালার নদীগুলিতে বাঙ্গালী খনকের বিদ্যার পরিচয় এখনও পাওয়া যাইতে পারে *।

শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

* মুরশিদাবাদ জিলার প্রবাস যে, গঙ্গার ও পদ্মার সঙ্গমস্থলে গঙ্গাব মোহানার তলদেশ তাড়ের চাপরের দ্বারা আবৃত ছিল। ১২৯২ সালের ভূমিকম্পের সময় সেই চাপর বাতির হয় এবং উহাকে তুলিয়া অনেক টাকা মূল্যে বিক্রয় করা হয়। সেই চাপর উঠাইয়া লইবার পর হইতেই ভাগীরথীর চূর্ণদশা হইয়াছে।

সিদ্ধিদাতা গণেশের বয়স ।

ভারতবর্ষ-ঘটিত পুরাতত্ত্বের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের অনেকে যেরূপ বিচার-প্রণালীর অবলম্বন করিয়া থাকেন, সেইরূপ প্রণালীর অনুসরণ করিয়া ক্রীষ্টীয় বিজ্ঞচক্রা মজুমদার মহাশয় নব-পর্যায়ের ‘বঙ্গদর্শনের’ তৃতীয় বর্ষের অষ্টম সংখ্যায় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, “গণেশের বয়স প্রায় ১৩ শত বৎসর ।” এই সিদ্ধান্তের আনুকূল্যে বিজ্ঞ বাবু যে সকল কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা এই,—

(১) মার্কণ্ডেয় ও অন্তর পুরাণের সৃষ্টির পূর্বে কুজাপি সিদ্ধিদাতা গণেশকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না ।

(২) মহাভারতের অনুক্রমণিকায় যখন কেবল একবারমাত্র গণেশের নাম উল্লিখিত, তখন ঐ দেবতা মহাভারত-রচনার সময়ে কদাচ পরিচিত ছিলেন বলিয়া স্বীকার করা যায় না । অনুক্রমণিকাটি যে পরবর্ত্তী সময়ে রচিত, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই ।

(৩) গণেশ নামক স্বতন্ত্র দেবতার কথা রামায়ণে নাই । উত্তরকাণ্ডের এক স্থানে মহাদেবকেই “গণেশ” বলা হইয়াছে ; কিন্তু ঐ স্থানটিও অদেখীয়া প্রাচীন পণ্ডিতগণের মতে প্রাপ্ত বয়সে বিবেচিত হইয়াছে ।

(৪) পঞ্চতন্ত্রে গণেশের উল্লেখ নাই । যদি খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতেও গণেশের অঙ্গা হইয়া থাকিত, তবে কদাচ এতদূর অনুলোপিত হইত না ।

(৫) বৎস, ভটি, কালিদাস, ভারবি প্রভৃতি ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীর কোনও কবি গণেশ গণেশের নাম নাই—ঐ যুগের কোনও প্রাক্তরলিপিতেও তাঁহার নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় না ।

(৬) ভরত-প্রণীত নাট্যশাস্ত্র বা নৃত্যশাস্ত্রে রঙ্গভূমির কলাগ-কামনায় যে সকল দেবতার উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাঁহার মধ্যে গণেশের নাম পাওয়া যায় না । গণেশের অনস্তিত্ব ভিন্ন ইহার অল্প কোনও ব্যাখ্যা সম্ভবপর নহে ।

(৭) তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অন্তর্গত যাজ্ঞিকী অথবা নারায়ণীয়া উপনিষদে গণেশের পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ঐ উপনিষদ “অত্যন্ত অর্ধাচীন ।”

(৮) খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে প্রোহুর্ভূত বাণভট্টের কামদম্ভরীতে হস্তিমুখধারী গণপতির প্রথম সাফাৎকার জ্ঞাত করা যায় । কিন্তু সেখানেও “গণ” ও “গন্ধর্ভ-

দিগের" আবাসস্থানের প্রসঙ্গে তাহাদের অধিপতিরূপে তাঁহার উল্লেখ করা হইয়াছে।

(৯) বাণভট্টের সাংসময়িক ভবভূতির 'মাণ্ডীমাধবে' মৰ্কণ্ডেয়গণমে গণেশের পূজা পদবী লাভ দেখিতে পাওয়া যায়। ভবভূতি দাক্ষিণাত্য ছিলেন। সুতরাং সে সময়ে দক্ষিণাপথে গণেশের পূজা প্রচলিত থাকিলেও উত্তর প্রদেশের বাণভট্টের গ্রন্থে তাঁহার কেবল অস্তিত্বমাত্র উপলব্ধ হয়।

(১০) রাষ্ট্রকূট ও চালুক্য রাজাদিগের বিজয়ের পূর্বে দক্ষিণদেশে আর্য্যনিবাস স্থাপিত হয় নাই। দক্ষিণাপথে আর্য্যনিবাস সংস্থাপিত হইবার পরে যে সকল পুরাণ গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহাতে গণপতির অনেক কথা আছে। মার্কণ্ডেয় ও কন্দপুরাণে গণেশের ও কন্দের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। অতএব ঐ পুরাণগুলি কদাচ খ্রীঃ ৮ম শতাব্দীর পূর্ববর্তী হইতে পারে না। ভবভূতির সময়ে গণপতি কোনও 'আন্ত' পুরাণে স্থান পাইয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু অল্প সময় পরেই তাঁহার জন্ম পুরাণ রচিত হইয়াছিল, নিশ্চয়ই দক্ষিণপ্রদেশে তাঁহার পূজা একটু পূর্ব হইতেই প্রবর্তিত হইয়াছিল।

এই দশবিধ কারণের উপর নির্ভর করিয়া বিজয় বাবু মিঙ্গিদাতা গণেশের বয়স ১৩ শত বৎসর বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। লেখক যেরূপ যুক্তিপ্রণালীর অনুসরণ করিয়াছেন ও যেরূপ সাহসের সহিত স্বীয় সিদ্ধান্ত স্থাপনে অগ্রসর হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কথা কহিতে সন্দেহ বোধ হয়। কারণ, আজকালকার বিশুদ্ধ বিদেশী পদ্ধতি অনুসারে ভারতবাসীর অনেক বস্তু-মাত্রকে প্রথমতঃ যথাসম্ভব আধুনিক বলিয়া স্থির করিয়া লইয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হয়। তাহার পর কোনও প্রাচীন গ্রন্থে ঐ বিষয়ের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হইলে ঐ গ্রন্থের প্রাচীনত্বে বা তাঁহার যে অংশে ঐ আধুনিক বলিয়া কল্পিত বিষয়ের উল্লেখ আছে, সেই অংশের মৌলিকত্বে যতপ্রকারে সন্দেহপর, সন্দেহ প্রকাশ করিতে হয়। এরূপ না করিলে বিজ্ঞান-সিদ্ধ প্রণালীর মর্যাদা রক্ষিত হয় না। এরূপ অবস্থায় গণেশের প্রাচীনত্বমূলক যে সকল প্রমাণ বর্তমান অবস্থায় উপস্থাপিত করিবার সম্ভব করা গিয়াছে, তাহার সকলগুলিই কোনও না কোনও হেতুহেতু প্রক্ষিপ্ত বা নিতান্ত আধুনিক বলিয়া প্রতিপাদন করিবার দিকে পাশ্চাত্যমতে দীক্ষিত অপর পক্ষের প্রবৃত্তি হইবার সম্ভাবনা আছে। তথাপি এই ছঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। বিদেশী যুক্তির অধিপতীকায় যদি এই সকল প্রমাণ ভস্মীভূত না হইয়া যায়, তাহা হইলে হিন্দুর পক্ষে তাহা সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে।

বিজয় বাবুর প্রথম যুক্তি এই যে, মার্কণ্ডেয় পুরাণাদির সৃষ্টির পূর্বে কৃত্যপি গণেশকে পূজিয়া পাওয়া যায় না। তিনি মার্কণ্ডেয় ও কন্দ পুরাণকে দ্বিতীয়

সত্যশ্রয় পুণ্ডরীকঃ (খ্রীঃ ৭ম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের) পরবর্তী—এমন কি, ৮ম শতাব্দীর অ-পূর্ববর্তী বলিয়া সাহসপূর্বক নির্দেশ করিয়াছেন। বিজয় বাবু মার্কণ্ডেয় পুরাণাদির রচনার যে সময় নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা তর্কচ্ছলে সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেও গণপতির বয়স যে ১৩ শত বৎসরের অধিক হয় নাই, এ কথা স্বীকার করা দুঃসাধ্য। কারণ, যে বায়ুপুরাণকে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্ববর্তী বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, সেই বায়ুপুরাণে আমরা গণপতির উল্লেখ দেখিতে পাই। যথা :—

গণেশস্ত পদে শ্রীকী মঙ্গলোকং নমোঃ পিতৃ নৃ ।

গঙ্গকর্ণতর্পণকৃৎ নির্মলং স্বর্গয়েৎ পিতৃ নৃ ॥ বায়ুপুরাণ. ১১১ অঃ ।

এখন এই বায়ুপুরাণ যে খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর পূর্ববর্তী, তাহার প্রমাণ ‘হর্ষচরিতে’ (৬২০ খ্রীঃ) পাওয়া যায়। যথা—

বিনোদমার্গাধ্য বেষঃ দধানঃ পুস্তকদাচকঃ স্মৃষ্টিরাজগমে । নাতিদূরন্থিষ্ঠাং চামপ্যাং নিমসাদ । * * * গমটকর্ম্মধুরেঃ আক্ষিপন্ মনাংসি শ্রোতৃণাং গীত্যা পনমানং শ্রোতৃং পুবাং পপাঠ ।—তৃতীয় উচ্ছ্বাসঃ ।

এই “পবমানশ্রোত পুরাণ” যে বায়ুপুরাণ, সে বিষয়ে বোধ হয় কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিবেন না। ‘হর্ষচরিত’-প্রণেতা বাণভট্টের সময়ে (৬০৭ খ্রীঃ—৬৪০ খ্রীঃ) যখন বায়ুপুরাণ-পাঠের পদ্ধতি ছিল ও সেই পুরাণে যখন গণেশের পদে পিণ্ডদান করিবার উল্লেখ আছে, তখন বাণভট্টের অন্ততঃ ১৩ বৎসর পূর্বেও উক্তর ভারতে গণেশ “পূজ্য পদবী লাভ” করিয়াছিলেন, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে।

যাহারা গণেশের আধুনিক প্রতীপাদনে প্রাসঙ্গী, তাহারা হয়ত বলিবেন যে, “গণেশস্ত পদে শ্রীকী” ইত্যাদি শ্লোকটি যে পরবর্তী কালে বায়ুপুরাণমধ্যে প্রসিষ্ট হয় নাই, তাহার প্রমাণ কি? সুতরাং এই প্রমাণটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে অখণ্ডনীয় বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। এই তর্কের উত্তরে প্রথম বক্তব্য এই যে, বায়ুপুরাণ হইতে আমরা যে শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা যে বাণভট্টের সময়ে প্রচলিত বায়ুপুরাণে ছিল না, তাহা সম্ভাব্য করিবার দায়িত্ব স্মারতঃ প্রতিপক্ষেরই গ্রহণ করা উচিত। দ্বিতীয়তঃ, বাণভট্টের পূর্বগামী লেখকদিগের গ্রন্থেও যখন গণেশের দেবত্বের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তখন বায়ুপুরাণের ঐ শ্লোকটিকে প্রসিষ্ট মনে না করিলেও চলিতে পারে। দশমী (বিজয় বাবুস মতে, ৫৯০ খ্রীঃ) প্রণীত ‘দশকুমারচরিতে’ “অদৃশ্যত স্বপ্নে হস্তিবক্ত্রো ভগবান্” এইরূপ উল্লেখ পাওয়া

যায়। এখানে গয়ারদিগের আবাসস্থানের কোনও উল্লেখ নাই, ইহা বলাই বাহুল্য। অথচ এই কবি বাণভট্টের পূর্বগামী।

এখানেও তর্ক উঠিতে পারে যে, দণ্ডীকে অনেকের মতন দাক্ষিণাত্য-কবি বলিয়া মনে করেন, তখন তাঁহার গ্রন্থে গণপতির “পূজ্যপদনী লাভ” নিতান্ত স্বাভাবিক। কারণ, বিজয় বাবুর মতে দক্ষিণ প্রদেশেই প্রথমতঃ গণেশপূজা প্রচলিত হইয়াছিল, উত্তর ভারতে বাণভট্টের গ্রন্থে গণেশের কেবল আন্তঃসমাজ উপলব্ধ হয়। বিজয় বাবু বাণভট্টের ‘কাদম্বরীর’ একটি মাত্র স্থল উদ্ধৃত করিয়াছেন ; কিন্তু বাণ-প্রণীত ‘হর্ষচরিতের’ও কয়েক স্থলেই গণেশের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—

(ক) শিখরনিখাতকুঞ্জকাল্যায়সকলকেশ বৈগবৈগ বিশাখিকাদণ্ডেণ সর্ববিজ্ঞামিচ্ছি-বিদ্য-
বিনায়কপনয়াদুশেনেব সত্যত পার্থবর্জিনা বিরাজমানঃ।

(খ) সকল মহীভুৎকম্পকুহুৎপজ্ঞাত এক এব নৃপবংশে।

বিপুলেহপি পৃথুপ্রতিমো দণ্ড ইব গণাধিপত্য মুখে।

(গ) অমরশিবসহচরো বিনায়কঃ।

শ্রীহর্ষ-প্রণীত ‘নাগানন্দের’ ৪র্থ অঙ্কেও গণেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্রীহর্ষ নিঃসন্দেহ উত্তরভারতীয় নরপতি ছিলেন।

প্রতিপক্ষ হয়ত বলিবেন যে, এই সকল উত্তরভারতীয় রচনায় গণেশের উল্লেখ আছে বটে কিন্তু তাঁহার দেবত্বের সুস্পষ্ট নিদর্শন কোথায় ? উত্তরে আমরা বাণ ভট্ট ও শ্রীহর্ষ অপেক্ষাও প্রাচীনতর লেখকের গ্রন্থ হইতে গণেশের দেবত্বের নিদর্শন প্রদর্শন করিতেছি। অমরসিংহ নিঃসন্দেহ উত্তর ভারতীয় গ্রন্থকার ছিলেন। বাণ ও শ্রীহর্ষ যে তাঁহার পরে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, সে বিষয়েও সন্দেহ নাই। অমরকোষে আমরা দেখিতে পাই—

বিনায়কো বিয়রাজ বৈমাতুরগণাধিপাঃ।

অপ্যেকদন্ত হেরথ লখোদরগজাননাঃ ॥

অমরকোষের প্রথমেই স্বর্গবর্গ। সেই স্বর্গবর্গের প্রারম্ভে স্বর্গ, দেবাসুর ও দেবযোনিমুহুর পম্যায়-কীর্তন ; তাহার পরে বৃক্ষদেবের নামাবলী। অমরসিংহ যে বোঝ ছিলেন, তাহা ইহা হইতেই প্রতিপন্ন হয়। তাহার পরেই অর্থাৎ ১১শ শ্লোক হইতে পৌরাণিক ত্রিমূর্তির নামাবলী আমরা দেখিতে পাই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর, এই ত্রিমূর্তি বা ত্রিদেব অমরকোষে যথাক্রমে বর্ণিত হইয়াছেন। শিবের

পরেই তাঁহার গৃহিণী ভবানীর পরিচয় আছে—চণ্ডিকা নামটিও এই প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে। চণ্ডিকার পরেই গণেশের কথা ও তৎপরে দেবসেনানী কার্তিকের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং দৃষ্ট হইতেছে যে, অমরসিংহের গণেশ কার্তিকের অগ্রগণ্য ছিলেন। বিজয় বাবুর মতে গণেশের অগ্রগণ্যত্ব বাণভট্টাদির সময়েও স্বীকৃত হয় নাই। তাঁহার সে মত যে ভ্রান্ত, তাহা অমরসিংহের লেখায় প্রতিপন্ন হইতেছে। শুদ্ধ তাহাই নহে, গণেশের ঠৈরমাতুরত্বের আখ্যায়িকাও অমরের সময় প্রসিদ্ধ ছিল, দেখা যায়। এখন অমরসিংহ যদি কালিদাসের সাম-সাময়িক হয়েন, তবে কালিদাসের গ্রন্থে গণেশের অনুল্লেক্য হইতে তাঁহার অনন্তিকল্পে প্রতাপ হয়, তাহা বুঝিতে পারি না।

অমরসিংহ কোন্ শতাব্দীর লোক? দেশীয় মতে তিনি খ্রীষ্টপূর্ব ১ম শতাব্দীতে বিদগ্ধমান ছিলেন। খ্রীষ্টপূর্ব সারদারঞ্জন রায় এম. এ. মহাশয় দেশীয় কিম্বদন্তীর যথার্থ্য প্রতিপাদন করিয়া বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির অন্তর্গত যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা নিতান্ত যুক্তিহীন বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। কিম্বদন্তী মতে, অমরসিংহ কালিদাসের সামসাময়িক। বিজয় বাবুও এই কিম্বদন্তীতে আস্থা বান্। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা পূর্বের কালিদাসকে ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। বিজয় বাবুও ঐ মতেই পক্ষপাতী। অমরসিংহের আবির্ভাবকালও খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতেই নির্ধারিত হইয়া থাকে। কালিদাসের সামসাময়িকত্ব ভিন্ন অন্য কোনও স্বতন্ত্র প্রমাণের বলে অমরের ঐ সময় কেহ নির্ধারণ করিয়াছেন, দেখি নাই। কিন্তু কালিদাসকে, মিষ্টার ম্যাকডোনেল তাঁহার “সংস্কৃত সাহিত্য” বিষয়ক গ্রন্থে খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর প্রারম্ভের লোক বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ভিক্টোরিট স্মিথও ঐ মতে সায় দিয়াছেন। সিঃ কিথ বলেন, কালিদাস কখনই ৪০০ খ্রীষ্টাব্দের পরে প্রোভূত হন নাই। এখন যদি কালিদাসের সহিত অমরসিংহের সমসাময়িকত্ব স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে অমরকোষ পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভকালের বা তদপেক্ষাও পূর্ববর্তী গ্রন্থ হইয়া পড়ে। ম্যাকমুলান বলেন, ৫৬১ খ্রীঃ হইতে ৫৬৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে চীনভাষায় অমরকোষের অনূবাদ হইয়াছিল। এই প্রমাণেও অমরকোষকে ৫ম শতাব্দীর গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, সুতরাং গণেশের জন্ম ৫ম শতাব্দীতেও হয় নাই, এ কথা বলা অসঙ্গত হইবে। কিন্তু বিজয় বাবু অন্যত্র লিখিয়াছেন—“দেশী হিড়িম্বা ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বের হেরষ হইয়াছিল, তাহা কেহ দেখাইতে পারিবেন না।” এই সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিবার পূর্বে বোধ হয় অমরকোষের কথাটা বিজয় বাবুর মনে ছিল না। গণেশের হেরষ নাম

যখন অমরসিংহের গ্রন্থে দেখিতে পাই, তখন হেরষ নামের উৎপত্তি অমরকোষ রচনার অন্ততঃ এক শতাব্দী পূর্বে হইয়াছিল বলিয়া মনে করিলে তাহা অসম্ভব হইবে কি ?

তর্কপ্রিয় পাঠক হয়ত বলিবেন যে, এ বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্বে অমরকোষের গণেশ বিষয়ক শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত কি না, তাহারও বিচার আবশ্যক। এইরূপ সন্দেহচিত্ত পাঠকের অবগতির অস্ত্র এ স্থলে ইহা বলা আবশ্যক যে, অমরকোষের অতি প্রাচীন টীকাকার শ্রীমদ্বামী এই শ্লোকের টীকা রচনা করিয়াছেন। শ্রীমদ্বামী কাশ্মীরের রাজা অম্বাপীড়ের (৭৫১ খ্রীঃ—৭৮২ খ্রীঃ) গুরু ছিলেন। তিনি স্বীয় টীকায় স্থানে স্থানে পূর্ববর্তী ২৩ জন টীকাকারের নামোল্লেখ করিয়াছেন, দৃষ্ট হয়। শ্রীমদ্বামীর পূর্ববর্তী টীকাকারেরা যদি আলোচ্য শ্লোকটিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে শ্রীমদ্বামীর টীকায় সে বিষয়ের আলোচনা বা উল্লেখ থাকিত, এরূপ অসুমান আমরা করিতে পারি। রামায়ণাদির টীকা দৃষ্টে অবগত হওয়া যায় যে, প্রক্ষিপ্ত শ্লোক সম্বন্ধে এইরূপ আলোচনা করা সে কালের টীকাকারদিগের প্রীতিসম্পন্ন ছিল। কায়েই অমরকোষের আলোচ্য শ্লোকটিকে প্রক্ষিপ্ত মনে করিবার কারণ নাই। পক্ষান্তরে গ্রন্থের ভূমিকায় অমরসিংহ যখন লিখিয়াছেন যে, তিনি “সমাস্ততান্ত্রিকানি” অর্থাৎ পূর্ববর্তী কোষগ্রন্থসমূহের মারসংকলন করিয়া আলোচ্য কোষগ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন, তখন অমরের পূর্ববর্তী কোষগ্রন্থেও গণেশের হেরষাদি নাম লিপিবদ্ধ ছিল, এরূপ অসুমানও করা যাইতে পারে।

অমরকোষের স্তায় বরাহপ্রণীত ‘বৃহৎ সংহিতার’ কথাও বিজয় বাবুর শ্রুতিপূর্ণ হইতে বিদ্যুত হইয়াছে, দেখিতেছি। ‘বৃহৎ সংহিতার’ ৫৮ অধ্যায়ে বরাহমিহির বিবিধ দেবপ্রতিমার লক্ষণ ও পরিমাণাদির বিচারপ্রসঙ্গে গণেশের নামোল্লেখ করিয়াছেন, দেখা যায় :—

ঐসখ্যাদিপো গজমুখঃ ঐলম্বজঠরঃ কুঠারধারী ত্রাৎ ।

একবিষাণোবিভ্রায়ালককন্দঃ স্নানীলদলকন্দা ॥ ৫৮।৫৮

বরাহ ৪২৭ শকাব্দের (৫০৫ খ্রীঃ অবঃ) লোক ছিলেন ; বিজয় বাবু যদি বরাহমিহিরকে দশিণ-ভারতীয় গ্রন্থকার বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা না করেন, তাহা হইলে বলিতে পারি যে, ৫০০ খ্রীষ্টাব্দে উক্তর ভারতে গণেশের প্রতিমা গড়িয়া পূজা করা হইত। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অমরসিংহকেও ৫০০ খ্রীষ্টাব্দে আনিভূত বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। কিন্তু বরাহের গ্রন্থে রামোপাসনার উল্লেখ ও অমর-

কোষে তাহার অসম্ভাব দেখিয়া মনে হয়, অমরসিংহ বরাহমিহিরের অপেক্ষা অনেক প্রাচীন, এমন কি, খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর অপেক্ষাও প্রাচীনতর । *

অতঃপর মহাভারতাদি পুরাণেতিহাসের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইক । মহাভারতীয় আদি পর্কের অমুক্তমণিকাধ্যায়ে গণেশের হেরণ, গণাধিপ, গণনায়ক প্রভৃতি নামের উল্লেখ দেখা যায় । কিন্তু বিজয় বাবুর মতে ঐ অধ্যায়টি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া তদুল্লিখিত প্রমাণ পরিত্যজ্য । কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, অমুক্তমণিকাধ্যায় কত দিনের প্রক্ষিপ্ত ; ইহাও কি এই প্রসঙ্গে আলোচ্য নহে ? বিগত ১৩০৯ সালের ‘বঙ্গ দর্শনে’ শিবপূজাশীর্ষক প্রবন্ধে বিজয় বাবু লিখিয়াছেন,—“পূর্বে মহাভারত বিষয়ক অক্যাত্ত গ্রন্থ প্রচারিত হইয়া থাকিলেও আমাদের পরিচিত প্রচলিত মহাভারত অপেক্ষাকৃত অনেক আধুনিক ; হয়ত তৃতীয় শতাব্দীর ।” ঐ প্রবন্ধেই বিজয়বাবু এই তৃতীয় শতাব্দীর মহাভারতকে “সৌতি-বিসৃত নব মহাভারত” নামে অভিহিত করিয়াছেন । এই “সৌতি-বিসৃত নবমহাভারতে” বা “আমাদের পরিচিত প্রচলিত মহাভারতেই” (অমুক্তমণিকাধ্যায়ে) যখন গণেশের উল্লেখ আছে, তখন গণেশের জন্ম যে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর বল পূর্বে হইয়াছিল, ইহা সহজেই সপ্রমাণ হইতেছে । খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর গুপ্তবংশীয় জনৈক নরপতির দানপত্রে যখন লক্ষলোকময় মহাভারতের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে, তখন মহাভারতের বর্তমান অমুক্তমণিকাধ্যায়যুক্ত শেষ সংস্করণ যে তাহার অন্ততঃ একশতাব্দী পূর্বে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা বেশ বুঝা যায় । মিষ্টার ম্যাকডোনেল স্বকৃত সংস্কৃত-সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থে এই কথা স্বীকার করিয়াছেন । তিনি বর্তমান অমুক্তমণিকাধ্যায়কে ৩৫০ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী বলিয়া মনে করা সম্ভব বিবেচনা করেন নাই । পঞ্চাশত্রে উজ্জয়িনীর ভূতপূর্ব প্রাধান বিচারপতি শ্রীযুক্ত চিত্তামণি বিনায়ক বৈষ্ণ এম. এ., এল. এল. বি. মহাশয় ও শ্রীযুক্ত বাজ গঙ্গাধর তিলক মহোদয়

* বরাহমিহির লিখিয়াছেন যে, উগবান রামচন্দ্রের মূর্তি ১২০ অঙ্গুলি পরিমিত গঠন করিলে,—“দশরথতনয়ো রামো বাসশটৈবরোচনিঃ শতংবিশঙ্গু ।” বৃহৎসংহিতা ।

পঞ্চাশত্রে অমরসিংহ বিষ্ণুর নামানবীর উল্লেখ প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ, বসুদেব, বলরাম, অনিরুদ্ধ প্রভৃতিরও নামের তালিকা সংকলন করিয়াছেন ; কিন্তু দাশরথি রামচন্দ্রের কোনও উল্লেখ করেন নাই । নানার্থবর্গের ১৪৩ সংখ্যক (মাস) ব্লোকেও বলরাম ভিন্ন অন্য কোনও রামের উল্লেখ নাই । সুতরাং ভারতে রামোপাসনায় বা রামচন্দ্রের দেবত্ব-প্রতিষ্ঠার পূর্বে অমরসিংহ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, মনে করিলে কি দোষ হয় ?

বলেন, মহাভারতের বর্তমান অক্ষরমণিকান্যায়যুক্ত শেষ সংস্করণ খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে সংকলিত হইয়াছিল। সে যাহা হউক, বিজয় বাবুর স্বীকৃত সময় যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করিলেও বলিতে হয় যে, “আমাদের পরিচিত বর্তমান প্রচলিত” মহাভারতের অক্ষরমণিকান্যায়যুক্ত গণেশের উল্লেখ হইতে তাঁহার জন্মকাল খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীরও পূর্ববর্তী দাঁড়াইতেছে। এই বিচারে গণেশের বয়স অন্ত্যন ১৮ শতাব্দী প্রাপ্ত হয়। তবে যদি বিজয় বাবু বিশিষ্ট প্রমাণ প্রয়োগ সহকারে সম্ভাষণ করিতে পারেন যে, মহাভারতে বর্তমান অক্ষরমণিকান্যায়টি খ্রীষ্টীয় তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীর পর প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা।

এই প্রসঙ্গে বায়ুপুরাণের ও স্কন্দপুরাণের রচনাকাল সম্বন্ধে ২১টি কথা বক্তব্য আছে। বিজয় বাবু স্কন্দপুরাণে সিদ্ধিদাতা গণেশের বিস্তারিত বৃত্তান্ত দেখিয়াই উহাকে খ্রীষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর গ্রন্থ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু মহানহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই বঙ্গদেশ হইতেই খ্রীঃ ৭ম শতাব্দীর মধ্যভাগে গুপ্তাক্ষরে লিখিত স্কন্দপুরাণের একখানি প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়াছেন। বঙ্গদেশস্থ এই প্রতিলিপির কত বৎসর পূর্বে মহারাষ্ট্রদেশে বা দক্ষিণাপথে স্কন্দপুরাণ রচিত হইয়াছিল, কে বলিবে? মার্কণ্ডেয় পুরাণও বাণভট্টের ‘হর্ষচরিত’ রচনার সময় (৬২০ খৃঃ) উত্তরভারতে প্রচলিত ছিল বলিয়া অনুমান করিবার কারণ আছে। বাণভট্টের ‘চণ্ডীশতক’ যে মার্কণ্ডেয়পুরাণোক্ত সুপ্রসিদ্ধ ‘চণ্ডীর’ পূর্ববর্তী, এ কথা বলিতে কি বিজয় বাবু সাহসী হইবেন? বায়ুপুরাণকে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর পরবর্তী বলিয়া মনে করা অসম্ভব। এ সকল বিষয়ের প্রমাণ ভিন্নমতে স্থিতির গ্রন্থে পাঠক দেখিতে পাইবেন। এই কারণেই বিষয়ের বিশদ আলোচনা এখানে করা গেল না। ফলতঃ পুরাণগুলিকে বিজয় বাবু যত আধুনিক বলিয়া মনে করেন, সেগুলি তত আধুনিক নহে।

“রাষ্ট্রকূট ও চালুক্য রাজাদিগের বিজয়ের পূর্বে দক্ষিণ দেশে আর্গ্যানিবাস সংস্থাপিত হয় নাই”—এইরূপ নির্দেশ-পূর্বক বিজয় বাবু গুরুতর ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তাঁহার এই সিদ্ধান্তের প্রমাণস্বৰূপে তিনি ডাঃ ভাণ্ডারকরের রচিত ইতিহাসের নামোল্লেখ করিয়া অতীব হাত্তকর ভ্রম সংঘটন করিয়াছেন। বিজয় বাবুর স্বতিশক্তি বোধ হয় এ স্থলেও তাঁহাকে প্রভাবিত করিয়াছে। কারণ, ডাঃ ভাণ্ডারকর স্পষ্টাঙ্গারেই বলিয়াছেন যে, খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে দক্ষিণাপথের প্রায় শেষ প্রান্ত পর্যন্ত সুশৃঙ্খল আর্গ্যারাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রাষ্ট্রকূট ও

চাণ্ড্য রাজগণ ইহার বহু শতাব্দী পরে দক্ষিণাপথ বিজয় করেন । এই সর্লজ্ঞনবিদিত ঐতিহাসিক তথ্য, গণেশের আধুনিকত্ব ও অনার্য্যত্ব প্রতিপাদনের আগ্রহানিক্য, বিজয় বাবুর স্মৃতিপথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে—ইহা নিতান্তই পরিতাপেব বিষয় ।

‘গাথা সপ্তশতী’ নামে মহারাষ্ট্রী-প্রাকৃত ভাষায় রচিত একখানি গ্রন্থ আছে । ঐ গ্রন্থ ডাঃ ভাণ্ডারকর ও মিঃ ভিন্সেন্ট স্মিথ মহোদয়দিগের মতে ৪০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছে । ‘গাথাসপ্তশতীর’ পঞ্চম শতকের তৃতীয় গাথায় গণেশের উল্লেখ আছে । যথা -

হেলাকরগ্গ অঠিঠ অঙ্কলরিকার সাঅরং পআগস্তো ।

জমাই অনিগ্গ অবড় গিগ্ভরি অগগণো গণাহিষ্টে ॥

(টীকা) গণাহিবসৈ গণাধিপতির্বিনাযকো মণ্ডল নায়কশ্চ ।

এখানে শুদ্ধ গণেশ নহেন, তাঁহার শুভ্রেরও উল্লেখ আছে । যখন খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রথমার্ধে রচিত গ্রন্থেও করিমুণ্ডারী গণপতির উল্লেখ পাইতেছি, তখন মহাভারতের অনুক্রমণিকাধায়ে গণেশের উল্লেখ আছে বলিয়া ঐ অধ্যায়কে ১৩শত বৎসরের অপেক্ষা অপ্রাচীন বলিয়া নির্দেশ করা আমরা যুক্তিসম্মত মনে করি না । সে যাহা হউক, ‘গাথা সপ্তশতীর’ প্রমাণে প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্বে গণেশের অস্তিত্ব ছিল, প্রতিপন্ন হইতেছে ।

গুণাঢ্য প্রণীত ‘বৃহৎ কথা’ নামে পেশাচী ভাষায় লিখিত একখানি কথাগ্রন্থও খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রচিত হয় । ঐ গ্রন্থ এখন আর পাওয়া যায় না সত্য ; কিন্তু ‘কথাসরিৎসাগর’ সেই ‘বৃহৎ কথা’ অবলম্বনে রচিত, এ কথা পুরাতত্ত্বানুসন্ধান-মাজেই অবগত আছেন । কথাসরিৎসাগরের যষ্ঠ তরঙ্গে ও ত্রয়স্বিংশত তরঙ্গে গণেশপূজার ভূমি ভূমি উল্লেখ আছে । সে সকল স্থল উদ্ধৃত করিতে গেলে প্রবন্ধ অতি বিস্তৃত হইয়া পড়ে বলিয়া আমরা সে অব্যবসানে বিরত রহিলাম । এক্ষণে যদি অনুমান করা যায় যে, সোমদেব ডাঃ গণেশপূজামূলক ঐ সকল কথা গুণাঢ্যের মূল বৃহৎ কথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা হইলে নিতান্ত দোষ হয় কি ? এ অনুমান যথার্থ কি না, তাহা মূল ‘বৃহৎকথার’ আবিষ্কার না হইলে নির্ণীত হইতে পারে না, ইহা স্বীকার করি । তথাপি ‘বৃহৎকথার’ সামসাময়িক ‘গাথাসপ্তশতীতে’ গণেশের উল্লেখ আছে বলিয়াই আমরা ‘বৃহৎ কথা’ সম্বন্ধে এইরূপ অনুমান করিতে সাহসী হইতেছি ।

‘গাথাসপ্তশতীর’ প্রমাণে সিদ্ধিলাভা গণেশের অস্তিত্ব দুই সহস্র বৎসর পূর্বেও

ছিল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। তাহার কত পূর্বে গণেশের জন্ম হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা যায় না। কারণ, ‘গাথাসপ্তশতীর’ অব্যবহিত পূর্বনক্ষত্র দুই তিন শত বা তিন চারি শত বৎসরের মধ্যে যে সকল গ্রন্থ এ দেশে রচিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে এক পতঞ্জলির মহাভাষ্য ও কাত্যায়নের বার্ত্তিক ভিন্ন আর কোন গ্রন্থেই সহিত পুরাতত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণের পরিচয় নাই। মহাভাষ্য ও বার্ত্তিকে যে কথার উল্লেখ নাই, তাহা সেকালে অপরিজ্ঞাত ছিল, এমন সিদ্ধান্তও করিতে পারি না। কারণ, পতঞ্জলি ও কাত্যায়ন ব্যাকরণ শাস্ত্রই রচনা করিয়াছেন, ভারতীয় জ্ঞানের ‘এন্-সাইক্লোপিডিয়া’ রচনা তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল না। কামেই বলিতে হয় যে, গণেশের বয়স মার্কি দুই সহস্র বর্ষ হওয়াও কিছুমাত্র অসম্ভব ব্যাপার নহে।*

শ্রীসখারাম গণেশ দেউড়র।

আত্মপ্রকাশ।

কুসুমের হৃদয়ে গোপনে
লুকায়িত সৌরভ যেমন—
পবনের পূজক-পরশে
নারে আর রহিতে গোপন ;
মানবের হৃদয়ে তেমনি
গুণরাশি নিবসে গোপনে,
আপনি সে আপনা প্রকাশে
পায় যবে গুণগ্রাহী জনে।

শ্রীবিভূতিভূষণ মজুমদার।

* পুরাকালে মজিকোতে গণেশের পূজা প্রচলিত ছিল ; থোটারে গীর্জার সপ্তম শতাব্দীতে গণেশের পূজা হইত। বত পূর্বে ভারতবর্ষ হইতে গণেশ তথায় নীত হইয়াছিলেন, তাহা জানা যায় না। তবে সপ্তম শতাব্দীতেই তিনি যখন থোটার পর্গাণ্ড অগসর হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার জন্ম যে সপ্তম শতাব্দীতে হইয়াছিল, এরূপ নির্দেশ কতদূর সম্ভব ?—লেখক।

কীটগুতত্ত্ব ।

(ইতিহাস ।)

২

বহু বৈজ্ঞানিক পচনশীল জব্য হইতে কীটগুর স্বতঃজন্মনে বিশ্বাস করিতেন । নীডহ্যাম ইহাদের মধ্যে অগ্রগামী । তিনি লক্ষ্য করেন, মাংসখণ্ডকে সিদ্ধ করিয়া জলের সহিত বোতলে ছিপি বদ্ধ করিয়া রাখিলে, তাহাতে জীবাণু উৎপন্ন হয় । ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে বনেট এই মতের প্রতিবাদ করিয়া বলেন, মাংসখণ্ডেই জীবাণুর বীজ বর্ত্তমান ছিল, বা বোতলের মধ্যস্থ বায়ুতে জীবাণু বিচরণ করিতেছিল । প্যালানজেন পরীক্ষাদ্বারা বনেটের মতের সমর্থন করেন । তিনি একটি কাচপাত্রে মাংস সিদ্ধ করেন এবং মাংস যখন সিদ্ধ হইতেছিল, তখন পাত্রের মুখ বদ্ধ করিয়া দেন । পাত্রমধ্যে জীবাণুর উৎপত্তি লক্ষিত হইল না । পরে একটি ক্ষুদ্র ছিদ্রপথে পাত্রমধ্যে বায়ু প্রবেশ করাইলে জীবাণু উৎপন্ন হইতে লাগিল । এই পরীক্ষাফলে নির্ভর করিয়া আপার্ট মাংসের ও উদ্ভিজ্জ পদার্থের পচননিবারণে সমর্থ হইয়াছিলেন । নীডহ্যাম এই মতের প্রতিবাদ করেন এবং ট্রাভারনাস বলেন যে, জীবাণুর স্বতঃজন্মনের অল্প বায়ুর অবস্থান ও অবস্থা-বিশেষ প্রয়োজন । তিনি বলেন, বোতলে বায়ু ছিল এবং সেই বায়ু অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিল । প্যালানজেন এই মতের প্রতিবাদ করেন ; কিন্তু পরীক্ষাদ্বারা কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই ।

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে শুল্জ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাদ্বারা নীডহ্যামের মত দৃঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন । তিনি একটি কাচপাত্রের অর্দ্ধাংশ চূয়ান জলে পূর্ণ করিয়া তাহাতে নানাপ্রকার প্রাণীজ ও উদ্ভিজ্জ বস্তু নিদ্রোপ করেন ও একটি ছিদ্রিত ছিপি দিয়া পাত্রটির মুখ বদ্ধ করেন । পরে তিনি প্রত্যেক ছিদ্রপথে একটি করিয়া কাচনল সমকোণ ভাবে বদ্ধ করিয়া প্রবেশ করাইয়া দেন । ঐ পাত্রটি সিদ্ধ করিলে জলীয় বাষ্প দুইটি নল দিয়া বাহির হইয়া গেল । তখন তিনি প্রত্যেক নলে দুইটি শূলমূল নলের (bulb tube) একটিতে কমটিক পটেশের সরবৎ ও অপরটিতে সালফিউরিক অ্যাসিড দিয়া aspiration দ্বারা কাচপাত্রে বাহিরের বায়ু প্রবেশ করাইয়া দেন । ঐ বায়ু সালফিউরিক অ্যাসিডের মধ্য দিয়া গমনকালে কীটগুবর্জিত হয়, এবং পাত্রমধ্যে কীটগুর উৎপত্তি পরিলক্ষিত হয় না । কিন্তু বায়ু সালফিউরিক অ্যাসিডের মধ্য দিয়া না যাইলে অল্পকালমধ্যেই

পাত্রে নানাবিধ কীটগুর উৎপত্তি হয়। ইহাতে প্রমাণ হয় যে, বায়ু উত্তপ্ত না করিয়াও রাসায়নিক প্রক্রিয়া-দ্বারা কীটগু বর্জিত করা যায়। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে সানও পরীক্ষায় এইরূপ ফলপ্রাপ্ত করেন। তিনি প্রতিপন্ন করেন যে, পচ্য পদার্থকে গলিত খনিজ পদার্থের উত্তাপে উত্তাপিত বায়ুতে রাখিলে কীটগু উৎপন্ন হয় না। ইহাতে তাঁহার প্রতীতি অগ্রে যে, বায়ুতে পচনক্রিয়ার কারণ নিহিত আছে। কেহ কেহ ইহাতে এই আপত্তি উত্থাপিত করেন যে, সুলুজের ও সানের পরীক্ষিত বায়ু রাসায়নিক ও উত্তাপিক কারণে বিকারগ্রস্ত হওয়াতেই কীটগু উৎপন্ন হয় নাই। এইজন্য নীড্‌হামের মতে লোক তেমন আস্থা স্থাপন করে নাই।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে জোডার ও ভ্যানডুস পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণ করেন যে, বায়ুর রাসায়নিক ও উত্তাপিক পরিবর্তন সংঘটিত না করিয়াও পচন নিবারণ করা যায়। বায়ুকে তুলার ভিতর দিয়া শুষ্ক করিয়া লইলে পচন নিবারণিত হয়। শেষে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে হফম্যান ও ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে সেগিনি ও পাস্তুর প্রতিপন্ন করেন যে, তুলার মধ্য দিয়া বায়ু পরিশুদ্ধ না করিয়াও পচন নিবারণ করা যায়। কোন দ্রব্যকে বক্রমুখ কীটগুবর্জিত—sterile—কাচপাত্রে রাখিলে জীবাণু সকল বক্র-মুখের নিম্নে পতিত হয় ও পচন নিবারণিত হয়। এইরূপে স্বতঃস্ফূর্তের বিরুদ্ধ মত পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইলেও স্বতঃস্ফূর্তনমতের পক্ষাবলম্বীরা নানারূপ যুক্তি উত্থাপিত করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, উত্তাপ-প্রয়োগ-হেতু জলের স্বাভাবিক গুণ বিনষ্ট হয়, এবং সেই জলে অপরিশুদ্ধ বায়ু প্রবিষ্ট হওয়ায় পচনক্রিয়া আরম্ভ হয়। বার্ডন, স্ত্রাণ্ডারসন ও লিষ্টার প্রমুখ কীটগুবিদগণ বিশেষরূপ পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করেন যে, রক্ত, মূত্র ও দুগ্ধ কীটগুবর্জিত কাচপাত্রে ঢালিবার সময় যদি তাহাতে বাহিরের বায়ু স্পর্শ হইতে দেওয়া না যায়, তবে পচন নিবারণিত হয়।

এইরূপ মতবাদ ও বাদামুবাদ-কালে আর এক সমস্তা উপস্থিত হইল। দেখা গেল, কোন দ্রব্য বিশেষরূপে সিদ্ধ করিয়া কাচপাত্রে উত্তমরূপে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেও কীটগুর উৎপত্তি হয়। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ব্যাসটিয়ান কীটগুর স্বতঃ-স্ফূর্তনমতের সমর্থন করিয়া এক পুস্তিকা প্রচার করিলেন।

শালগম ও পনীরের কাথ পরিষ্কৃত করিয়া দশ মিনিট সিদ্ধ করিবার পর কোন পাত্রে ছিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলেও উহাতে কীটগুর উৎপত্তি হয়। ইহার কারণ এই যে, সিদ্ধ করাতে কীটগু বিনষ্ট হইলেও কীটগুবীজ (spore) নষ্ট হয় না।

ইহারা কীটগু অপেক্ষা অধিক ক্ষমতামালী। এই বীজ হইতেই পরে কীটগু উৎপন্ন হয়। টিডাল এই মত প্রকাশ করেন যে, দুই তিনবার সিক করিলে কোন জন্মে আর কীটগু জন্মিতে পারে না। কারণ, প্রথম বার সিক করিলেও যে সকল বীজ সজীব থাকে—সেই সকল বীজ হইতে উৎপন্ন কীটগু দ্বিতীয় বার সিক করিলে বিনষ্ট হয়।

যৎকালে এই সকল আলোচনা চলিতেছিল, সেই সময় আর কয়েকজন বৈজ্ঞানিক সংক্রামক ব্যাধির সহিত কীটগুর সম্বন্ধ নির্ণয়ে প্রবৃত্ত ছিলেন।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ল্যাটোর ও মান আবিষ্কার করেন যে, yeast plant পচনশীল-দ্রব্যসম্ভূত। পচনক্রিয়ার সহিত ব্যাধির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ পূর্বেও বৈজ্ঞানিকগণের অগোচর ছিল না। এফগে কীটগুই পচনের কারণ প্রতিপন্ন হইলে অনেকের মনে করিলেন, কীটগু হইতেই ব্যাধির উৎপত্তি। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে বোয়েম এই মত প্রচার করেন যে, যুরোপে বিসৃচিকা কীটগুর দ্বারা উৎপাদিত। ইহার এক বৎসর পূর্বে ব্যাসী গুটীপোকার সংক্রামক ব্যাধির কীটগু আবিষ্কৃত করিয়া এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিকদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন। তিনি আবিষ্কার করেন, ব্যাধিত পোকের দেহ হইতে কীটগু, সুস্থ পোকের দেহে প্রবেশ করিয়া বীজদ্বারা বহু কীটগু উৎপন্ন করিয়া পোকের প্রাণনাশ করে। এই আবিষ্কারে কীটগুর সহিত সংক্রামক ব্যাধির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রতিপন্ন হয়।

হিউল এই সকল পরীক্ষা করিয়া ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, কীটগু হইতেই সংক্রামক ব্যাধির উৎপত্তি হয়। কিন্তু তিনি বসন্ত ও ফার্মসেট জ্বর প্রভৃতির কীটগু দেখিতে পাইলেন না। ব্যাসীর আবিষ্কার ও হিউলের মত বৈজ্ঞানিকদিগকে নূতন উৎসাহে উৎসাহিত করে, এবং সেই উৎসাহের ফলে বহু নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হয়। এই সময় বহুবিধ সংক্রামক চর্মরোগের কীটগু ও কীটগুবীজ আবিষ্কৃত হয়; এবং অনেক বিসৃচিকার কারণ নির্ণয়ে বঙ্গপরিকর হইলেন। মান, বুটান ও বাড বিসৃচিকারোগগ্রস্ত ব্যক্তির মূলে কীটগু দেখিতে পাইয়াছিলেন। ডারউইনও অল্পস্থ খাত্তজন্মে ক্ষুদ্রতম কীটগু (monad) দেখিয়াছিলেন। কিন্তু এই সময় বিসৃচিকা যুরোপ হইতে প্রায় অন্তর্হিত হওয়াতে এ বিষয়ে আর পরীক্ষা হয় নাই—কারণেই এই কীটগুর সহিত ব্যাধির সম্বন্ধও নির্ণীত হয় নাই।

ল্যাটোরের ও মানের কার্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে পাস্তুর প্রতিপন্ন করেন যে, ল্যাকটিক, অ্যাসেটিক ও বুটিক পচনক্রিয়া কীটগুর কার্য। ইহার পূর্বে

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ডারউইন ও রেয়ার সংক্রামকব্যাদিগ্রস্ত মেঘের রক্তে দণ্ডাকৃতি কীটগু দেখিয়াছিলেন। পল্যাণ্ডার গোরক্লেও উহার অস্তিত্ব লক্ষ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু ডারউইন তৎকালে তাঁহার আবিষ্কারের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা স্থির হয়,—কীটগুই মেঘের মৃত্যুর কারণ। এই সকল কীটগু জীবদেহে প্রবেশ করিয়া বংশাবৃদ্ধি করে, ও রক্ত বিকৃত করিয়া জীবের প্রাণনাশ করে; কিন্তু তখন অনেকে এ মত গ্রহণ করেন নাই।

যাহা হউক, এই সময় কীটগুত্বের যথেষ্ট আলোচনা চলিতেছিল এবং এই সময় অসাধারণ-ধীশক্তিসম্পন্ন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত পাস্তরের আবির্ভাবে কীটগুত্বের ইতিহাসে নবযুগের সূচনা হয়।

শ্রীমতোজ্ঞানাথ মিত্র।

যেও একবার।

আমার জীবনকুঞ্জে যেও একবার,
সুমন্থর বসন্তের সমীরের মত;
বাঁজিয়া উঠিবে শত বিহগ-বাঁকার,
পরশে উঠিবে ফুটি' ফুল শত শত।

তা'র পর আসে যদি চির অন্ধকার
তবু আগি শ্বতি-সুখে রহিব বিভোর;
বরেপড়া-ফুলগন্ধ নীরব বাঁকার,
জাগা'বে তোমারি শ্বতি বাহিত আমার।

রাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণবীর ।

বঙ্গবাসী অধুনা রাজকীয় সেনাবিভাগে প্রবেশলাভ করিতে সম্পূর্ণ অধিকারী ; এমন কি, অনেক বিদেশীয়েও নিকট বাঙ্গালী ভীক ও কাপুরুষ বলিয়া গণ্য ; কিন্তু এমন দিন গিয়াছে, যখন আত্মাক্রমচঞ্চল সকল বঙ্গবাসীই সেনাবিভাগে প্রবেশ করিতে অধিকারী ছিলেন,—রাজপুরুষদিগের নিকট কেহই ভীক বা কাপুরুষ বলিয়া নিন্দিত ছিলেন না ; বরং তাঁহারা মুসলমান রাজগণের পার্শ্বে থাকিয়া তাঁহাদের দক্ষিণহস্তস্বরূপ বহিঃশত্রু হইতে দেশরক্ষা করিতেন । তাঁহারা অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিয়া জাতীয় ইতিহাসে চিরপ্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন ।

বাঙ্গালার ইতিহাসের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ১৩৪৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের হিন্দু মুসলমানের মধ্যে অপূর্ণ মিলন সংঘটিত হইয়াছিল । ঐ বৎসর ফখর উদ্দীন মুজফ্ফর মুবারক শাহ দিল্লীশ্বরকে অমাত্য করিয়া সুবর্ণগ্রাম অধিকারপূর্বক স্বাধীনতা ঘোষণা করেন । ঐ সময়ে পূর্ববঙ্গের প্রধান প্রধান হিন্দু জমিদার তাঁহার সহায় হইয়াছিলেন । মুবারক শাহদের আত্মকুল্যে স্বাধীন হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে উপযুক্ত খেলাত ও জায়গীর দিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন । কিন্তু এ সম্ভাব স্থায়ী হয় নাই । মুবারক স্বজাতীয় আমীর ও মরাহগণের পরামর্শে অল্প দিন পরেই হিন্দু সামন্তবর্গকে অবজ্ঞা করিতে লাগিলেন ; এবং সেইজন্য অত্যন্তকাল মধ্যেই তাঁহার অধঃপাতের সূত্রপাত হইল । তাঁহারই অভ্যুদয়কালে পশ্চিম বঙ্গে শামসুদ্দীন ইলিয়াস তাঁহারই নীতির অনুসরণ করিয়া হিন্দু জমিদারগণের সাহায্যে আপনার সৌভাগ্যপথ প্রশস্ত করবার অবসর খুঁজিতেছিলেন । মুবারকের হিন্দুবিদ্বেষের পরিচয় পাইবামাত্র তখন সম্ভবলগে বাঙ্গালী নৌসেনাগণের সাহায্যে মুবারককে আক্রমণ ও সুবর্ণগ্রাম অধিকার করিলেন । তৎপূর্বেই দিল্লীর সম্রাট ফিরোজশাহ শামসুদ্দীনের দমন করিবার জন্য সৈন্যে রাঢ়দেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন । পশ্চিম বঙ্গের বহু হিন্দু জমিদার ফিরোজশাহের পক্ষাবলম্বন করেন । ‘তারিখ-ই-মুবারকশাহী’ ও ‘তারিখ-ই-ফিরোজশাহী’ পাঠে আমরা অবগত হই যে, তৎকালে পূর্ববঙ্গের অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ইলিয়াসের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন । এমন কি, সহদেব নামে একজন বাঙ্গালী বীর বঙ্গাধিপের সেনাপতি হইয়া দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে ঘোরতর যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন । অবশেষে

তিনি এক লক্ষ আশী হাজার বাঙ্গালীর সহিত রণক্ষেত্রে জীবন বিসর্জন করেন এবং শাম্ভুদীন দিল্লীশ্বরের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন ।

পশ্চিম বঙ্গ হইতে শাম্ভুদীন পূর্বা বঙ্গে পদার্পণ করিলে বহু হিন্দু জমীদার তাঁহার পৃষ্ঠপোষক হইলেন । তিনিও ফকরুদ্দীন মুবারকের দ্বারা তাঁহার পক্ষীয় হিন্দু বীরগণকে উপাধি দানে সম্মানিত করিলেন । তন্মধ্যে চট্টবংশাবতঃস রাষ্ট্রীয় কুলীনপ্রবর আকরপোত্র মহাধনী মনোহরপুল্ল ভূর্গোদন “বজ্রভূষণ” উপাধি এবং মুবারকের পক্ষীয় সামন্তরাজ বা জমীদারগণকে পরাস্ত করায় পুতিভুগুৎসবংশীয় প্রসিদ্ধ কুলীন চক্রপাণি “রাজজয়ী” উপাধি লাভ করিয়াছিলেন । প্রায় ৪ শতবর্ষ পূর্বে প্রসিদ্ধ রাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ-কুলাচার্য্য প্রবানন্দ মিশ্র তাঁহার মহাবংশে উক্ত দুই ব্রাহ্মণ-বীরের এইরূপ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন—

ভূর্গোদনের পরিচয়—

“মনো মনীষি ধনবান্ বিশ্ববিখ্যাতপৌরুষঃ ।

জিয়োথ গোবিন্দঃ বুঢ়োগদোকৌ ভূজোশ্রুজোকৌ চ মনোহরশ্চ ।

পুত্রো বভূবঃ ধোড়শ স্নয়োগ্যাঃ সর্কৈ স্মৃচটোম্ জভাগুরাশ্চে ॥

দ্বিজরাজপদং প্রাপ্য ভূজো রেজে মহীতলে ।

বজ্রকভূষণখ্যাতঃ প্রসিদ্ধঃ সর্বদেশতঃ ॥”

জগৎবিখ্যাত, তেজস্বী, মনীষী ও ধনবান্ মনোহর চট্টের ঘোলাটি পুত্র, তন্মধ্যে জিয়ো বা জীব, গোবিন্দ, বুঢ়, গদাধর, ভূর্গোদন ও স্নয়োদন এই সকলেই চট্টবংশীয় পণ্ডের সূর্য্যস্বরূপ । ইহাদের মধ্যে ভূর্গোদন দ্বিজরাজপদ লাভ করিয়া “বজ্রভূষণ” নামে সর্বত্র প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন । *

চক্রপাণির পরিচয়—

“সদীশ্বরঃ পুতিকুলাগ্রগণ্যো

ধন্তো যশস্বী গুণবান্চ পুত্রী ।

যশচক্রপাণি বহুকর্মপুজ্যো

‘রাজজয়ী’ কর্মচতুষ্টয়েন ॥”

পুতিভুগুৎসবংশীয়, সদাশয়গণের প্রভু, ধন্ত, যশোভাজন, গুণবান্ ও পুত্রবান্ যে চক্রপাণি, তিনি বহুকর্মগুণে পূজনীয় এবং চতুর্বিধ কর্মগুণে “রাজজয়ী” উপাধি লাভ করিয়াছিলেন । কেবল উক্ত দুই মহাত্মা বলিয়া নহে, আরও বহু ব্রাহ্মণ-

* ইহার বংশধরগণও বজ্রভূষণ চট্ট বলিয়াই প্রসিদ্ধ ।

বীরের পরিচয় প্রাচীন কুলশাঙ্গে পাইয়াছি । দিল্লীখর ফিরোজশাহ শাহসুন্দানের বিরুদ্ধে যখন রাঢ় দেশে আগমন করেন, তৎকালে যে সকল জমীদার দিল্লীখরকে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেক ব্রাহ্মণবীরের সন্ধান পাওয়া যায় । ঐ সকল বীরের মধ্যে সাগরদায়ার বন্দ্যবংশীয় উদয়ন কবিকঙ্কণ ও তাঁহার সপ্ত বীর-পুত্রের নাম রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকুলগ্রন্থে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । যথা প্রবানন্দের ‘মহাবংশ’—

“দৌহিত্যকঃ শ্রীকরচট্টোজ
বন্দ্য প্রসিদ্ধোদয়নো বভূব ।
শঙ্করার্থসিংহঃ কবিকঙ্কণোৎমৎ
তর্কশূজার্কঃ স্মৃতিশাস্ত্রবক্তা ॥
ভূপাল-শৌর্য্যাতুল-সম্বিভূতিঃ
প্রসিদ্ধ-বিজ্ঞাতুল-শুদ্ধকীর্ত্তিঃ ।
মুরারিকো গাধবরামকোকাঃ
সন্তোষকঃ পণ্ডিতকঃ কুমারঃ ।
এতে চ বন্দ্যোদয়নস্য পুত্রাঃ
সপ্তৈশ্চ বীরব্রতধারিণশ্চ ॥”

শ্রীকর চট্টের দৌহিত্য স্মৃতিপ্রসিদ্ধ উদয়ন বন্দ্য । ইনি কবিকঙ্কণ উপাধিতে ভূষিত, শক্তি ও অর্থশাঙ্গে মহাশক্তিশালী, তর্কশাঙ্গের অক্ষকার রূপে সূর্য্যস্বরূপ, স্মৃতিশাস্ত্রবক্তা, ভূখাগী, অতুলশৌর্য্যশালী, উত্তম-বিভূতি-বিশিষ্ট, ও অসাধারণ বিজ্ঞাপ্রভাবে অমল কীর্ত্তিতে প্রসিদ্ধ । মুরারি, গাধব, রাম, থোকা, সন্তোষ, পণ্ডিত ও কুমার উদয়নের এই সপ্ত পুত্রও বীরব্রতাবলম্বী বলিয়া প্রথিত ।

বঙ্গের কুলগ্রন্থরূপ সামাজিক ইতিহাসে এইরূপ বীরগণের পরিচয়ের অভাব নাই । স্থানান্তরে এই সকল খ্যাতনামা মহাবীরগণের পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছি । †

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু ।

উত্তরাধিকারী।

১

পাড়ার নিকরমা ছেলেরা যখন সময় কাটাঁইবার জন্য একটা মথের থিয়েটার খুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল—তখন মফঃস্বলে জিয়ার মদরে আদালতে নকলনবীশ গৌরীচরণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভবতারণ সেই দলে যোগ দিল। ভবতারণ সে বার প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবে। বিদ্যালয়ে বুদ্ধিমান বালক বলিয়া তাহার খ্যাতি ছিল; সহসা পাঠে তাহার অনন্যযোগ ও রজালয়-সংস্থাপনে অসাধারণ উৎসাহ দেখিয়া গৌরীচরণ বিরক্ত হইলেন। তিনি কয়বার ভ্রাতাকে পাঠে মনোযোগী হইতে বলিলেন; কিন্তু তাঁহার কথায় বিশেষ ফল হইল না।

যথাকালে ভবতারণ পরীক্ষা দিল। তাহার পর দীর্ঘ অবকাশ; ভবতারণ ও তাহার সঙ্গীরা সোৎসাহে রজালয়-সংস্থাপনের আয়োজন করিতে লাগিল। তাহার পর পরীক্ষার ফল বাহির হইল; ভবতারণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। গৌরীচরণ আফিসে এ সংবাদ পাইলেন; তাঁহার আফিসের অনেকেই তাঁহার সহিত সহানুভূতি করিল, সকলেই বলিল,—ভবতারণ থিয়েটারের দলে গিশিয়াই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিল না। কেহ কেহ গৌরীচরণকে বলিল, “তোমার দোমেই ভীইটা নষ্ট হইল। তুমি ভেগন শাসন কর না।”

গৌরীচরণ লোকটা স্বভাবতঃ “রগচটা”। তাহাতে আবার সংসারের অসচ্ছল অবস্থা, সেই জন্য তাঁহার মেজাজটা আরও খারাপ থাকিত; সামান্য আয়—সংসারে অনেকগুলি লোক—স্বয়ং, ভ্রাতা, পত্নী, দুই পুত্র। ইহার উপর আবার তিনি কয় মাসপূর্বে ভ্রাতার বিবাহ দিয়াছেন। কায়েই আয়ে ব্যয় সঙ্কলান হওয়া প্রায় অসম্ভব। ভ্রাতার অসাফল্যের সংবাদে ও তদুপরি বন্ধুদিগের মন্তব্যে তাঁহার মন বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি সে দিন যে কায়ে হাত দিলেন, সেই কায়েই ভুল করিলেন; তিরস্কৃত হইলেন।

ভাবিতে ভাবিতে গৌরীচরণ গৃহে ফিরিলেন। গৃহদ্বারে তাঁহার সহিত ভবতারণের সাক্ষাৎ হইল। সে তখন থিয়েটারের আড্ডায় যাইতেছে। গৌরীচরণ কিছু উফ্বরে বলিলেন, “ভনিয়াছ, তুমি ‘ফেল’ হইয়াছ?”

ভবতারণ কোন উত্তর দিল না; দাঁড়াইয়া রহিল।

গৌরীচরণ দক্ষিণ হস্তে ভ্রাতার মস্তকটি ঝাঁকাইয়া বলিলেন, “বুঝিতে পারিয়াছ ?”

বদমেজাজ গৌরীচরণের মৌলিক নহে ; পরন্তু কৌলিক । জ্যেষ্ঠের ব্যবহারে কনিষ্ঠের ধৈর্য্যচ্যুতির উপক্রম হইল । সে বলিল, “হাঁ ।”

গৌরীচরণ জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোথায় যাইতেছ ?”

ভবতারণ উত্তর করিল, “মথুরের বাড়ী ।”

“আবার থিয়েটারের আড্ডায় যাইতেছ ? তথায় যাইতে পাইবে না ।”

“কেন ?”

“কেন ?”—বলিয়া গৌরীচরণ কনিষ্ঠকে চপোটাঘাত করিলেন । তিনি বলিলেন, “যদি আর কোন দিন সে আড্ডায় যাও, তবে তোমাকে আমার গৃহ হইতে দূর করিয়া দিব ।”

গৌরীচরণ ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে গৃহে প্রবেশ করিলেন । ভবতারণ চলিয়া গেল ।

২

সন্ধ্যা উজ্জীর্ণ হইয়া গেল । ভবতারণ গৃহে ফিরিল না । ততক্ষণে গৌরীচরণের রাগ নিবিয়া আসিয়াছে । তিনি কিছু চিন্তিত হইলেন । ভবতারণ সাধারণতঃ সন্ধ্যার সময়ই গৃহে ফিরিয়া আইসে । ক্রমে যখন রাত্রি নয়টা বাজিয়া গেল তখন গৌরীচরণের চিত্ত নানা ভ্রমচিন্তায় ব্যাকুল হইয়া উঠিল । তিনি অর্ধন লইয়া ভ্রাতার সন্ধানে বাহির হইলেন । তিনি মথুরানগরের গৃহে—স্বরক্ষিত থিয়েটারের আড্ডায়, যাইলেন ; ভবতারণ তথায় যায় নাই । তিনি তাহার অচ্ছায়া সহ-পাঠীর ও বন্ধুর গৃহে গমন করিলেন ; কোথাও তাহার সন্ধান পাইলেন না । হতাশ হইয়া রাত্রি দশটার পর তিনি গৃহে ফিরিলেন । সে রাত্রিতে তাহার আহার নিদ্রা কিছুই হইল না । তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—কেন তাহাকে প্রহার করিলাম ? সে তাঁহার একমাত্র ভ্রাতা,—বয়সে অনেক ছোট—তাঁহার বয়স ভ্রাতার বয়সের দ্বিগুণেরও অধিক, পিতামাতার মৃত্যুর পর হইতে তিনিই তাহাকে লালনপালন করিয়াছেন । গৌরীচরণ সেই সব কথা ভাবিতে লাগিলেন । যখন তাঁহার বিধবা জননীর মৃত্যু হয়, তখন ভবতারণের বয়স ছয় বৎসর মাত্র । তাঁহার জন্মের পর ও ভবতারণের জন্মের পূর্বে তাঁহার যে তিনটি ভগিনী ও দুইটি ভ্রাতা জন্মিয়াছিল—তাহারা কেহই পঞ্চমবর্ষ অতিক্রম করে নাই । তাই ভবতারণ জননীর একান্ত—অতিরিক্ত প্রিয় ছিল । মন্দিবার সময় তিনি

কেবল ভবতারণের কথাই বলিয়াছিলেন। আশ্চর্য্য সেই সব কথা গৌরীচরণের মনে পড়িতে লাগিল।

ভবতারণ কোথায় গেল,—গৌরীচরণ ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। শেষে তাঁহার মনে হইল, সে হয়ত শ্মশুরালয়ে গিয়াছে। অল্প অবলম্বনের অভাবে গৌরীচরণের আশা এই শেষ অবলম্বনই গ্রহণ করিল। গৌরীচরণ পরদিন প্রত্যহই ভবতারণের শ্মশকে পত্র লিখিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সংবাদপত্রের “ভাই ভবতারণ তুমি আমাদেরকে ছাড়িয়া গিয়াছ”—ইত্যাদি মামুলি বিজ্ঞাপন প্রকাশের ব্যবস্থা করিলেন।

৩

গৌরীচরণ গৃহে প্রবেশ করিলে ভবতারণ লক্ষ্যহীন ভাবে কিছু দূর অগ্রসর হইল; তাহার পর ভাবিল, “কোথায় যাই?” তাহার মনে পড়িল, তাহার শাশুড়ী অসুস্থ অসুস্থ বলিয়া তাহাকে একবার যাইতে লিখিয়াছিলেন। পরীক্ষার ফল বাহির হইলে যাইবে বলিয়া সে জ্যেষ্ঠের আদেশ স্বেচ্ছা যায় নাই। তাহার শ্বশুরের “ধনাপবাদ” ছিল। তাহার পক্ষীই তাহার বিদবা শাশুড়ীর একমাত্র সন্তান।

এক বন্ধুর নিকট হইতে কয়টি টাকা সংগ্রহ করিয়া ভবতারণ শ্মশুরালয়ে গেল।

জামাতার অপ্রত্যাশিত আগমনে ভবতারণের শাশুড়ী অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিলেন। ভবতারণ দেখিল, সত্য সত্যই তাঁহার শরীর অসুস্থ, চিকিৎসার বিশেষ প্রয়োজন। সে তাঁহাকে সে কথা বলিল। কিন্তু বলিলে কি হইবে? পুত্র পল্লীগ্রামে চিকিৎসার সুব্যবস্থা করা সহজ নহে। অগতঃ রোগিনীকে কোণাও লইয়া যাইবার সুবিধা নাই। ভবতারণের শ্বশুর মাতামহের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া এই গ্রামে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। এ স্থানে তাঁহার কোন আত্মীয় ছিল না। তাঁহার মাতামহের আত্মীয়গণ—এই “পরগাছার” প্রতি কুণ্ঠ ছিলেন না—তাঁহাদিগের সহিত তাঁহার সস্তাব ছিল না। এ অবস্থায় কি করা যাইতে পারে? কিছুই স্থির হইল না।

পরদিন ভবতারণ যাত্রার আয়োজন করিল। শাশুড়ী জামাতার এই ব্যবহারে বিষম ও দুঃখ প্রকাশ করিলে ভবতারণ জানাইল, সে পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই বলিয়া তাহার জ্যেষ্ঠ তাহাকে গৃহ হইতে দূর করিয়া দিতে চাহিয়াছেন। সে আর কাহারও সহিত কোন সম্বন্ধ রাখিতে ইচ্ছুক নহে। সে দাদার নিকট বিদায় লইয়াছে, এখন তাঁহাদের নিকট শেষ বিদায় লইতে আসিয়াছে।

জামাতার এই কথায় ভবতারণের শাশুড়ী ভীত হইলেন ; বলিলেন, “সে কিছুতেই হইবে না । আমি তোমাকে যাইতে দিব না ।

ভবতারণ বলিল, “কিন্তু আমি কি করিব ?”

“তোমার শ্বশুর যাহা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তোমাকে কিছু করিতে হইবে না ।”

“আমি আর কাহারও গলগ্রহ হইয়া থাকিব না ।”

“এ সবই তোমার । তুমি আবার কাহার গলগ্রহ হইবে ?”

কিন্তু ভবতারণ যখন কিছুতেই এ প্রস্তাবে সন্মত হইল না, তখন তাহার শাশুড়ী একান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন । তিনি স্বভাবতঃ অল্পে ভয় পাইতেন ; তাহার উপর রোগভোগফলে তাঁহার সেই ভীতি-প্রবণতা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছিল । তিনি কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন । তাঁহার বিধবা ও বক্ষ্যা ভগিনী তাঁহার গৃহে আসিয়াছিলেন । ভগিনীর অবস্থা দেখিয়া তিনি ভবতারণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি করিবে ?”

উত্তরে ভবতারণ বলিল, “আমি কলিকাতায় যাইয়া পড়িব ।

“সে ত ভাল কথা । পুরুষমানুষের বিছাই অলঙ্কার । তুমি কলিকাতায় যাইয়া পড়িতে চাহ, ভাল । কিন্তু দিদিরও তুমি ব্যতীত আর কেহ নাই । তাঁহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন । আমি বলি, দিদিকে ও তরুকে লইয়া তুমি কলিকাতায় যাও ।”—বলা বাহুল্য ভবতারণের পত্নীর নাম তরুবালা ।

ভগিনীর এই কথায় ভবতারণের শাশুড়ী যেন অন্ধকারে আলোক পাইলেন । তিনি মনে মনে ভগিনীর বুদ্ধির বিশেষ প্রশংসা করিলেন ; প্রকাশে বলিলেন, “তোমাকেও আমার সঙ্গে যাইতে হইবে ।”

অনেক অমুরোধে ভবতারণ শেষে এই প্রস্তাবে সন্মত হইল । কিন্তু সে বলিল, “শাশুড়ী জুস্থ হইলেই তাঁহাদিগকে গৃহে ফিরিতে হইবে । শাশুড়ী ভাবিলেন, “পরের ভাবনা পরে ; এখন ত কোনরূপে বিপদ কাটাইলাম ।”

তখন যাত্রার আয়োজন হইতে লাগিল । দুই দিনের মধ্যে যাত্রার সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া তৃতীয় দিন ভবতারণ তিনটি মহিলাকে লইয়া একান্ত অপরিচিত জনরগ্যাভিমুখে যাত্রা করিল ।

যাইবার দিন গৌরীচরণের পত্র তাহার হস্তগত হইল । জ্ঞাতার হস্তাক্ষর দেখিয়া সে পত্রখানি খুলিল, খুলিয়া পড়িল, পড়িয়া হাসিল । তাহার পর সে পত্রখানি ছিঁড়িয়া ফেলিল, কাহাকেও সে পত্রের কথা বলিল না ।

কলিকাতায় আসিয়া ভবতারণ শাণ্ডীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করিল। রোগিণী ডাক্তারের ঔষধ খাইতে আপত্তি করায় কবিরাজ ডাকা হইল। কবিরাজ দুই দিন দেখিবার পর বলিলেন, যতক্ষণ শ্বাস—ততক্ষণ চিকিৎসা, কিন্তু চিকিৎসায় রোগ আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা অল্প; কারণ, রোগভোগের ফলে রোগিণীর জীবনীশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়াছে। চিকিৎসা চলিতে লাগিল।

এক মাসের কিছু অধিক কাল পরে কলিকাতার ও গুণিণীর আত্মনাদের মধ্যে ভবতারণের শাণ্ডীর প্রাণবায়ু তাহার দেহ ত্যাগ করিল।

ভবতারণ পত্নীকে বুঝাইয়া দেশের সম্পত্তি বিক্রয় করিল এবং কলিকাতায় একখানি গৃহ ক্রয় করিয়া বাস করিতে লাগিল। তাহার শাণ্ডীর ভগিণী তাহার ও তাহার পত্নীর একান্ত অমুরোধে তাহাদের সংসারেই রহিয়া গেলেন।

শাণ্ডীর মৃত্যুর পূর্বেই ভবতারণ সুরনাথ নাম লইয়া বিজ্ঞানম্বে ভর্তি হইয়াছিল। এখন সে নিশ্চিন্ত হইয়া পাঠে মনোযোগ দিল। সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জীবন সংগ্রামে জমী হইবে এবং খ্যাতি ও অর্থ অর্জন করিবে এ বিষয়ে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। ভ্রাতার ব্যবহারে তাহার মনে এই সঙ্কল্প সমুদিত হইয়াছিল। সে স্বভাবতঃ একগুঁয়ে—সে এই সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিতে প্রাণপাত পর্য্যন্ত করিবে, স্থির করিয়াছিল।

কলিকাতায় সে কাহারও সহিত মিশিত না। একে সে মফঃস্বল হইতে আনিয়া সবই নুতন বোধ করিত, তাহাতে আবার তাহার অধিকাংশ সহপাঠীই তাহার অপেক্ষা বয়সে ছোট—এই জন্য সে কাহারও সহিত মিশিবার সুযোগ পাইত না,—সে প্রবৃত্তি ও তাহার ছিল না। সে অনন্তকর্ম্ম হইয়া অধ্যয়ন করিত।

তাহার পক্ষে এই অনন্তসাধারণ মনোযোগের ও অসাধারণ উৎসাহের পুরস্কার লাভ করিতে বিলম্ব হইল না। পূর্ববার ভবতারণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া জ্যেষ্ঠ কর্তৃক লাঞ্চিত হইয়াছিল, এবার সুরনাথ নামক একজন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বালকদিগের মধ্যে সর্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়া বহু বালকের দীক্ষা ও বহু শিক্ষকের বিশ্বাস উপাদান করিল।

বলাবাহুল্য এই সাফল্যে ভবতারণ অসীম আনন্দ লাভ করিল; এবং দ্বিগুণ উৎসাহে অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইল।

ইহার পর হইতে ভবতারণের সাফল্য আর কোন বিষ উপস্থিত হইল না।

এবার সে যেন ভরা জুয়ারে তরী ভাসাইয়াছিল ; তরী অনাহত দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল । পরীক্ষার পর পরীক্ষায় তাহার সাফল্য তাহার সতীর্থ-দিগকে বিস্মিত করিতে লাগিল । শেষে সে ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চিকিৎসা করিতে লাগিল ।

ভাগ্যদেবী যখন যাহাকে দয়া করেন তখন আপনার সম্পদ-ভাণ্ডারের দ্বার তাহার পক্ষে মুক্ত করিয়া দেন ; তাহার আর কোন অভাব থাকে না । তিনি ভবতারণের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন । দিন দিন তাহার পশার বাড়িতে লাগিল, যশ চারিদিকে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল, উপার্জনের বৃদ্ধি হইতে লাগিল ।

এক একদিন আপনার অবস্থার আলোচনা করিয়া ভবতারণ যথেষ্ট আশ্চর্যমাদ লাভ করিত । সে দিন সে জ্যেষ্ঠের হস্তে লালিত হইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছিল—সে দিনে আর বর্তমান সময়ে কি পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে । সে দিন সে আশ্রয়-হীন, সম্বলহীন—পথের ভিখারী । আর আজ ? আজ তাহার যশ অনেকের চৈধ্যার কারণ, তাহার উপার্জন—তাহার প্রয়োজনাতিরিক্ত ; আর সকলের উপর তরুণালার অনাবিল প্রেম । সে প্রেমে তাহার হৃদয় চিরমধুময় হইয়াছিল । তাহার বিশ্বাস দাঁড়াইয়াছিল, পত্নী হইতেই তাহার সৌভাগ্যের সূচনা—পত্নীই তাহার সৌভাগ্যের কারণ । সে সর্ববিষয়ে পত্নীর কথা শুনিত, কেবল এক বিষয়ে শুনিত না । তরুণালা মধ্য মধ্য তাহাকে জ্যেষ্ঠের সংবাদ লইতে বলিত । ভবতারণ সন্মত হইত না ; বলিত, “এখনও সময় হয় নাই । পরে লইব ।” এবিষয়ে তরুণালা স্বামীর কার্যের কারণ বুঝিতে পারিত না ।

কিন্তু তরুণালা মনে করিত, বিশেষ কারণ ব্যতীত স্বামী এ কার্য্য করিতেন না । সে স্বামীকে দেবতার মত ভক্তি করিত । তাহার জনকজননী-পরলোকে, তাহার ভ্রাতাভগিনী জন্মে নাই, শিশুর কোমল স্পর্শে তাহার রমণীজন্ম সম্বলতা প্রাপ্ত হয় নাই ; কায়েই তাহার মেহ, প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা সবই তাহার স্বামীকে অবলম্বন করিয়াছিল । স্বামীই তাহার হৃদয় পূর্ণ করিয়া বিরাজিত—সে কি স্বামীর কার্য্য অসম্ভব বা অকারণ বলিয়া মনে করিতে পারে ?

৬

বিশ বৎসর কাটিয়া গেল । ভবতারণের সৌভাগ্য-স্রোতে ভাঁটা পড়িল না । এই সময় একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিল । দ্রুতগামী রেলগাড়ী সম্মুখে অতিক্রান্ত বাধায় যেমন ধ্বংস হইয়া যায়, তেমনই অতিক্রান্ত বিপদে ভবতারণের সব শেষ হইল । সে বার কলিকাতায় প্রথম ‘মেগ’ দেখা দিল । বোম্বাই বিধ্বস্ত

করিয়া বিষম ব্যাধি কলিকাতা আক্রমণ করিল। ব্যাধি প্রকাশ পাইতে না পাইতে নানারূপ জনরব উঠিতে লাগিল। ফলে যাহাব পলাইবার স্থান ছিল, সে পলাইল; বহু পরিত্যক্ত জীর্ণ পল্লীগৃহ সংস্কৃত হইল। ঠেগনে, ঘাটে ভারবাহক নাই, কলে মজুর নাই, সকলে প্রাণভয়ে, ততোহধিক অভ্যাচারের আশঙ্কায়, কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া পলাইল। সময় বুনিয়া যানচালক দশাশুণ ভাড়া লইল। ঠেগনে যাজী ধরে না। সকলেই পলাইতে ব্যস্ত। এমনও হইল যে, আসন্ন-প্রসবী কুলদম্ব গমন পথে—ঠেগনে বা গাড়ীতে প্রসব বেদনায় ব্যথিতা হইলেন। নগরেও নানারূপ অশান্তি সূচিত হইল; শ্রমজীবীগণ ধর্মঘট করিতে লাগিল, লোকের যোগী লটবার যানে অগ্নিযোগ করিল। শেষে এমনই দাঁড়াইল যে, অন্ন ছোটলাট ঘাটে ঘাটে ঘাইয়া অভয় দিতে লাগিলেন,—কাহাকেও বলপূর্ব্বক টাকা দেওয়া হইবে না—কোন ব্যাধিগ্রস্তকে বলপূর্ব্বক গৃহ হইতে হাঁসপাতালে লওয়া হইবে না।

এই সময় কোন কোন ডাক্তার ‘প্লেগের’ রোগী দেখিতে অস্বীকৃত হইলেন। ভবতারণ তাঁহাদিগকে বিদ্রূপ করিয়া বলিল, “যে পরের জীবন আপনার জীবনের অপেক্ষা অধিক মূল্যবান মনে না করে, তাহার পক্ষে ডাক্তারী করা বিড়ম্বনা মাত্র।” সে প্লেগরোগী দেখিতে ইতস্ততঃ করিত না।

একদিন একটি প্লেগরোগী দেখিতে ঘাইয়া তাহার দেহে রোগজীবাণু প্রবেশ করিল। ভবতারণ অসুস্থ হইল। এই কথা শুনিয়া মহরের সকল বড় বড় চিকিৎসকই তাহার চিকিৎসার্থ অগ্রসর হইলেন। সে বলিল, “আমার ডাক পড়িয়াছে।”

বলা বাহুল্য চিকিৎসার কোনরূপ ফল হইল না। মাস্কের সাহায্যে তাহা করা হইল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ব্যাধির প্রকোপ বাড়িতে লাগিল।

তিনদিন রোগী অরথোরে অজ্ঞান হইয়া রহিল। চতুর্থ দিন সব ফুরাইল। তরুণালার সর্বনাশ হইল। তরুণালার মাতৃদম্বা নিষ্ফল জীবনের সাম্রাজ্যে যে আশ্রয়ে আসিয়া শান্তি ও সাধনা লাভ করিয়াছিলেন, সে আশ্রয় নষ্ট হইয়া গেল।

৭

তরুণালার দিন কাটিতে লাগিল। গৃহ শূন্য—হৃদয় শূন্য—জীবন দুর্ব্বল যাতনার ভার; তবুও জীবন যায় না কেন? বর্ষাদিক কাল পরে যখন তাহার সংসারে শেষ সম্বল মাতৃদম্বার মৃত্যু হইল, তখন সে যেন অকুণ্ঠ সমুদ্রে পড়িল। তাঁহার মৃত্যুতে তরুণালার জীবনের দারুণ শোক যেন নুতন হইয়া উঠিল।

কোন কাঁচ নাই। দিন যেন আর কাটে না। সঙ্গে সঙ্গে তরুণীলার আর এক ভাবনা জুটল। ভবতারণ পীড়িত হইয়াই ‘উইল’ করিয়াছিল। সেই উইল অনুসারে ‘তাহার সমস্ত সম্পত্তি তরুণীলার। এখন সে সম্পত্তি যেন তরুণীলার নিকট ফুর্কহ তার বোধ হইত। এ সম্পত্তি লইয়া সে কি করিবে? শয়নগৃহে পতির একখানি চিত্র বিশিষ্ট ছিল। তরুণীলা প্রতিদিন সেইখানির পূজা করিত। এখন কর্মহীন মধ্যাহ্নে বা নিজাহীন নিশীথে সেই চিত্রের দিকে চাহিয়া তরুণীলা জিজ্ঞাসা করিত, হে দেবতা, হে হৃদয়-সর্বস্ব, তুমি এ কি করিলে? আমি এ ন্যাস কি করিব?’ সে ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিত না।

এক একবার তাহার মনে হইত যদি স্বামীর জাতার কোন সম্মান পাইত। তখনই, তাঁহার সন্মানের কথায় ভবতারণের সেই উত্তর তাহার মনে পড়িত,— “এখনও সময় হয় নাই।” সে সময় আর হইবে কি? ভবতারণ কেন এ কথা বলিত, তরুণীলা তাহা বুঝিতে পারিত না। সে কেবলই ভাবিত। আবার তাহার মনে হইত, সে কেমন করিয়া তাঁহার সম্মান লইবে? সম্মান লইবার উপায় কি?

৮

বৈশাখের মধ্যাহ্নে। বাতাস অগ্নিবৎ। রৌদ্র প্রখর। কর্মকেজর কলিকাতা রাজপথেও যেন জনশ্রোতে ভাঁটা পড়িয়াছে। এ রৌদ্রে কেহ ইচ্ছা করি: ঘরের বাহির হইতে চাহে না। পথে মধ্য মধ্য ভারবাহী গোয়ামের গমন-শ্রান্ত হইতেছে; আর সেই মধ্যাহ্নবিকরতত্ত্ব পবনে বায়ুসের ‘কা কা’ রন বাহি হইতেছে। আজ একাদশী। তরুণীলা অনমনে শূন্য গৃহে কত কি ভাবিতেছে এমন সময় নিম্নে রাজপথে বাগকের কাতর কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল—“অন্ন ভিখারীকে দয়া কর।” এই দারুণ রৌদ্রে যে বাগক ভিখার অল্প পণে বাহির হইয়াছে তাহার মত দুঃখী আর কে আছে? তরুণীলার দয়ার উৎস উচ্ছ্বসিত হইয় উঠিল। তরুণীলা দাসীকে বলিল, “যাও, ভিখারীকে বাড়িতে আনিতে বল।” দাসী তখন নিজার আয়োজন করিতেছিল; এ আদেশে বিরক্ত হইল। এ আপন মনে কি বকিতে বকিতে নামিয়া গেল।

দাসীর অস্থানে একজন প্রোট অম্বকে লইয়া একটি দশম বা একাদশ ব বয়স্ক বাগক গৃহে প্রবেশ করিল। তরুণীলা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, গতরাি হইতে তাহারা অনাহারে আছে; ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, রৌদ্রে তাহারা অবসন্ন তাহারা কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিবার পর তরুণীলা তাহাদিগের আহারের ব্যবস্থা করিল। তাহারা আহার করিল।

তাহার পর তরুণী জিজ্ঞাসা করিল, “তোমাদের বাড়ী কোথায়?”

অন্ধ উত্তর দিতে মুহূর্তমাত্র ইতস্ততঃ করিল। পরিচয় দিতে তাহার লজ্জা বোধ হইল। কিন্তু তরুণীর ব্যবহারে সে মঞ্চোচ স্থায়ী হইল না; সে বলিল, “মুর্শিদাবাদ জিলায়—তেলীমহাট গ্রামে।”

মুর্শিদাবাদ জিলায়—তেলীমহাট গ্রামে। সেই গ্রামে তরুণীর শ্বশুরালয় ছিল। তাহার কোণ্ঠুল উদ্ভিজ্জ হইল। সে বলিল, তুমি কলিকাতায় আগিলে কি প্রকারে?

ভক্তগণে মহামুত্ত্বলিতভাবের আশায় অন্ধ আপনার দুঃখকাহিনী বলিতে উৎসুক হইয়াছে। সে বলিল, তাহার পিতার নাম গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি চাকরী করিতেন। তাঁহার এক ভ্রাতা ছিলেন। পিতৃমাতৃহীন ভ্রাতাকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া জ্যেষ্ঠ কর্তৃক তিরস্কৃত হইয়া কনিষ্ঠ নিরুদ্দেশ হইলেন। সেই দুঃখে জ্যেষ্ঠের মস্তিষ্কে বিকার-লক্ষণ দেখা দেয়। তাঁহার দুই পুত্র—অন্ধ জ্যেষ্ঠ। এই সময় কনিষ্ঠ পুত্রের মৃত্যুতে গৌরীচরণ উন্মাদ-রোগগ্রস্ত হইলেন। চিকিৎসার উপায় নাই। শেষে অনন্তোপায় হইয়া জননী পুত্রের বিবাহ দিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করেন ও পতিকে লইয়া চিকিৎসার্থ কলিকাতায় আইসেন। অন্ধ বিদ্যালয় ত্যাগ করিল। উদরায়-সংস্থান-চেষ্টায় চেষ্টিত হইল। শেষে বহু চেষ্টায় তাহার একটি মাসিক দশ টাকা বেতনের চাকরী জুটিল। গৃহে দারুণ দারিদ্র্য। এক বৎসর পরে উন্মাদ পিতার মৃত্যু হইল। মৃত্যুর পূর্বে তিনি কেবল কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভবতাবণের নাম দিয়া ডাকিতেন। তাহার দুই বৎসর পরে তাহার একটি পুত্র জন্মিল—এই বালকই তাহার পুত্র। পুত্র প্রসব করিয়া তাহার পত্নী স্নতিকারোগগ্রস্ত হইলেন এবং বর্ষাদিক কাল রোগ-ভোগ করিয়া মৃত্যুর কোড়ে শান্তি লাভ করেন। সে আজ আট বৎসরের কথা। সে চাকরী করিয়া যাহা পাইত তাহাতে কোনরূপে সংসার চলিত। তাহার জননী পৌত্রকে পালন করিতেন। গত বৎসর বসন্তে জননীর সব জালা জুড়াইয়াছে; সে অন্ধ হইয়াছে। এখন ভিক্ষা ভিন্ন তাহার আর উপায় নাই।

বলিতে বলিতে অন্ধের দৃষ্টিহীন নয়নে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। আর তরুণীর দুই চক্ষু হইতে দ্রববিগলিত ধারায় অশ্রু পড়িতে লাগিল। তরুণী অন্ধের পরিচয় পাইল। তাহার হৃদয়ে তুমুল ঝটিকা বহিতে লাগিল। সে উদ্দেশ্যে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, “তবে কি আজ সময় হইল?” সে কোন উত্তর পাইল না; কিছু

স্থির করিতে পারিল না । শেষে সে অন্ধকে পাঁচটি টাকা দিয়া বলিল, “তুমি কল্যাণ আবার আসিও ।”

অন্ধ ও বালক চলিয়া গেল । তরুবালা আপনার শয়ন কক্ষে যাইয়া পতির চিত্রের নিম্নে হৃদয়তঃ লুটাইয়া কাঁদিল ;—সে এখন কি করিবে ?

৯

পরদিন তরুবালা তাহাদের আগমনপ্রতীক্ষা করিতে লাগিল । ক্রমে দিবাবসান হইল—তাহারা আসিল না । তখন তরুবালায় হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল । আরও একদিন গেল ; তাহারা আসিল না । তখন তরুবালা ভাবিল, কেন সেই দিনই তাহাদের থাকিতে বলি নাই ? সে আপনাকে আপনি দোষী ভাবিল ।

পরদিন প্রাতে বালক একাকী আসিল । তাহার নয়ন জন্মনশীত ; পরিধানে ‘কাচা’ । সে তরুবালাকে দেখিয়া কেবল কাঁদিতে লাগিল । বহু কষ্টে তাহাকে একটু শাস্ত করাইয়া তরুবালা জানিল, গত পরশ তাহার গৃহে আসিবার সময় পথে অন্ধের সন্দিগ্ধি হয় । সে পথে পড়িয়া যায় । কয়জন পথিক দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে হাঁসপাতালে লইয়া যায়েন—তথায় তাহার মৃত্যু হইয়াছে । হাঁসপাতালের দুইজন ভৃত্য বালকের প্রতি দয়াবশে তাহাকে শবের সঙ্গে লইয়া যাইয়া শেষ কায় করাইয়া তাহাকে, তাহার নির্দেশমত, তরুবালায় গৃহদ্বারে পৌছাইয়া দিয়া গিয়াছে ।

তরুবালা বালককে সাস্থনা দিবার চেষ্টা করিতেছিল বটে, কিন্তু বালকের হৃদয়ে তাহার আপনার হৃদয় সাস্থনা মানিতে ছিল না ।

বালক কাঁদিতে কাঁদিতে অজ্ঞাসা করিল, “আমি কাহার কাছে থাকিব ?”

তরুবালা বলিল, “তুমি আমার কাছে থাকিবে ।”

বালক জন্মন ভুলিয়া তরুবালায় মুখে চাহিল । তাহার দৃষ্টিতে কি অসীম কৃতজ্ঞতা !

সেই দৃষ্টিতে তরুবালায় মেহের উৎস মুক্ত হইয়া গেল । সে জিজ্ঞাসা করিল, “তোমার ঠাকুরমা তোমাকে খুব ভালবাসিতেন ?”

বালক বলিল, “হাঁ, খুব ।”

তরুবালা বলিল, “আমি তোমার ঠাকুরমা হইব ।”

বালকের অশ্রুগঞ্জল নয়নে হৃদয়ীকৃতি ফুটিয়া উঠিল ।

কয়দিন দারুণ উদ্বেগ, বিষম দুঃখ ও ক্লেশ ভোগ করিবার পর মধ্যাহ্নে আহারান্তে বালক ঘুমাইয়া পড়িল। তখন তরুণালা আসিয়া সেই চিত্তের সম্মুখে দাঁড়াইল, অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিল, “আজ বুঝি সময় হইয়াছে। তাই তুমি এই জালম-আশ্রম-অবলম্বনহীন বালককে তোমার আশ্রমে আনিয়া দিয়াছ ?” সে উদ্দেশে স্নানীকে প্রশ্ন করিল।

তরুণালার মনে হইল, যেন যে স্রাস্তারে সে প্রণীড়িতা হইতেছিল, আজ সে তার দূর হইল। সে যে অনন্তভূতপূর্ব শিথ শান্তি লাভ করিল তাহাতে তাহার মনে হইল, যেন বিশ্বদেবতা ও তাহার হৃদয়দেবতা তাহার প্রতি প্রিয় হইয়াছেন।

সে দিন বালকের অল্প সকল ব্যবস্থা করিয়া গভীর রাত্রিতে তরুণালা শয়ন করিতে গেল। আজ কতদিনের কত কথা তাহার মনে পড়িতে লাগিল। সে কাঁদিয়া উপাধানসিক্ত করিতে লাগিল। শেষরাত্রিতে তাহার নিজাকর্ষণ হইল। প্রভাতে বালক-কণ্ঠে “ঠাকুরমা”—সন্ধ্যায়ে তাহার নিজাভঙ্গ হইল। সে আস্থান তাহার পক্ষে একান্ত নূতন। তাহাতে তাহার হৃদয়ে মেঘ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল; সে হৃদয়ে এক নূতন শিথ—সরস—কোমল অমৃতুতি অমৃভব করিল। সে কিরিয়া দেখিল, গত রাত্রিতে বাতাসে যে মালা ভবতারণের চিত্রচ্যুত হইয়া হর্ম্যতলে পড়িয়াছিল, বালক তাহা কুড়াইয়া—একখানি চেয়ারে উঠিয়া যথাস্থানে সংস্থাপিত করিতেছে।

মৃত্যু-মিলন ।

—ঃ—

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

—ঃ—

ভ্রাতা ও ভগিনী ।

—ঃ—

যে দিন নিশাশেষে রাণী অক্ষ-আবিল নগনে রাজার শূন্য শয়নগদির হইতে হতাশ হইয়া ফিরিলেন, সেই দিন মধ্যাহ্নে প্রাসাদের শুদ্ধাঙ্গ হইতে একখানি শিবিকা বাহির হইয়া গেল। শিবিকা কয়টি পথ অতিক্রম করিয়া একটি বৃন্দামতন গৃহে প্রবেশ করিল। গৃহ বৃহৎ—দৃঢ়গঠিত। গৃহের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে কয়টি মৃগ;—কেহ আহারে ব্যাপৃত, কেহ বৃক্ষচ্ছায়ায় শয়ান—রোমন্থরত। গৃহ-প্রাঙ্গণে শিবিকা প্রবেশ করিলে, তাহারা একবার নিবৃত্ত, অকোমল নয়ন তুলিয়া চাহিয়া দেখিল। শিবিকা সে প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া গেল।

প্রাঙ্গণের পর কতকগুলি কক্ষ; সেগুলিতে অপ্রতিহত সূর্য্যালোক প্রবেশ করে না। সেগুলি অতিক্রম করিয়া শিবিকা আর একটি প্রাঙ্গণে উপনীত হইল। বাহকগণ শিবিকা নামাইল। প্রাঙ্গণে বহু পারাবত আহার করিতেছিল। শিবিকা আসিলে তাহারা উড়িয়া যাইয়া কেহ বা কার্নিসে, কেহ বা আলিসায়, কেহ বা দ্বিতলস্থ অলিন্দবৃত্তিতে বসিল। উমা শিবিকার মধ্য হইতে বাহির হইয়া প্রাঙ্গণে দাঁড়াইল।

শঙ্কর সিংহের জ্যেষ্ঠা কন্যা পারাবতদিগকে আহাৰ্য্য দিতেছিল। সে উমাকে দেখিয়া করম্বত পাত্ত ভূমিতে রাখিয়া আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিল। উমা তাহার মুখচুম্বন করিল। উমার সর্ষদা পিতৃগৃহে আগমন ঘটিল না।

উমা প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিবার পূর্বেই তাহার আগমন-সংবাদ প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল। সে সোপানে উঠিতে না উঠিতে ভ্রাতৃপুত্রগণ ও ভ্রাতৃপুত্রীরা তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। উমা সকলকে আদর করিল;—সকলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে উপরে চলিল।

সে দ্বিতলে উপনীত হইতেই শঙ্কর সিংহের পত্নী আসিয়া তাহার কুশল জিজ্ঞাসা করিল। উমা বলিল, “তুমি ভাল আছ ত? আমি এবার প্রায় একমাস আসি

নাই। তোমাকে দুর্বল দেখাইতেছে।” বলিতে বলিতে উমা ভ্রাতৃজামার নিকট হইতে তাহার বর্মমাজবয়স্ক কন্যাকে লইতে গেল। শিশু জননীকে আঁকড়াইয়া ধরিল। উমা হাসিয়া বলিল, “আমাকে পর ভাবিতেছ।”

ভ্রাতৃজামা বিজ্ঞপ করিয়া বলিল, “রাজবাড়ীতে কি আর উহাদের মনে পড়ে ? উহাদের আর অপরাধ কি ?”

উমা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, “সত্য ; উহাদের আর দোষ কি ?”

ভ্রাতৃজামা উমাকে পার্শ্বস্থ কক্ষে লইয়া যাইয়া বসাইল।

দুইজনে ঘরসংসারের, — ছেলেমেয়ের, — কুটুম্ব-কুটুম্বিতার, — দাসদাসীর কত কথা হইতে লাগিল। রমণীগণের মধ্য সহজে বিশ্বাসে বিকশিত হয়। বিশেষ আপনার জনের নিকটে নহিলে রমণীর অন্তরের কথা বাহির হয় না। সংসারের নিত্য নান্য কার্যের শত কথা পুরাতনের ভাল লাগে না ; তাহার কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত, কণ্ঠব্য বহুবিধ। রমণীর সে সব কথা রমণীই বুঝিতে পারেন। তাই আপনার জনের সঙ্গে দেখা হইলে রমণীর কথা আর ফুরায় না ; কথায় কথায় কথা বাড়িয়া যায়—সে সব কথা সহানুভূতির স্নেহরসে সরস—সমবেদনার আশায় মনোরম। তাই আজ প্রায় একমাস পরে সাফাতে দুইজনের কথা যেন আর ফুরায় না। সংসারের শত ক্ষুদ্র কথার পুজাভুজা আলোচনায়, —কত আত্মীয় কুটুম্বের সংবাদ জিজ্ঞাসায় দেখিতে দেখিতে প্রায় এক গ্রহর অতীত হইয়া গেল। দুই জনের কেহই তাহা বুঝিতে পারিল না।

এই সময় ভগিনীর আগমন-সংবাদ পাইয়া শঙ্কর সিংহ অন্তঃপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শঙ্কর সিংহকে দেখিয়া উমা বলিল, “এই যে, দাদা। আমি তোমার সমানে লোক পাঠাইতেছিলাম।”

শঙ্কর সিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন ?”

“তোমার সহিত আমার কিছু কথা আছে। সেই অজুই আমি আসিয়াছি।”

শঙ্করসিংহ কিছু বিস্মিত হইলেন। উমার সহিত প্রাসাদে তাঁহার প্রায়ই সাক্ষাৎ হয়। তবে সহসা কি আবশ্যক কথা—কি গোপনীয় কথা বলিবার অজুই সে আসিয়াছে ? প্রাসাদে সবই যেন অঘটন ঘটিতেছে। শঙ্কর সিংহ মনে করিলেন, কোন সাংসারিক কথা বলিবার অজুই উমা আসিয়াছে। তিনি বলিলেন, “কি কথা ? বল।”

উমা বলিল, “সে কথা ছেলেদের—এমন কি বদুরও শুনিয়া কান নাহি।”

শঙ্কর সিংহ বলিলেন, “তবে আমার বলিবার ঘরে চল। তথায় কেহ নাই।”

কয়টি কক্ষ ও অলিন্দ অতিক্রম করিয়া ভ্রাতা ও ভগিনী একটি বৃহৎ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কক্ষের হর্ম্যতলে একখানি বিস্তৃত আসন ; কক্ষপ্রাচীরে নানাবিধ অস্ত্র সজ্জিত ।

শঙ্কর সিংহ ভগিনীকে উপবেশন করিতে বলিলেন। কক্ষের এক পার্শ্বে একখানি কাঠাসন ছিল, উমা সেইখানিকে হর্ম্যতলে বিস্তৃত আসনের নিকটে আনিয়া তাহাতে বসিল। শঙ্কর সিংহ আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

কয় মুহূর্ত্ত কাটিয়া গেল। উভয়েই নীরব। উমা ভাবিতে লাগিল, কেমন করিয়া কথাটার উত্থাপন করিবে ? শেষে উমা বলিল, “আমি তোমার নিকট একটি প্রহেলিকার সমাধানজন্ত আসিয়াছি।”

শঙ্কর সিংহ বলিলেন, “ভগিনী, তোমার কথাই যে প্রহেলিকার মত বোধ হইতেছে।”

“সত্য। কিন্তু এ প্রহেলিকার সমাধান তুমি ব্যতীত আর কেহ করিতে পারিবে না। প্রাসাদে কি ঘটিতেছে ?”

“কেন ?”

“তুমি কি কিছু লক্ষ্য কর নাই ? তুমি কি রাজার ও রাণীর ভাবান্তর বুঝিতে পার নাই ?”

“কিরূপ ভাবান্তর ?”

“যদি তাহা বুঝাইতেই পারিব, তবে আর তোমাকে জিজ্ঞাসা করিব কেন ? তুমি কি আমার নিকট এ সকল কথা গোপন করিবে ?” অভিমান উমার নয়নে জ্বলি আসিল।

শঙ্কর সিংহ অশ্রুমনস্কতাতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন, উমা পিতার, মাতার ও ভ্রাতার আদরে বড় অভিমানিনী হইয়াছিল। তিনি যেন সজ্জিত হইলেন ; বলিলেন, “উমা, তোমার কাছে কি গোপন করিব ? রাজার সহসা ভাবান্তর হইয়াছে। তিনি সহসা দীর্ঘকালের আলস্য ও উদাসীনতা ত্যাগ করিয়া রাজকার্য্যে মন দিয়াছেন।”

“সহসা এ পরিবর্তনের কারণ কি ?”

“দোলার দিন মন্দিরে বৃক্ষ পুরোহিত রাজাকে বাচাল বালক বলিয়াছিলেন।”

“কেন ?”

“তিনি বলিয়াছিলেন, “যে রাজা রাজ্যরক্ষায় অক্ষম, তাহার হস্তে রাজদণ্ড শোভা পায় না।”

“তাহার পর ?”

“তাহার পর রাজার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। উভয়ে কি কথা হয়—কেহ জানে না। সেই দিন হইতে রাজার পরিবর্তন হইয়াছে।”

“ভালই হইয়াছে। কিন্তু রাণীর এ ভাবান্তরের কারণ কি ?”

“রাণীর কি ভাবান্তর লক্ষ্য করিতেছ ?”

“যে দিন রাজা চক্রে অগ্নি-নির্দীপন করিতে গিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে রাণী সর্বদাই কেমন চিন্তিতা। গত রজনীতে তাঁহার অটল গাভীরা যেক্রপ বিচলিত দেখিয়াছি, সেক্রপ আর কখনও দেখি নাই। ভূমি উদ্যানে রাজারানীর কথোপকথন শুনিতে পাও নাই ?”

“না। আমি দূরে ছিলাম।”

“রাণী পূর্বে কখনও রাজার কোন কার্যের কথায় মন দিতেন না। গত রাজিতে রাজা আসিলেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—নিশীথে একাকী প্রাসাদের বাহিরে গমনে কি বিপদের আশঙ্কা নাই ?”

“রাজা কি উত্তর দিলেন ?”

“তিনি বলিলেন, বিপদ ঘটা অসম্ভব নহে ; কিন্তু তাঁহার বিপদে, সম্পদে, সুখে, দুঃখে কাহারও ত কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।”

“তাহার পর ?”

“তাহার পর রাজা তোমার সহিত উদ্যান ত্যাগ করিলেন ; রাণী আকুল ভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। দিবালোকবিকাশের অল্পকাল পূর্বে তিনি মুখ তুলিলেন,—কাদিতে কাদিতে আমাকে বলিলেন, ‘উমা, আমি কি ভাস্ত !’ তাহার পর তিনি গৃহে ফিরিলেন।”

শঙ্করসিংহ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, “সত্যই রাণী ভাবিবশে আপনি দুঃখ পাইয়াছেন, রাজাকেও অশুখী করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অপরাধ কি ? মানুষ মানুষকে প্রায়ই ভুল বুঝে। দোষ সহজে দৃষ্টিপথে পতিত হয়, গুণ লক্ষ্য করা সহজ নহে। তাই মানুষ অপরের গুণবিষয়ে অন্ধ হয়—মহৎ সহজে বুঝিতে পারে না।”

উমা জিজ্ঞাসা করিল, “এখন ঘটনাস্রোতঃ কোন্ দিকে প্রবাহিত হইতেছে ?”

“তাহা বুঝিবার সাধ্য আমার নাই।”

কিছুক্ষণ কেহই কোন কথা কহিলেন না। তাহার পর শঙ্কর সিংহ বলিলেন,

“তোমাকে আর একটি কথা বলিব। দেখিও, এ কথা বুঝাফরেনও প্রকাশ না পায়।”

উমা বিস্মিত নেজে ভ্রাতার দিকে চাহিয়া রহিল।

শঙ্কর সিংহ বলিলেন, “রাজা অত্যাচ্য রাজপুত রাজাদিগের নিকট প্রস্তাব করিতেছেন,—রাজপুত রাজশক্তির সমবেত চেষ্টায় আত্মরক্ষার উপায় করা আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।”

উমা বলিল, “সে কি?”

“রাজা এই প্রস্তাব করিয়া দূত পাঠাইতেছেন।”

“এ কথা যদি প্রকাশ পায়?”

“তাহা হইলে মোগলের বিরাট শক্তি তাহার সর্বনাশ-সংসাধনে সচেষ্ট হইবে।”

“রাজা সে কথা বুঝিয়াছেন?”

“সে কথায় তিনি হাসিয়া বলেন, ভয়ে কর্তব্যচ্যুত হওয়া অপেক্ষা মৃত্যু শত গুণে শ্রেয়ঃ। তিনি আবও বলেন, ‘আমি কর্তব্য-কর্ম্ম অবহেলা করিয়াছি। আবশ্যক হইলে দেহশোণিতপাতে তাহার প্রাণশিষ্ট করিব।’

“দূত গিয়াছে কি?”

“পক্ষকাল মধ্যে আমাকে যাইতে হইবে।”

“এ চেষ্টা রাজার উপযুক্ত বটে। কিন্তু ইহা সফল হইবার সম্ভাবনা আছে কি?”

“তাহা এখন বলা অসম্ভব।”

উমা কিছুক্ষণ বসিয়া ভাবিতে লাগিল,—কোন কথা কহিল না।

শঙ্কর সিংহ বলিলেন, “ভগিনি, আমি প্রথম বাটিকার পূর্বসূচনা লক্ষ্য করিতেছি। প্রাণীদের উচ্চ চূড়ায় বাটিকাবেগ প্রাহত হইবে। তখন যেন আমাদের ভ্রাতা-ভগিনীর কর্তব্যের জটী না হয়।”



সমালোচনা ।

ফরিদপুরের ইতিহাস ।*

বাঙ্গালা প্রাচীন দেশ । ভারতবর্ষের ইতিহাসে ও এশিয়ার সভ্যতায় বাঙ্গালা এর সময় অসাধারণ প্রভাব বিস্তৃত করিয়াছিল । বাঙ্গালার ভূমি সমতল ও কোমল বলিয়া এই প্রদেশে ভারতবর্ষের অসংখ্য প্রদেশের মত প্রাচীন গৃহের বা জীর্ণ মন্দিরের সংখ্যা অধিক দৃষ্ট হয় না—কারণ, বাঙ্গালায় কালজয়ী প্রস্তরের বহুল ব্যবহার ছিল না । কিন্তু বর্তমান কালে অল্পসংখ্যক ফলে বাঙ্গালার বহু স্থানে পুরাবস্তুর সন্ধান পাওয়া যাইতেছে । এই সকল পুরাবস্তু ইতিহাসের অক্ষয় উপাদান । দিনাজপুরে কান্তনগরের মন্দির, মহিপাল দীর্ঘিকা, তাম্রলিপিহু বর্গভীমার মন্দির, যশোহরে সীতারামের রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ—বাঙ্গালার এই সকল কীর্তি ও অপেক্ষাকৃত আধুনিক । ইহার বহু পূর্বে—সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে—বাঙ্গালী যবদীপে ও বলিদীপে উপনিবেশসংস্থাপন করিয়াছিল । বাঙ্গালী সিংহল জয় করিয়াছিল বৌদ্ধধর্মের উন্নত দশায় বাঙ্গালা হইতে যে ধর্মমত ও শীলদর্শ টীনে, আপনেনে কোরিয়ায় বিস্তৃত হইয়াছিল আজও তাহা বিলুপ্ত হয় নাই ; পরন্তু সেই শিল্পদর্শ স্বাতন্ত্র্যাহেতু আপনায় সজীবতাসংরক্ষণে সমর্থ হইয়াছে । সময় ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গালাই সর্বাপেক্ষা অধিক কাল মুসলমানশক্তির প্রতিকূলে দাঁড়াইতে পারিয়াছিল । পাঠানগণ প্রায় ৪০০ বৎসরের চেষ্টাতেও বাঙ্গালাদেশ জয় করিতে পারেন নাই । কথিত আছে, চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার পূর্ববর্তী নগের নিকট হইতে বাঙ্গালা রাজ্য পাইয়াছিলেন ।

বাঙ্গালা প্রাচীন দেশ । কিন্তু এদেশের প্রকৃত ইতিহাস নাই । বহুদিন পূর্বে ষ্টুয়ার্ট বাঙ্গালার ইতিহাস-গঠনের চেষ্টা করিয়াছিলেন । তাঁহার সে চেষ্টা নানা কারণে আশাশূন্য ফলবতী হয় নাই । রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ও রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাঙ্গালার ইতিহাস বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের অল্প লিখিত, একান্ত ক্ষুদ্রায়তন । দ্বিতীয় পুস্তকে মৌলিক তথ্যের একান্ত অভাব । এশিয়াটিক সোসাইটীর ‘জর্নালে’ ও ‘কলিকাতা রিভিউএর’ পৃষ্ঠায় যে সকল উপাদান সংগৃহীত হইয়া আছে—সে সকলের ও সম্যক সদ্যব্যহার হয় নাই ।

* ফরিদপুরের ইতিহাস ।—১ম খণ্ড—শ্রী আনন্দনাথ রায় প্রণীত । ১৯০৭, নং কর্ণওয়ালিস ট্রাট, নব্যভারত প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত । মূল্য দশ আনা ।

বহুদিন পূর্বে ‘বঙ্গদর্শনে’ বন্ধিগচ্ছ বলিয়াছিলেন,—“বাঙ্গালার ইতিহাস-চাই; নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই। কে লিখিবে? তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালী তাহাকেই লিখিতে হইবে। * * * * আইস, আমরা সকলে মিলিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের অনুসন্ধান করি। যাহার যতদূর সাধ্য, সে তত দূর করুক; ক্ষুদ্র কীট যোজনব্যাপী ধাপ নির্মাণ করে। একের কাজ নয়, সকলে মিলিয়া করিতে হইবে।”

মনে হইতেছে, এতদিন পরে বাঙ্গালী এই আহ্বানে বাঙ্গালার ইতিহাস-উদ্ধারে বদ্ধপরিকর হইয়াছে। তাই বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর জিবেন্দ্রী মহাশয় বলিয়াছিলেন,—“ধাতু, পাথর ও মাটির টুকরায় আমরা স্তম্ভনির্মাণে প্রবৃত্ত হইয়াছি; ছেঁড়া কাগজের ও পোকায় কাটা তালপাতার জঞ্জালে আমাদের মার্কেল-মণ্ডিত কুঠরী যুগপৎ অধুষ্য ও অভাগিনী হইয়া পড়িয়াছে; হিজিবিজি হস্তাক্ষরের দৌরাড্যো আমাদের পরিষৎ-পত্রিকা সভ্যগণের ভয়প্রদ হইয়া উঠিয়াছে, এবং প্রজ্ঞাতত্ত্বের বিতীথিকা আমাদের কাব্যকলাকুতূহলী বঙ্গুগণের হৃদয়ে আতঙ্ক-সঞ্চারের উপক্রম করিয়াছে।” তাই স্মৃতি কুমার শ্রীশরৎকুমার রায় মহাশয়ের উদ্যোগে রাজশাহী অঞ্চলে ঐতিহাসিক অভিধান আরম্ভ হইয়াছে। তাই অল্পদিনের মধ্যে বাকরগঞ্জ, মেদিনীপুর, গয়মন-সিংহ, বিক্রমপুর, রাজশাহী, ফরিদপুর প্রভৃতি বাঙ্গালার অনেকগুলি জিলার ইতিহাস রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। তাই বাঙ্গালায় বহু উপাদেয় ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও সম্ভর্ড প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে।

দেশকে জানিবার জন্য বাঙ্গালীর এই আগ্রহ যে ইতিহাস-উদ্ধার-চেষ্টায় আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে, সে চেষ্টা ফলবতী হইলে যে আমাদের পরম উপকার হইবে তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। বন্ধিগচ্ছ সত্যই বলিয়াছিলেন,—“বাঙ্গালার ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালী কখন মানুষ্য হইবে না। যাহার মনে থাকে যে, এ বংশ হইতে কখন মানুষ্যের কাজ হয় নাই, তাহা হইতে কখন মানুষ্যের কাজ হয় না। তাহার মনে হয়, বংশে রক্তের দোষ আছে। তিত্ত নিম্ন বংশের বীজে তিত্ত নিম্নই জন্মে—মাকালের বীজে মাকালই জন্মে।”

বাঙ্গালার ইতিহাস-উদ্ধার কার্যে বাঙ্গালার জিলাগুলির ইতিহাস যে বিশেষ সাহায্য করিবে—সেই ইতিহাস যে একান্ত আবশ্যক তাহা বলাই বাহুল্য। দেড়শত বৎসর পূর্বে ইংরাজের আগমনকালে কলিকাতা কেবল লোকবাসের যোগ্য হইয়া উঠিতেছে। আর তখন বাঙ্গালার মফঃস্বলে কত পরিত্যক্ত রাজধানী স্থাপন

সমুদ্র অরণ্যে আবৃত হইয়া গিয়াছে, কত দীর্ঘদীর্ঘিকা জলজগন্মো পূর্ণ হইয়াছে, কত দেবমন্দিরের অমরচুড়ী চূড়া ধূল্যবলুষ্ঠিত হইয়াছে। তখন বাঙ্গালার মুক্তি-কায় কত কবির, কত ধর্ম-সংস্কারকের, কত বীরের, কত রাজনীতিকের, কত পণ্ডিতের, কত শিল্পীর চিত্তাভঙ্গ মিলাইয়া গিয়াছে। তখন বাঙ্গালার নদী বহিয়া কত পণ্যস্রব্যপূর্ণ তরঙ্গী দেশে দেশে ধনসংগ্রহ করিতে গিয়াছে। তখন বাঙ্গালার প্রান্তর কত গৈরিকের রক্তে রঞ্জিত হইয়াছে। তখন বাঙ্গালার পল্লী কত শিল্প-কীর্তিতে শোভিত হইয়াছে। তখন বাঙ্গালার সমাজের স্তরে স্তরে কত পরিবর্তন-ধাবনের পলী সঞ্চিত হইয়াছে। তখন বাঙ্গালীর জীবনে কত পণ্ডিতের প্রভাব পরিস্ফুট হইয়াছে। পলাশীর যুদ্ধ দেড়শত বৎসরের ঘটনা; কিন্তু বিষ্ণুপুরের যে রাজগণ মল্লাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ লিপি প্রায় তিনশত বৎসরের (১৬২২ খৃষ্টাব্দের)। বাঙ্গালার স্থাপত্য বাঙ্গালার বিশেষত্বব্যঞ্জক, বাঙ্গালার সাহিত্য বাঙ্গালীর নিজস্ব। এই শিল্প ও এই সাহিত্য বাঙ্গালার মফঃস্বল শোভিত করিয়াছিল, বাঙ্গালার পল্লীতে উৎপন্ন হইয়াছিল। পূর্বে বাঙ্গালায় ধনবানগণ জলাশয় ও রাজপথ প্রস্তুত করাইয়া পূণ্যসঞ্চয় করিতেন। সেই প্রাচীন কীর্তির অবশেষ আজও বঙ্গের সর্বত্র বিদ্যমান। ‘আলোচ্য গ্রন্থেও সেই সকল কীর্তির পরিচয় পাওয়া যায়। কেমদার রায় চাঁচুরতলার নিকটে যে গৃহ নির্মাণ করাইয়াছিলেন সেই “রাজবাড়ীর অনতিদূরে ‘কেশার মার দীঘী’ নামে এক বৃহৎ জলাশয় ছিল। প্রবাদ, কেশা অথবা, কেশবের মাতা, পতি-পুত্রহীনা হইয়া, পতিকুলের প্রভু চাঁদরায়ের আশ্রয়ে থাকিয়া জীবন যাপন করে। * * * * কেমদার রায় জন্মগ্রহণ করিলে পর, কেশার মাকে তাঁহার ধাত্রীপদে নিযুক্ত করিয়া, রাজা পুত্রের প্রতি-পালনভার তৎকরে চ্যুত করেন। কেমদার রায় বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে পর, ধাত্রীর ইচ্ছানুসারে এই বৃহৎ জলাশয় খনন করাইয়া তদ্বারা উৎসর্গ করাইয়াছিলেন। এই নিমিত্ত ইহার নাম হয়, ‘কেশার মার দীঘী’। আরও প্রবাদ, কেশার মা যতদূর হাঁটিয়া যাইতে পারিবে, ততদূর পর্যন্ত এই সরোবর খনিত হইবে বলিয়া কেমদার রায় প্রতিশ্রুত হন। তদনুসারে ধাত্রী প্রায় ১ মাইল ব্যাপী স্থান হাঁটিয়া অতিক্রম করার পর অক্ল কর্তৃক বাধা প্রাপ্ত হইয়া ক্ষান্ত হয়। এতদ্ব দীঘীও এক মাইল ব্যাপী স্থান ব্যাপিয়া খনিত হইয়াছিল। অতাপি উহার ভগ্নাবশেষ বর্তমান রহিয়াছে।” কাচকির দরজা রায়দিগের আর এক কীর্তি। “উহা এক বৃহৎ রথ্যা—ইদিলপুরের নিকটস্থ বুড়ীরহাট ও দেওভোগ

স্থান হইতে উহার এক শাখা আরম্ভ হইয়া বিক্রমপুর ভেদ করিয়া উত্তর দিকে বরাবর ধলেশ্বরী নদীর তট পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়াছিল। অপরটি মেঘনার তট হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিম দিকে বরাবর পদ্মাতট পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। রাস্তা দুইটি বক্র গতিতে নানা জনপদ ঘুরিয়া ফিরিয়া যাওয়ায় বিক্রমপুরের অধিকাংশ গ্রামের যাতায়াতের সুবিধা ছিল। সেন রাজগণের সময়ে যে সমস্ত রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার কতকাংশ এই কাচকির দরজার সহিত পরে সংযোজিত হয়। সুতরাং এই রাস্তার সমুদয় ভাগ রায় মহাশয়দের নিজকৃত নয়। * * * * এই রাস্তাটির উৎপত্তি সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায় যে, কেদার রায়ের মাতার অদৃষ্ট গণনা করিয়া কোন জ্যোতির্বিদ বলিয়াছিল মৎস্যের কণ্টক বিদ্ধ হইয়া তাঁহার মৃত্যু-সংঘটন হইবে। এই কারণে কেদার রায় (৭) রাণীর জন্ত কণ্টকহীন মৎস্যের ব্যবস্থা করেন। কাচকির গুড়া নামে একপ্রকার গুড় মৎস্য নদীতে সর্বদা পাওয়া যায়। সেই মৎস্য পদ্মা, মেঘনা, ধলেশ্বরী নদীতে প্রত্যহ ধৃত হইয়া যাহাতে সুবিধামত রাণীর জন্ত পৌঁছিতে পারে, তন্নিমিত্ত চাঁদ রায় কর্তৃক এই রাস্তার পত্তন আরম্ভ হইয়া কেদার রায়ের সময়ে 'পরিসমাপ্ত' হয়। কথার মূলে যাহাই থাকুক, কাচকি মৎস্য ধৃত করিবার ব্যপদেশে উহার সৃষ্টি, এই কিংবদন্তীই চলিয়া আসিয়াছে, এবং এইজন্ত রাস্তার নামও 'কাচকির দরজা' হইয়াছিল। প্রবাদ সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, এই চতুর্দিক-প্রসারিত পথগুলি যখন পূর্ণাবয়বে, বিক্রমপুরে বিদ্যমান ছিল, তখন তদেশবাসীরা যে বর্তমান অধিবাসিগণের অপেক্ষা অধিক সুখস্বচ্ছন্দে যাতায়াত করিত, তাহা যথেষ্ট সন্দেহ নাই।”

বাল্যালার মফঃস্বল এইরূপ ঐতিহাসিক উপাদানে পূর্ণ। তাহার অল্পসন্ধান, কিংবদন্তীর সংগ্রহ ও উপস্থিত উপাদানের বিশ্লেষণ ও সংযোজন আবশ্যক। বাল্যালার জিলাসকলের ইতিহাসরচনা সম্বন্ধে আমরা গভর্নমেন্টের ও সরকারী ইংরাজ কর্মচারীদের নিকট বিশেষভাবে আশ্রয় আশ্রয়। সরকারী 'গেজেট' টিয়ার' প্রভৃতিতে এই ঐতিহাসিক অল্পসন্ধানের আরম্ভ। তাহার পর বেঙ্গালি অথবা বঙ্গভাষায়, ওয়েশল্যাণ্ড ঘোষারের, টেলার ও ডাডলি বাট' টাকার, ওয়ালস মুর্শিদাবাদের, টয়েনবী হুগলীর যে সকল প্রামাণ্য ইতিহাস লিখিয়াছেন সে সকল ঐতিহাসিক উপকরণের আকর বলিলে ও অতুল্য হইবে না। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত ভিত্তির উপর সৌধনির্মাণ অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইয়াছে।

বাল্যালার পঞ্জীতে ঐতিহাসিক উপাদানের সন্ধান বিশেষ যত্নসহকারে সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। বাল্যালার পঞ্জীর নামই স্থানে স্থানে তাহার বয়সজ্ঞাপক।

প্রাকৃত-প্রভাব-প্রাবিত বাঙ্গালায় পরিশেষে সংস্কৃত-সমাদান-দুগে যে সকল গ্রামের প্রতিষ্ঠা, সে সকলের নামেই তাহাদের বয়স সংলক্ষণ। শ্রীপুর, লক্ষ্মীনগর, ইচ্ছা-পুর, শ্যামনগর, যশোহর, কৃষ্ণনগর—এই সকল মার্জিত সংস্কৃত নামের বয়স-বিচার কর্ণমাধ্যম নহে। পূর্ববর্তী লোকালয়ের নাম একপ মার্জিত নহে। অবশ্য বলা বাহুল্য অল্প প্রমাণের অভাবে কেবল নামের উপর নির্ভর করিয়া গ্রামের বয়স-বিচার নিরাপদ নহে। গ্রামে সন্ধান করিলে যদি কোন অস্পষ্ট আত্মীয়ের জীর্ণ গৃহে ‘ধর্ম ঠাকুরের’ মূর্তি পাওয়া যায়, বা গ্রামের কোন শ্রেণীর লোকের মধ্যে ‘ধর্ম ঠাকুরের’ পূজার প্রমাণ পাওয়া যায়—তবে বুঝিতে হইবে, সে গ্রাম এক কালে বৌদ্ধ-প্রভাব হইতে অব্যাহতিলাভ করে নাই। সে প্রভাব কতদিন পূর্বে—কিভাবে—কেন আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহার অনুসন্ধান করা আবশ্যক। বাঙ্গালার সকল প্রাচীন পল্লীগ্রামেই দেবালয় ও জলাশয় ছিল। সেই সকলের সম্বন্ধে কিম্বদন্তীরও অভাব ছিল না। সেই সকল কিম্বদন্তীর অতিরঞ্জনের মধ্যে সত্যের অংশ উদ্ধার করিতে হইবে। হয় ত মন্দিরের সম্বন্ধে শুনা যায়, কিছুকাল পূর্বে কোন নৈসর্গিক কারণে পূর্ববর্তী মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে বর্তমান মন্দির নির্মিত হয়। সে কিছু কাল কত দিন পূর্ববর্তী—বর্তমান মন্দিরের বয়স অনুমান কত দিনের—এই সকল সন্ধান করিলে ফলশাঙ্কের সম্ভাবনা। বর্তমান মন্দির যদি পূর্ববর্তী মন্দিরের ভিত্তির উপর গঠিত না হইয়া অন্যত্র গঠিত হইয়া থাকে, তবে পূর্ববর্তী মন্দিরের ভগ্নাবশেষ পরীক্ষায় ঐতিহাসিক উপকরণের আবিষ্কার অসম্ভব নহে। দেবমন্দির অধিকাংশ স্থলেই প্রতিষ্ঠাতার সাম্প্রদায়িক মতের পরিচায়ক। কিন্তু যদি নিকটবর্তী কতকগুলি গ্রামে একই দেবতার মন্দির লক্ষিত হয়, তবে সেই সকল গ্রাম যে শৈব, শাক্ত বা বৈষ্ণব প্রভাবে প্রাবিত হইয়াছিল, একপ অনুমান করিতে পারা যায়। তখন সেই প্রভাবের পোষক প্রমাণের সন্ধান করিলে অনেক অনাবিষ্কৃত সত্যের আবিষ্কার হইতে পারে। জলাশয়গুলির পরীক্ষায় আরও মূল্যবান ঐতিহাসিক উপাদান প্রাপ্তির সম্ভাবনা। মুসলমানের ও মার্হাট্টার আগমনে ও লুণ্ঠনে বাঙ্গালা বহুবার বিপন্ন হইয়াছে। গ্রান্ডউইডেল বলিয়াছেন, অল্প ধর্মের প্রতি মুসলমানদিগের দারুণ ঘৃণার ফলে ভারতের প্রাচীন স্থাপত্যাদির চিহ্নমাত্র নাই।—মহারাষ্ট্রদিগের বিরুদ্ধেও শিষ্টাচারীধর্মের অভিযোগ বর্তমান। মুসলমানের ও মহারাষ্ট্রীয়ের আগমন-সম্ভাবনার শঙ্কিত জনগণ কতবার বিগ্রহ বা অলঙ্কারাদি মূর্তিকামধ্যে প্রোথিত করিয়াছিল বা জলাশয়ে নিক্ষেপ

করিয়াছিল, তাহা কে বলিবে? এই সকল লুপ্তপ্রায় জ্ঞানশয়ের গর্ভে কত ঐতিহাসিক উপকরণ লুপ্ত হইতেছে কে তাহার ইয়ত্তা করিবে?

এক্ষণে যে সকল উপাদেয় ইতিহাস প্রকাশিত হইতেছে, সে সকলে এইরূপ অল্পসন্ধানের পরিচয় অধিক নাই। এরূপ অল্পসন্ধান যে ভ্রম, সময় ও ব্যয়সাপেক্ষ। কিন্তু এরূপ অল্পসন্ধান ব্যতীত ইতিহাস সম্পূর্ণ বা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে না। আশা করি অদূর ভবিষ্যতে বাঙ্গালীর সমবেত চেষ্টায় এইরূপ অল্পসন্ধানের আবশ্যক অর্থ সংগৃহীত হইবে ও বাঙ্গালার সম্পূর্ণ ইতিহাসরচনার পথ পরিষ্কৃত হইবে।

আনন্দনাথ বাবু পরিণত বয়সে যে উৎসাহে ফরিদপুরের ইতিহাস উদ্ধারকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা অল্পকরণযোগ্য এবং বিশেষ প্রশংসনীয়। তিনি বহু যত্নে যে সকল কিম্বদন্তী সংগ্রহ করিয়াছেন, সে সকল ঐতিহাসিক হিসাবে বিশেষ মূল্যবান। ভরসা করি, এই গ্রন্থ সমাপ্ত হইলে বিশেষ সমাদৃত হইবে।

গ্রন্থখানির সম্বন্ধে আর দুই চারিটি কথা বলিয়া আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব। গ্রন্থখানির ভাষা আরও মার্জ্জিত ও প্রাদেশিকতা-বর্জ্জিত হইলে ভাল হয়। গ্রন্থকার মহাশয় ৩২ পৃষ্ঠায় আদিশুরের ও সেনরাজগণের কালনির্ণয়ের কথায় স্মৃতিবিচারকারীদিগের কার্য্যে কিছু বিরক্তিপ্রকাশ করিয়াছেন। সত্যের উদ্ধার-চেষ্টা সর্ব্বত্রই প্রশংসার যোগ্য। তাহাতে আনন্দ বাবুর মত প্রবীণ লেখকের বিরক্তিপ্রকাশ সম্ভব নহে। গ্রন্থমধ্যে এক স্থানে সম্প্রদায়-বিশেষের বর্ত্তমান অবস্থার সহিত অতীত অবস্থার যে তুলনা করা হইয়াছে, তাহা অবাঞ্ছনীয়; সে তুলনায় গ্রন্থ অনাবশ্যকভারাক্রান্ত না করিলে ক্ষতি ছিল না। ১৭ পৃষ্ঠায় লেখক লিখিয়াছেন,—“বর্ত্তমান বর্ষে পাটের দর ন্যূন হওয়ায় অনেক মহাজনের ক্ষতি হইয়াছে বটে, কিন্তু চাষীরা তাহা অত্যাগি অল্পভব করিতে সমর্থ হয় নাই।” এইরূপ মন্তব্য সংবাদপত্রে শোভন—সাময়িক পত্রোচলিতে পারে, কিন্তু ইতিহাসে স্থানপ্রাপ্তির যোগ্য নহে। গ্রন্থে বর্ণিত বিষয়ের বিস্তার-বিষয়ে গ্রন্থকার মহাশয় আরও মনোযোগী হইলে ভাল হয়। বিষয়বিস্তার অমনোযোগ এরূপ গ্রন্থের উপযোগিতার পক্ষে অনিষ্টকর। আমাদের সর্ব্বশেষ বক্তব্য,—এরূপ গ্রন্থে মুখপত্রের বা টাইটল পেজের ও পৃষ্ঠার অভাষ এবং আবরণেই “ভূমিকা” মুদ্রণ গ্রন্থের গৌরববর্ধক না হইয়া গৌরবনাশক হইয়া দাঁড়ায়। এই ক্ষুদ্র বিষয় সম্বন্ধে গ্রন্থকারে মহাশয়ের অমনোযোগ পাঠকমাত্রেয়ই পক্ষে দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই।

সংগ্রহ ।

— :: —

ইতিহাস ।

— :: —

অন্ধকূপে ইংরাজ রমণী ।

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের অন্ধকূপ-হত্যাকাণ্ড বাঙ্গালার ইতিহাসে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, নবাব-সেনা ১৭৫৬ অব্দে কলিকাতা নগরী অধিকৃত করিবার পর কতকগুলি খেতাব নবাব-সৈন্যের হস্তে আত্মসমর্পণ করেন। হুগলীর শাসনকর্তা ম্যাকটোর এ ইংরাজ নরনারীগণকে কোর্ট উইলিয়মের কারাগৃহে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিতে আদেশ করিয়াছিলেন। সেই কারাগৃহটি দৈর্ঘ্যেও প্রস্থে বার হাত মাত্র ছিল। নবাব-সেনাগণ সশস্ত্র ও তরবারি দেখাইয়া সেই গর্ভীর প্রকোষ্ঠে ১৪৬ জন খেতাবকে প্রবেষ্ট করাইয়া দেয়। নিদায়ে প্রবৃত্ত প্রাণে খেতাবগণ তথায় আবদ্ধ হইয়া জাহি জাহি ডাক ছাড়িতে থাকেন। সেই কারাগৃহে দুইটি অতি ক্ষুদ্র গবাক ছিল। প্রাণান্ত যজ্ঞায় অস্থির হইয়া অবরুদ্ধ নরনারীগণ সেই গবাকের সম্মুখিত হইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ঠেলাঠেলির 'ও ছড়াছড়ন' ফলে অবরুদ্ধ খেতাবগণের কষ্ট আরও অধিক হইতে লাগিল।" ফলে সেই ভীষণ নিদায-রক্তনী যত অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই তাঁহারা অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিলেন। ক্রমে প্রাণহারিণী পিপাসায় ও শ্বাসকষ্টে তাঁহারা একে একে যুত্মর জোড়ে আত্মীয় লইলেন। পরদিন প্রভাতে রক্ষিণের সেই কারাগৃহের দ্বার উন্মোচিত করিয়া দেখিল, ১৪৬ জন অবরুদ্ধ খেতাবের মধ্যে ১২৩ জনের শবমাত্র পড়িয়া আছে, অবশিষ্ট ২৩ জন মৃয়ু—অচেতনপ্রায় পতিত রহিয়াছেন। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন,—যে সকল খেতাব অন্ধকূপে হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন,—তাঁহাদের মধ্যে কেবল মিসেস কেরীই রমণী।

অন্ধকূপ-হত্যাকাণ্ডের প্রামাণিকতা লইয়া কিছু দিন পূর্বে বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছিল। স্বর্গীয় ভোলানাথ চন্দ্র মহাশয়ই প্রথমে বলেন যে, দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে বার হাত প্রকোষ্ঠে ১৪৬ জন নরনারীকে প্রবেষ্ট করান নিতান্তই অসম্ভব। ইহার অতি অল্প দিন পরেই 'বঙ্গবাসী'র প্যাতমাগা মেধক জীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয় 'অম্বাভূমি' নামক মাসিক পত্রিকায় অন্ধকূপ-সম্পর্কিত ঘটনার অলীকতা প্রমাণিত করিবার উদ্দেশ্যে কয়েকটি গারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকটিত করেন। তাহার পরই জীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় নানা যুক্তি ও প্রমাণ প্রয়োগে উক্ত ঘটনা মিথ্যা প্রমাণিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ফলে শেষোক্ত দুইজন প্যাতমাগা মেধকের যুক্তির ও তর্কের প্রভাবে অন্ধকূপ-সম্পর্কিত বিবরণ সম্পূর্ণ মিথ্যা, অনেকের মনে এইরূপ ধারণাই বদ্ধমূল হইয়া পড়ে। ইহার পর অধ্যাপক মি. আর. উইলসন

অন্ধকূপ-হত্যা। সত্য বলিয়া সপ্রমাণ করিতে বন্ধপত্রিকর হয়েন। লর্ড কার্জন উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে অন্ধকূপের স্থতিস্তম্ভ পুনর্গঠিত করিয়া ঐ ঘটনা ভারতবাসীর হৃদয়ে চিরজাগরক রাগিতে সঞ্চার করেন এবং তাঁহারই যত্নে লালমিথীর উত্তর পশ্চিম কোণে অন্ধকূপের একটিরূপ স্থতিস্তম্ভ মস্তক উন্নত করিয়া বড়ের শোম আধীন নবাবের অত্যাচারকাহিনী জনগণসমক্ষে কীর্ত্তন করিতেছে।

কেহ কেহ মনে করেন, পরবর্ত্তী অসুসন্ধানের ফলে অন্ধকূপের হত্যাকাণ্ড অংশতঃ সত্য বলিয়া সপ্রমাণ হইয়াছে। / তবে হলওয়েল্‌ এড্‌ভুতি ইংরাজ লেখকগণের লিখিত বিবরণ যে নিতান্ত অতিরঞ্জিত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সম্ভবতঃ সেই কারাগারকোষ্ঠ বৃহত্তর ছিল, অথবা অবরুদ্ধ ইংরেজদিগের সংখ্যা অনেক অল্প ছিল। সেই কারাগারে কেবল ইংরাজ পুরুষই নিষ্কিণ্ড হয়েন নাই; অনেক ইংরাজ রমণীও তথায় নিষ্কিণ্ড হইয়াছিলেন। লর্ড কার্জনের প্রতিষ্ঠিত স্থতিস্তম্ভে মৃত ব্যক্তিগণের তালিকায় মিসেস ইলেনর ওয়েষ্টন নামক জনৈক ইংরাজ মহিলার নাম দৃষ্ট হয়।

অন্ধকূপে কতগুলি ইংরাজ রমণী আবদ্ধ হইয়াছিলেন,—তাঁহাদের মধ্যে কতজন সেই ভীষণা রজনীতে প্রাণ হারাইয়াছিলেন,—কত জনই বা রক্ষা পাইয়াছিলেন, তাহা বলিয়া ইদানীং একটু আলোচনা হইতেছে। ১৯০৬ অব্দের ২৫শে মার্চ তারিখের ‘ষ্টেটস্ম্যান্’ পত্রে প্রীযুক্ত এচ. ই. এ. কটন একটি স্মরণ প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। তাহার পর গত ১৯১০ অব্দের ২৯শে মে তারিখের ‘ষ্টেটস্ম্যানেন্’ প্রীযুক্ত ওয়াল্টার কে. ফার্মিগ্লার আর একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন।

অন্ধকূপের ঘটনার রাজিতে কতকগুলি ইংরাজ যে এক রক্তবায়ুপ্রদেয় প্রকোষ্ঠে নিরাজফৌলার অসুচরবর্গকর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন—এবং সেই বন্দিগৃহে তাঁহাদের মধ্যে

অন্ধকূপে রমণী। অনেকই প্রাণ হারাইয়াছিলেন,—এ কথা যৌহারী একেবারেই অস্বীকার করেন না, তাঁহারা অবশ্য স্বীকার করিবেন যে, সেই

বন্দিগৃহে পুরুষের সহিত অনেক রমণীও নিষ্কিণ্ড হইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, পুরুষ অপেক্ষা রমণীর সংখ্যা অল্প ছিল। ইহার কারণও ছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁহাদের কার্য্য নির্বাহের জন্ত এদেশে যেতাদ্য যুবক পাঠাইতেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের সহিত “খসকমা” করিবার জন্ত রমণীদিগকে পাঠাইতেন না। কলে তখন ইংরাজ—গম্ভীর রমণীর সংখ্যা অতি অল্পই ছিল। রমণীর অল্পতা নিবন্ধম তখনকার ইংরাজ মহিলারা অতি অল্প দয়সেই উদ্বাহরণে আবদ্ধ হইতেন। একাদশ হইতে পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রমের মধ্যেই অনেক ইংরাজ বাণিকার বিবাহ হইয়া যাইত।

অন্ধকূপে আবদ্ধ জনগণের মধ্যে কতজন মহিলা ছিলেন, সে সম্বন্ধে কোন তথ্যই অবিসংবাদিতরূপে সপ্রমাণ হয় নাই। হলওয়েল্‌ই প্রথমে এই ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া

সংখ্যা নির্ণয়। য়ায়েন। তিনি কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়ম ছুর্গের অধিনায়ক

ছিলেন এবং ঐ ভীষণা রজনীতে অন্ধকূপে আবদ্ধ ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, সেই রাজিতে আবদ্ধ জনগণের মধ্যে একটি মাত্র ইংরাজ মহিলা ছিলেন।

লাবিষ্টেন মিলেব ল নামক জটনক ব্যক্তি একদানি দলখাও লিখিয়াছিলেন, ঐ দলখাওে তিনি অক্ষকূপে একটিমাত্র ইংরাজ মহিলা ছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সেজেটোরী কুক (ইনিও অক্ষকূপে আবদ্ধ ছিলেন) ও অর্ধ ঐ ধনিরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। কিন্তু সে সময় ভারতে ইংরাজ মহিলাদিগের সংখ্যা যতই অল্প থাকুক না কেন, মার্কশত ইংরাজের মধ্যে একটিমাত্র মহিলার অবস্থান অত্যন্ত অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। এ স্থানে বলা আবশ্যক যে, হলওয়েল যে সকল কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহার মধ্যে অনেক কথাই পরে মিথ্যা ও অতিরঞ্জিত বলিয়া সপ্রমাণ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং যাহারা কেবল হলওয়েলেরই ধনিত্তে ধনি মিশাইয়াছেন, তাঁহারাও বিযম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। কাপ্তেন মিলস্ নামক জটনক ইংরাজ সেই অরণীয় রজনীতে অক্ষকূপে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি সেই জীবিত ব্যক্তিগণের মধ্যে অন্যতম। ঘটনার অব্যবহিত পরেই ইনি তৎসম্বন্ধে এক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইনি লিখিয়াছেন যে, “অক্ষকূপে ১৪৪ জন নরনারী ও বালকবালিকাকে আবদ্ধ রাখা হইয়াছিল, তন্মধ্যে ১২০ জনেরও অধিক লোক শোচনীয় ভাবে খামরুদ্ধ হইয়া মরিয়াছিল।” ইহার লিখিত বিবরণ হইতে বুঝা যায় যে, অক্ষকূপে একাধিক রমণী ও অনেক বালকবালিকাও আবদ্ধ হইয়াছিল। ইহাদের সকলের কথা এখন বিশ্লেষণে অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। সে তথ্য উদ্ধারের আশা অতি অল্প।

মিসেস কেরী নামী জটনকা মহিলা ঐ ভয়ঙ্করী বিভাবরীতে সেই ভীষণ প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ ছিলেন, এবং জীবিতাবস্থায় তথা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া তাহার পর বহু দিন জীবিত ছিলেন,—এ কথা এখন অনেকে স্বীকার করেন। ১৭৯৯

মিসেস কেরী। খৃষ্টাব্দে মিঃ টমাস বইলু নামক জটনক ইংরাজ ইহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। মিসেস কেরীর সহিত এই বইলুর যে কথাবার্তা হইয়াছিল, তাহা তিনি তাঁহার ‘হলওয়েলের ট্র্যাক্টের’ এক পৃষ্ঠায় লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। ঐগুক্ত কটন লিখিয়াছেন, “তাঁহার সেই পুস্তকখানি এখন মিসেস বিভারিগের নিকট আছে।” ঐ পুস্তকের পৃষ্ঠায় উক্ত মিঃ বইলু যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায় যে, মিসেস কেরী হলওয়েলের অনেক কথারই সমর্থন করিয়াছিলেন। মিঃ বইলু স্কটিশ কোর্টের এটর্নি ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভকালে তাঁহার মৃত্যু হয়। ডাক্তার বন্ডি তাঁহার “Echoes from Old Calcutta” নামক পুস্তকে এই মন্তব্যগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন। উহা পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, মিসেস কেরী বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার স্বামী, তাঁহার মাতা মিসেস ইলেনর ওয়েষ্টন, ও তাঁহার দশবর্ষব্যবস্কা এক ভগিনী অক্ষকূপে প্রাণ হারাইয়াছিলেন; ইহা তিন অনেক সেনা-সিঁপ্তিনী ও বালকবালিকা সেই পবনগতি-প্রতিধ্বি প্রকোষ্ঠে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে টমাস বইলু মিসেস কেরীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। সে সময় মিসেস কেরী আপন মুখেই বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার বয়স ৫৮ বৎসর। সুতরাং অক্ষকূপহত্যার সময় তাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বৎসরের অধিক হয় নাই। তখন তিনি কুমারী মহেন—গৃহিণী। অক্ষকূপেই তাঁহার পতি

প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। প্রকাশ, অক্ষকূপ হইতে বাহির হইবার পর তিনি সিরাজদৌলার শুদ্ধান্তে মীত হইয়াছিলেন। হলওয়েল স্বয়ং লিখিয়াছেন যে, তিনি জুন্দরী ও যুবতী ছিলেন, সেই জন্ত নবাব তিনি ভিন্ন আর যাঁহারা জীবিত ছিলেন, তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়া-
ছিলেন। অর্গ ও মেকলে এই কথা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ডাক্তার বন্ডিদ লিখিয়াছেন যে, “অক্ষকূপের যজ্ঞাভোগের পর আর কাহাকেও জুন্দরী ও যুবতী দেখাইতে-
ছিল না। সম্ভবতঃ মিসেস্ কেরী আর সকলের সহিত কুলীবাখার গিয়াছিলেন। তথা
হইতে ইংরাজ জাহাজ দেখা যাইতেছিল।” এই স্থানে বলা আবশ্যিক যে, অক্ষকূপহত্যার
পর যাঁহারা জীবিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে চারি জনকে নবাব ওস্তাদ মের সন্ধান দিবার
জন্ত আটক রাখিয়াছিলেন। শুনা যায়, ১৮০১ অব্দের ২৮শে মার্চ তারিখে মিসেস্ কেরীর
মৃত্যু হইয়াছিল। মিসেস্ কেরী তাঁহার জননী ও ভগিনীর সম্বন্ধে যে কথা লিখিয়াছেন,
বর্তমান সময়ে অসুসঙ্গানের ফলে তাহার যাবার্য্য অবিসংবাদিতরূপে প্রমাণিত হয় নাই।
তিনি লিখিয়াছিলেন যে, তাঁহার মাতার নাম মিসেস্ ইলেনর ওয়েষ্টন। দ্বিতীয় বার
উদ্ধৃতিতে আবদ্ধ হইয়া তিনি ঐ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কলিকাতা-অবরোধকালে
বাঙ্গালার কুঠীতে যে সকল যুরোপীয় ও অস্থায়ী ব্যক্তি ছিলেন, মিষ্টার ছিল তাঁহাদের
নামের এক তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সেই তালিকায় ইলেনর ওয়েষ্টনের নাম নাই।
কেবলমাত্র বন্ডিদ কর্তৃক উদ্ধৃত উক্তির উপর নির্ভর করিয়াই লর্ড কর্ভার্ন বর্তমান
মস্মেগেটে ইলেনর ওয়েষ্টনের নাম প্রোদিত করিয়া দিয়াছেন। ক্রীযুক্ত কটন লিখিয়াছেন,
ইলেনর ওয়েষ্টনের সহিত সম্ভবতঃ চার্লস্ ওয়েষ্টনের কোন সম্বন্ধ ছিল। এই চার্লস্
ওয়েষ্টন নন্দকুমারের মোকদ্দমায় অত্যন্ত জুরী ছিলেন। বলা বাহুল্য, একপা-সংশয়মিহ
অসুমানের উপর নির্ভর করিয়া ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কৃত করা সমীচীন নহে।

ক্রীযুক্ত কার্ণওয়াল অক্ষকূপ হইতে জীবদ্দশায় প্রত্যাগত আর একটি রমণীর নাম করিয়া-
ছেন। ‘কলিকাতা পেপেটে’ প্রকাশিত হয়,—“১৮১৫ অব্দের ১৪ই অক্টোবর তারিখে ৭৮

বৎসর বয়সে মিসেস্ নরোর লোকান্তরপ্রাপ্তি হইয়াছে। ১৭৫৬
আর একজন।

খুষ্টাদের অক্ষকূপ হইতে যাঁহারা রক্ষা পাইয়াছিলেন,—ইনিই
তাঁহাদের শেষ। সেই ঘটনার সময় তাঁহার বয়স্কম ১৪ বৎসর ছিল এবং তিনি ডাক্তার
নরোর স্ত্রী ছিলেন। শেষ জীবন পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার মানসিক শক্তি অব্যাহত রাখিতে
সমর্থ হইয়াছিলেন।”

মিষ্টার ছিলেন তালিকায় নক নামধারিণী তিন জন ইংরাজ রমণীর উল্লেখ দেখা যায় বটে
কিন্তু ঐ তিন জনের মধ্যে উপরি উক্ত মিসেস্ নক দে প্রকৃতপা, ইহা নিশ্চয় বলা যায় না।
১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় জন নক নামধের ছইজন ডাক্তার ছিলেন; একজন ‘জুনিয়ার’
আর একজন ‘সিনিয়ার’ নামে অভিহিত হইতেন। সিনিয়ার ডাক্তার নরোর পত্নীর নাম ছিল
এলিজাবেথ নক। কলিকাতা অবরোধের সময় তিনি ফল্গুয়্য অবস্থিতি করিতেছিলেন।
সুতরাং তিনি কখনই অক্ষকূপে অবরুদ্ধ হইতে পারেন না। জুনিয়ার নক ১৭৫৭ অব্দে

অন্ন ও যত্নপ্রদানে প্রাণত্যাগ করেন। ইহার পক্ষীই কি অক্ষকূপে অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন? কেহ কেহ অস্বপ্ন করেন, ডাক্তারী করা অপেক্ষা ব্যবসায় করা অধিক লাভজনক বলিয়া ইনি ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। আবার গত ৩১ মে তারিখে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন,—“মেজেন্ট জেনারেল ট্যাপ্পেনের অস্বপ্ন লইয়া আমি প্রাচীন অন্ন মুদ্রা রেজিষ্টারীর তালিকায় এই কথা লিখিত দেখিলাম;—“বাপাণায় কলিকাতা” কোর্টউইলিয়মে সমাধি; ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের ১৪ই অক্টোবর, মিসেস্ রোজ নয়া; বয়স ৭২।” ১০ই তারিখে যাহার দেহান্ত হইয়াছে ১৪ই তারিখে তাহার সমাধি হওয়া সম্ভব। কিন্তু কলিকাতা গেজেটে উহার বয়স ৭৪ বৎসর বলা হইয়াছে, গির্জার রেজিষ্টারী খাতায় উহা ৭২ বৎসর লিখিত হইয়াছে। উভয়েই কি একই ব্যক্তি? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে অক্ষকূপ হত্যার সময় তাঁহার বয়স ১২ বৎসর মাত্র ছিল। ইহার পূর্ণ নাম রোজ নয়া; ‘কলিকাতা গেজেটে’ পূর্ণ নাম প্রকাশিত হয় নাই। এখন জিজ্ঞাস্য, এরূপ বালিকার পক্ষে অক্ষকূপে রক্ষা পাওয়া কি সম্ভব হইয়াছিল?

উড নামী আর একটি ইংরাজ বালা সেই ভয়ঙ্করী বিভাবরীতে অক্ষকূপে বন্দি হইয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। ১৭৮০ খৃঃ অব্দের নবেম্বর মাসে হিকির ‘বেঙ্গল গেজেটে’ ও কাপ্তেন বাক্স্ লিখিত Bengal Artilleryর ইতি-
আরও একজন।

হাসে ইহার কথা পাওয়া যায়। ইহা উপগ্রাস ও নবচাগ হইতেও বিশ্বয়জনক। চুণার দুর্গ হইতে প্রায় অর্ধকোশ দূরবর্তী গিরিগাজে অবস্থিত কোন মসজিদের দেওয়ানে অদ্বার-সাহায্যে ইহার বৃত্তান্তটী নাকি লিখিত ছিল। আনেকজাতার ক্যাপ্টেন নামক জনৈক ব্যক্তিই নাকি তাহা লিখিয়াছিলেন। সেই অদ্বার-লিখিত বৃত্তান্তের মর্মার্থ এইরূপ;—“লেফ্টেন্যান্ট জন উডের পক্ষী প্রীমতী জ্যাম্ উড্ এই স্থানে বন্দি হইলেন। সার রবার্ট দোয়ার (সিরাজুদৌলা) সেমানায়ক আফর বেগ ইহাকে কলিকাতার অক্ষকূপ হইতে বন্দি করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন। উক্ত আফর বেগ চুণার গড়ে বহুদিন কৌশলদ্বারের কার্য করিয়া উচ্চপদে উন্নীত হইয়াছিলেন। আমি আনেক-জাতার ক্যাপ্টেন ঐ হতভাগিনী রমণীর সহিত বন্দী হইয়াছিলাম। যে ব্যক্তি আমাদের উভয়কে বন্দী করিয়াছিল, সে আমাদের খোঁজা করিয়া দেয়। যে সময় আমি বন্দী হইয়াছিলাম, তখন আমার বয়সক্রম একাদশ বৎসর মাত্র। ঐ বন্দিবীর পরিচর্যা করাই আমার কার্য ছিল। চার বৎসর কাল আমি ঐ কার্য করিয়াছিলাম। ১৭৬২ খৃঃ অব্দের ৩রা মে তারিখে উক্ত আফর বেগ ঐ বন্দিবীরকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, যদি তিনি আফর বেগের সহিত একত্র বাস করিতে সম্মত না হইলেন, তাহা হইলে তিনি আমাকর্তৃকই শাস্ত হইয়া হত হইবেন। ৩রা তারিখে নিম্নে এই গবাক্ষ হইতে আমরা দুইজনে লাফাইয়া পড়ি, তথা হইতে গঙ্গাতীরে যাই এবং চুঁচুড়ায় যাইবার অল্প পথাপটি পূর্বমুখা দিয়া একখানি নৌকা ভাড়া করি। ১১ই তারিখে আমরা নিরাপদে চুঁচুড়ায় আসিয়া উপনীত হইয়াছিলাম। ঐ স্থানে আমরা প্রথমেই শুনিলাম যে, লেফটেন্যান্ট উড্ হৃৎপ্রাণে প্রাণত্যাগ

করিয়াছেন। অ্যান উড সেই সংবাদপ্রবণে পীড়িতা হইয়া পড়েন এবং ঐ মাসের ২৭শে তারিখে মৃত্যুমুখে পতিতা হইলেন। মিঃ উড অত্যন্ত অবিমূঢ়াকারিতার কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহাকে গুলি করিয়া হত্যা করা উচিত ছিল। আলেকজান্ডার ক্যাম্বেল, আমি এখন সৌভাগ্য চাকরী করি।" বাক্স্ বলেন, অ্যান্ উড্ যে একোঠে বসিয়া ছিলেন, উহা দৈর্ঘ্যে ৯ ফিট ৬ ইঞ্চি, প্রস্থে ৮ ফিট ৯ ইঞ্চি এবং উচ্চতায় ৭ ফিট ৯ ইঞ্চি। গবাক্ষটি ১৮ ইঞ্চি মাত্র।

এই বিবরণটি সত্য কি না, তাহা জামিবার কোনও উপায় নাই। অথচ কোনও ঘটনা বা উক্তি দ্বারা উহা সমর্থিত হয় নাই। তবে এইটুকু মাত্র জানা গিয়াছে যে, উড্ নামক অমৈক ব্যক্তি কলিকাতা মিলিটারিয়ার ক্যাম্পে ছিলেন। ফলতঃ যে সমস্ত খেতাব আশ্রয় লইয়াছিলেন, তিনি তাহাসিগকে গ্রহণাশ্রিত পঞ্চাশি যোগান দিতেন এবং কলিকাতা অব-রোধের পূর্বে গোটি উইলিয়মসে আবশ্যক জিনিসপত্র সরবরাহ করিতেন। অস্বাভাবিক-লিপিত বিবরণে পলায়নের পরবর্ত্তী ঘটনা, চুড়ায় উপস্থিতি ও অ্যান উডের মৃত্যু পর্য্যন্ত লিপিত আছে। পলায়নকালে এ কথা লেখা সম্ভব নহে। পরে কিরূপ অবস্থায়, কখন উহা লিপিত হয়, তাহাও জানা যায় নাই। ঐ সময়ে আলেকজান্ডার ক্যাম্বেল নামক কোন খেতাব ধোজা সিরাজুদ্দৌলার কার্য্যে নিযুক্ত ছিল এবং সে ঐ ঘটনার পর পুনরায় চুণার দুর্গে ফিরিয়া গিয়াছিল, এরূপ কোনও প্রমাণই পাওয়া যায় নাই। কেবল একোঠের প্রাচীর-গাজে লিখন দেখিয়া এই ঘটনা সত্য বলিয়া অনুমান করা যায় না।

দুর্ভাগ্যক্রমে অক্ষকুপ-সম্পর্কিত সমস্ত ঘটনাতেই সংশয় করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। অথচ নামা হাদিসে নামা ঘটনার সহিত ইহার সংশ্লিষ্ট নহিয়াছে। ইহার প্রকৃত তথ্য নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন।

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ।

বারাণসী ।

বৈশাখ মাসের 'আর্য্যাবর্ত্ত' আগমনা বলিয়াছিল। মিষ্টার 'রামজি ম্যাকডোনাল্ড' ভারত-ভ্রমণের পর 'ডেলি ক্রনিকেল' পত্রের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতেছেন। নিম্নে তাঁহার বারাণসী সম্বন্ধীয় প্রবন্ধের সার সঙ্কলিত হইল।

পূর্বদিক-চক্রবালে হস্তিজাত লোহিতরেখা খুটিয়া উঠিতেছে। শিরোগরে শশধর—যেন মীলমকমলের উপর দীপ্ত রত্ন। পশ্চাতে—পশ্চিমে ভারতীয় দীপ্তি। এতদ ও সূর্য্যো-

নয়ের অর্ধধন্টা লিখন আছে। আমি পক্ষাভিমুখে যাইতেছি।

প্রত্যয়ে।

বারাণসীর দুর্গক সঙ্কীর্ণ পথে লোকচলাচল আরম্ভ হইয়াছে।

কোথাও একজন রোগী দ্বারপথ সার্জন করিতেছেন, কোথাও কোম পুণ্ড জাগিতেছে, কোথাও কেহ অগ্নি জালিতেছে। ক্রমে আলোক রক্তাভ হইতেছে; ভূমি হইতে

কুলত্রাটিকা উঠিতেছে। সহসা পথশেষে গঙ্গাজীৱে উপনীত হইলাম। পশ্চিম দিক্ হইতে গঙ্গা বক্রগতিতে আগিয়াছে; কুলে সোপান, মন্দির, হর্ম্য—সর্বোপরি গগনপটে আনন্দ-ধেবের সম্মিলনের চূড়া। এই—বারাগমী।

তীরে জনতাশুল্লভ ও যাত্রীদিগের গমনাগমন। যেন তাহার মুক্তির সন্ধান পাইয়াছে। এদিকে চর্যোদয় হইল। সহস্র কণ্ঠে উপাসনার উদাত্ত ধ্বনি উদ্ভিত হইল। সহস্র সহস্র লোক গঙ্গাজলে স্নান করিতে লাগিল—ময়োচ্চারণ করিতে পুণ্য।

লাগিল। স্নানার্থীদিগের পিএল বারিপাত রবিকরে আলিতে লাগিল।—বর্ণের কি বৈচিত্র্য! এই জনসংজ্ঞাভূত শুভ্রন যেন কালবাহিত হইয়া আসিতেছে। মন্দিরের খণ্টাধ্বনি, নদীকূলে বংশীরব—সকল শব্দ মিশিয়া যাইতেছে।

নানা ঘাট, নানা মন্দির, নানা সাধুর আশ্রম অতিক্রম করিয়া আমরা শ্রাণানে উপনীত হইলাম। সমস্ত দিন লোকে বজ্রাচ্ছাদিত শব্দ বহিয়া আনিতেছে, চিতা সাজাইতেছে।

তাহার পর চিতাধূম গগনে উঠিতেছে—শব ভস্মীভূত হইতেছে। শ্রাণানে।

হিন্দুরা বলে—কাল পূর্ণ হইলে মৃত্যু অনিবার্য। তবে যাহার চিতা-ভস্ম গঙ্গাজলে পতিত হয়, সে মুক্ত হয়। বর্ণের কি বৈচিত্র্য! মানবের ও তাহার কি বাহুল্য! উচ্চের ও নীচের এবং জীবনের ও মৃত্যুর কি বিশ্বাকর মিলন।

সূর্য্য বহুক্ষণ সমুদিত। দেবমন্দিরে খণ্টাধ্বনি শুনা যাইতেছে; শত কণ্ঠের মন্ত্রপাঠ-শব্দে পবন পূর্ণ। আমরা নদী হইতে পুত নগরে গমন করিলাম। যুরোপের পক্ষে রোম যাহা, ভারতের পক্ষে বারাগমী তাহাই। ইহার সর্গীয় পথের নগরে।

বিচিত্র জীবনের বর্ণনা করা অসম্ভব। বারাগমীর বক্ষে যে ভক্তি—যে ছলনা, যে পুণ্য—যে পাপ মিত্যক্রীড়া করে, তাহা কে বুঝিতে পারে? মন্দির পূজার্থীতে পূর্ণ; তাহাদের গন্ত্যাতের বিগ্রাম নাই। বিশ্বস্তা মন্দির-মধ্যে প্রবেশের অধিকারী নহে। তাহার দ্বারে দাঁড়াইয়া দেখে, মন্দির-গর্ভে মলিনবর্ণ মননারী পুষ্পবারিদামে বিকটাকার প্রতিমার পূজায় রত। চারিদিকে বানরবৃন্দের চীৎকার। মন্দিরপ্রাঙ্গণে বহু গাভী গুরিয়া বেড়াইতেছে। সর্বজ সন্ন্যাসীর বাহুল্য। রাজপথে সর্বজ ধূণ্য রোগে কাতর বিকলাঙ্গ ভিক্ষকের দল। তাহাদের চীৎকার—কাতরোক্তি, অর্ধপ্রার্থনা যেন নরকের আভাস দেয়। বিগ্রাম নাই—বিগ্রাম নাই। জনশ্রোতের শব্দ নাই।—কলরবের শান্তি নাই। জনবাহুল্য—কুসুমসৌরভে—পশুর মলমূত্রাদির দুর্গন্ধে বাতাস তপ্ত—ভারাক্রান্ত। লোকে গলায় যে মালা পরাইয়া দেয়, তাহা লৌহশৃঙ্খলের মত গুরুভার—তাহার গন্ধে চক্ষুতে জল আইসে। সে অবস্থায় অধিক সময় থাকা অসম্ভব। প্রাঙ্গণে বাতাস অপেক্ষাকৃত স্নিগ্ধ। তথায় দাঁড়াইয়া বারাগমীর বিচিত্র জীবন লক্ষ্য করা যায়। একপার্শ্বে একটি লৌহ-পিঞ্জরে একজন সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন। কয়েক জন বৃদ্ধা তাঁহার উপদেশ লইতেছে। তাঁহাদের বিশুদ্ধ বক্ষ, কোটরগত ময়ম,—বিশীর্ণ দেহ দেখিয়া সহজেই অস্বস্তি হয়, তাহার জীবনে সুখের স্থান পায় নাই; পরন্তু দুঃখের সাবানলে দগ্ধ হইয়াছে। নিকটে জ্ঞানবাণী।

তাহার বৃত্তির চারিদিকে জনতা । নগরায়—উন্মাদাচিতকায় সমাগীনা ঘুরিয়া বেড়াই-
তেছেন । এই স্থানে দাঁড়াইলে বারানসীর অন্তরের আভাস পাওয়া যায় । এই স্থানে লোক
বিচার-বিবেচনার অতীত শাস্তির সন্ধানে ব্যস্ত । ইহারা ধর্মচিন্তার বিষয় নীল আকাশে
উজ্জীম হয়—ধর্ম-অন্তর্ধানের কর্ণধ্বনি শুণ্য ।

ভারতবর্ষ উদার । মানুষের দুর্বলতা-জনিত ক্রটি মার্জনা করা ভারতবর্ষের অভাবমিহ্ন
গুণ । ভারতবাসীদিগের দেবতারা যেন তাহাদিগের পরিবারভূক্ত—একান্ত প্রিয় । যখন
পূজার পর প্রতিমা বিগর্জন হয়, তখন নাকি পুরাঙ্গনাগণের হৃদয়
উদারতা ।

শূন্য হয়—যেন তাহারা সন্তানবিয়োগশোকে কাতরা । হিন্দুর এই
স্নেহপ্রেমভক্তিপূত দেবপ্রীতি অগ্রধর্মাবলম্বীর পক্ষে সম্যক বুঝিতে পারা সহজ নহে,
হইতে পারে না ; কারণ, ধর্ম হিন্দুর সমাজের—পরিবারের—জীবনের অঙ্গীভূত । ধর্মকে
এমন করিয়া আর কে আপনায় করিয়াছে ?

দর্শন ।

আত্মা ।

পাশ্চাত্য সভ্যতার অভ্যুদয়ের বহু পূর্বে হিন্দুধর্ম মানবাত্মা সম্বন্ধে যে নিগূঢ় তত্ত্ব জগৎ
সমক্ষে প্রচার করিয়াছিল, বেদান্তে যাহার দার্শনিক বিশ্লেষণ ও সমালোচন ভারতীয় প্রাচীন
সনাতন ধর্মকে জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, তাহাই অংশবিশেষের দ্বারা প্রতিধ্বনি বহু শত
বৎসর পরে (ষষ্ঠপূর্ব যষ্ঠ শতাব্দীতে) গ্রীসে পিথাগোরাস (ও তৎপরে প্লেটো) প্রবর্তিত
আত্মার জন্মান্তরবাদে প্রাত হইয়াছিল । তৎপরে খ্রিষ্টের নবধর্মব্যাখ্যায় যুরোপের সমস্ত পুরাতন
ধর্মপ্রথা একে একে ভাসিয়া গেল । তখন পিথাগোরাস-প্রমুখ দার্শনিকগণের আত্মাসম্ব-
ন্ধীয় মত পরবর্ত্তিগণের নিকট কুমসংস্কারাচ্ছন্ন যুগের জগৎপূর্ণ বিশ্বাস বলিয়া পরিগণিত হইল ।
কিন্তু এই নবীন ধর্মের প্রভাব যতই বিস্তৃত হইতে লাগিল, ততই যেন ইহা জ্ঞানসম্পর্কশূন্য
হইয়া পড়িতে লাগিল । এক কালে এই অজ্ঞানরাশিমুগ্ধ নানা কু-প্রথা পাশ্চাত্য জাতিগমূহকে
বিবেকহীন পশুপং করিয়া তুলিয়াছিল । ফলে—পুথানুকৃত ধর্মসংস্কার । এই মহাত্মাই
মর্ক্সপ্রথমে ধর্মনামে অভিহিত অন্ধ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া ধর্মের ও
জ্ঞানের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ স্থাপন জাতিগমূহকে বুঝাইয়া দিলেন । কিন্তু ইহার অন্যবহিত
পরেই বেকনের ছায়ামনীষীও এই মত প্রচার করেন যে, ধর্মের প্রতিপাদ্য ঈশ্বর ও তৎ-
সংক্রান্ততত্ত্বসমূহ ক্ষুদ্র মানববুদ্ধির অগোচর ; অতএব ধর্মের সহিত জ্ঞান সম্পর্কিত হইবার
কোন কারণ নাই । সুতরাং শাস্তোক্ত কোন বিষয় নিতান্ত যুক্তিবিরাগ ও বিশ্বাসের
অযোগ্য হইলেও তাহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিয়া নির্বিচারে গ্রহণ করিতে হইবে । কিন্তু
বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে যুরোপ এইরূপ সিদ্ধান্তে গুপ্ত হইয়া থাকিতে পারিতেছে না ।
আর হিন্দুধর্মের সহিত সংঘাত এই চঞ্চলতা আরও বৃদ্ধি করিয়াছে । এখন চারিদিকে

বাইবেলের নানারূপ ব্যাখ্যা আরম্ভ হইয়াছে। কাউন্ট টম্বে ও (Old Testament) নামক উহার অষ্টাদশ খৃষ্টীয় ধর্মশাস্ত্রের অর্থ হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিতে প্রয়াসী। ডাক্তার কার্পেন্টার রূপকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বহু সমস্তার হাত এড়াইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

সম্প্রতি 'ইষ্ট এন্ড ওয়েস্ট' নামক পণ্ডিত ম্যাদাম জীন ডিলেয়ার নামী জর্মনক ইংরাজ মহিলা লিখিত 'মানবজাতি সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পশ্চাচ্চ্য মত' শীর্ষক এক অতি উপাদেয় ও চিত্তাকর্ষক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিদ্বান মহিলা হিন্দুধর্মের তত্ত্ব-উদ্ভাটনে কল্পণ সমর্থ হইয়াছেন, তাহা দেখিলে নিশ্চিত হইতে হয়।

জৈনিক বসেন,—খৃষ্টধর্ম ও হিন্দুধর্ম পরস্পর তুলনা করিলে প্রথমটিকে প্রমাণক ও দ্বিতীয়টিকে জ্ঞানাত্মক বলিলে বিশেষ অসঙ্গত হয় না। কিন্তু এই পর্য্যন্ত নিরস্ত না হইয়া আর একটু গভীর ভাবে আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইয়া যায় যে, খৃষ্টধর্ম ছই সমস্ত বৎসর ধরিয়া কেবল নৈতিকতা জইয়াই

নাড়াচাড়া করিয়াছে, জ্ঞানের দিকে উন্নত হইতে পারে নাই। কিন্তু জ্ঞানই হিন্দুধর্মের প্রধান ভিত্তি হইলেও হিন্দুধর্ম নীতিকেও সঙ্গুচিত না করিয়া বরং পূর্ণ প্রমাণ দিয়াছে। খৃষ্টধর্ম আত্মা সম্বন্ধে সন্তোষজনক কোন ব্যাখ্যাই করিতে পারে নাই। আত্মা অমর,—খৃষ্টধর্মালম্বীরা এ কথা স্বীকৃত; কিন্তু যখনই ইহার স্বরূপ কিম্বা প্রকৃতি সম্বন্ধে কোনরূপ প্রশ্ন উঠিয়াছে, তখনই হয় তাহা শূন্য বাগ্‌যুদ্ধে অথবা অন্ধ ধর্মীশাসনমাজে (dogmas) পর্য্যবসিত হইয়াছে। যে কেহ এই অশাসন ব্যতীত কোনরূপ স্বাধীন মত পোষণ কিম্বা প্রচার করিতে সাহসী হইত, তাহার যে কি দশা হইত, তাহা মধ্যযুগের রক্তাক্ত-ইতিহাস-পাঠকমাজেই অবগত আছেন। এই ত গেল, অপেক্ষাকৃত অতীত কালের কথা। কিন্তু

এই বিজ্ঞানের যুগেও যুরোপীয় মনীষিগণ লিখিত যে সকল গভীর-আত্মা। গবেষণাপূর্ণ আত্মতত্ত্বালোচনা প্রকাশিত হইতেছে—তাহাতেও আত্মা সম্বন্ধে এই জটিল সমস্তার কোন সমাধান দৃষ্ট হইতেছে না। তাহাদের ধারণা এই যে, আত্মা অমৈমর্গিক একটা কিছু; তাহার সমস্ত ভাগতিক অংশ কোন ব্যাপার বা নিয়মের সহিত কোনরূপে সংশ্লিষ্ট নহে; ইহা একটা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন চেতন্যুনি (isolated unit of consciousness)। মানব ব্যতীত অথ কোন প্রাণীর যে আত্মা থাকিতে পারে তাহা কখনও তাহাদের ধারণায় আইসে না। আর এই মানবাত্মার উৎপত্তি দেশকাল-সাপেক্ষ। প্রত্যেক মানবের জন্মকালে তাহার আত্মা সৃষ্ট হইতেছে,—ইহাই খৃষ্টীয় ধর্ম-মত; অতএব ইহা অনাদি নহে। কিন্তু বিশ্বের বিষয় এই যে, যদিও আত্মা এইরূপ আদিবিনিষ্ট, তথাপি খৃষ্টীয় শাস্ত্রালম্বীরা ইহা একেবারে মহা অমরতা লাভ করে, এবং অনন্তকাল কোন এক অনির্দিষ্ট স্বর্গ ভোগ করিতে থাকে। আত্মার এইরূপ অতিপ্রাকৃত পরিণাম কখনও যুক্তিতর্কের কাছে দাঁড়াইতে পারে না। কারণ, যাহার আদি আছে, তাহার অন্ত থাকিবেই; * যাহা অনাদি, তাহাই কেবল অমর ও অনন্তকালস্থায়ী হইতে পারে।

* গীতার কথায়—জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ।

ইহার উপর খৃষ্টধর্মের অঙ্গীভূত অভ্যুত্থানবাদ (Resurrection) এবং শেষ বিচার (Last Judgment) এই আশ্মাণটিত সমস্তকে আরও জটিল ও রহস্যময় করিয়া তুলিয়াছে। কারণ, মৃত্যুর পরেই আশ্মার অবস্থিতি কোথায়? সেই শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত কোম অনির্দিষ্ট প্রেক্ষণিকায় তাহাকে থাকিতে হয়, না তখনই স্বর্গে কিবা নরকে তাহার অবস্থান স্থিরীকৃত হয়? এই প্রশ্নেরও সহজতর খৃষ্টধর্মের পাওয়া যায় না। এক কথায় লেখিকা বলেন যে, খৃষ্টধর্মাসূসারে আশ্মাত্বের সমাধানের সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে। তাহার একমাত্র কারণ এই যে, মানুষই কেবলমাত্র আশ্মাবিশিষ্ট জীব এই ধর্মগামূলক আরও কতকগুলি অতিপ্রাকৃত ও যুক্তিবিরুদ্ধ ধারণা আশ্মার প্রকৃত ভূমির্গয় একরূপ অসম্ভব করিয়া ফেলিয়াছে।

অতঃপর লেখিকা হিন্দুধর্ম এই সমস্তের বিরূপ মীমাংসা করিয়াছে। তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া বলিয়াছেন যে, 'হিন্দুর আশ্মা খৃষ্টানের জ্ঞান আদিবিশিষ্ট রহস্যময় বস্তু নহে,

এবং মানবজন্মের সঙ্গে সত্যজ্ঞানভাবে সৃষ্ট হইয়া মৃত্যুর পরেই ঐশ্বরাসূ-
সমস্তা সমাধান। * এহে অমরতালভরূপ অলৌকিকতা হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত। ভারত-

বাসীর নিকট প্রাপ্তি আশ্মা—মানবজীবন ঐ আশ্মার স্মরণমাত্র। সমগ্র আশ্মিজগতে এক বিরাট ঐশী শক্তি নিবিড়ভাবে অস্পষ্টভাবে রহিয়াছে। এই দৈবী সজীবতা, যাহা লোক চক্ষুর অস্ত্রাঙ্গে ওপুড়াবে সমগ্র প্রকৃতিতে ব্যাপ্ত রহিয়াছে, তাহাই মানবে আশ্মাক্রমে ব্যক্ত হইয়া উঠে, এবং তখনই তাহার কথিক স্বাতন্ত্র্য পরিষ্কৃত হয়। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত এই পরিজ্ঞেয় শক্তিই ঐশ্বর—ব্রহ্ম; এবং তাহারই অংশমাত্র মানব-জীবনে আশ্মাক্রমে প্রকট হয়। অতএব ঐশ্বরই আশ্মা, এবং এই আশ্মা তাহারই জ্ঞান অঙ্গানি অনন্ত।*

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আশ্মা-ত্বের অন্তর্নিহিত এই সত্য উপলক্ষি করিতে পারেন নাই। অতি প্রাচীন কালে ভারতীয় আর্যকবিগণ গভীরজ্ঞানবলে মানবকে দেহ পুঞ্জ পুঞ্জ শরীরাদিতে নিহিত করিয়াছেন, তাহা বিশেষ ভাবে আলোচনা করা এইরূপ পুঞ্জ প্রবন্ধে অসম্ভব এবং এখানে নিষ্প্রয়োজন। এই স্থলে একটি কথা বলা যাইতে পারে, সর্বত্রই মানুষ দেহ ও আশ্মার নিরবচ্ছিন্ন সমষ্টিক্রমে কলিত হইয়াছে; কিন্তু প্রতীচ্যে মানুষ আশ্মাবিশিষ্ট দেহ, আর প্রাচ্যে মানুষ দেহবিশিষ্ট আশ্মা। এই মূলগত বিভিন্নতাই হিন্দুকে অগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা আধ্যাত্মিক করিয়াছে। হিন্দুর নিকট আশ্মাই সত্য,— মানুষ আধ্যাত্মিক জীব।

এই নিয়ত-পরিবর্তনশীল বৈচিত্র্যময় অগতের অন্তরালে যে এক শাস্ত্র সত্য মিত্য বিরাজ করিতেছে, তাহা মানুষ জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সত্যই অস্পষ্টভাবে উপলক্ষি করিয়াছে, এবং সর্বকারণভূত সেই সনাতন সত্য কি, তাহা অজ্ঞতমমানুষের সূদূর অতীত হইতে

* "প্রাণো হি ভগবানীশঃ প্রাণো বিষ্ণুঃ পিতামহঃ।

প্রাণেন ধার্যতে লোকঃ সর্বত্র প্রাণময়ঃ জগৎ।"

আজ পর্য্যন্ত মানবজাতির চিন্তা ও অহুস্কানের বিষয়ীভূত হইয়াছে। উপনিষদে ইহাকেই অয়তু, অপ্রকাশ, নিরাকার, পরব্রহ্ম বলা হইয়াছে। ইহাই বৈজ্ঞানিকদিগের 'আদি কারণ' (First Cause), এবং প্রবর্তাবাদিগণের (Positivist) 'চরম পদার্থ' (Ultimate Reality)। ইহাই আবার সাকার রূপে ত্রিহোবা, ত্রীকৃষ্ণ ও যীশুখ্রীষ্ট রূপে প্রতিভাত হইয়া জগতে আপন মহিমা প্রচার করিয়াছে।

মানবদেহও ঐকপ মিত্য নানা পরিবর্তনের অধীন। আমরা বিবেকামনস সত্যই বলিয়াছেন, "শরীর পরিবর্তন-পরম্পরার নামান্তর মাত্র।" কিন্তু এই সকল পরিবর্তনের মূলে যে অবি-
নশ্বর অপরিবর্তনীয় সত্য নিয়ত বর্তমান আছে, তাহাই প্রকৃত মানব—Ego—Self.

এই দুই সত্যের মধ্যে সম্বন্ধ কি? মানবাত্মা সর্বব্যাপী, মিত্য, নিরবচ্ছিন্ন কোন ব্রহ্মের সত্যের—ব্রহ্মের—অন্তর্ভুক্ত। অতএব আত্মাই ব্রহ্ম; ইহাই হিন্দু ধর্মের আত্মা শব্দকে মীমাংসা।

বিরহে।

১

সে যে গো নিবিড় প্রেমে বেঁধেছিল চির মোরে

ছুটি বাহু দিয়া।

পুণ্যপুত হৃদিখানি অর্থের ডালায়' তুলি'

সঁপেছিল প্রিয়া।

কর্ম্মমাবে আপনারে রেখেছিল চিরদিন

করিয়া গোপন ;

আজি সে গিয়াছে চলি'—কোন পরিচয়-হীন

অধার ডবন।

২

ছিল যবে গৃহ মাঝে, করে নাই আপনার

অথ অন্বেষণ ;

রিক্ত করে গেছে চলি' ; ভাবিতেছি কোথা তা'র

পা'র দরশন ?

আপনার যাহা ছিল, লয় নি কিছুই সাথে,

সব গেছে দিমে ;

আমি ত পারি নি কিছু তুলে দিতে তা'র হাতে,

যায় নি সে নিমে।

৩

আজি বার্থ প্রেমরাশি উঠিছে ব্যাকুলি তাই—

হৃদয়ের তটে ;

এ প্রাণের শক্ত সাধ উৎকলিত যা'রে চাহি'—

সে নাই নিকটে ।

আছে পড়ি শূন্য গেহ, শুনিতে না পাই আর

সম্ভাষণ-বাণী ;

মুকুরে দেখেছি বুধা, যদি সেথা থাকে তা'র

প্রতিবিম্বখানি ।

৪

স্তব্ধ অর্ধ রজনীতে শুনি, পদধ্বনি কা'র—

সে বুঝি সমীর ?

চমকিয়া সম্ভাষিতে ভুল ভেদে যায়, আর

ঝরে আঁখি-নীর ।

পত্র-মরমর শুনি' ভাবি বুঝি তা'রি কথা,

কিন্তু সে কোথায় ?

শয্যা'পরে জ্যোৎস্না আসে, ভাবি' তার তরুলতা

বুধা বাহু ধায় ।

৫

অথবা সে অল্পদিন আছে মোর কাছে কাছে,

পেয়েছি সন্ধান ।

সে মুখ মুকুরে নাই, আশারি অন্তরে আছে

ভরি' মনপ্রাণ ।

আর শোণিতের সনে আছে সেই প্রেম মোর,

ভুলিব কেমনে ?

বিরহ-জীবন-নিশি তা'রি ধ্যানে হ'বে ভোর,

তাহারি স্মরণে ।

শ্রীগিরিজানাত মুখোপাধ্যায় ।

প্রজ্ঞাপারমিতা কি ?

‘আর্য্যাবর্ত্তের’ পাঠকগণ বিদিত আছেন যে, আষাঢ় মাসের ‘আর্য্যাবর্ত্ত,’ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন ‘প্রজ্ঞাপারমিতা’-শীর্ষক একটি সচিত্র প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ঐহারা এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই দীনেশ বাবুর এই মুর্ছিতপ্রাণিতার প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছেন; যে হেতু, এ তথ্যের আলোচনায় আমাদের দেশের অনেকেই কিছু শিথিলপ্রাণ, সুতরাং অনেকেই নিকট উহার উপস্থিতিমাত্রই প্রশংসাই। বিশেষ, লেখক বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত, তৎকর্তৃক সিদ্ধান্তিত প্রবন্ধ-বস্তু যে অনেকেই নিকট অজান্ত বসিয়া বিবেচিত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ কি ?

আমি ঐ প্রবন্ধ দেখিয়া মনে করি, ভালই হইল—‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের’ যশস্বী লেখক যে, প্রকৃতপ্রাণসন্ধানকার্য্যে ব্রতী হইলেন, ইহা আমাদের দেশের পক্ষে বড় মঙ্গল-সমাচার। সাগ্রহে ছবি মিলাইয়া প্রবন্ধ পড়িলাম। মনে একটু সন্দেহ হইল, প্রজ্ঞাপারমিতার যতগুলি ধ্যান জানা ছিল, সকলগুলির সহিতই একে একে ছবিখানি মিলাইলাম; মিলিল না। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া শেষে ইহাই কর্তব্য বলিয়া স্থির করিলাম যে, আমার অবগত প্রজ্ঞাপারমিতার ধ্যানগুলি পাঠকবর্গের গোচর করি, তাঁহারাও সেই ধ্যানগুলির সহিত দীনেশ বাবুর সিদ্ধান্তিত প্রজ্ঞাপারমিতার ছবিখানি মিলাইয়া দেখুন, ও উহা প্রজ্ঞাপারমিতার চিত্র কি না স্থির করুন। ধ্যানগুলি এই :—

(১)

.....প্রজ্ঞাপারমিতাঃ পীতাঃ অক্ষোভ্যাস্তঃ হৃৎকটীমুহুটীনাং ব্যাখ্যাসমুজ্জাদরাং পুস্তক-সহিতনীলোৎপলস্ত বামপার্শ্বে ধারিণীঃ.....

(২)

প্রজ্ঞাপারমিতাঃ অটীমুহুটীনাং চতুর্ভুজাঃ একমুখীঃ হস্তদ্বয়েন ধর্ম্মমুজ্জাদরাং.....বাম-ভুজাসক্তপ্রজ্ঞাপারমিতাখিতনীলোৎপলধরাং.....দক্ষিণহস্তেনাভয়প্রদাং.....

(৩)

.....অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি প্রজ্ঞাপারমিতোদয়ং যত্নাৎ ভাবিতমাজায়ং নিগ্রহঃ সর্ব্ব-বাসিমাং ॥ দ্বিভুজামেকবদনাং.....পদ্মাং দক্ষিণহস্তে তু রক্তবর্ণাং বিভাবয়েৎ। প্রজ্ঞাপারমিতাং বামে চক্রবজপার্ব্বাকসংস্থিতাং.....

(৪)

.....ভগবতী প্রজ্ঞাপারমিতা পীতবর্ণা দ্বিভুজেকমুখী পদ্মতথাগতমুহুটী ব্যাখ্যাসমুজ্জাদ-বতী.....বামদক্ষিণপার্শ্বে উৎপলস্তপ্রজ্ঞাপারমিতাপুস্তকধারিণীঃ.....

(৫)

.....ভগবতীং বিভুজাং একমুখাং শুক্লাং.....রত্নমুকুটধারিণীং প্রজ্ঞাপারমিতা
পুস্তকাধিতকমলদয়ং বামদক্ষিণপার্শ্বয়োঃস্বরহিতং সজ্জায়া কন্নাত্যাং ব্যাখ্যানমুজামাবধ্য
মিতপদ্মচন্দ্রে বজ্রপর্য্যাক্ষিণীং নবযৌবনোদ্ধতাং বিচিত্রবস্ত্রালঙ্কারভূষিতাং.....

(৬)

.....শুদ্ধকটিকথটিতাং ভগবতীং একানমাং...বিভুজাং.....সনালরক্তকমলাঙ্কুতদক্ষিণ-
পাণিপল্লবাং তদন্থকরেণ হৃৎ হৃদয়বিনিহিতপুস্তকাং... , প্রজ্ঞাপারমিতাং.....

(৭)

.....ভগবতীং প্রজ্ঞাপারমিতাং বিভুজাং.....ব্যাখ্যানমুজায়া সমুপেতকরাং
সপুস্তকনীলোৎপলং বিজাণাং বামপার্শ্বতঃ ..

(৮)

.....প্রজ্ঞাপারমিতাং পীতবর্ণাং...বিভুজামেকমুখীং ব্যাখ্যানমুজাবতীং.....রত্ন-
মুকুটিনীং বামপার্শ্বস্থিতপদ্মমধ্যে প্রজ্ঞাপারমিতাপুস্তকধারিণীং ভাবয়েৎ.....

সংক্ষিপ্ত অনুবাদ ৪—

১। মস্তকে অঙ্কোভা, হস্তদ্বয় ব্যাখ্যানমুজায়ুক্ত, বাম পার্শ্বে নীলোৎপল, তাহার উপরে
একধানি পুস্তক (প্রজ্ঞাপারমিতা-নামক)।

২। চারি হস্ত, এক মুখ, অটোনির্মিত শিরোভূষণ, দুই হস্ত ধর্ম মুজা অর্থাৎ ধর্মচক্র-
মুজায়ুক্ত, অপর হস্তদ্বয়ের বাম হস্তে প্রজ্ঞাপারমিতাংগিত নীল পদ্ম, দক্ষিণ হস্ত—অভয়-
দানকারী।

৩। দুই হস্ত, এক মুখ, দক্ষিণ হস্তে রক্ত পদ্ম, বাম হস্তে প্রজ্ঞাপারমিতা পুস্তক।

৪। দুই হস্ত, এক মুখ, শিরোভূষণে পাঁচটি ভাগত, ব্যাখ্যানমুজাশালিনী, বাম দক্ষিণ
উভয় হস্তের পার্শ্বেই পদ্মের উপর প্রজ্ঞাপারমিতা পুস্তক।

৫। দুই হস্ত, এক মুখ, রত্ননির্মিত শিরোভূষণ, বাম দক্ষিণ পার্শ্বে প্রজ্ঞাপারমিতা-
পুস্তকযুক্ত দুইটি উৎপল, হস্ত ব্যাখ্যানমুজাশালী, নবযুবতী, বিচিত্রবস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিতা।

৬। দুই হস্ত, এক মুখ, দক্ষিণ হস্তে সনাল রক্ত কমল, বাম হস্তে বকোপরি প্রজ্ঞা-
পারমিতা পুস্তক।

৭। দুই হস্ত, ব্যাখ্যান মুজা, বাম পার্শ্বে সপুস্তক নীলোৎপল।

৮। দুই হস্ত, এক মুখ, ব্যাখ্যান মুজা, রত্নের মুকুট, বামপার্শ্বস্থিত পদ্মের মধ্যে
প্রজ্ঞাপারমিতা পুস্তক।

এই অষ্টবিধ ধ্যান আমরা জানা আছে। পাঠকবর্গ দেখিবেন, প্রত্যেক ধ্যানে
প্রজ্ঞাপারমিতা, ‘প্রজ্ঞাপারমিতা’ নামক পুস্তক ধারণ করিয়া আছেন। কোন
স্থানে উক্ত পুস্তক দেবীর হস্তে, কোন স্থানে বা পদ্মের উপরে উহার অবস্থিতির
কথা পাওয়া যায়; কিন্তু উহার অবস্থান বিষয় অষ্টবিধ ধ্যানেই বলা হইয়াছে।

দীনেশ বাবুর নিরূপিত প্রজ্ঞাপারমিতার ছবিখানিতে কিন্তু পাঠকবর্গ উক্ত পুস্তকের চিহ্ন পাইবেন না। এতি য়ানেই পুস্তকের উল্লেখ থাকায়, যদি বলা যায় যে, প্রজ্ঞাপারমিতা মূর্তির উহাই বিশেষত্ব, তাহা হইলে বোধ হয় কথাটা খুব অযৌক্তিক বলিয়া মনে হইবে না; আর সেই বিশেষত্ব নাই বলিয়া দীনেশ বাবুর প্রজ্ঞাপারমিতা “প্রজ্ঞাপারমিতা কি না” এ বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ উপরি উক্ত অষ্টবিধ ধ্যানের একটিরও সহিত ইহার মিল না থাকায় স্বতঃই মনে সন্দেহ হয়, ইহা প্রজ্ঞাপারমিতা কি ? তবে ইহা হওয়া অসম্ভব নহে যে, এই আট প্রকার ব্যতীত প্রজ্ঞাপারমিতার আরও ধ্যান আছে ও তাহার সহিত ইহার মিল আছে ও দীনেশ বাবু তাহারই সাহায্যে ইহা বলিয়াছেন। স্বীকার করি, ইহা হইতে পারে; কিন্তু এমন একটা সাধারণের জ্ঞান-সম্পাদক প্রবন্ধ প্রমাণবিরহিত করিয়া প্রকাশ করা বিজ্ঞানবিরুদ্ধ নহে কি ? যাহারা এই প্রবন্ধ হইতে প্রজ্ঞাপারমিতা চিনিয়া রাখিতে চাহিবেন, তাঁহারা কোন প্রমাণবলে দীনেশ বাবুর অনুসরণ করিবেন ? এ সকল প্রবন্ধ শিক্ষার জন্য; ইহা হইতে যাহা শিখিলাম তাহা যদি এ সব প্রবন্ধে পরিশুট হয়, তবেই এরূপ প্রবন্ধ মনোহর।(১)

বলিতে কি, দীনেশ বাবুর এ প্রবন্ধটি পড়িয়া মনে হয়, তিনি যেন মনে করেন, বিষয় যেরূপই কেন হউক না, তাহাতে কবিশূলভ কল্পনার নবনীত-প্রলেপ দিলেই তাহা সুখাদ্য হইল। কারণ, তিনি বলিয়াছেন, “উর্দ্ধতম ধ্যানী বুদ্ধের নিম্নে সিংহ-মুখ। ইহা দেবীর অভিমুখে নিমিত্ত ফোয়ারা স্বরূপে কল্পিত হইয়া থাকিবে।” কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহার নাম কীর্তিমুখ বা কৃতিমুখ এবং উহা ইংরাজী চতুর্থ শতাব্দীর পর হইতে ভাস্কর-কার্যের একটি প্রিয়তম নক্সা (design) রূপে চলিত। এ সকল বিষয়ক প্রবন্ধ কেবল ললিতমধুর ভাষায় মনোরম হয় না; পরন্তু অনুসন্ধানলব্ধ তথ্যেই গৌরবাধিত হয়।

দীনেশবাবু কৃতবিদ্য ও সূত্রাতিষ্ঠ, তাঁহার কাছে আমরা সবই সম্পূর্ণ আশা করি, এমন প্রমাণবিরহিত অসম্পূর্ণ কিছুই আশা করি না। যদি তাঁহার ছবিখানিকে প্রজ্ঞাপারমিতা বলিবার কোন প্রমাণ তাঁহার কাছে বিদ্যমান থাকে, তাহা তিনি সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ করিয়া অসম্পূর্ণ প্রবন্ধকে সম্পূর্ণ করুন। কথিত মুখ যে সিংহমুখ এবং উহা যে কল্পিত ফোয়ারা তাহারও প্রমাণ দিয়া আমাদের কাছে প্রমাণিত করুন।

(১) খামঙলি ‘সাধনমালা’ নামক বৌদ্ধ তাত্ত্বিক গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত।

মুত্তিতত্ত্ববিষয়ে আপনাব জ্ঞানবিজ্ঞাপন আমার উদ্দেশ্য নহে । আমি জ্ঞানার্থী, গত দশ বৎসর ধরিয়া এই তত্ত্বগন্ধ্যে অল্পবিস্তর আলোচনা করিতেছি । আমার মনে হয়, এ তত্ত্বটি জটিল ; এবং সেইজন্য ইচ্ছা হয়, আমাদের দেশের কৃতবিদ্য সম্ভ্রাদায় ইহাকে একটা নিতান্ত ভুল্ল বিষয় বলিয়া মনে না করিয়া ইহার তত্ত্বানুসন্ধান করেন । দীনেশবাবু যেন মনে না করেন, ইহা তাঁহার আবশ্যক প্রতীতি । ইহা প্রতীতি নহে, পরন্তু জিজ্ঞাসা ও আগ্রহ ।

পরিশেষে বক্তব্য, আমার বুলিতে যাহা আছে, তাহা কাড়িয়া এই মূর্তিটিকে সাধারণতঃ বৌদ্ধ ভারা মূর্তি ব্যতীত আর উপস্থিত কিছু নাম দিতে পারি না । তবে মূর্তির বামে ও দক্ষিণে উপবিষ্ট ক্ষুদ্র মূর্তিযুগ্মই যদি জীমূর্তি হয় (১) (ছবিতে আমি ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না), তাহা হইলে ইহাকে বরদ ভারা বলিয়া মনে করা যাইতে পারে । বরদ ভারার ধ্যান এইরূপ :—

.....বামে নীলোৎপলবতীঃ দক্ষিণে বরদাঃ অর্ধপর্বাঙ্কনিয়াঃ দক্ষিণপার্শ্বে অশোক-
কাস্তা পীতা নানানয়নমূর্তী বামদক্ষিণহস্তয়োঃশোকপল্লবকুলিশধরী.....বামপার্শ্বে একজটী
পর্বা, ক্রমা, ব্যাঘ্রাজিনধরা, জিনেজা, দংষ্ট্রাকরালবদনা, অলংপিঙ্গলোদ্ধকেশা, কর্জীকপাল-
ধারিণী.....

অর্থ—

দেবীর বামহস্তে নীলোৎপল, দক্ষিণ হস্ত বরদান করিতেছে, তিনি পালকে অসম্পূর্ণরূপে উপবিষ্ট, তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে অশোককাস্তা নামী একজন ভারা—যাঁহার বামহস্তে অশোক বৃক্ষের পল্লব, ও দক্ষিণ হস্তে বরদ ; এবং তাঁহার বাম পার্শ্বে একজটী নামী ভারা—যিনি পর্বা, ক্রমা, ব্যাঘ্রচর্মধরা, জিনেজা, দংষ্ট্রাকরালবদনা ; এবং যাঁহার মাথার কেশ উদ্ধোখিত, পিঙ্গলবর্ণ সূতরাং যেম অলিঙেছে । যিনি কর্জী (কাঁচি) ও মদকপাল ধারণ করিয়া আছেন ।

এই ধ্যান অমুসারে আমরা দেখিতে পাই, এই ছবিখানির প্রধান মূর্তির বাম-
হস্তে পল্লব আছে, ও দক্ষিণ হস্ত বরদান করিতেছে, এবং ইনি দক্ষিণ পদ অধোবিস্তৃত
করিয়া পালকে অসম্পূর্ণরূপে বসিয়া আছেন । ইহার দক্ষিণ পার্শ্বের মূর্তিটি
নারীমূর্তি বলিয়া মনে হইতেছে ; এবং তাঁহার বামহস্তে যাহা আছে তাহাকে

(১) অবশ্যে দেখিতে পাই "মূর্তির দক্ষিণে হস্তীক এবং বাম ভাগে ভারা" বলিয়া
উল্লেখ আছে ; সূতরাং লেখকের মতে দক্ষিণে একটি পুংমূর্তি, বামে জীমূর্তি । ছবি
দেখিয়া কিন্তু মনে হয়, মূর্তির দক্ষিণ দিকের মূর্তিটি জীমূর্তি, বামেরটি পুরুষ । বোধ অবশ্যে
ঐ মূর্তিযুগ্মসম্বন্ধে এই গোলমাল থাকায় একবার মূল শিলাখানি দেখিতে ইচ্ছা হয় । লেখক

বৃক্ষপল্লব বলিয়াই যেন মনে হয় ; বামহস্তের বস্তুটি বজ্রই বটে । এইবার কথা হইতেছে, বাম পার্শ্বের মূর্তি গইয়া । ছবিতে ইহাকে পুরুষ বলিয়াই মনে হয় । যদি পার্শ্বদ্বয়স্থ উভয় মূর্তিই জীর্ণাপিনী হয়, তাহা হইলে ইহাকে বরদ তারা বলিবার পথ পরিস্কৃত হয় । পাঠক দেখিবেন, এ মূর্তিটি ধর্মকাম, মস্তকে কেশ উদ্ভোজিত ; হস্তদ্বয়ে যাহা আছে, তাহার মাধ্যম বামহস্তের বস্তুটি কপালই বটে ; তবে দক্ষিণ হস্তের বস্তু কর্তী কি না, ছবি দেখিয়া বলা কঠিন ; তবে যাহুযবে আমরা এই জাতীয় মূর্তির হস্তে ঐরূপ প্রকারে যাহা ধৃত থাকে, তাহাকে সচরাচর কর্তীকপাল বলিয়াই দেখিতে পাই ।

যাহাই হউক, এ আলোচ্য মূর্তিটিতে বরদ তারার অনেক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় এই মাত্র ; কিন্তু ইহাকে স্থিরভাবে সে নাম এখনও দিতে পারিতেছি না । উপস্থিত ইহাকে সাধারণ বুদ্ধ তারা বলাই উচিত ।

শ্রীবিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ ।

প্রতীক্ষা ।

১

এত নহে আর গাধের কানন,

ফুটেনা হেথায় ফুলদল,

‘পল্লবহারী তরু তলে বসি’

কেন ফেল মিছে অঁধিজল ।

——“বসে আছি তা’র পথচেয়ে,

যদি ফিরে আসে—যাবে ছেয়ে

মুকুলে, নূতন পল্লবে, বন

পরশি তাহার পদতল ।

ফুটিবে আবার ফুলদল ।”

২

দিন হ'ল শেষ, প্রাস্ত পথিক,
 সন্ধ্যাভিমির আসে ঘিরে,
 শেষ থেয়া আজ চলে গেছে পারে
 কেন তুমি একা নদীতীরে ।
 —“এসেছি তাহারি পথধরি’
 যদি দিন শেষে থেয়াতরী
 বাহি’ সে আমারে নিয়ে যেতে পারে
 আবার হেথায় আসে ফিরে’ !
 তাই বসে আছি নদীতীরে ।”—

৩

নিশীথ রজনী, স্তম্ভ অগৎ
 লুপ্ত আঁধারে চারিধার ;
 নিভানো প্রদীপ জলে এ সময়ে
 জেগে বসে’ আছি কেন আর !
 —“বুচায়ে নিবিড় যবনিকা,
 যদি হাতে জলে দীপশিখা
 নিভৃত নিশায় আসি দিয়ে যায়
 জালি’ দীপখানি সে আবার ।
 আছি তাই পথ চাহি’ তা’র ।”—
 শ্রীরমণীমোহন ঘোষ ।



পাষাণের কথা ।

(৩)

শিল্পিগণের কার্য শেষ হইল। কতদিনে শেষ হইল তাহা আমি বলিতে পারি না। তোমাদিগের গণনা অনুসারে সে বোধ হয় দীর্ঘকাল। দিন আসিত, দিন যাইত, প্রতিদিন শ্রমজীবীগণ নগর হইতে আসিত, সন্ধ্যাসমাগমে আবার চলিয়া যাইত; তখন রক্ষিগণ আমাদিগের রক্ষণের ভার লইত। এইরূপ ভাবে যে কতদিন গেল তাহা যদি বলিতে পারিতাম, তাহা হইলে একটি রাজ্যের ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা বলিয়া যাইতে পারিতাম। শিল্পিগণের কার্য শেষ হইল। ক্রমে শ্রমজীবীগণের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ক্ষোদিত পাষাণ পর্ণশালা হইতে বাহির হইয়া যথাস্থানে নীত হইল। তোমরা বলিয়া থাক যে, গুরুভার পাষাণ দ্বিসহস্র বৎসর পূর্বে মানবগণ কর্তৃক কিরূপে ইতস্ততঃ চালিত হইত, তাহা বিশ্বাসের বিষয়। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। পর্ণশালাসমূহ হইতে স্তূপ নির্মাণের জন্য নির্দিষ্ট ক্ষেত্র পর্যন্ত পঞ্চহস্ত বিস্তৃত পথ প্রস্তুত হইয়াছিল। সে পথের ইষ্টক এখনও সে প্রান্তরে পড়িয়া আছে। যেকোন শকটে আমরা পর্বতের সাহস্রদেশ হইতে নগরে আসিয়াছিলাম, তক্ষণকার্য শেষ হইলে সেইরূপ শকটে আরোহণ করিয়াই আমরা স্তূপক্ষেত্রে নীত হইয়াছিলাম। শত শত শ্রমজীবীর সমবেত চেষ্টায় আমরা যথাস্থানে ন্যস্ত হইয়াছিলাম। ইহাতে বিশ্বাসের কিছুই নাই। সে কথা সকলের জ্ঞান হইবে না। নির্মাণকার্য শেষ হইলে, প্রতিপদ প্রস্তর যথাস্থানে ন্যস্ত হইলে আমরা কিরূপ আকার ধারণ করিয়াছিলাম, তাহাই বলিয়া যাই। স্থপতিগণ যখন সৌধ নির্মাণ করে, তখন তাহাদিগের কার্যে নমনশ্রীতিকর কিছুই থাকে না, কিন্তু সমগ্র সৌধ নির্মিত হইলে, তাহা সত্য সত্যই আনন্দবর্জক হইয়া থাকে।

ক্ষেত্রমধ্যে অর্ধগোলকাকার স্তূপ নির্মিত হইল; সমান্তরালে, সমভাবে, সমান আকারের প্রস্তরখণ্ড যোজনা করিয়া শতহস্ত উচ্চ স্তূপ নির্মিত হইল। শেষে তাহার কয়েকখণ্ড প্রস্তরমাত্র পড়িয়া ছিল; আর অশ্রুশি নিকটবর্তী গ্রামবাসিগণ সহস্র বর্ষকাল ব্যাপিয়া আপনাদের প্রয়োজনে লইয়া গিয়াছিল; এতদিনে হয়ত সে কয়খানিও অস্তিত্ব হইয়াছে। এখন সেই রক্তবর্ণ, মসৃণ, প্রস্তরে নির্মিত অর্ধগোলকাকার বিশাল স্তূপের পরিবর্তে কি দেখিয়া আসিয়াছ? শ্রমজীবী-

গণের পদধূলি সঞ্চিত করিলে সেরূপ মৃৎপিণ্ড নির্মিত হইতে পারিত। স্তূপের ক্ষেত্র
বৃত্তাকার, অতরাং তাহার বেষ্টনও বৃত্তাকার। স্তূপের পার্শ্বে পঞ্চহস্ত বিস্তৃত
পরিক্রমণের পথ; এই পথও পূর্ণবৃত্তাকার ছিল। তিথ্যাগতাবে যোজিত প্রস্তর-
খণ্ডের সমাবেশ করিয়া এই পথ নির্মিত হইয়াছিল। পরিক্রমণের পথ বলিলে
সহজবোধগম্য হইবে না, কালে তীর্থযাত্রীর ভাষাও পরিবর্তিত হইয়াছে, তাহারা
এখনও পরিক্রমণ করিয়া থাকে, পূজ্যব্যক্তির বা বস্তুর অর্চনার পূর্বে বা পরে
প্রদক্ষিণ করিবার প্রথা এখনও তীর্থযাত্রীদিগের মধ্যে বর্তমান আছে; ইহাই
পরিক্রমণ। পুণ্যার্থী পূর্ব তোরণ দিয়া স্তূপবেষ্টনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথমে
পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিত, পরে পরিক্রমণের পথ তিনবার বা সাতবার অতিক্রম
করিয়া পুনরায় স্তূপ অর্চনা করিত। স্তূপ নির্মাণের কাল হইতে যুগলমান-
সমাগমকাল পর্য্যন্ত অর্চনার এই প্রথাই প্রচলিত ছিল। তাহার পর আর কেহ
স্তূপের অর্চনা করে নাই। সে অনেক পরের কথা। স্তূপবেষ্টনের পরে ত্রিহস্ত-
পরিমিত স্থান ছিল, ইহার পরে বৃত্তাকার প্রথম স্তম্ভশ্রেণী। সমাস্তুরালে
স্তম্ভশ্রেণীর মধ্যে চারিদিকে চারিটি তোরণ ছিল ও প্রতি তোরণের সম্মুখে এক
একটি আবরণ স্থাপিত হইয়াছিল। এই আবরণ ও স্তম্ভ, স্মৃতি ও আলম্বন-সজ্জায়
নির্মিত। স্তূপের পূর্বদিকে যে তোরণ ছিল, তাহাই প্রধান তোরণ বলিয়া গণিত
হইত; কারণ, স্তূপের পূর্বদিকেই নগর অবস্থিত ছিল। দুইটি স্তম্ভের উপর
তোরণ স্থাপিত; প্রতি স্তম্ভ একখণ্ড প্রস্তর হইতে ক্ষোদিত অষ্টকোণ স্তম্ভচতুষ্টয়ের
সমষ্টি। স্তম্ভদ্বীপে চতুর্কোণ প্রস্তরখণ্ডের উপর পদ্মপুষ্পপল্লবমধ্যে দুইটি উপবিষ্ট
সিংহমূর্তি। সিংহপৃষ্ঠের উপর ন্যস্ত পুষ্পমালাশোভিত চতুর্কোণ প্রস্তরখণ্ডের
উপর তোরণগুলি স্থাপিত। সমাস্তুরালে তিনটি তোরণ এইরূপ চতুর্কোণ
ব্যবধানের উপর স্থাপিত হইয়াছিল। সিংহচতুষ্টয়ের পৃষ্ঠস্থ চতুর্কোণ শিলাখণ্ডের
উপর প্রথম তোরণ। উহার উভয় পার্শ্ব গোলাকার; এই অংশে কুণ্ডলীকৃতপুচ্ছ
এক একটি মকর মুখাব্যাদান করিয়া রহিয়াছে। মকরের সম্মুখে, দক্ষিণ পার্শ্বে
একটি মন্দির ও বাম পার্শ্বে একটি স্তূপ। মন্দিরটি স্তম্ভশ্রেণীবেষ্টিত, চূড়ার কেতন
উড্ডীয়মান, মন্দিরমধ্যে পুষ্পাবৃত বেদী ও মন্দিরদ্বার পুষ্পমালা পরিশোভিত।
স্তূপটি দুই শ্রেণীর স্তম্ভবেষ্টনের মধ্যে অবস্থিত ও স্তম্ভশ্রেণীদ্বয়ের ব্যবধানে পরিক্রমণের
পথ। স্তম্ভের স্তম্ভবেষ্টনের মধ্যে স্তূপের উভয়পার্শ্বে স্তম্ভীকৃত কেতন উড্ডীয়মান।
অর্ধবৃত্তাকার স্তূপ পুষ্পমালাবিজড়িত। স্তূপের উভয় পার্শ্বে মকরের নাসিকা-
ভাগে স্তম্ভবেষ্টনীর সম্মুখে প্রস্তুত কমলসমূহ ক্ষোদিত। মন্দির ও স্তূপের

মধ্যভাগের স্থান হস্তিযুগদ্বারা পরিপূর্ণ, তোরণের মধ্যভাগে একটি বৌদ্ধিকম ও উহার উভয় পার্শ্বে হস্তিদয় অঙ্কিত। হস্তিগণ শুভে সনাতন উৎপল লইয়া বৌদ্ধিক অর্চনায় যাইতেছে। প্রথম ও দ্বিতীয় তোরণের ব্যবধানে একাদশটি ক্ষুদ্র শুভ, ইহার একটি অষ্টকোণ ও পরবর্তীটি চতুর্কোণ, চতুর্কোণ শুভগুলির সম্মুখে যক্ষিণী ও অপ্সারোগণের মূর্তি। প্রথম তোরণের উপর দুইখণ্ড চতুর্কোণ প্রস্তর স্থাপন করিয়া তাহার উপরেই দ্বিতীয় তোরণ স্থাপিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় তোরণের শেষাংশে পূর্বের স্থায় মকর, স্তূপ ও মন্দির ক্ষোদিত। এই তোরণের মধ্যভাগে বেদীর উপর স্থাপিত কয়েকটি পল্লব ও উহার উভয় পার্শ্বে দুইটি করিয়া সিংহ। সিংহগণের ব্যবধানে প্রস্তুতিত ও প্রস্তুটনোমুখ পদ্মসমূহ অঙ্কিত। ইহার উপরে তৃতীয় তোরণ। ইহাও চতুর্কোণ প্রস্তরদ্বয়ের উপর স্থাপিত এবং ইহার ও দ্বিতীয় তোরণের মধ্যে পূর্বের স্থায় কতকগুলি ক্ষুদ্র শুভ। এই শুভগুলির কিছু বিশেষত্ব আছে,—যখন এই শুভগুলি ক্ষোদিত হয় তখন ভাস্করগণ শ্রেণীবিজ্ঞানে স্থান নির্দেশের জন্য প্রতি শুভে বর্ণমালার এক একটি অক্ষর ক্ষোদিত করিয়াছিলেন। নাগরিকগণ যখন অসমাপ্ত ভাস্করকার্য দেখিতে আসিতেন, তখন তাঁহারা এই শুভগুলিতে নূতন প্রকারের অক্ষর দেখিয়া ভাস্করগণকে তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। তদন্তরে তাঁহারা জানাইয়াছিলেন যে, বহুকাল ভারতবর্ষে বাসহেতু তাঁহারা তদ্দেশ-প্রচলিত বর্ণমালা ব্যবহারে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে যাবনিক বর্ণমালা লুপ্তপ্রায়। যে বর্ণমালা তাঁহারা ব্যবহার করিতেছেন, তাহা গান্ধার ও কপিশা প্রভৃতি দেশে প্রচলিত; উহা ভারতীয় বর্ণমালার অনুরূপ নহে। উহা দক্ষিণদিক হইতে বামদিকে লিখিত হইয়া থাকে ও উহার লিখন-প্রণালী ভারতীয় বর্ণমালার লিখন-প্রণালী হইতে সরল। পারসিকগণ যখন ঐরাণ দেশীয় রাজগণের নেতৃত্বে উত্তরপশ্চিম প্রদেশসমূহ জয় করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদিগের রাজকার্য্যালয়ে ব্যবহারপ্রযুক্ত এই বর্ণমালাও তদ্দেশবাসিগণ কর্তৃক ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। গান্ধার, কপিশা প্রভৃতি প্রদেশেও ভারতীয় বর্ণমালার প্রচলন আছে, তবে তাহা পারসিক বর্ণমালার স্থায় বহুল ভাবে প্রচলিত নহে। সর্বোচ্চ তোরণের মধ্যভাগে প্রস্তুতিত অর্ধকমলের উপর নবপত্রিকা ও তদুর্ধ্বে ধর্মচক্র প্রতিস্থাপিত, ইহার উভয় পার্শ্বে প্রস্তুতিত শতদলের উপর জিরদর। জিরদের অস্তভাগ মৎস্ত-পুচ্ছাকার ও তাহার পার্শ্বে পুসজ্জিত অশ্বপৃষ্ঠে খেতচ্ক্র ও চামরধর। প্রতি তোরণের দক্ষিণ পার্শ্বের শুভে রাজার বংশপরিচয় উৎকীর্ণ, “সুদরাজ্যে গান্ধীপুত্র

বিশ্বদেবের পোতা, গৌপ্তীপুত্র অগরাজের পুত্র বাৎসীপুত্র ধনভূতি এই তোরণ ও শিলাকর্ম সম্পন্ন করাইলেন ।”

পূর্ব তোরণের দক্ষিণ পার্শ্বের স্তম্ভে যে লিপি দেখিতে পাইতেছি, তদনুসারে লিপি অপর তোরণক্রমেও ছিল । দক্ষিণ তোরণের স্তম্ভদ্বয় হুণগণ অগ্নিসংযোগে বিনষ্ট করিয়াছে । সে কথাও বলিব, কিন্তু সে অনেক পরের কথা । অপর তোরণদ্বয়ের স্তম্ভগুলির ভগ্নাংশমাত্র তোমরা পাইয়াছ, কিন্তু তাহারাও এই পূর্ব তোরণের মায় উচ্চশীর্ষ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাহারাও ভাষিয়াছিল যে, তাহাদিগের উচ্চশীর্ষ আর কখনও মেদিনী স্পর্শ করিবে না । কিন্তু মুসলমানের দণ্ডপ্রহারে, হুণের অগ্নিদাহে ও ব্রাহ্মণগণের পুনরভ্যুত্থানে তাহারাও পুনরায় ধরাশায়ী হইতে বাধ্য হইয়াছে । পূর্ব তোরণের পার্শ্ব যে স্তম্ভটি আছে, তাহা চাপদেবা-নামী বিদিশাবাসী রেবতী-মিত্র নামক জনৈক শ্রেষ্ঠীর পত্নীর দান । রেবতীমিত্রের পত্নী প্রাতি তোরণের সামিধ্যে একটি স্তম্ভ স্থাপিত করিয়াছিলেন । এইরূপে জনসাধারণের সমবেত চেষ্টায় স্তম্ভবেষ্টনীর স্তম্ভ ও স্মৃতিগুলি নির্মিত ও যথাস্থানে স্থাপিত হইয়াছিল । প্রত্যেকের নাম ওদত্ত অথবা উৎকীর্ণ হইয়াছিল । আলম্বন কে দিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশ পায় নাই, তবে নগরবাসিগণের কণোপকথন শ্রবণে জানিয়াছিলাম যে, আর্য্যাবর্তবাসী জনৈক বিখ্যাত ব্যক্তি আলম্বন নির্মাণের ও যথাস্থানে স্থাপনের ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন ; কিন্তু সুলতানজগনের ভয়ে স্বীয় নাম প্রকাশ করেন নাই । চাপদেবা-প্রদত্ত স্তম্ভের একপার্শ্বে হস্তিপ্রায়ের পৃষ্ঠে স্থাপিত পাদপীঠের উপর গরুড়ধ্বজধারী একটি অশ্বারোহীর মূর্তি ; অপর পার্শ্বে গণযুগলবাহিত পাদপীঠের উপর তিনটি হস্তি, ইহার মধ্যে মধ্যমটি সর্কীপেক্ষা বৃহৎ । প্রত্যেক হস্তীর দ্বয়ো অঙ্গুলহস্তে হস্তিপাল উপবিষ্ট । প্রত্যেক স্তম্ভের উপরিভাগে একটি অর্ধবৃত্ত অঙ্কিত ও ইহার মধ্যে একটি প্রস্ফুটিত পদ্যের অর্ধভাগ । সাধারণতঃ তোরণের পার্শ্বে বেষ্টনের প্রথম স্তম্ভ এইরূপে চিত্রিত হইত । অপর স্তম্ভগুলিতে প্রত্যেক পার্শ্বে, উর্ধ্বে একটি ও নিম্নে একটি অর্ধবৃত্ত এবং মধ্যভাগে একটি পূর্ণবৃত্ত অঙ্কিত হইত ; ইহার মধ্যে কোনটিতে চিত্র, কোনটিতে জাতক, কোনটিতে প্রস্ফুটিত বা প্রস্ফুটনোগ্রন্থ পদ্য ফোদিত হইয়াছিল । উর্ধ্বের অর্ধবৃত্ত ও মধ্যস্থলের পূর্ণবৃত্তের অন্তঃস্থ স্থানে কোনটিতে প্রস্ফুটিত পদ্যের উপর নৃত্যশীলা অঙ্গরা, কোনটিতে সনাল উৎপল, কোনটিতে সফল আত্মপল্লব, কোনটিতে বা পুষ্পমালা ফোদিত হইয়াছিল । স্তম্ভযুগলের ব্যবধানে তিনটি করিয়া স্মৃতি স্থাপিত হইয়াছিল, তিনটি স্মৃতি প্রতি স্তম্ভযুগলকে পরস্পর সংলগ্ন করিত । স্তম্ভের পার্শ্ব স্মৃতিবৎ বিদ্য

করিয়া থাকিত বলিয়া বোধ হয় ভাস্করগণ পাঠাণময় বেষ্টনের এই অংশের “শ্রুতি” নামকরণ করিয়াছিলেন। প্রত্যেক শ্রুতির পাশে এক একটি পূর্ণবৃত্ত অঙ্কিত থাকিত ; সাধারণতঃ শ্রুতিগাত্রে বৃত্তগুলিতে প্রস্তুত পদ্য ফোঁদিত ছিল, কিন্তু অতি অল্পসংখ্যক শ্রুতিতে নানাবিধ চিত্রও ছিল।

তাহার পর আলম্বন। উত্তরভারতবাসী কোন্ মহাপুরুষ যে এই আলম্বনের ব্যয় দিয়াছিলেন, তাহা জানিতে পারি নাই ; কিন্তু আলম্বনটি সর্বাঙ্গোপযোগী সুন্দর হইয়াছিল। স্তূপবেষ্টনীর সমুদায় স্তম্ভের ও তোরণের আবরণগুলির স্তম্ভসমূহের শীর্ষে আলম্বন স্থাপিত হইয়াছিল। আলম্বনের শীর্ষদেশে ঈষৎ গোলা ও মস্তক ; প্রতি পাশে সমান্তরাল রেখাদ্বয়ের অভ্যন্তরে, উপরে একশ্রেণী চতুর্ভুজ ও নিম্নে একশ্রেণী পুষ্পমাল্যে লব্ধিত ঘণ্টা ; এতদ্বয়ের অভ্যন্তরে কোন স্থানে হস্তী, কোন স্থানে বা মকরমুখ হইতে নির্গত মৃণাল বক্রগতিতে চলিয়া গিয়াছে, অবশিষ্টস্থান পত্রপুষ্প-ফল-সিংহ-হস্তি-বানর প্রভৃতি জীব ও নানাবিধ চিত্রে সুশোভিত। আলম্বনের কোনস্থানে প্রদাতার নাম নাই বটে, কিন্তু প্রতি চিত্রের নিম্নে বা উপরে উহার নাম অঙ্কিত আছে ও আলম্বন যে স্থানে শেষ হইয়াছে, সেই স্থানে একটি উপবিষ্ট সিংহমূর্তি অঙ্কিত আছে।

স্তুপ বা স্তূপবেষ্টনীর নির্মাণকার্য যত দিন চলিতেছিল, ততদিন যখন ভাস্করগণ রাজপুরুষ, শ্রমজীবী বা নিতান্ত পরিচিত ব্যক্তি ভিন্ন অপর কাহাকেও বেষ্টনীর মধ্যে প্রবেশের অধিকার দেন নাই। নির্মাণকার্য শেষ হইলে যখনজাতীয় দেশীয় ভাস্করগণ রাজসঙ্গীপে যাইয়া সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। পরদিন প্রাতে নগর হইতে দলে দলে নাগরিক ও নাগরিকগণ আসিয়া প্রান্তর আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, কিন্তু রক্ষীগণ রাজাদেশে কাহাকেও বেষ্টনীর মধ্যে আসিতে দিল না। তখনও মঞ্চসমূহ অপসারিত হয় নাই ; গুরুভার তোরণগুলি উদ্ধে উত্তোলন করিবার অচ্ছ যে মৃৎস্তূপগুলি নির্মিত হইয়াছিল, সেগুলি তখনও দূরে নিক্ষেপ করা হয় নাই ; ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সর্ববিধ আকারের ভগ্ন প্রস্তরখণ্ডগুলি পরিক্রমণের পথ আচ্ছন্ন করিয়া ছিল। কিন্তু প্রবল বাসনার বলে সমুজ্জতরঙ্গের স্থায় সেই বিশাল জনসঙ্ঘ বার বার আসিয়া মুষ্টিমেয় রক্ষীগণকে গ্রাস করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল। হস্তিপৃষ্ঠে, রথে, উষ্ট্রে ও অশ্বে নাগরিকগণ আসিয়া বেষ্টনীর মধ্যভাগে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল ; জনতা বদ্ধিত হওয়ায় কোষ্ঠপালকে সংবাদ দিয়া রক্ষিসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইল। তখন হতাশ হইয়া সেই জনসঙ্ঘ বেষ্টনের বহির্ভাগে দণ্ডায়মান রহিল। উৎসাহে ও

হৃদয়মণীয় বাসনায় মত্ত হইয়া তাহারা তাহাদিগের ধর্ম্মযাজকের
আগমন লক্ষ্য করে নাই। আজ তিনিও যেন নূতন বলে বলীমান হইয়া
নগর হইতে স্তূপবেষ্টন পর্য্যন্ত দীর্ঘ পথ এই বিশাল জনতা ভেদ করিয়া আসিয়াছেন।
আজ তাঁহার অল্প জনসমূহের মধ্য দিয়া পথ উন্মুক্ত হয় নাই। তাঁহার দেয়ামিত
দেহ দেখিয়া যদি একজন সমস্তমে অপমৃত হইয়াছে, তখনই দশজন দশদিক্ হইতে
সেই স্থান অধিকার করিবার চেষ্টা করিয়াছে। তাঁহার ক্ষণ দেহ জনসমূহের পেগণে
বহবার পীড়িত হইয়াছে। তাঁহাকে দেখিয়া যদি কেহ সলজ্জভাবে সরিয়া যাইবার
উচ্চস করিয়াছে, তখনই সে বুঝিয়াছে, সে আশা বুধা ; কারণ, তাহার পরক্ষণেই
অপরে সে স্থান অধিকৃত করিয়াছে। সকল বাণা বিধ অতিক্রম করিয়া হস্তী ও
উষ্ট্রের আশ্রয় ও রথচক্রের ঘূর্ণন উপেক্ষা করিয়া ধূলিধূসরিত দেহে তিনি রক্ষ-
ণের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ; আসিয়া দেখিলেন, রাজা তখনও আইসেন
নাই, যবনচতুষ্টয় তাঁহার অল্প ধীরভাবে অপেক্ষা করিতেছেন। তাহা দেখিয়া
তিনিও বেষ্টনীর বহির্ভাগে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজাও তাঁহারই
অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন। তাঁহার চতুরশ্রয়োজিত রথ স্তূপবেষ্টনী পর্য্যন্ত
আসিতে পথ পায় নাই, নগরদ্বার হইতে বাহির হইয়াই তাঁহাকে রথ হইতে অব-
তরণ করিতে হইয়াছে। জনতার মধ্যে অনেকেই তাঁহাকে সর্ব্বিনয়ে বেষ্টনীর
দ্বার উন্মুক্ত করিবার অল্প অমরোধ করিয়াছে ; অমরোধ উপরোধ অতিক্রম
করিয়া ক্ষিপ্তপ্রায় জনতাকে শাস্ত করিয়া নগরপদে রাজা বেষ্টনীর প্রবেশপথে উপ-
স্থিত হইলেন। তখন যবন শিল্পিগণ, বুদ্ধ ধর্ম্মযাজক ও রাজা বেষ্টনীর অভ্যন্তরে
প্রবেশ করিলেন। বেষ্টনীর অন্তরালে কি হইল, তাহা বলিবার বোধ হয় আব-
শ্যকতা নাই। বিস্ময়বিফারিত নেত্রে রাজা দেখিলেন, চারিদিকে চারিটি ভোরণ
প্রায় আকাশ স্পর্শ করিয়াছে ; প্রতি ভোরণগোত্রে তাঁহার নাম ও বংশপরিচয়
ক্ষোদিত আছে ; প্রতি শুভে নাগ, যক্ষ ও কিম্বর প্রভৃতি উপদেবভাগ্যের
মূর্ত্তি, স্ফুটতে জাতক বা অপর কোন চিত্র। তাঁহার সে সময়ে নিশেষ বাক্য-
স্মৃতি হয় নাই ; তিনি, বিস্ময়বিফারিত লোচনে শিল্পকীর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন।
শিল্পিগণ ও ধর্ম্মযাজক নীরবে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। প্রায় এক প্রহর
কাল রাজা শুভের পর শুভ, স্ফুটের পর স্ফুট, সমুদায় শু প ও বেষ্টনী পর্য্যবেক্ষণ
করিলেন। পরে বাহিরে আসিয়া রাজা দনভূতি ও ধর্ম্মযাজক বহুক্ষণ পরামর্শ
করিলেন। ইতোমধ্যে জনসমূহ কোলাহল বুদ্ধি পাইতে লাগিল। সমুখ
পংক্তির নাগরিকগণ ক্রমশঃ অধীর হইয়া উঠিল। রাজাদেশে রক্ষিগণ জনতা-

মধ্যে প্রবেশ করিয়া নগরের কয়েকজন মহাশয় বাজিকে রাজসমীপে আনয়ন করিল। তখন তাঁহারা সকলে সেই স্থিতিবৎ ভীষণ নিলামঙ্গল অনাবৃত ভূমির উপর উপবেশন করিয়া ভবিষ্যতের কার্য সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। জনসাধারণ নাগরিকগণকে রাজসমীপে আসিতে দেখিয়া কণ্ঠস্থ শাস্ত হইল; তাহারা বোধ হয় ভাবিল যে, রাজা হয়ত তাহাদিগের আশা পূর্ণ করিবার জন্ত প্রাচীন প্রধান নাগরিকগণকে সমীপে আহ্বান করিয়াছেন। কতদিন হইতে তাহারা শুনিয়া আসিয়াছে যে, উপাসক ও উপাসিকাগণের পুজার জন্ত তথাগতের দেহাবশেষ আনীত হইবে; মথুরাবাসীরা স্বপ্নাদিগের জন্ত ভ্রমাবশেষের এক কণা দিতে স্বীকৃত হইয়াছে। কতদিন হইতে তাহারা শুনিয়া আসিতেছে যে, নগরপ্রান্তে গর্ভচৈত্যা নির্মিত হইবে, চৈত্যাগর্ভে তথাগতের দেহাবশেষ রক্ষিত হইবে, স্বদূর পর্বত হইতে নির্মাণ-কার্যের জন্ত রক্তবর্ণ প্রস্তর আনীত হইবে, স্বদূর উচ্চান, গাফার ও কপিলা হইতে যবন শিল্পী আসিয়া নূতন ও পুরাতন ভাস্কর্য্যমিশ্রিত নব প্রথায় স্তূপ-বেষ্টনী নির্মাণ করিবে। শ্রাপদসঙ্কুল অরণ্যময় পর্বতসার হইতে বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অশ্বরাশি সঞ্চিত হইয়াছে; উত্তরপশ্চিম প্রদেশ হইতে যবন শিল্পী এবং মগধ ও মথুরা হইতে দেনীয় ভাস্করগণ আনীত হইয়াছে; পাটলী-পুত্র হইতে বিদিশা পর্য্যন্ত ও গাফার হইতে আটবীক প্রদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত ভূখণ্ডে সঙ্কল্পে বিশ্বাসী ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে গোপনে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে; স্তূপও নির্মিত হইয়াছে; তাহাদিগের মধ্যে অনেকই অর্থপ্রদান করিয়াছে বা বিনা পারিশ্রমিকে পরিশ্রম করিয়াছে, অথচ তাহারা স্তূপ দেখিতে পাইবে না বা বেষ্ট-নীর অভ্যন্তরে যাইতে পারিবে না, ইহা তাহাদিগের নিকট অবিচার বলিয়া বোধ হইল। পরামর্শান্তে রাজসমীপে আহুত নাগরিকগণ জনগণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন যে, গুপ্তাহায়ে স্তূপগর্ভে তথাগতের শরীর নিহিত হইবে, সেই দিন নগরে অষ্টপ্রহরব্যাপী উৎসব হইবে ও সেই দিন প্রাতঃকাল হইতে সকলেই বেষ্টনীর অভ্যন্তরে প্রবেশের ও অর্চনার অধিকার লাভ করিবে। তাঁহারা জানাইলেন যে, রাজা তখনও ব্রাহ্মণগণের উপজন্মের আশঙ্কা করেন; কারণ, ইতোমধ্যে তাহারা দুই একবার বিপৎপাতের চেষ্টা করিয়াছে; সুতরাং, অসম্বন্ধ জনপ্রবাহ বেষ্টনীর অভ্যন্তরে ছাড়িয়া দিলে তাহারা অবসর পাইয়া নূতন কি উৎপাত করিবে, তাহা বলা যায় না। বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া তাঁহারা সকলকে বেষ্টনীর অভ্যন্তরে প্রবেশলাভের অনুমতি দিবার বিরোধী হইয়াছেন। তাঁহারা আরও বলিলেন যে, অপর সকলের স্থায় তাঁহারাও স্তূপ দেখিবার আশায় নগর

পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন ; কিন্তু অবস্থা বিবেচনা করিয়া তাঁহারাও প্রত্যাবর্তন করিতেছেন । তখন সেই বিশাল জনসত্তা নগরে প্রত্যাবর্তন করিল ।

গুলিলাম, সপ্তাহান্তে উৎসব হইবে । উৎসবের ক্রেশ ভুলিয়া যাইলাম ; উৎসব কিরূপ, তাহা জানিবার জন্ত বড়ই আগ্রহ জন্মিল । মনুষ্যজাতিকে অলদিন দেখিতেছি, যতই দেখিতেছি, বিষয় ততই বর্ধিত হইতেছে । সেই কৃষকজাতি কোথায় গেল, সেই উজ্জল শেতবর্ণ জাতি কোথায় গেল, শেতকৃষ্ণমিশ্রিত অপেক্ষাকৃত খর্ব্বাকার জাতি কোথা হইতে আসিল ? এসকল কথার মীমাংসা বোধ হয় আজও হয় নাই, কখনও হইবে কিনা সন্দেহ । তবে যদি আমার ছায় অতীতের সাক্ষী আরও কেহ আঁসে, আমা অপেক্ষা প্রাচীন কথার অবতারণা যদি কেহ করে, অথবা মনুষ্যজাতির সৃষ্টি হইতে তৎসংশ্লিষ্ট ব্যাপারসমূহে লিপ্ত অপর কেহ যদি নিজের বাকশক্তি পরিশুদ্ধ করিবার চেষ্টায় সফলকাম হয়, তবেই এ প্রশ্নের মীমাংসা হইবে । তখনও মনুষ্যজাতির উৎসব দেখি নাই । নূতন দৃশ্য দেখিবার উৎসাহ ও দৃষ্ট সমৃদ্ধির স্মৃতি একরূপ প্রবল হইয়াছিল যে, সে উৎসবের চিত্র অস্ত্রাণি আমার মনে পরিশুদ্ধ আছে । নূতন বেশে, নূতন চিত্রে শোভিত হইয়া তৎকালের শাণিত অজ্ঞাঘাতের দুর্ভিক্ষহ যন্ত্রণাও বিস্মৃত হইয়াছিলাম ।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ।

সার্থকতা ।

আমার বেদনা 'অরি' যদি তুমি ব্যাথা পাও,

সে বেদনা সার্থক আমার ;

ধন্য আমি, মম দুঃখে যদি তব 'অ' 'রি' পলে

করণায় বারে আঁখিধার ।

উচ্চ আমি—পেয়ে তব করণ সাধনানাগী

পেয়ে তব মেহ—ভালবাসা ।

তোমারে হেরিয়া আমি ভুলে যাই যে বেদনা

বক্ষোমারে বাঁধিয়াছে বাসা ।

শ্রীদেবীনাথী ঘোষ ।

মৃত্যু-মিলন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—ঃঃ—

শোকাতুরা।

—০—

বিচারালয়ে বিচারকার্য শেষ করিয়া ফিরিবার সময় রাজা বিষমভাবে শঙ্কর সিংহকে বলিলেন, “শঙ্কর সিংহ, আগার পরীক্ষার দিন আসিয়াছে।”

শঙ্কর সিংহ বলিলেন, “আপনি অকারণে চিন্তিত হইতেছেন। যদি পরীক্ষার দিন আসিয়াই থাকে, তাহাতে আপনার আশঙ্কার কারণ নাই। আপনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন।”

“কি জানি। মানব-হৃদয় দুর্বল,—তাই পদে পদে আশঙ্কা।”

সেই দিন রাজা সংবাদ পাইয়াছিলেন, নগরে বিপ্লবিকা দেখা দিয়াছে, বাজারে তাহার প্রথম প্রকাশেই বহু লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

মধ্যাহ্নের পর নগরপালকে ও অচ্যুত আবশ্যক লোকদিগকে লইয়া রাজা ব্যাধিকেন্দ্র বাজারে গমন করিলেন। রবিকর তপ্ত অলদণ্ডের মত উষ্ণ ; পবন অগ্নিশাসী। রাজার সে দিকে মন ছিল না।

বাজারে উপস্থিত হইয়া রাজা অধিবাসীদিগকে ডাকাইয়া সাহস দিলেন—সাহসনা দিলেন ; তাহাদিগকে সাবধানে থাকিতে বলিলেন ; পথ ও গৃহ পরিষ্কৃত রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন। তাহার পর রাজা বলিলেন, “যে সকল গৃহে বিপ্লবিকা দেখা দিয়াছে, আমি সে সকল গৃহে যাইব।” যে পীড়ায় আক্ষীপ্তজনগণ পীড়িতের নিকটে যাইতে শঙ্কিত হয়, রাজা সেই পীড়াগ্রস্তদিগের গৃহে যাইবেন জ্ঞানিয়া জনতা বিস্মিত হইল ;—সকলের প্রকার উৎস উৎসারিত হইল।

রাজ-বৈদ্য বলিলেন, “আপনার যাইবার প্রয়োজন কি ?”

রাজা হাসিয়া বলিলেন, “আমার যাওয়া বিশেষ আবশ্যক। আমার অস্ত্র শঙ্কিত হইতেছেন ? রাজা অন্তর। সময় সময় রাজকর্তৃবাসগণের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির তিরোভাব হয় ; তাহাতে রাজার মৃত্যু হয় না। আজ প্রজাবৃন্দ ব্যাধিভয়ে ভীত,—এ অবস্থায় আমার প্রাণের ভয় করিবার অবকাশ কোথায় ?”

রাজ-বৈদ্য আর কোন উত্তর করিতে পারিলেন না ।

নগরপাল পথ দেখাইয়া চলিলেন—রাজা তাঁহার পশ্চাদ্ধাবী হইলেন ।

সেদিন রাজা সেরূপ গৃহে গমন করিলেন, প্রবল-কর্তব্য-বুদ্ধির প্ররোচনা ও উত্তেজনা ব্যতীত তিনি সেরূপ গৃহে মুহূর্ত্ত ভিষ্ঠিতে পারিতেন না ।

সে দিন মলিন, জীর্ণ শয্যার পার্শ্বে রাজার মূর্ত্তি দেখিয়া কত ব্যাধিতের অস্তিম-মুহূর্ত্ত আনন্দোজল হইয়া উঠিল । একজন বৃদ্ধ ব্যাধিত অশ্রাকম্পিত কণ্ঠে বলিল, “এ মৃত্যুও সুখের । দেবতাকে সম্মুখে রাখিয়া এ মৃত্যু সাধনার ফল ।” রাজাকে যাতনায় সহ্যভূতি প্রকাশ করিতে দেখিয়া সে দিন কৃতজ্ঞতায় কত কোটরগত নয়ন হইতে অশ্রু গড়াইয়া পড়িল ।

তাঁহার পর রাজাকে আরও দুষ্কর কার্য্য করিতে হইল । কত গৃহে পুঞ্জ-শোকাতুরা জননীরা, ভ্রাতৃহীনা ভগিনীরা, পতিগতপ্রাণা বিধবারা, পিতৃহীন সন্তানের আকুল ক্রন্দন ধ্বনিত হইতেছিল । তাহাদের সে শোকে সাস্থনাদান দুষ্কর কার্য্য । রাজা সে দুষ্কর কার্য্যও করিলেন । সংস্কারবশে লোক রাজাকে দেবতা-জ্ঞানে ভক্তি করিত ; তাঁহার লোকরঞ্জন কার্য্যে ও সে দিনের ব্যবহারে সেই ভক্তি শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল । তাই রাজার সাস্থনাধীন ব্যাধিতের শোকবিগ্ন হৃদয়ে স্নিগ্ধ ভেষজের মত কার্য্য করিল ।

সে দিন সম্ভার কিছু পূর্বে প্রাসাদের একজন কর্মচারী মন্দিরের প্রধান পুরোহিতকে কি বলিয়া যাইলেন ।

মধ্যরাত্রি অতীত হইবার পর একজনমাত্র প্রহরী সঙ্গে লইয়া রাজা পদব্রজে মন্দিরদ্বারে উপনীত হইলেন । পূর্বব্যবস্থামত প্রদান পুরোহিত দ্বারে উপস্থিত ছিলেন ; তিনি আর সকলকে বিদায় দিয়াছিলেন । রাজা প্রহরীকে বাহিরে অপেক্ষা করিতে আদেশ করিয়া পুরোহিতের সহিত প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন । প্রাঙ্গণ জনশূন্য ; প্রাঙ্গণে বিরাট দেউলের ছায়া বিরাটতর দেখাইতেছে । কি অনাহত নীরবতা । উভয়ে মন্দিরে প্রবেশ করিলেন ।

রাজ্যের কোন বিপদে দেবতাকে পূজা করা কৌলিক প্রথা । আজ রাজা সেই প্রাচীন কৌলিক প্রথা পালন করিতে আসিয়াছিলেন । তিনি দীন ভাবে দেবদ্বারে হৃদয়ের প্রার্থনা লইয়া আসিয়াছিলেন । তিনি দীন ভাবে দেবতার চরণে প্রার্থনা জানাইলেন ;—সে প্রার্থনা কেবল প্রজার মঙ্গল-কামনা ।

রাজা যখন মন্দির হইতে বাহির হইলেন তখন নীলাধরে তারকার দীপ্ত দ্যুতি মলিন হইয়া আসিতেছে । মন্দির হইতে রাজা প্রাসাদে ফিরিলেন ।

রাজা যখন প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন, তখন ঘরে প্রায় বাতীত আর সকলেই নিদ্রিত বলিয়া বোধ হইল। কিন্তু অগ্ৰপূরে একজন রমণী তখনও জাগিয়া ছিলেন,—তাহার বেসমান হৃদয় নানা চিন্তায় ব্যাকুল হইতেছিল। তাহার চিন্তার অস্ত্র নাই। রাণী তখনও বসিয়া ভাবিতেছিলেন। রাজার পদশব্দে তিনি চাহিয়া দেখিলেন। রাজা তাঁহাকে লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। কক্ষসমুৎপত্তী অগ্নিনে পুষ্পিত তরঙ্গতার অন্তরালে সেই বিমাদময়ী মূর্তি তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করিল—কারণ, কক্ষ আলোকোজ্জ্বল, অগ্নিগ্ন মুহু আলোকে আলোকিত। রাজা শ্রান্তভাবে শয়ান করিয়া গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। রাণী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

সেদিন ও রাজা পূর্কদিনের মত মধ্যাহ্নের পর নগর-পরিদর্শনে বাহির হইলেন। ব্যাধি নগর মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছিল। রাজাকে নানা দিকে—নানা পল্লীতে যাইতে হইল। তাহার যেন শ্রান্তি নাই। তাহার মঙ্গীরা শ্রান্ত হইয়া পড়িল—বিরক্ত হইতে লাগিল, কেবল মুখ ফুটিয়া বিরক্তিক্রোশ করিতে পারিল না। নগরের লোক বিশ্বয়ে ও অজ্ঞায় মুগ্ধ হইয়া রহিল। রাজা পল্লীর পর পল্লীতে গমন করিয়া বাধিবিষহৃষ্ট গৃহে গৃহে যাইতে লাগিলেন।

মধ্যাহ্নের পর যখন তিনি প্রাসাদমুখগামী হইতেছেন তখন সংবাদ আসিল, মন্দিরের নিকটে—পুরোহিতপল্লীতে একটি শবের সংকার হইতেছে না। কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া রাজা জানিলেন, সে গৃহে একটি বালিকা ও তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাস করিত। বাধক প্রভায়ে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া মধ্যাহ্নেই প্রাণত্যাগ করিয়াছে। তাহার ভগিনী সেই শব জড়াইয়া কাঁদিতেছে। আত্মীয়স্বজনগণ বহু চেষ্টায় তাহাকে সরাইতে সমর্থ হয় নাই—বুঝাইয়া শাস্ত করিতে পারে নাই। সে কিছুতেই ভ্রাতার শবদেহ ত্যাগ করিতেছে না। শুনিয়া রাজার নয়ন আর্জ হইয়া আসিল।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, “বালিকার আর কেহ নাই?”

সংবাদদাতা বলিল, “তাহার পিতা তীর্থভ্রমণে গিয়াছেন। তীর্থযাত্রার পূর্বেও তিনি একরূপ সংসারত্যাগী ছিলেন।”

মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কাহার কথা বলিতেছ?”

“মন্দিরের বৃদ্ধ পুরোহিতের।”

রাজা বিস্মিত নয়নে মন্ত্রীর দিকে চাহিলেন।

মন্ত্রী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “বালিকা কি পার্শ্বতী?”

আগন্তুক বলিল “হাঁ।”

মন্ত্রী রাজাকে বলিলেন, “পুরোহিত মহাশয় তীর্থদর্শন করিতে যাইয়া একবার কয়লাস :হরিদ্বারে বাস করেন। তথায় কন্ডার জন্ম হয় ; তাই তিনি তাহার পার্কর্তী নাম রাখিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং কন্ডাকে শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইয়াছেন। এই মাতৃহীনা কন্ডার গুণের তুলনা নাই। দীন, দুঃখী, ব্যামিত, অসহায়—ইহাদিগের সেবা ও উপকার করাই তাহার ভ্রত। পুরোহিত মহাশয় সর্বদাই এই কার্যে তাহাকে উৎসাহিত করিয়া থাকেন।”

আগন্তুক বলিল, “লোক তাহাকে ‘দীন-জননী’ বলিয়া থাকে।”

রাজা কি ভাবিতেছিলেন।

রাজা নগরপালকে বলিলেন, “আমি পুরোহিত মহাশয়ের গৃহে বাইব।”

নগরপাল পথ দেখাইয়া চলিলেন।

ক্রমে রাজা বৃদ্ধ পুরোহিতের গৃহদ্বারে উপনীত হইলেন। পুরোহিত-পঞ্জী মন্দিরের পশ্চাতে অবস্থিত, বহুদিনের। পণ সঙ্কীর্ণ,—দুই পার্শ্বে গৃহগুলি উচ্চ ; বহুতল। বৃদ্ধ পুরোহিতের গৃহ পুরাতন। দ্বারের সম্মুখে বিশদবসন কয়লান আত্মীয় দাঁড়াইয়া ছিলেন। রাজা আসিলে আরও অনেক আত্মীয় উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া সকল কথা অংগত হইলেন। তাঁহারা প্রথম সংবাদদাতার কথারই পুনরাবৃত্তি করিলেন। তাঁহারা বালকের শব দেহ আনিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়াছেন,—তাহার ভগিনী সেই দেহ জড়াইয়া রহিয়াছে। শেষে তাঁহারা নিরুপায় হইয়া রাজার নিকট সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন।

রাজা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

নিম্নতল অন্ধকার। একজন একটি বর্তিকা জালিয়া লইয়া পথ দেখাইয়া চলিলেন—রাজা তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া সকলে দ্বিতলে উপনীত হইলেন। অলিন্দা অতিক্রম করিয়া পথপ্রদর্শক একটি কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া রাজা সম্মুখে হৃদয়-বিদারক দৃশ্য দেখিতে পাইলেন।

কক্ষের এক পার্শ্বে একটি দীপ যুত্ৰ যুত্ৰ জলিতেছে। সেই দীপের স্মীণ আলোক হৃদয়তলে শুভ্র শয্যায় শয়ান বালকের মৃত্যু-সুপ্ত আননে পতিত হইয়াছে ; আর তাহারই পার্শ্বে তাহার ভগিনী,—সেই দেহ জড়াইয়া আছে,—মধ্যে মধ্যে মৃত জাতীর মরণ-মুদিত নয়নে, মৃত্যু-শীতল কপোলে চুখনদান করিতেছে। সে যেন বাহুজ্ঞানহীনা।

রাজা সেই শয্যা-পার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

তিনি ধীরে ধীরে বালিকাকে বুকাইতে লাগিলেন। তাঁহার পর মহাশুভ্রুতি-সিদ্ধ ;—তাঁহার মাখনা হৃদয়স্পর্শিনী। শোকাতুরাকে এমন করিয়া আর কেহ বুকাই নাই,—এমন করিয়া আন কেহ মাখনা দেয় নাই,—এমন মহাশুভ্রুতি আর কেহ দেখায় নাই। সে জানহীনা—বোদহীনা নহে ; কেবল শোকের আত্মশয্যে বিবশা হইয়াছিল। সে সব বুঝিতে লাগিল ; আপনাতঃ অবস্থা উপলব্ধি করিতে লাগিল। এতক্ষণ সে কাঁদিতে পারে নাই ; এখন তাহার নয়নে শান্তি-সালিল দেখা দিল। সে কাঁদিতে লাগিল।

রাজা কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন। শোকের প্রথম উচ্ছ্বাস অপগত না হইলে শোকার্ন্তের হৃদয় মাখনায় শীতল হয় না। তাহার পর রাজা আবার বালিকাকে বুকাইলেন। তাহার পর তিন বালকের দেহ লইতে চেষ্টা করিলেন। বালিকা তখনও সে দেহ জড়াইয়া আছে। রাজা তাঁহাকে বলিলেন, “বালক একা তোমারই নহে। এ শোক কেবল তোমার নহে। আমি তোমার রাজা ;—আমিও আছি শোকাক্ত। বালককে আমার কাছে দাও।”

বালিকা আর কিছু বলিল না।

রাজা সমস্ত বালকের দেহ তুলিয়া লইয়া বাহিরে আসিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

মাখনা।

রাজা প্রত্যাবর্তনকালে পুরোহিতের আশ্রয়দিককে ডাকিয়া বালিকার রক্ষণা-বেশনের ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছিলেন। গৃহে ফিরিয়া তিনি ভাবিলেন, এই অসহায়ার কি উপায় করা যাইতে পারে ? বৃদ্ধ পুরোহিত তীর্থনির্শনে গিয়াছিলেন ; তিনি কোথায় ছিলেন, তাহা কেহ জানিত না—বালিকাও জানিত না। কায়েই তাঁহাকে সংবাদ দিবার কোনরূপ ব্যবস্থা করা অসম্ভব। আশ্রয়গণ রাজার অনুরোধে দুই চারি দিন বালিকাকে যত্ন করিতে পারেন ; কিন্তু তাঁহাদিগের সে যত্ন বহুদিনস্থায়ী হইবার সম্ভাবনা নাই। বিশেষ এ অবস্থায় তাহার যেরূপ মাখনা

ও শুশ্রূষা আবশ্যক—তাহার কি হইবে? রাজা ভাবিয়া কিছু স্থির করিতে পারিলেন না ।

সে দিন শয্যাশয়ন করিয়া রাজা সেই কথা ভাবিতে লাগিলেন । তাঁহার নয়ন-সমক্ষে সেই করুণ দৃশ্য বিরাজিত,—ভগিনী ভ্রাতার শবদেহ জড়াইয়া আছে—জীবন মৃত্যুকে আলাদা করিয়া রাখিয়াছে; সে দৃশ্যে মৃত্যুঞ্জয়ী মেল সপ্রকাশ । জীবন যাহাদিগকে একত্র আনিয়াছিল, মৃত্যু তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না, এই বিশ্বাসে বালিকা তখনও ভ্রাতার দেহ জড়াইয়া ছিল । হায়—দুঃখীনা ! মৃত্যু যাহাকে অপনার করিয়া লয়, সে যে সর্ববন্ধনমুক্ত । শোকা-তুরার সেই অশ্রুসিক্ত মুক্তি কেবল রাজার মনে পড়িতে লাগিল ।

প্রভাতে রাজা শঙ্করসিংহকে সকল কথা বলিলেন; অজ্ঞাসা করিলেন, “এখন কি করা কর্তব্য?”

শঙ্করসিংহ বলিলেন, “আপনি কি কিছু স্থির করিয়াছেন?”

“না । আমি ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না ।”

“তাহাকে প্রাসাদে আনিতে হয় না?”

রাজা শঙ্কর সিংহের দিকে চাহিয়া যান হাসি হাসিলেন । শঙ্কর সিংহ তাহার অর্থ বুঝিলেন,—“তুমি কি সব জান না?”

শঙ্কর সিংহ যেন কিছু লজ্জিত হইলেন । তিনি রাজার বেদনার কথা জানিতেন । তাহার পর তিনি বলিলেন, “উমাকে বলিতে সে যত্ন করিবে । যদি আপনার অভিপ্রেত হয়, তবে তাহাকে রাণীর অমুমতি প্রার্থনা করিতে বল ।”

রাজা বিষমভাবে মন্তক সঞ্চালন করিলেন; বলিলেন, “উমা অমুমতি চাহিলে অবশ্য অমুমতি পাইবে । কিন্তু যে দয়া হৃদয় হইতে স্বতঃ উৎসারিত হয় না, সে দয়া অপমান । আমি বৃদ্ধ পুরোহিতের কথা—শোকাতুরা বালিকাকে সে দয়ার ভাগী করিতে পারিব না । তাহাকে সে অপমান হইতে রক্ষা করাই রাজার কর্তব্য ।”

শঙ্করসিংহ আর কোন কথা বলিলেন না । তিনি আর কি বলিবেন? রাজার কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইল ।

কিছুক্ষণ কেহই কোন কথা কহিলেন না । রাজা ভাবিতে লাগিলেন । তিনি এমনই তন্ময়ভাবে চিন্তাবিষ্ট ছিলেন যে, শঙ্করসিংহের কণ্ঠস্বরে চমকিয়া উঠিলেন । শঙ্করসিংহ কহিলেন, “যদি আপনি অমুমতি করেন, তবে বালিকাকে পুরোহিত মহাশয়ের প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত আমার গৃহে লইয়া রাখিবার প্রস্তাব করি ।”

রাজা চিন্তিত ভাবে বলিলেন, “কাহার নিকট প্রস্তাব করা যাইবে?”

“এখন তাহার আত্মীয়দিগের নিকটেই প্রস্তাব করিয়া দেখিতে হয়।”

“আমি কিছু স্থির করিতে পারিতেছি না। বালিকা এ প্রস্তাবে সম্মত হইবে কি না, জানি না। তাহার আত্মীয়গণ কি কোনরূপ দায়িত্ব লইতে প্রস্তুত হইবেন? আমার এখন কর্তব্য কি?”

শঙ্করসিংহ ভাবিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে রাজা বলিলেন, “চল, উভয়ে একবার পুরোহিতের গৃহে ঘাট। তথায় অবস্থা বুঝিয়া যে ব্যবস্থা হয়, করা যাইবে।”

রাজা প্রতীহারকে ডাকিয়া তাঁহার জন্ত ও শঙ্করসিংহের জন্ত দুইটি অশ্ব সজ্জিত করিতে আদেশ করিলেন।

প্রতীহার জিজ্ঞাসা করিল, “সঙ্গে কয়জন রখী যাইবে?”

রাজা বলিলেন, “সঙ্গে কাহারও যাইবার প্রয়োজন নাই।”

প্রতীহার চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে প্রতীহার ফিরিয়া আসিয়া আনাইল, অশ্ব সজ্জিত হইয়াছে, প্রাঙ্গণে উপস্থিত।

রাজা প্রস্তুত হইয়া ভিলেন; এটো কথা শুনিয়া প্রাঙ্গণমুখগামী হইলেন। শঙ্করসিংহ তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

উভয়ে অশ্বারোহণে পুরোহিতপল্লীতে চলিলেন।

অশ্বারূঢ় পুরোহিতের গৃহদ্বারে দণ্ডায়মান হইলে নানা গৃহ হইতে অনেকে সেই গৃহদ্বারে আসিয়া উপনীত হইলেন। রাজা অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অন্তরঙ্গ করিয়া বালিকার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজার আগ্রহ দেখিয়া সকলেই এমন ভাব দেখাইতে লাগিলেন, যেন সকলেই বালিকার চুঃখে কাতর। কিন্তু তাহা না হইলে, তাঁহারা সেই শোকাতুরার, শুভাগা করা দূরে থাকুক, সংবাদও লইতেন কি না সন্দেহ। রাজা পূর্ণাদিন যাঁহাদিগের উপর বালিকার রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসার ফলে অবগত হইলেন, বালিকা এখন শাস্ত হইয়াছে; গত রাত্রিতে তাহার শুভাগার কোনরূপ ক্ষতি হয় নাই, বরং রাজার অনুগ্রহভাজন হইবার আশায় এত অধিক আত্মীয় আত্মীয়তা দেখাইয়াছেন যে, বালিকা বোধ হয় সান্নিধ্য ও শুভাগার আধিক্য ও আত্যাচারে বিভ্রত হইয়াছে।

রাজা পল্লীবৃক্ষদিগকে বলিলেন, “বৃক্ষ পুরোহিত মহাশয় কোথায়, কের

জানেন না । তাঁহার প্রত্যাবর্তন পর্য্যন্ত তাঁহার কণ্ঠার সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে ?”

কেহ তাহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন, কেহ বা তাঁহাকে নিজগৃহে লইয়া যাইতে চাহিলেন ।

সব শুনিয়া রাজা বলিলেন, “এ বিষয়ে বালিকাকে কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছেন কি ?”

সে কথা শুনিয়া এ উহার দিকে চাহিতে লাগিলেন । শেষে একজন বৃদ্ধ বলিলেন, “রাজন, পার্বতীর পিতার কতকগুলি বিশেষত্ব আছে । তিনি কোন বিষয়ে কাহারও সহিত পরামর্শ করেন না । তিনি অনেক সময় অপ্রিয় সত্য বলিয়া লোকের বিবাগভাজন হইয়েন । তিনি কখন কাহারও নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইয়েন নাই । তিনি কাহারও সাহায্য লইতে অনিচ্ছুক । তিনি যাইবার সময় কণ্ঠকে কিছু বলিয়া গিয়াছেন কি না—তাহা আমরা কেহ বলিতে পারি না । এ অবস্থায় এ বিষয়ে বালিকাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিবার, তাহা আপনি স্বয়ং জিজ্ঞাসা করিলেই ভাল হয় ।”

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, “বালিকা কি এক্ষণে বিষয়ে আপনাকে কিছু বলিবার মত শাস্ত হইয়াছে ?”

“হাঁ ।”

বৃদ্ধ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং অল্পক্ষণ পরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া রাজাকে জানাইলেন, বালিকা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ কারিতে প্রস্তুত ।

বৃদ্ধ পথ দেখাইয়া চলিলেন । শঙ্করসিংহ তাঁহার অনুসরণ করিলেন । আর ধাহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহ বা গৃহদ্বারেই দাঁড়াইয়া রহিলেন, কেহ বা গৃহপ্রাঙ্গণে, কেহ বা সোপানমূলে দাঁড়াইয়া পরস্পর নানা কথার আলোচনা করিতে লাগিলেন ।

রাজা পূর্বরাজিতে যে পথে গিয়াছিলেন, সেই পথে—পরিচ্ছন্ন সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া অলিন্দে উপনীত হইলেন ।

পার্বতী কক্ষমধ্য হইতে একখানি আসন আনিয়া অলিন্দে বিছাইয়া দিল ; রাজাকে বলিল, “দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে অন্ন আগনের অভাব । আপনি যেরূপ দয়া দেখাইয়াছেন, তাহাতেই আমি আপনাকে উপবেশনের অনুরোধ করিতে সাহস করিতেছি ।”

রাজা উপবেশন করিয়া বলিলেন, “তোমার কুষ্ঠিত হইবার কোনও কারণ নাই । পুরোহিতগৃহে আশীর্বাদই আমাদের পরম লাভ ।”

রাজা মুখ তুলিয়া দেখিলেন, দীপালোকে গত নিশায় যাহাকে বালিকা বলিয়া বোধ হইয়াছিল, সে কিশোরী। যৌবনের প্রথম জলোচ্ছ্বাস কেবল তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া দেহে সম্পূর্ণতার ও লাবণ্যের সঞ্চার করিতেছে; কিন্তু সে জলোচ্ছ্বাস এখনও তাহার বালিকা-হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাহার বাক্য ও ব্যবহারে বালপুলভ সরলতা ও সঙ্কোচহীনতা সপ্রকাশ। পার্শ্বতী শান্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহার অন্তরের শোক কেবল সংযত হইয়াছে—অপনীত হয় নাই। তাহার মুখ-ভাব দেখিয়া বর্ষগের অব্যবহিত পূর্বে বর্ষার সজলজলদজালবৃত্ত, স্বচ্ছাঙ্গকার আকাশের কথা মনে হয়। সে মুখভাব বিধানে তেমনই স্বচ্ছাঙ্গকার; কোমলতায় তেমনই স্নিগ্ধমধুর; আপনাতে আপনি তেমনই সম্পূর্ণ; পূর্ণতায় তেমনই গৌরবায়িত। রাজার পক্ষে সে এক নূতন অমুভূতি। তিনি পার্শ্বতীকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তাঁহার মনে হইল, পুরোহিতের পুণ্য-প্রভাব ব্যতীত অক্ষুণ্ণ সরলতার এ প্রতিমা এমন পুণ্যজ্যোতিসমুজ্জ্বল থাকিতে পারিত না।

রাজা বলিলেন, “তুমি হৃদয় শাস্ত করিয়াছ দেখিয়া আমি অত্যন্ত সুখ হইয়াছি।”

পার্শ্বতী বলিল, “রাজন, পিতা উপদেশ দিয়াছেন, চিত্তবৃত্তি সংযত করিবে—ভাবের প্রভাবে আপনার হৃদয় চঞ্চল হইতে দিবে না। কিন্তু মাতৃয় অনেক সময় আপনাকে আপনি সংযত রাখিতে পারে না।”

“সত্য। তিনি জ্ঞানগাভীর্যে অবিচলিত। কয়জন তাঁহার মত হইতে পারে?”

তাঁহার পর রাজা বলিলেন, “তাঁহাকে সংবাদ দিবার অচ্চ আমি তাঁহার সম্মান লইয়াছি।” কেহই সম্মান দিতে পারেন না। তিনি না আসা পর্যন্ত তুমি কি করিবে?”

পার্শ্বতী বলিল, “তাঁহার নির্দিষ্ট কার্যাই করিব। কেবল যে নির্দিষ্ট কার্য মৃত্যু আর করিতে দিবে না, তাহাই অসমাপ্ত রহিবে।” বলিতে বলিতে পার্শ্বতীর কণ্ঠ বাষ্পোচ্ছ্বাসে রুদ্ধ হইয়া আসিল।

রাজা কিছুক্ষণ মৌন রহিলেন।—তাঁহারও মুখে কণা সরিতেছিল না। তাঁহার পর তিনি বলিলেন, “তুমি একাকিনী এই গৃহে থাকিবে?”

পার্শ্বতী বলিল, “অজ্ঞাথা পিতার আদেশ লঙ্ঘন করা হইবে।”

“শঙ্করসিংহের পিতা পুরোহিত মহাশয়ের বিশেষ মেহভাজন ছিলেন। যদি প্রাসাদে যাইতে তোমার ইচ্ছা না হয়, শঙ্করসিংহের গৃহে যাইলে হয় না? তথায় তোমার যত্ন ও শুশ্রূষা হইবে; তোমার পক্ষে এখন দুই-ই আবশ্যক। তাহার পর পুরোহিত মহাশয় আসিয়া যেরূপ ব্যবস্থা হয়, করিবেন।”

“আমার জন্ম কিছুই প্রয়োজন নাই। বিশেষ পিতার অনুমতি ব্যতীত গৃহত্যাগ আমার পক্ষে অসম্ভব। এ বিষয়ে আমাদের উভয়ের প্রতি পিতার বিশেষ আদেশ ছিল। একজন সে অনুমতির অতীত হইয়াছে। আমি—” পার্শ্বতীর নয়ন দিয়া দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

রাজা তাহাকে সে অপ্রিয় প্রশ্ন ভুলাইবার জন্ত বলিলেন, “আমাকে তোমার জন্ম আর কি করিতে বল ?”

পার্শ্বতী বলিল, “আমার কিছুই প্রয়োজন নাই।”

“কিছুই না ?”

“আমার জন্ম কিছুই না।”

“আর কাহারও জন্ম কি কিছু করা প্রয়োজন ?”

“আপনি স্বয়ং প্রজার দুঃখ দেখিয়াছেন। রাজ্যের ব্যাধিত, রক্ত, অসহায়— যদি সম্ভব হয় ইহাদের জন্ম একটি আশ্রম সংস্থাপিত করিলে আমার শোকতপ্ত হৃদয় কিছু শান্তি পাইবে।”

“তাহাই হইবে।”

পার্শ্বতীর নয়ন আনন্দে উজ্জল ও কৃতজ্ঞতার অশ্রুসজল হইয়া উঠিল।

সুখ-শয্যা ।

—:~::~:—

সে শয্যা সুখের নহে প্রেম যা'র, পরে

আপনার সিন্ধু তরু বিস্তারে প্রথম ;

বিরহের তপ্তখাস উষ্ণ যবে করে

তখন সে প্রেম-শয্যা হয় মনোরম ।

শ্রীবিজুতিভূষণ মজুমদার ।

আজমীর।

—:—

এদেশে ইংরাজের আগমনকালে ইংরাজের অমৃতম সহায় কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি বলিয়াছিলেন :—

কাঞ্চীপুর বর্জমান ছ'মাসের পথ।

ছয় দিনে উত্তরিল অশ্ব মনোরথ।

ইংরাজের আগমনের শতবর্ষমধ্যে ভারতে যে বাম্পীয়রথের আবির্ভাব হইয়াছে তাহাতে “ছ'মাসের পথ” ছয় দিনে অতিক্রম করা একান্তই সহজসাধ্য হইয়াছে। ভারতে এই রেলপথ-বিস্তার ইংরাজের বিরাট কীর্তি। ইহার কৃপায় পশু ও অনায়াসে পৰ্ব্বতলঙ্ঘন করিতে পারে। দেশদর্শনের এমন সুযোগ পরিত্যাগ করাই দুঃসাধ্য। আমি রাজপুতানা-দর্শনে ইচ্ছুক হইয়া যাত্রা করিলাম। রাজপুতানায় যাইতে হইলে দিল্লী বা টুওলা হইয়া যাইতে হয়। দিল্লীর পথে সুবিধা এই যে, যানপরিবর্তন করিতে হয় না। কিন্তু তাম্রমহল দেখিবার প্রলোভন সঞ্চরণ করিতে না পারিয়া আমি টুওলায় নামিয়া আগ্রায় গমন করিলাম।

আগ্রায় একটি সরাইয়ে উঠিয়া পথপ্রদর্শক সংগ্রহ করিয়া শাজাহানের মৃত্যুজয়ী প্রেমের পুত সুতি দেখিয়া আসিলাম। তাহার পর আগ্রা ত্যাগ করিয়া পরদিন প্রাতে রাজপুতানা-মালোয়া রেলপথে ভরতপুরে উপনীত হইলাম। এই ভরতপুর হইতেই রাজপুতানার প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। যতদূর দৃষ্টি চলে— অক্ষুর প্রান্তর ; মধ্য মধ্য ছ' একটি বাবলা গাছ সেই রসহীন ভূমি হইতে কোনরূপে রস সংগ্রহ করিয়া আশ্রয়ণ করিতেছে। বঙ্গদেশের আমায়মান বনানীর সৌন্দর্য বা সিদ্ধকুলের তালীবন-শ্রাম শোভা এ প্রদেশে নাই। প্রান্তর-দৃশ্য রক্ষ করিয়া চারিদিকে আরাবলী গিরিমালার অধরচুড়ী চূড়া রবিকরে বিচিত্রবর্ণে রঞ্জিত। এইরূপ দৃশ্যের মধ্য দিয়া পরদিন প্রাতে আজমীরে উপনীত হইলাম।

আজমীর ইংরাজাধিকৃত রাজপুতানার রাজধানী ; চীফ কমিশনারের শাসনাধীন। রাজপুতানার অবশিষ্ট অংশ বহু কবররাজ্যে বিভক্ত। তন্মধ্যে যোধপুর, জয়পুর, আলোয়ার, বিকানীর, উদয়পুর, কোটা, বুদ্ধি প্রভৃতি বিশেষ প্রসিদ্ধ। আজমীর চারিদিকে আরাবলী গিরিমালায় বেষ্টিত। উপত্যকায় নগর অবস্থিত। আজমীরের

পশ্চিমে তারাগড় । প্রবাদ, ১৪৮ খৃষ্টাব্দে রাজা অজ্ঞ প্রথমে পর্ব্বতের উপর ও পরে উপত্যকায় রাজধানী সংস্থাপিত করেন । কথিত আছে, তাঁহার নাম অনুসারে আজমীরের ও চৌহানবংশীয় পৃথীরাজার প্রধানা মহিষী তারা বাইএর নাম অনুসারে তারাগড়ের নামকরণ হয় । পর্ব্বতের গাভ্রদেশ হইতে আজমীরের উচ্চতা ১৪০০ ফিট । নগরের দৈর্ঘ্য প্রায় ৮০ একার । এখন পর্ব্বতের উপর ইংরাজ সৈনিকদিগের স্বাস্থ্য-নিবাস সংস্থাপিত হইয়াছে । পর্ব্বতে উঠিবার কয়টি প্রশস্ত পথ আছে । তন্মধ্যে “ত্রিকোনিয়া গেট” দিয়া যাইবার পথে “আড়াই দিনকা কোপড়া” দৃষ্টিগোচর হয় । ইহা পূর্বে একটি বৃহৎ জৈন মন্দির ছিল । আলাউদ্দীন খিলজী ইহাকে মসজিদে পরিণত করেন । ইহার নামকরণ সম্বন্ধে মতান্তর আছে । কেহ বলেন, ইহা আড়াই দিনে নির্মিত হইয়াছিল ; কেহ বলেন, হিন্দু-যবন-সংগ্রামে হিন্দুরা পরাজিত হইলে মুসলমানগণ আড়াই দিনে মন্দিরটি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল । দুই মতের কোনটি সত্য, স্থির করা দুষ্কর । পূর্ব্ববর্তী মন্দিরের প্রায় সবই বর্ত্তমান, কেবল মূর্ত্তিগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে । খণ্ডিত-হস্ত-পদ-নাসিকা অনেকগুলি মূর্ত্তি এখন সংগ্রহাগারে সংরক্ষিত হইয়াছে ।

আজমীরের প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ; সহরটি সুন্দর । চারিদিকে গিরিমালা । সহরটি প্রাকারবেষ্টিত । রাজপথ প্রশস্ত ও পরিচ্ছন্ন । ষ্টেশনের সম্মুখেই “মাদার দরওয়াজা”—বাজার ও বোম্বাই অঞ্চলের মুসলমান সওদাগরদিগের দোকান । সহরের পশ্চিমভাগে “দৌলতবাগ” ও “দৈকসরবাগ” মনোহর উদ্যান । “দৌলত-বাগের” ভিতর দিয়া “বারুয়ারী” বা “আনামাগরে” যাইবার পথ । কথিত আছে, পুরাকালে আনা নামক হিন্দু মূপতি এই বিধৃত দীর্ঘিকা খনিত করাইয়া-ছিলেন । তখন ইহার পরিধি সাত মাইল ছিল । এখানে ইহার কতক অংশ শুষ্ক—পরিধি চারি মাইলে পর্য্যবসিত । এই দীর্ঘিকাকূলে খেতমর্ম্মরে রচিত “বারুয়ারী”—উদ্যানবাটিকা । জাহাঙ্গীর এই আনামাগরের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার জন্ত বহুবারে এই উদ্যানবাটিকা নির্মিত করাইয়াছিলেন । এই স্থানেই ১৬৫১ খৃষ্টাব্দে (২৩শে ডিসেম্বর) ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমসের রাজত্বকালে ভারতে প্রথম ইংরাজ দূত সার টমাস রো জাহাজীবেদ দরবারে আসিয়াছিলেন । এই “বারুয়ারীর” নির্মাণ-কৌশল বিস্ময়কর । কড়ি বরগা নাই ; বৃহৎ চতুর্কোণ প্রস্তরখণ্ডগুলি কি প্রকারে নিরবলম্বনভাবে এখিত, তাহা দেখিয়া বুঝা যায় না । ইহার কয়টি কক্ষে সংস্কার প্রয়োজন হওয়ায় লর্ড কার্জনের নির্দেশে বহুবারেও হানচু্যত প্রস্তরগুলি পূর্ব্ববৎ এখিত করা যায় নাই । দীর্ঘিকাটি অসম্পূর্ণ হইলে

এই উত্থানের শোভা সত্য সত্যই বর্ণনার অতীত হয়। দীর্ঘিকার দক্ষিণ পার্শ্বে কমিশনারের রেসিডেন্সি।

ভারতীয় রাজকুমারদিগের শিক্ষার্থ কর্তৃত মেও কলেজ আজমীরে অবস্থিত। লর্ড মেও ইহার ভিত্তিস্থাপন করিয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের সম্মুখে তাঁহার পূর্ণাবয়ব প্রতিমূর্তি সংস্থাপিত।

আজমীর মুসলমানদিগের প্রসিদ্ধ তীর্থ। ১২৩৫ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ বিন চিঙ্গি নামক একজন মুসলমান ফকির এই স্থানে বাস করিতেন। তাঁহার বিশ্বাস, অলৌকিক ক্ষমতায় মুক্ত মুসলমানগণ বহু অর্থব্যয় করিয়া তাঁহার সমাধির উপর একটি মসজিদ নির্মিত করিয়া দিয়াছেন। সমাধিকক্ষটি স্বর্ণাবৃত। এই “খোজা সাহেবের দরগা” মুসলমানতীর্থমধ্যে মক্কার অব্যবহিত পরবর্তী স্থান অধিকার করিয়াছে। নিঃশ্রম মুসলমানগণ মক্কা যাইতে না পারিলে এই স্থানে আসিয়া মনে করেন, মক্কাদর্শনের ফললাভ হইল। দরগায় জুতা পায় দিয়া যাওয়া নিষিদ্ধ; যুরোপীয়গণ কাপড়ের জুতা পরিধান করিয়া গমন করেন। প্রবেশপথের দ্বিতীয় তোরণের দুই পার্শ্বে দুইটি বৃহৎ ডেক্টি। প্রত্যহ প্রথমটিতে ১২৫ মণ ও দ্বিতীয়টিতে ৭৫ মণ খেচরায় প্রস্তুত হইয়া বিতরিত হয়। প্রত্যেকটিতে খেচরায় রন্ধনের ব্যয় ৩০০ হইতে ৫০০ টাকা। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে একটি প্রকাণ্ড পিষ্টল-নির্মিত বাড় ও নহবতমঞ্চে একটি জাটকা আছে। কথিত আছে, আলাউদ্দীন চিতোর জয় করিয়া তথা হইতে এই দুইটি জবা আনিয়াছিলেন। প্রতি বৎসর আবাড় মাসের শুক্লপক্ষে এই স্থানে একটি মেলা বসিয়া থাকে। তখন নানা স্থান হইতে মুসলমান তীর্থযাত্রীদিগের ও নর্ত্তকীদিগের সমাগম হয়।

আজমীরে আর উল্লেখযোগ্য স্থান কেবল “বিচ্‌লা” বা “বিশাল্যা” নামক বৃহৎ জলাশয়। জনশ্রুতি, ১০৫০ খৃষ্টাব্দে বিশাল দেও নামক রাজপুত্র রাজা ইহার প্রতিষ্ঠা করেন।

সহরে কতকগুলি প্রবাসী বাঙ্গালী বাস করেন। কতিপয় বাঙ্গালী মুন্সেফ চেষ্টায় এই দূর দেশেও একটি নাট্যসমিতি, একটি পাঠাগার ও একটি বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ষ্টেশনের সম্মুখেই একটি হিন্দু হোটেল, একটি সরাই, একটি ডাকবাংলো ও অফিসারস্‌ ক্লাব অবস্থিত।

পুষ্করতীর্থ আজমীর হইতে সাত মাইল দূরে। পক্ষীগাজে অপ্রশস্ত পথ ঘুরিয়া ঘুরিয়া গিয়াছে। পুষ্করে একটি হ্রদ ও হ্রদকূলে কতকগুলি দেবমন্দির

বিদ্যমান । মন্দিরগুলির মধ্যে ব্রহ্মার, সাবিত্রীর, বজ্রনারায়ণের, বরাহের, শিবের ও অটখটেশ্বর মহাদেবের মন্দির প্রসিদ্ধ । পুষ্কর শব্দের অর্থ পদ্ম । পদ্মপুরাণান্তর্গত পুষ্কর-মাহাত্ম্যে ইহার সবিশেষ উল্লেখ আছে । পুষ্করস্থানের পূর্বে সাবিত্রী দর্শন করিতে হয় । পুষ্কর হইতে সাবিত্রীমন্দির প্রায় এক জোশ দূরে, পর্ব্বতোপরি অবস্থিত । পূর্বে পাণ্ডারা অর্ধের জন্ত অত্যন্ত উৎপীড়ন করিত, সেইজন্ত আজমীরের পরোলোকগত জনকীনাথ সেন, পরলোকগত প্রসন্নকুমার চক্রবর্তী ও শ্রীযুক্ত হরিমোহন সেন সাবিত্রী-তীর্থে একখানি প্রস্তরফলকে সোঁদিত করিয়া দিয়াছেন যে, কি ভদ্র, কি অভদ্র, কি ধনী, কি নিধন—সকল হিন্দুকেই সিন্দুরের জন্ত পাঁচ সিকা হিসাবে দিতে হইবে ।

কার্ত্তিকী পূর্ণিমার সময় পুষ্করতীর্থে সপ্তদিনব্যাপী একটি মেলায় অধিবেশন হয় ।

শ্রীশরচ্ছত্র মিত্র ।

জিজ্ঞাসা ।

—••*••—

	কি পুর বাজা'লে হৃদয়ে আগার,
	হৃদি-বল্লভ মোর ?
আমি	সারা দিনমান
	শুনি সেই গান,
	নয়নে স্বপন ঘোর ।
আমি	'সারানিশি জাগি
	সেই গান লাগি'
	বুঝিতে পারি না, আকুল নয়নে
	কেমন এ নয়ন-মোর ।

কি ফুল ফুটা'লে জীবনে আমার,
 হে মোর জীবনধন ?
 ত'র মদির সুবাসে
 এ জীবনে ভাসে
 সুখ-আশা অগণন ;
 আমি লাজে—সুখে মরি—
 আপনা পাশরি,
 কেমনে গোপনে রাখিব আমার
 হরষ-আকুল মন ।

কি আলো জালিলে পরাণে আমার,
 টুটিলে আঁধাররাশি ?
 ত'র কনক কিরণে
 গগনে গগনে
 ফুটিলে দিনের হাসি ।
 সেই আলোকে চাহিয়া
 দেখি, মোর হিয়া
 আপনি চলিছে, হে পরাণ-প্রিয়,
 তোমারি চরণে ভাসি' ।

কি প্রেম ঢালিলে, হৃদি-বল্লভ,
 আমার হৃদয়মূলে ?
 তাই পূর্ণ আমার
 হৃদি চারিধার
 বিকাশিত শতফুলে ;
 তাই গিক কল কল
 হৃদয়ে কেবল ।

শুধু হৃদয়ে এ প্রেম ঢালিলে
 হে প্রিয়, কি ভুলে ভুলে ?

আশার সমাধি ।

১

আমরা সেবার পুরীতে ছিলাম । আমার ভগিনী বহুদিন ম্যাগ্নেট্রিয়ায় ভুগিতেছিলেন, তাঁহার সিদ্ধ-তীর-বাসের ব্যবস্থা হইলে, আমাকেই অভিভাবকতার ভার লইতে হইল । আমার ভগিনীপতি ডাকবিভাগের কর্মচারী, তাঁহার পক্ষে ছুটি পাওয়া একরূপ অসম্ভব । আমি তখন বি. এ. পরীক্ষা দিয়া “বেকার” অবস্থায় বসিয়া আছি । কাষেই পরীক্ষার কঠিন পরিশ্রমের পর শ্রাস্ত্যভঙ্গের নিকট সম্ভাবনা থাকায় পুরীতে ভগিনীর রক্ষণাবেক্ষণ ও সাহায্যের ভার যখন আমার স্বন্ধে ন্যস্ত হইল, তখন আমি কাহাকেও বুঝাইতে পারিলাম না যে, আমার শ্রাস্ত্যভঙ্গের সম্ভাবনা নিতান্তই অল্প ; যেহেতু পরীক্ষার অন্ত যে সকল ছাত্র দিবাবাত্রি পরিশ্রম করে, আমি সেই অল্পবুজি বালকদিগের দলভুক্ত নহি । পরীক্ষাটা নিতান্ত না দিলে নহে, এই মনে করিয়া, কর্মফলে সম্পূর্ণ অনাসক্ত ভাবেই দিয়াছিলাম ; সুতরাং, আমার শ্রাস্ত্য পূর্বাপেক্ষাও পরিপুষ্ট হইতেছে, ইত্যাদি নানা যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়া যখন কোনও ফলই হইল না, তখন কাষেই আমাকে একদিন বাধ্য হইয়া জনিষপত্র গুছাইয়া পুরী অভিমুখে রওনা হইতে হইল ।

পুরীতে গিয়া প্রথম যখন সমুদ্র দর্শন করিলাম, তখন আমার আনন্দের সীমা ছিল না । ঐ শ্রান্তিশূন্য চঞ্চলতা, ঐ নিবিড় বিজ্ঞনতা, ঐ সীমাহীন বিশালতা আমাকে বিস্মিত, পুলকিত, শুদ্ধ করিয়া রাখিত । আমি গারাদিন সমুদ্রের সৈকতে, বালুরাশির মধ্যে, নহে ত, বারান্দায় আরামকেদারায় বসিয়া সমুদ্রের বিচিত্র লীলা দেখিতাম । অন্ধকারে যখন আকাশের বিশাল কক্ষটি পূর্ণ হইয়া যাইত,—যখন নিকটের বস্তুও দৃষ্টিগোচর হইত না, তখনও আমি অতৃপ্ত নয়নে সিঁদুর দিকে চাহিয়া থাকিতাম । সন্ধ্যার অন্ধকারে তীরসমিহিত ফোনিলোচ্ছল উর্ষিগুলি দীর্ঘ—অতি দীর্ঘ রজনীগন্ধার মালার মত তটবক্ষে বিলম্বিত হইত । আমার সেই তটবিলয় কুটীর হইতে আমি যেন তাহার সৌরভ পর্য্যন্ত আশ্রণ করিতে পাইতাম । চন্দ্রোদয়ে অশুরাশি যখন ক্ষীণ ও চঞ্চল হইয়া উঠিত, তখন আমি পুলকে আত্মহারা হইয়া যাইতাম । চন্দ্রালোকে সমগ্র তটভূমি শুভ্রবাসে আচ্ছাদিত হইত, তমালতালীবনরাজি সেই বসনপ্রাপ্ত অলঙ্কৃত করিত ।

নিশীথের উৎকট নির্জনতার মধ্যে সিঁদুর সেই দিগন্তপারী গর্জনে গঙ্গীতের মুচ্ছ না উঠিত, আর আমি উন্মুক্ত বাতায়নপথে সে দৃশ্য দেখিয়া—সেই গঙ্গীর ধ্বনি শুনিয়া মুগ্ধ ও মুক হইয়া রহিতাম। বঙ্গ ও স্বজনদিগের মধ্যে আমি উদ্দামপ্রকৃতি বলিয়া পরিচিত ছিলাম। কি নিগূঢ় মজের বলে আমার সেই তুচ্ছ উচ্ছৃঙ্খলতা, এই উদ্দাম, বাধাহীন, নিরবচ্ছিন্ন উচ্ছৃঙ্খলতার নিকট আত্মোৎসর্গ করিল, তাহা আমি বলিতে পারি না; আমার এই সংযত, শান্ত, শিষ্ট ভাব দেখিয়া ভগিনী আমাকে অনেক সময়ে “কনি,” “দার্শনিক” ইত্যাদি আখ্যায় বিভ্রত করিয়া তুলিতেন। তাহার একটু কারণ ও যে না ছিল, এমন নহে। আমি ইহারই মধ্যে প্রায় এক দিস্তা কাগজে কেবল কবিতাই লিখিয়া ফেলিয়াছিলাম। সেগুলি তাঁহাকে অবসন্ন মত পড়িয়া শুনাইতাম। আমার ভগিনী যদিও আমার কবিতার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন না, তাহা হইলেও তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইত, যে কবিতাগুলিতে যথার্থ মৌলিকতা ও ভাবুকতা ছিল।

আমার কবিতার আর একজন সমালোচক হঠাৎ জুটিয়া গেলেন; আমাদের বাড়ীর অনতিদূরে একজন ভদ্রলোক সপরিবারে বায়ু পরিবর্তনের জন্য আগিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহার কন্যা ননীবালা একবার আমার ভগিনীর জ্বর হইলে প্রত্যহ সংবাদ লইতে আসিতেন। সমুজ্জীৱেই ইহাদের সহিত আমাদের আলাপ হয়। ভদ্রলোকটি আমার ভগিনীপতির অফিসেই কাণ্ড করিতেন, সম্প্রতি অল্প বিভাগে গিয়াছিলেন। ইহাদের অমায়িকতায় অল্পদিনের মধ্যেই আমরা মুগ্ধ হইলাম; আমার ভগিনীর অশ্রুণের সময় সূর্যকাস্ত বাবু ও তাঁহার পত্নী নিত্যন্ত আত্মীয়ের মত আমাদের তত্ত্বাবধারণের সমস্ত ভারই গ্রহণ করিয়াছিলেন। সূর্যকাস্ত বাবুর অষ্টাদশ বর্ষীয়া অনিবারিত কন্যা ননী আমার ভগিনীকে “দিদি” বলিয়া ডাকিতেন, এবং আমার সম্মুখে আসিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেন না। একদিন আমার ভগিনীর সহযোগিতায়, তাঁহার নিকট আমার কবিতা ধরা পড়িয়া গেল। আমি মধ্যাহ্নে বারান্দায় বসিয়া একাধিচ্ছিন্ন সমুদ্রের বর্ণবৈচিত্র্য দর্শন করিতেছি ও সেই অনির্ধ্বজনীয় বিশালতাকে জায়া ও ছন্দের ক্ষুদ্র গ্রন্থিতে বান্ধিবার চেষ্টা করিতেছি, এমন সময়ে আমার ভগিনী ও ননী আসিয়া সহসা আমার চিন্তাসূত্রকে বিখণ্ডিত করিয়া দিলেন। আমি আত্ম-গোপন করিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু ব্যর্থ চেষ্টা। ভগিনী হাসিয়া উঠিলেন। আমি অপ্রতিভ হইলাম, ননীর চক্ষু কিন্তু আমার কবিতার দিকে; কেতুহলের দীপ্তি সে কমনীয় মুখখানিকে আরও সুন্দর করিয়া তুলিয়াছিল। আমার হুই একটি

কবিতা পাঠ করিবার জন্ত যখন আমি আহুত হইলাম, তখন বাস্তবিকই আমার সর্বশরীর ধর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল। আমার স্বাভাবিক সপ্রতিভ ভাব কোথায় চলিয়া গেল। আমি নিতান্তই অনিচ্ছা জানিলাম। আমার ভগিনী বলিলেন, “ভবে থাক। একটা কিছু ভাল দেখা হইলে মোহিন্ আমাদের পড়িয়া শুনাইবে, এই সৰ্ব্বোচ্চ আজ আমরা মোহিন্কে মাপ করিতে রাজি আছি। কি বল, ননী ?” উত্তরের জন্ত আমি ননীর দিকে সোৎসুখ ভাবে চাহিলাম। যাহারা কাব্য ও কবিতা লিখে, এবং যাহারা গান গাহিতে জানে তাহারা প্রথম আস্থানে যুগপৎ ইচ্ছা এবং অনিচ্ছার দোলায় জুলিতে থাকে। ইচ্ছা, কবিতা পড়িয়া বা গান গাহিয়া শুনা ; কোনরূপে আত্ম-পরিচয় দেয় ; কিন্তু লজ্জা—সঙ্কোচ সে ইচ্ছাকে কুণ্ঠিত করিয়া তুলে। তখন শ্রোতার পক্ষে একটু আগ্রহ ও সনির্বাক অমুরোধ বড়ই মিষ্ট লাগে। ভগিনীর এই উপেক্ষাব্যঞ্জক উক্তিতে আমি মোখিক সাগ্রহ সন্মতি জানাইলেও মনে মনে সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছিলাম না। তাঁহার সঙ্গিনী কিন্তু পূর্বেরই ছায় আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, আমি তাঁহাকে বিমুগ্ধ করিতে পারিলাম না। প্রথমে আমার ‘সিদ্ধাস’ নামক কবিতাটি পাঠ করিয়া তাঁহাকে শুনাইলাম। তাহার পর ‘জলদি-গীতি’ ‘জলকল্লোল’ প্রভৃতি এক এক করিয়া তাঁহাদিগকে শুনাইতে লাগিলাম। নিব্বারের দ্বারায় ছায় আমার কবিতার উৎস কি এক রহস্তের প্রভাবে স্বতঃই উৎসারিত হইতে লাগিল। আমার শ্রোতাদিগের প্রশংসোজ্জ্বল নেত্রো আমার কবিতার চরিতার্থতা দেখিতে পাইলাম। আমি এতই তন্ময় হইয়া গিয়াছিলাম যে, মধ্যাহ্নের কড়ি মধ্যম কখন অপরাহ্নের নিখাদে গিয়া মিশিল, তাহা আমার আদৌ খেয়াল ছিল না। আমার ভগিনী বলিয়া উঠিলেন, “ভাল, ননী, আজ বৃষ্টি আর বেড়াইতে যাইতে হইবে না ? সব কবিতার পাঠ্য পড়িয়া আমার মত অরসিকায় নিরুপায় দেখছি।” তাঁহার সঙ্গিনী ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িলেন। আমি আমার “দপ্তর” বাদিতে মনোযোগী হইলাম। ননী যাইবার সময় আমার ভগিনীকে বলিলেন, “মোহিনী বাবু ত স্মরণ কবিতা লিখেন ; ইনি কালে একজন বিখ্যাত কবি হইবেন, সন্দেহ নাই।” আমার ভগিনী একটু হাসিলেন। বলা বাহুল্য, আমি গলিয়া গেলাম। সেই হইতে ননী আমার কবিতার নিয়মিত সমালোচক হইলেন। আমি আমার সমস্ত কবিতাগুলিই তাঁহাকে শুনাইতাম, তিনিও নিঃসঙ্কোচে ও মুক্তকণ্ঠে সেগুলির প্রশংসা করিতেন। তাঁহার প্রশংসায় আমি উৎফুল্ল হইতাম, এবং প্রতিভার অবশ্য প্রাপ্য—শ্রদ্ধা, পূর্ণমাত্রায় আদায় করিয়া লইবার জন্ত ব্যগ্র হইতাম।

সূর্য্যকান্ত বাবুর পরিবারের সহিত, আমাদের পরিবারের সম্বন্ধ ক্রমশঃ ঘনীভূত হইতে লাগিল। সূর্য্যকান্ত বাবু ভ্রাতৃ; তিনি অতি অমায়িক ও সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার সৌম্য, সুন্দর, বাগ্ধ মূর্তিতে মধ্য ও মহাপুত্ৰীত মঙ্গলকাশ ছিল। তাঁহার হাসিতে বাজকোচিত সরল প্রমুদতা মুটিয়া উঠিত। আমি যেমন তাঁহার ব্যবহারে তৃপ্ত হইয়াছিলাম, তিনিও আমার প্রাণে মৈত্রপ তুষ্ট ছিলেন। একবার মণ্ডাহাস্ত ভ্রমণে আমার ভগিনীপতি পুনর্বার আমিলে সূর্য্যকান্ত বাবু তাঁহার নিকট শতমুখে আমার প্রশংসা করিয়াছিলেন। আমি আমার কাব্যকলা ছাড়িয়া, অনেক সময় তাঁহাদের প্রীতি আমার কর্তব্য করিয়া উঠিতে পারিতাম না। কিন্তু তাঁহারা অক্লান্তভাবে আমাদের স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের জন্য চেষ্টা করিতেন। এইরূপ ভাবে অনতিদীর্ঘকালমধ্যে আমাদের প্রীতি-বন্ধন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতে চলিল। যখন সমুদ্রতীরে বেড়াইতে যাইতাম, তখন আমি আর ননী হয়ত সূর্য্যাস্তের সৌন্দর্য্য, গোপুর্ণিতে রক্ত মেঘের নিম্নে শান্ত সমুদ্রের সৌন্দর্য্য, বিরল-নক্ষত্র বিশাল গগনের সৌন্দর্য্য—এই সকল লইয়া আলোচনা করিতাম। আমি উপদেষ্টার স্থায় আমার মতগুলি দাও করিতাম, ননী শিখার স্থায় সে সকল শুনিয়া যাইতেন। তাঁহার কাবিন্দ্রমণী কল্পনাকে আমি অজ্ঞানশ্রীর স্তর দিয়া, লহরীর সোপান দিয়া, চক্রাকরণের উপর দিয়া, অন্তঃপ্রত্যয়-মালারূপ বলাকাক্ষের স্রুতাম গতির মধ্য দিয়া ছুটাইয়া দিতাম; এবং আপনার শ্রেষ্ঠ উপলব্ধি করিয়া মনে মনে গর্জ অল্পভব করিতাম। ভ্রাতৃ পরিবারে লাগিতা, সূর্য্যকান্ত বাবুর স্থায় পিতার আদর্শ ও সংসর্গে বর্দ্ধিতা ননীবালা যে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিতা ছিলেন, তাহা আমার বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। সেই জন্যই তাঁহার স্থায় ভক্ত সঙ্গিনী ও সমালোচক প্রাপ্ত হইয়া আমার গর্জ সর্বতোভাবে চারভাণ হইতেছিল। অপরাহুটী অনেক সময়ে আমরা এক সঙ্গে কাটাইতাম। কোন কোন দিন সমুদ্রবক্ষে মেঘের লীলা দেখিবার জন্য আমরা সমুদ্রকূলে বসিয়া থাকিতাম, এবং ছোট ছোট ছেলে মেয়ে ও আমার ভগিনীকে লইয়া সূর্য্যকান্ত বাবু, আমাদেরকে সম্বর আসিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুবাদ করিয়া, গৃহে ফিরিতেন। আমরা মেঘাকারে শ্রামায়মান গোপুর্ণিতে নিঃস্রব্দ মৈকতে বসিয়া থাকিতাম। এবং ক্যাক্টাস্-বেষ্টিত রাজপথ বাহিয়া বিদ্রাঘমকিত সন্ধ্যায় গৃহে ফিরিতাম।

আমি প্রত্যুষে সমুদ্রদর্শন করিতে যাইতাম। বহুদূর জলে থাকিয়াও আমার মনের পিপাসার নিবৃত্তি হইত না। এই যে দিগন্তপ্রসারিত লবণাসুপ্রাণ,

যাহা বিপুল রাহুর জ্বাল ক্রমক্রমে শতশ্রামমা পুণিবীকে ত্রিপাদ গ্রাস করিয়া পাদমাত্র অবশিষ্ট রাখিয়াও শাস্তি লাভ করে নাই, তাহাকে শরীরের অতিনিকটে পাইয়া আমি বড়ই প্রীতি লাভ করিতাম। যখন ঢেউ এর পর ঢেউ আসিয়া আমাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত, তখন আমি দক্ষিণমেরু পর্গান্ত বিশ্রান্ত এক সচেতন, প্রবুদ্ধ সত্তার স্পর্শ অনুভব করিতাম। যে দিন মগ্নজ্ঞান করিতে না পাইতাম, সেদিন যেন আমার আর ক্ষুণ্ণি বোধ হইত না।

সূর্য্যকান্ত বাবু যখন জন্মিলেন যে, আমি একজন নিত্যস্মায়ী, তখন তিনিও নিত্য আসিতে লাগিলেন। তাঁহার সঙ্গে ননী ও তাঁহার মাতা আসিতেন। শেষে সব দিন হয়ত সূর্য্যকান্ত বাবুর এবং তাঁহার জীর আসা ঘটিয়া উঠিত না; কেবল ননী আমার ভগিনীর সঙ্গে সান্নিধ্য আসিতেন। আমিও তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতাম।

সকালে বৈকালে এইরূপ প্রতীক্ষা করিয়া করিয়া প্রতীক্ষা করাটাই আমার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু একদিন বুঝিতে পারিলাম যে, এ প্রতীক্ষা অভ্যাসের ফলমাত্র নহে—ইহার মধ্যে এমন একটা কিছু আছে, যাহা একবার ছাড়িয়া দিলে মুহূর্ত্তমধ্যে সমস্ত হৃদয় প্রাবিত করিয়া ফেলিলে। প্রথমে আমি আপনার কাছে ধরা দিতে চাহি নাই, নানারূপ কারণ খুঁজিয়া আমার এই ভিত্তরীপনা উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিলাম; সাহিত্যমোদ, পুরীত নির্জ্ঞনতা, উভয়ের মতের প্রতি পরস্পরের সহানুভূতি ইত্যাদির আশ্রয় লইয়া যথার্থ কারণটাকে চাপিয়া রাখিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু একবার যখন ননী অসুস্থ হইয়া বাড়ীর বাহিরে আসিতে নিষিদ্ধ হইলেন, তখনই আমি বুঝিতে পারিলাম যে, আমার অজান্তসারে আমার হৃদয় আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে। রমণীর রূপলাবণ্য আমার চিত্তে রেখাঙ্কিত করিতে পারিত না। আমি একটু আধটু সাহিত্য-চর্চা করিলেও এ পর্য্যন্ত কখনও সৌন্দর্য্যচর্চা করি নাই। কয়েকই প্রথম যখন আমি আপনার কাছে ধরা পড়িলাম, তখন মনে যে ভাব হইয়াছিল, তাহার সহিত আনন্দের সম্পর্কমাত্র ছিল না। আমি ভয়ে ও বিশ্বয়ে অভিভূত হইলাম। কেমন করিয়া আমি আত্মবিক্রম করিলাম, কোন্ মুহূর্ত্তে বিস্তৃত কাব্যচর্চা প্রেমের পূর্ব্বরাগে পরিণত হইল, কোন্ ছুটে দেবতা আমার এই দুর্ব্বল হৃদয় লইয়া এমন তীব্র পরিহাস আরম্ভ করিলেন, তাহাই ভাবিতে ভাবিতে আমি অস্থির হইয়া উঠিলাম। কোথায় গেল আমার কাব্যকলা, কোথায় গেল আমার নূতন নূতন সৌন্দর্য্যসৃষ্টি। কোথায় একজন বিখ্যাত কবি হইবার আয়োজন করিব না,

কোণায় বিরহের তাড়নায় 'পতঙ্গবৎ বহিমুখং বিবিক্ষুঃ' হইয়া সকল আশার অবসান করিতে বসিলাম। ইংরেজিতে একটা কথা আছে যে, গভীর এ-এ হাত্মাস্পদের মধ্যে পান্থিকমাত্র ব্যবধান। আমার ভাগ্যে তাহাই ঘটিল।

যাহা হউক, ননীরা রূপলাবণ্য সম্বন্ধে আর আমি উদাসীন থাকিতে পারিলাম না। তাঁহার সুবিন্যস্ত ক্রমবিকাশপাশ হইতে চঞ্চল চরণক্ষেপণদ্বী পর্যন্ত সমস্তই আমার নয়নে অভূতনীয় সুন্দর বোধ হইতে লাগিল। প্রেমাস্পদের মুদ্র মুদ্র ক্রটি গুলি পর্যন্ত চিত্ত আকর্ষণ করে। আমিও সম্পূর্ণরূপে আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। যদি যুদ্ধের জন্তও সে আকর্ষণের একটি ক্ষুদ্র প্রতিবিম্ব তাঁহার নয়নে বা ভঙ্গিতে দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলে আমার জীবনের সমস্ত সাধনার সফলতা লাভ হইত। কিন্তু কখনও সে ভাবটি দেখিতে পাই নাই। ননীরা কথাবার্ত্তায়, পরিহাসকৌতুকে এমন কিছুই কখনও প্রকাশ পায় নাই, যাহার প্রান্ত্রে আমার আশার অতি দীন দুগ্ধটি বাদিয়া দিতে পারি। সুতরাং আমি বুঝিলাম, নিষ্কল্য প্রেমের তুষানল বিদ্যাতা আমার অন্ধ ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমি ভাবিয়া নিহরিয়া উঠিলাম।

ইহার পর যত বার ননীরা সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে, আর পূর্বের মত নিঃসঙ্কেচ কথা কহিতে পারি নাই। যেন বাধ বাধ চৈকিত। কিন্তু তাঁহার আকর্ষণ আরও প্রবল ভাবে অমুভব করিতাম। ননী বা সূর্য্যকান্ত বাবু, কেহই আমার হৃদয়ের এই ভাবপরিবর্ত্তন জানিতে পারেন নাই। কিন্তু আমার দিদির নিকট আমি সম্পূর্ণ আত্ম-গোপন করিতে সমর্থ হই নাই। সময়ে সময়ে আমার মনে হইত, যেন তিনি আমার অন্তরের কথা জানিতে পারিয়াছেন। আমি যথাসাধ্য তাঁহার দৃষ্টি এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করিতাম; মনো মনো অপরাধে কাহাকেও কিছু না বলিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িতাম। ননী আসিতেন, আমার সন্ধান করিতেন, এবং আমি তাঁহাদের ফেলিয়া বেড়াইতে গিয়াছি বলিয়া ছুঃখ প্রকাশ করিতেন।

কিন্তু আমার একঠোর আত্মনির্ভরতা চেষ্টা ব্যর্থ হইল। আমি নিতান্ত নিরুপায় হইয়া ঘটনাস্রোতে গা ঢালিয়া দিলাম। যখন কোন সিদ্ধি সম্ভাব্য সমুদ্র-সৈকতে বাতুরাশির মনো আসন রচনা করিয়া আমরা প্রকৃতির রহস্য-গোচনায় ব্যাপ্ত থাকিতাম, লোড়পরায়ণ বালক বালিকারা যখন উন্মির সঙ্গে ছুটাছুটি করিয়া হাতকোথাহলে সমুদ্রতীর মুখরিত করিয়া তুলিত, সূর্য্যকান্ত বাবু যখন ভ্রমণক্রান্ত প্রৌঢ় ও বৃদ্ধদিগের সহিত আলাপে রত হইতেন, আর অজমিয়াত-

সমীর-হিলোলে যখন শরীর সিক্ত ও নোমাঞ্চিত হইয়া উঠিত, তখন আমি হৃৎ-বিহ্বলনেজে ননীর মুখপানে চাহিয়া থাকিতাম। ননীর কবি-হৃদয় স্বভাবের শোভায় নিমজ্জিত হইয়া থাকিত। আমাব নীরব—কাতর নিবেদন তাহার মর্মে প্রবেশলাভ করিত না। আমি মর্মে মর্মে ব্যথিত হইতাম।

কিন্তু এত দিনে অঙ্গে অঙ্গে যে প্রভুত্ব আমি গড়িয়া তুলিয়াছিলাম, সে প্রভুত্বের নেশায় আমাকে অনেক সময়ে বিভোর করিয়া রাখিত। যে স্থানে মানসিক শ্রেষ্ঠতা অমূল্যব করিবার সুযোগ আছে, তথায় সে সুযোগ পরিত্যাগ করা বড় সহজ নহে; বিশেষ, প্রেমাস্পদের নিকট আপনাকে যত বড় করিয়া দেখান যাইতে পারে, ততই আত্মপ্রসাদ লাভ করা যায়। অতঃস্থলে যাহাই হউক, তথায় আপনাকে বাড়াইবার ইচ্ছা এত বলবতী হয় যে, সে প্রলোভন সহজে অতিক্রম করা যায় না। আমারও তাহাই হইল, শুধু বিশুদ্ধ সাহিত্য সম্বন্ধে নহে, ভগবতের যাবতীয় তত্ত্ব লইয়া আমি আলোচনা করিতাম ও আপনার মত অসঙ্গতিচিহ্নে প্রকাশ করিতাম। ননী যেরূপ অবহিত ভাবে শুনিয়া যাইতেন, তাহাতে আমার উৎসাহ শতগুণ বর্দ্ধিত হইত। আমি পুস্তকে যে সকল তত্ত্ব পাঠ করিয়াছিলাম, সেই সকলকে নূতনত্বের আবরণ দিয়া অত্যন্ত গভীর ভাবে বিবৃত করিতাম, এবং আমি যে একজন অসাধারণ পণ্ডিত ননীর মনে এমনই একটা ধারণা জন্মাইয়া দিতে চেষ্টা করিতাম। এক দিন সঙ্গীতের সম্বন্ধে কথা পাড়িলাম; কয়েকটি সঙ্গীতের অংশ অনর্গল আবৃত্তি করিয়া ফেলিলাম, এবং গাহিয়া না শুনাইতে পারিলে তাহার সৌন্দর্য্য বুঝাইয়া দেওয়া অসম্ভব, এইরূপ আভাস দিয়া জানাইলাম যে, সঙ্গীতেও আমার বিশেষণ অধিকার আছে। ছাত্রমণ্ডলে আমাকে কখন কখন গান করিতে হইত, সুতরাং সঙ্গীতের সহিত আমার পরিচয় ছিল। এখন আমার ইচ্ছা হইল যে, ভগবান যখন আমাকে সু-কণ্ঠ দিয়াছেন, তখন ননীকে একবার গান শুনাইব না? “প্রিয়েয়ু সৌভাগ্যকলা হি চারুতা” যাহাকে ভালবাসি, তাহাকে যদি মুগ্ধ না করিতে পারিলাম, তবে গুণ থাকিয়া লাভ কি?

সেই দিনই অপরাহ্নে যখন ননীর পছন্দিয়া দিয়া বাড়ীতে ফিরিব, তখন ননী সূর্য্যকান্ত বাবুকে বলিলেন, “বাবা, মোহিনী বাবু ভাল গাহিতে পারেন, তাহা জান না।” আমি মগ্নক অবনত করিলাম। সূর্য্যকান্ত বাবু হাসিয়া বলিলেন, “বটে। তা, এতদিন মোহিনী আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছে কেন? আমি ভাবি, মোহিনী কাব্য আর দর্শন লইয়াই থাকে।” তাহার হাত্রে গৃহপ্রাঙ্গণ ভরিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, “বেশ ত, আজই হউক না?” আমি প্রথমে একটু

আপত্তি জানাইলাম, পরে সম্মত হইলাম। একটা টেবল্ হারমোনিয়ম্ গৃহাভ্যাস হইতে বারান্দায় আনীত হইল। আমি সূর্য্যকান্ত বাবুর মুখের দিকে চাহিলাম, তিনি বলিলেন, “ও সব আমার আসে না, ছেলে মেয়েরা বাজায় আমি শুনি এই পর্য্যন্ত।” আমি একটু বিব্রত হইলাম। বাজটা আমার তত অভ্যস্ত ছিল না। তবুও আমি একটু চেষ্টা করিলাম; সুরিণা হইল না। সূর্য্যকান্ত বাবু বলিলেন, “তুমি এস, ননী, যাও ত, মা।” আমার ত চক্ষু স্থির। আমি যতক্ষণ সম্মতি ও ভাব ধারণ করিতে চেষ্টা করিতেছিলাম, ততক্ষণে ননীর চম্পকাস্থলিগুলি অবলীলাক্রমে পর্দার মধ্যে সঞ্চালিত হইতেছিল। আমি আমার যথার্থ গান করিতে লাগিলাম। যদি গানের দ্বারা আমার ক্ষুধা গৌরবকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারি, সেই চেষ্টা করিলাম। কিন্তু কণ্ঠ কাঁপিয়া গেল, স্থানে স্থানে স্বরভঙ্গ হইল। আমার উৎসাহ নিকীর্ণ হইল। সূর্য্যকান্ত বাবু ননীকে গান গাহিতে অনুরোধ করিয়া বসিলেন। আমি দেখিলাম, আমার আসন টলিয়া উঠিয়াছে—আমি যে উচ্চ আসন গ্রহণ করিয়া ননীর নিকট কিছু পূর্বে আমার গৌরব প্রচার করিতেছিলাম, বাধা হইয়া সে আসন আমাকে পরিত্যাগ করিতে হইল। ননী অসুস্থতার দোহাই দিয়া আসন হইতে একেবারে উঠিয়া পড়িলেন। যেন জানি না, আমি তাহাতে একটু শ্রীতি অনুভব করিলাম। কিছুক্ষণ পরে আমি গৃহে ফিরিবার অসুস্থতা প্রার্থনা করিলাম। সে দিন আর আমার মনের অক্ষকার ঘুটিল না।

এই ঘটনার পর অনেক দিন আমাদের মাফাৎ হইয়াছে, কিন্তু সঙ্গীতের কথা এক দিনও উঠে নাই। আমার ভগিনী আমাকে একদিন বলিয়াছিলেন যে, ননী আমার গানের প্রশংসা করিয়াছে। আমি ভাবিলাম, “পরিহাস নহে ত?” পরবর্ত্তী ঘটনায় সে ধারণা আরও বদ্ধিত হইল। একদিন ‘মলয়া’ নামক একখানি মাসিক পত্র আমার দিদির নামে আসিল। এখানি মহিলা-পরিচালিত উচ্চ শ্রেণীর মাসিক পত্র। আমার দুই একটি কবিতা হাতে ছাপিবার অস্ত্র পাঠাইয়াছিলাম; মুদ্রিত হয় নাই। ননী এ সংবাদ রাখিতেন। তিনি সম্পাদিকার নিকট চণী শক্তিকে এ জন্ত এক দিন নিন্দাও করিয়াছিলেন। ‘মলয়া’ যে সময় হস্তগত হইল, ননী তখন আমাদের বাড়ীতে ছিলেন। আমরা সর্ব্বাঙ্গে কবিতা পাঠ করিলাম। তাহার মধ্যে একটি কবিতা আমি একাধিক বার পাঠ করিলাম এবং রচয়িত্রীর প্রশংসা করিলাম। এ সময়ে ননী আমার সহিত একমত হইতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন যে, কবিতাটি সর্ব্বাংশেই নিষ্ফল হইয়াছে। আমাদের এইরূপ মতভেদ বড় হইত না। কায়েই আমি আরও দৃঢ়তার সহিত

সেই কবিতার প্রশংসা করিয়া আমার প্রাধান্য অটুট রাখিতে গাঢ় হইলাম । আমার দিদি যখন আমাকে আসিয়া বলিলেন যে, কবিতাটি ননীর লেখা, তখন আমি বিস্ময়ে, দুঃখে—লজ্জায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম । শ্রীমতী শ্রীতিবালা রায় নূতন কবিদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা যশস্বিনী হইয়াছেন বলিলেও অত্যাশ্চিত্র হয় না । সেই শ্রীতিবালাই কি ননী ? ননী পূর্বেই বিদায় লইয়াছিলেন । সুতরাং, আমি আমার মনোভাব সহজেই গোপন করিতে পারিলাম । আমার অন্তঃকরণে তখন যে কি বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা দিদি জানিতে পারেন নাই । তিনি গৃহকর্মে ব্যাপ্ত হইলেন ; যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, “কি আশ্চর্য্য, তুমি এত দিন জানিতে না যে, ননী একজন স্র-কবি ।” আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই ছিল না । ননী কাব্যরসগিনী, তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম । বিস্তৃত জীজ্ঞাসিত স্র-কবি । আমাদের মত চেষ্টা করিয়া, মিল জুটাইয়া তাহাদিগকে কবি সাজিতে হয় না ।

যতই চিন্তা করিতে লাগিলাম, ততই মনে মনে লজ্জিত হইতে লাগিলাম । কি আশ্চর্য্য, এত দিন কিছুই জানিতে পারি নাই । আমার কত কি ছাই ভস্ম কবিতা ননীকে পড়িয়া শুনাইয়াছি ! আর তাঁহার যে প্রশংসা শুনিয়া আমি আনন্দে কণ্টকিত হইয়া উঠিতাম, তাহা উপহাস । মনে মনে ননীর উপর ক্রুদ্ধ হইলাম । ননীর চরিত্রে স্বাভাবিক মাধুর্য্যের সঙ্গে যে কাব্য-সৌন্দর্য্য ও সম্বীত-কলা মিশিয়া অপূর্ব্ব জীবনী-সঙ্গমের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা চিন্তা করিয়া আনন্দ অল্পভব করিবার মত প্রবৃত্তি তখন আর আমার ছিল না । চিরদিনের মত কবিতাকে বিদায় দিলাম । বহুদূর না হাঁটিলে ক্ষুধা হয় না, শরীর পালনের এই নিয়মের দোহাই দিয়া মহিলাদিগের সংসর্গ ত্যাগ করিলাম । ননী ও আর পূর্ব্বের মত সর্বদা আমাদের বাড়ীতে আসিতেন না ; দিদি বিজাপ করিয়া বলিতেন, আমার “কবিতার নদীতে ভাঁটা পড়িয়া যাওয়ায়, ননীকে আর দেখিতে পাওয়া যায় না ।” কারণটা তিনি ঠিক অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন কি না, বুঝা যায় নাই ।

৩

আমার গর্ব্বের এক একটি স্তম্ভ এইরূপ নির্মম ভাবে ভগ্ন হইতে লাগিল, তাহাতে অত্যন্ত অপ্রীতি ও ক্ষুব্ধ হইয়াছিলাম, সন্দেহ নাই । কিন্তু আমার সর্বাপেক্ষা দুঃখের কারণ এই যে, স্বদেশ যাহার নিকট এমন সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, তাহার নিকট অভিমান এইরূপ লাহিত ও দগ্ধ হইলে দুঃখের আর সীমা থাকে না । আমি এই নিষ্ফল দুঃখের জ্বালা হৃদয়ে বহিয়া বহিয়া কাতর

হইয়া পড়িতেছিলাম। সমুজের অনাবৃত, সীমাহীন, উদারতা সে আলা প্রাণমিত করিতে পারিল না।

এইরূপ অশান্ত হৃদয়ে কিছু দিন বেড়াইলাম, তাহার পর আবার যখন আমার পক্ষে ননীর আকর্ষণ প্রবল হইয়া আসিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে যে ঘটনাটি ঘটিল তাহার জোতে আমার গৌরবের শেষ চিহ্নটুকু পর্য্যন্ত ভাসাইয়া লইয়া গেল।

একদিন আমি ও আমার দিদি সূর্য্যকান্ত বাবুর বাড়ীতে নিমজ্জিত হইয়াছিলাম। তাঁহার আরও কয়জন বন্ধুও আহ্বানের জন্ত নিমজ্জিত হইয়াছেন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। বৃদ্ধদিগের উচ্চ হোষ্ট্র ও শিশুদিগের কলরবে গৃহ আমোদিত হইয়াছে। উৎসবের কারণ শুনিলাম যে, ননী বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সংবাদ কলিকাতা হইতে আজ আসিয়াছে। কি সর্ব্বনাশ! মধ্যাহ্নে আমিও একখানি চিঠি পাইয়াছিলাম। তাহাতে আমি পাশ না হওয়ায় আমার ভগিনী-পতি দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। আমি তাহাতে দুঃখিত হই নাই, কারণ, আমার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার কোন সম্ভাবনাই ছিল না।

ননীর সাফল্য-সংবাদে আমি ক্ষোভে, ক্রোধে, লজ্জায় যেন একেবারে জ্ঞানশূন্য হইয়া গেলাম। কি বিড়ম্বনা, ইহারই নিকট উপদেষ্টার আসন গ্রহণ করিয়া, এত দিন বিজ্ঞার জন্ত বাহ্যিকরূপে লইতে চেষ্টা করিয়াছি। ইহা ভাবিতে ভাবিতে আমি ঘর্ম্মাধ্বুত হইয়া উঠিলাম; এবং সন্ধ্যার অন্ধকারে সে স্থান পরিত্যাগ করিলাম। সূর্য্যকান্ত বাবুকে সংক্ষেপে শারীরিক অসুস্থতা জানাইয়া বিদায় লইলাম। ননীর সহিত সে দিন দেখা হয় নাই।

বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া বারান্দায় শুইয়া পড়িলাম। যে মুক্ত বায়ু নিদ্রাধ মধ্যাহ্নের উত্তাপকেও শীতলতায় পরিণত করিত, আজ তাহা আমার গায়েজালা দূর করিতে পারিল না। আহত ফণী যেমন আপনাকে আপনি সংশয় করিয়া জর্জরিত হয়, অভিমানাহত আমি তেমনই আপনার বিয়ে আপনি দখল হইতে-ছিলাম, এই অনলদাহে প্রেমই অধিক ইন্ধন সংগ্রহ করিয়া দিল। বুঝিলাম, অম্ল ইচ্ছা করিয়া এমন এক ক্ষুদ্রিত রাগসকে জাগাইয়া তুলিয়াছি যে, সমস্ত জীবনটি তাহার নির্মম কবলে অঙ্গে অঙ্গে নিষ্পেষিত হইতেই হইবে। তারকা-খচিত বিশাল গগনের দিকে চাহিলাম, শুভ্রফেনমজ্জিত তরঙ্গরাশির দিকে চাহিয়া রহিলাম। কিছুতেই শান্তি দিতে পারিল না। আমার ভগিনী যখন গৃহে ফিরিলেন, তখন আমি নিজার ভাগ করিয়া রহিলাম।

ননীর সঙ্গে একেবারেই বর্জন করিলাম। ননীও আর আমার সহিত আলাপ

করিবার জন্য আগ্রহ কর হইতেন না । সম্ভবতঃ আমার মনোভাব তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই । দেখা হইলে, কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াই আমরা অন্য কাণ্ডে চলিয়া যাইতাম । এমনই ভাবে, অভিমানেই অনন্তে কাব্য, সঙ্গীত, প্রেম-সব পুড়িয়া ভস্মীভূত হইতে লাগিল ।

স্নানের সময়—যে দিন নদীর সহিত দেখা হইত, সে দিন আমার আর ভাল স্নান হইত না । কিন্তু নদী আর পূর্বের মত স্নান করিতে যাইতেন না । কিছু দিন তাহাতে শাস্তি অনুভব করিতাম । কিন্তু আবার প্রাণে আঁকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল । আবার তাঁহার দর্শনের জন্য মন ব্যাকুল হইতে লাগিল ; মানুষের অসীম দুর্বলতা সমস্ত সঙ্কল্পকে পরাভূত করিল । মনে হইত, এত রূপ, এত গুণ,—দর্শনে কি দোষ ? সমুদ্রতরঙ্গের মধ্যে যে বাধাহীন, ভাষাহীন, অনাবিল মিলন,—তাহাকে বহুদিন হইতে কামনার বস্তু বলিয়া মনে করিয়া আসিয়াছি, কাষেই আমার সে অতৃপ্ত কামনা শাস্ত হইত না ।

সেইরূপ অবাধ মিলন একদিন আমার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল । সে দিন সিদ্ধ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে । অদীর তরঙ্গগুলি তটভূমিকে বিধ্বস্ত, ব্যথিত, প্রাণিত করিয়া ফেলিল । অনেক স্নানার্থী সমুদ্রের অবস্থা দেখিয়া স্নানে বিরত হইলেন । ভ্রমণরত জনগণ তীর হইতে সমুদ্রের ভীষণভাব দেখিতে লাগিলেন । গর্জনও সে দিন অচ্যুত দিন অপেক্ষা গভীর । মধ্যে মধ্যে কামানের নিনাদের শ্রাব্য শব্দ হইতেছিল । উর্মিতে সে দিন দূর সমুদ্র দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না । কেবল যে ভঙ্গপ্রবণ তরঙ্গগুলি প্রবল ছিল, তাহা নহে, স্রোতেরও এমন ভয়ানক টান ছিল যে, স্নানের সময় আশ্রয়লাভ করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল । আমি স্নান করিতে করিতে চাহিয়া দেখি, আমার ভগিনী ও নদী হাত ধরাধরি করিয়া নামিতেছেন । কিছুক্ষণ পরেই দেখিলাম, তাঁহারা গভীর জলে গিয়া পড়িতেছেন, এবং সহজ চেষ্টা সঙ্কেত তরঙ্গের ও টানের বিরুদ্ধে কুলের দিকে আসিতে পারিতেছেন না । মুহূর্ত্ত মধ্যে আমি সমস্ত অবস্থাটা বুঝিতে পারিলাম, এবং প্রাণপণে তরঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগের সাহায্যার্থ যাইতে লাগিলাম । তীর হইতে আর্ন্তনাদ উত্থিত হইল । স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের নিকটে যাইতে অধিক সময় লাগিল না । ততক্ষণে নদী ডুবিয়া গিয়াছেন, আমার ভগিনী তখনও ভাসিয়া ও ডুবিয়া তীরের দিকে আসিতেছেন । আমি নিকটে যাইতেই তিনি হাত বাড়াইয়া দিলেন, আমি অগ্রে ডুব দিয়া প্রবল চেষ্টায় নদীকে জলের উপর তুলিলাম । আমার দিদিও আমাকে বেঁচন করিয়া ধরিলেন । স্রোতের প্রতিকূল দিকে

যাইতে এইবার আমার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতে হইল। আমি উন্মত্তের মত সমুদ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলাম। আমার দিককে আমাকে চাপিয়া ধরিতে নিষেধ করিলাম। কিন্তু তিনি ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তিনি আরও দৃঢ়ভাবে আমার গলদেশ বেঠেন করিলেন। নদীর দেহে স্পন্দন ছিল না। কতক্ষণ এইরূপ সংগ্রাম করিয়াছিলাম, তাহা আমার মনে নাই, কিন্তু সেই কয় মুহূর্ত্ত আমার পক্ষে যুগের মত বোধ হইতে লাগিল। কতকটা দূর আসিবার পর আমার প্রাণান্ত চেষ্টাও ব্যর্থ হইতে লাগিল। তরঙ্গের সহিত সংগ্রামে আমার হস্তপদ অবসর হইয়া আসিয়াছিল। কুলের নিকটে আসিয়া আমার সংজ্ঞা লুপ্ত হইতে লাগিল। তার পর কি হইয়াছিল, তাহা আমি আর ভাল জানি না। তীর হইতে কয়েকজন নামিয়া আমার শিথিল হস্ত হইতে নদীকে ও আমার দিককে টানিয়া তুলিলেন, কিন্তু আমাকে ধরিবার পূর্বেই প্রোতে আমাকে অগাধ জলে ভাসাইয়া লইয়া গেল। পরে শুনিয়াছি, ঠিক সেই সময়ে ছুনিয়াদের একখানি মাছ ধরিবার নৌকা ফিরিতেছিল, তাহারা এই আমাকে সেই আসন্ন সলিল-সমাধি হইতে তুলিয়া লইয়া আইসে।

আমার যখন জ্ঞান হইল, তখন প্রভাতের আলোক ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছিল। দিদি ও ননী আমার শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। আমি চক্ষুঃস্মীলন করিবাগাত্ৰই দিদি উচ্চৈঃস্বরে কানিয়া উঠিলেন। ননীও অধঃশে চক্ষু মুছিলেন। সূর্য্যকান্ত বাবু আসিয়া সম্মুখে আমার মস্তকে হস্ত বুলাইয়া দিলেন।

আমার স্মৃতি হইতে এক পক্ষ কাল অতীত হইয়া গেল। আমার অট্টোক্তা-বন্দায় সূর্য্যকান্ত বাবু ও তাঁহার কন্যা আমাদের বাড়ীতেই ছিলেন। আহা-নিজা ত্যাগ করিয়া তাঁহারা আমার গুণ্ণায় তৎপর ছিলেন। একটু স্মৃতি হইয়াই তাঁহাদিগকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাইবার অবসর খুঁজিতে লাগিলাম। কিন্তু তাঁহার পূর্বেই সূর্য্যকান্ত বাবু অশ্রুপূর্ণলোচনে, তাঁহার কন্যার জীবনরক্ষার জন্য আমাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিলেন। তাঁহার সে আবেগপূর্ণ প্রাণ ও কৃতজ্ঞতা দেখিয়া বাস্তবিক মনে হইল, আমার ক্ষুদ্র গৌরব সত্য সত্যই পুনরাজ্জীৱিত হইল।

এক দিন জ্যোৎস্না-পুলকিত সম্মুখ, ননী আমার শয্যাপার্শ্বে বাগিয়া মোক্ষা সেলাই করিতেছিলেন, তখনও আমি রূগ্নশয্যা পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। আমি একমনে তাঁহার অঙ্গুলিগুলির নিপুণ গতি দেখিতেছিলাম। সহসা ননী "ঔঃ" বলিয়া ছুঁচ ফেলিয়া দিলেন। অঙ্গুলির একস্থানে একটু রক্ত দেখা দিল। আমি

অন্ততঃ তাহার অঙ্গুষ্ঠটি লইয়া টিপিয়া দিলাম। বেদনার অবসান হইল, কিন্তু তখনও সে কর আমার করে ছিল। ননী হাত সরাইয়া লইলেন না। আমি সাহসভরে বলিলাম, “ননী, তুমিই আমার স্পর্শ বাড়াইয়াছিলে, তুমিই আমার তাহা ধর করিয়া দিয়াছ। আমাকে ক্ষমা করিয়াছ কি?”

“তুমি ত কখনও কিছু অস্থায় কর নাই; এ কথা বলিতেছ কেন?”

আমি তাঁহার ললাটের কুঞ্চিত উদ্দাম কেশগুলি সরাইয়া দিয়া বলিলাম, “যদি বাঁচি, আর যদি কখনও তোমার উপযুক্ত হইতে পারি, তখন কি আমাকে মনে রাখিবে?”

ননী কোনও উত্তর করিতে পারিলেন না, তাঁহার মুখের স্নিগ্ধ, সজ্জ, রক্তিম ভাব এবং হস্তের নিবিড় স্পর্শ আমার প্রাণের যথেষ্ট উত্তর দান করিল।

এই সময় দিদি সে কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ননী সমস্ত্রমে আগুন হইতে উঠিয়া গেলেন।

*

*

*

ননীর উৎসাহে সেই বৎসরই বিলাত যাত্রা করিলাম। তিন বৎসর চরিত্র অধ্যবসায়ের ফলে কেন্দ্রিঅ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী ও আইনের ডিগ্রী লইয়া দেশে ফিরিলাম। প্রবাসে সূর্য্যকান্ত বাবুর মেহপূর্ণ পত্র ও তাহার সঙ্গে ননীর প্রীতি-সম্ভাষণ আমাকে উৎসাহিত করিত। কিন্তু যাহার জন্ত এত পরিশ্রম ও প্রবাস-ক্লেশ স্বীকার করিলাম, দেশে প্রত্যাগত হইয়া শুনিলাম, তিনি আর ইহ-লোকে নাই।

এখনও আমি প্রতিবৎসর আদালত বঙ্গ হইলে পুরীতে গিয়া থাকি; এখনও বিজ্ঞান সঙ্ঘায় সমুদ্রগর্জনে আমি ননীর আহ্বান শুনিয়া থাকি। যক্ষারোগে কাতর হইয়া ননী, তাঁহার আপনার ইচ্ছায়, পুরীর সমুদ্রতটে বায়ুরাশিতে দেহ মিশাইয়াছিলেন। তাই সে তীর্থ আমি ভুলিয়া থাকিতে পারি না।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র ।

ঢাকা।

যোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে পর্তুগীজ দস্যাদল আরাকান ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে আসিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করে। কোন কামঠি এষ্ট সকল আবিষ্কারী, নির্মূল, লোভী জলদস্যুদিগের অসাধ্য ছিল না। ইহাদের অত্যাচারে ঐ সময় পূর্ববঙ্গের প্রজাগণের ধনপ্রাণ অত্যন্ত বিপদময় হইয়া উঠিয়াছিল। এই জলদস্যুদল ক্ষিপ্ত গতিতে অতীব দক্ষতার সহিত নৌকা চালাইতে অভ্যস্ত ছিল। দস্যুতা ও লুণ্ঠনের দ্বারাই ইহারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করিত। ঘনাককার লোক নিশীথে জাতগামী তরী বাহিয়া ইহারা নিঃশব্দে এক একটি সমৃদ্ধিশালী জনপদে আসিয়া পড়িত, এবং প্রচণ্ড বিক্রমে শুষ্ট জনপদবাসিগণকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের ধনজন লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যাইত। কত নরনারী যে এই দুর্ভাগ্যবশত ক্রুর হস্তে পতিত হইয়া কঠোর দাসত্বে কালান্তিপাত করিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহার ইহুতা করা কঠিন। ইহাদের নির্মম অত্যাচারে পূর্ববঙ্গের নিরীহ প্রজাকুল পরিত্রাহি ডাক ছাড়িতেছিল। এই পর্তুগীজ জলদস্যুগণই তখন “বোম্বটে” নামে অভিহিত হইত। তখন “বোম্বটে” শব্দ উচ্চারিত হইলে বাঙ্গালার লোক শিহরিয়া উঠিত।

পর্তুগীজ বোম্বটে দলই কেবল সে সময় পূর্ববঙ্গবাসীর ওকমাত্র শত্রু ছিল না। আরাকানের মগেরাও পূর্ববঙ্গবাসীর বড়বৈরী ছিল। দস্যুতায়, নির্মূলতায় ও লুণ্ঠনে আরাকানী মগেরা পর্তুগীজ বোম্বটেদিগের অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন ছিল না। “মগ” বলিলে তখন দোর অত্যাচারী দুর্ভাগ্য, ও নির্মূল লোক বুঝাইত। “মগের যুগ্ম” কথাতো এখনও বাঙ্গালীর মনে মগদিগের সেই প্রাচীন অত্যাচারের ভীত স্মৃতি জাগরিত করিয়া দেয়।

পর্তুগীজ ও মগদিগের অত্যাচারে যখন পূর্ববঙ্গ থর থর কাঁপিতেছিল, সে সময় তথায় ঘোর অরাজকতা উপস্থিত। পাঠানদিগের গৌরব-তপন তখন অস্তমিত, মোগলদিগের শৌর্য-শশধর তখন যৌলকলার সমুদিত। ইতঃপূর্বেই পাঠানগণ রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া উড়িষ্যায় আশ্রয় লইয়াছিল, মোগলগণ বঙ্গপুত্র নদের তীর পর্যন্ত সমস্ত বাঙ্গালা করায়ত্ত করিয়াছিল। তাহাদের দুর্দান্ত সর্দির কতলু খাঁও মানসিংহের প্রতাপে ভগ্নহস্ত হইয়া প্রাণ হারায়েন। কতলুর পুত্র ওসমান তখন গুল্লু মহল অম্বারোহী ও ছয় মহল পদাতিক লইয়া পূর্ববঙ্গে বিচরণ করিতেছিলেন। সম্রাট শতাব্দীর প্রারম্ভে বুড়ীগঙ্গার তীর পর্যন্ত

ওসমান্ আপন অধিকার বিস্তৃত করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। এই সময় অনেক পাঠান ময়মনসিংহে, ঢাকায় ও চট্টগ্রামে আসিয়া বাস করিতে থাকে। ইহারা এই সময় প্রজাগণের নিকট হইতে করগ্রহণ করিতে পারিত না। সুতরাং তাহারাও অনেক সময় নিরীহ প্রজাগণের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠিত করিত। এইরূপ রানা উপদ্রবে পূর্ববঙ্গের প্রজাগণ নিঃশ্র হইয়া পড়িয়াছিল। গোঁগল শাসকগণও সেই নিঃশ্র প্রজার নিকট হইতে বীতিমত কর আদায় করিতে পারিতেন না। এই কারণে পূর্ববঙ্গের এই ব্যাপারে দিল্লীর বাদসাহ জাহাঙ্গীরের মনোযোগ স্বতঃই আকৃষ্ট হইয়াছিল।

বাঙ্গালা, বিহার এবং উড়িষ্যার নবাব জাহাঙ্গীর কুলী খাঁর মৃত্যুর পর দিল্লীখর জাহাঙ্গীর বুঝিলেন যে, সমগ্র বঙ্গ, বিহার এবং উড়িষ্যা একই নবাবের শাসনাধীন রাখিলে পূর্ববঙ্গের এই অশান্তি সহজে লোপ পাইবে না। সুতরাং তিনি আফজল খাঁর হস্তে বিহারের এবং সেখ আলাউদ্দীন ইসলাম খাঁর হস্তে বাঙ্গালার শাসনভার ন্যস্ত করেন। এই সেখ ইসলাম খাঁ ফতেপুরের সেলিম চিস্তির পৌত্র ছিলেন। সেলিম চিস্তির আশীর্বাদে ফলেই উদিপুরী বেগমের গর্ভে জাহাঙ্গীরের জন্ম হয়। সেখ ইসলাম খাঁ সেই জন্মই সম্রাট জাহাঙ্গীরের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। যে সময় ইনি বাঙ্গালার মসনদে উন্নীত হইয়াছিলেন সে সময় রাজমহলই বাঙ্গালার রাজধানী ছিল। প্রতিভাসম্পন্ন ইসলাম খাঁ পূর্বেই বুঝিয়াছিলেন যে, পূর্ববঙ্গে বাঙ্গালার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত না করিলে কিছুতেই এই অশান্তির শান্তিবিধান হইবে না। তাই তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই রাজমহল পরিত্যাগপূর্বক পূর্ববঙ্গে ঢাকা সহরে বাঙ্গালার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার পর প্রায় সার্ব শতাব্দী কাল ঢাকা বাঙ্গালার রাজধানী ও দুই শতাব্দী কাল বাঙ্গালার একটি প্রধান নগরী রূপে বিরাজ করিয়াছিল। ঢাকার ইতিহাস অত্যন্ত বিস্ময়জনক। খাঁ বাহাদুর সৈয়দ আউলাদ হাসান Echoes from Old Dacca নামক পুস্তকে এই নগরীর ইতিহাস অতি সুন্দর ভাবে বিবৃত করিয়াছেন। বিগত ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ঢাকার নর্থব্রুক হলে ইনি সুললিত ভাষায় ঢাকার প্রাচীন কাহিনী সম্বন্ধে একটি অতি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন। ইহার যত্ন, অনুসন্ধান ও অধ্যবসায়প্রভাবে এই ঐতিহাসিক নগরীর অনেক অতীত কাহিনী সাধারণের নিকট প্রকাশিত হইয়াছে। ঢাকা সহরের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্মভাস আমরা নিম্নে প্রদান করিলাম।

১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দের বর্ষাবসানে এক দিন প্রভাতে রাজমহল হইতে নানা শ্রেণীর তরণীর একটি বিরাট বহর রাজমহল পরিত্যাগ করিয়া পূর্বাভিমুখে যাত্রা করিল। কোন কোন তরীতে দেড়শত ক্ষেপণিক ক্ষিপ্র হস্তে ক্ষেপণি সঞ্চালন করিতেছিল। গঙ্গাবক্ষে হেলিতে ছলিতে সেই তরণীশ্রেণী দ্রুতবেগে পশ্চিমপালের স্থায় যেন উড়িয়া যাইতেছিল। তরণীশ্রেণীর মধ্যভাগে নবাবের তরণী, সুন্দরী ও সুসজ্জিত। তাহার উপর গর্জভরে মুসলমান নবাবের সিংহ-সূর্য্য-চিহ্নিত বৈজয়ন্তী পত পত শব্দে উড্ডীন। সেই সুবর্ণখচিত তরণীর উপর সমগ্র বাঙ্গালার নবাব সেখ আলাউদ্দিন ইসলাম খাঁ বিরাজমান। ইনি ইঁহার রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে নূতন রাজধানী সংস্থাপনের একটি যোগ্য স্থানের অনুসন্ধানার্থ বহির্গত। পূর্ব বাঙ্গালায় তখনও শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। পূর্ববঙ্গ তখন মোগলগণ কর্তৃক কেবল নূতন বিজিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িয়া হইতে তখন পাঠানগণ কেবলমাত্র পূর্ববঙ্গে বিতাড়িত হইয়াছে। তাহারা সর্দার ওসমানের নেতৃত্বাধীনে গণক পাড়া, গোরী পাড়া ও ধামরাই দুর্গে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া ঐ অঞ্চলে অরাজকতার সৃষ্টি করিতেছে। সুতরাং ক্ষিপ্রহস্তে তাহাদিগের শাস্তিবিধান একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ববঙ্গে আবার এক নূতন বিপদ উপস্থিত। পর্তুগীজ বোম্বেটে দিগের সর্দার শিবাষ্টিয়ান্ গঞ্জেলস্ মগদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া ভুলুয়া ও লক্ষ্মীপুরের সম্মিলিত জনপদসমূহ আধিকৃত করিয়া লইয়াছে; এবং নদী বাহিয়া নবজিত মোগল রাজ্যে নানাপ্রকার নিষ্ঠুর অত্যাচারের অনুষ্ঠান করিতেছে। সুতরাং সৈয়দ ইসলাম খাঁর স্থায় স্থায়নিষ্ঠ নবাবের পক্ষে আর স্থির থাকা সম্ভব নহে। তাই তিনি এই বিশৃঙ্খলার কেন্দ্রস্থলে শ্রীয রাজধানী সংস্থাপন করিতে বাহির হইয়াছেন।

পূর্ববঙ্গে উপনীত হইয়া নবাব ইসলাম খাঁ অনেক স্থানে অবতরণ করিয়া তাঁহার ভবিষ্যৎ রাজধানী সংস্থাপনের যোগ্য স্থান অনুসন্ধান করিলেন। কিন্তু কোন স্থানই তাঁহার মনোমত হইল না। শেষে বুড়ী গঙ্গার তীরে তাঁহার তরণী-শ্রেণী আসিয়া উপনীত হইল। ঢাকা সহরের অপর তীরে সমস্ত তরী নঙ্গর করিল। ইসলাম খাঁ স্বয়ং তরী হইতে অবতরণ করিয়া ঐ স্থান তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিলেন। স্থানটি মনোনীত হইল। তিনি বুঝিলেন, সামরিক হিসাবে ঐ স্থানটি সর্বোৎকৃষ্ট। যেখানে তিনি প্রথম পদক্ষেপ করিয়াছিলেন, ঐ স্থানটি তাঁহারই নামানুসারে ইসলামপুর নামে অভিহিত। উহা সহরেরই অঙ্গীভূত। স্থানটি পরীক্ষা করিয়া তিনি সহরের সীমা নির্দেশ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে

করিতে নদীর দিকে ফিরিতেছিলেন, এমন সময় দেখিলেন যে, কয়েকজন হিন্দু-ঢাক বাজাইয়া পূজা করিতেছে। ঢাকের শব্দে তাঁহার মনে সীমা-নির্ধারণ-সমস্তার সমাধান হইয়া গেল। তিনি সমস্ত ঢাকীগুলিকে ঐ স্থানের মধ্যস্থলে সমবেত করিলেন এবং তাহাদিগকে প্রাণপণে ঢকা নিনাদ করিতে আদেশ দিলেন। বঙ্গ, বিহার, ও উড়িষ্যার অধিপতির আদেশপ্রাপ্তিমাত্র ঢকাবাদকগণ প্রাণপণে ঢকানিনাদ করিতে আরম্ভ করিল। ঢাকের গভীর নিনাদে বুড়ীগঙ্গার তীরস্থ প্রান্তর প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তখন তিনি তাঁহার অনুচরগণের মধ্যে একজনকে পূর্বদিকে, একজনকে পশ্চিম দিকে, আর একজনকে দক্ষিণ দিকে প্রেরণ করিলেন। যে স্থানে ঐ গভীর ঢাকের শব্দ আর শ্রুত হইবে না, সেই স্থানেই তিনি তাহাদিগকে তাহাদের হস্তস্থিত পতাকা প্রোথিত করিতে আদেশ করিলেন। যে যে স্থানে ঐ পতাকা প্রোথিত হয়, সেই সেই স্থানে তিনি তাঁহার অভীপ্সিত রাজধানীর সীমা নির্ণায়ক স্তম্ভ নির্মিত করেন। ঢাকের শব্দে এই নগরের সীমা নির্ধারিত হইয়াছিল বলিয়া এই মহানগরী ঢাকা নামে প্রখ্যাত হইয়াছে। নবাব ইসলাম খাঁ এই নগরকে তদানীন্তন দিল্লীর বাদসাহ জাহাঙ্গীরের নামানুসারে জাহাঙ্গীর নগর নাম প্রদান করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, এ নামে ঢাকা কখনই পরিচিতা হয় নাই।

ঢাকা নামের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে খাঁ বাহাদুর যাহা বলিয়াছেন তাহা অশ্রান্ত বলিয়া মনে হয় না। যে সময় নবাব ইসলাম খাঁ ঢাকায় আসিয়া নৌকা-হইতে অবতরণ করিয়াছিলেন,—সে সময় ঐ স্থান জনশূন্য প্রান্তর ছিল না। তথায় জনপদ ছিল। নতুবা হিন্দুরা তথায় ঢাক বাজাইয়া পূজা করিবে কেন? শক্তি-পূজা ও চড়কপূজা ভিন্ন অল্প কোন সময় হিন্দুরা ঢাক বাজায় না। যে সময় ইসলাম খাঁ ঢাকায় আসিয়াছিলেন,—সে সময় চড়কপূজার সময় নহে, শক্তি-পূজারও সময় নহে। সুতরাং ইহা হইতে অনুমান হইতেছে যে, হিন্দুগণ ঢাকেশ্বরীর মন্দিরেই পূজা দিতেছিলেন বা পূজা দিতে যাইতেছিলেন। জনশ্রুতিতে প্রকাশ, সম্রাট বল্লালসেন কর্তৃক ঢাকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী প্রতিষ্ঠিত। এই জনশ্রুতিতে অবিশ্বাস করিবার কোন সন্তোষজনক কারণ নাই। খাঁ বাহাদুর বলেন, মন্দিরের গঠনভঙ্গী দেখিয়া উহা মহারাজ বল্লাল সেন কর্তৃক নির্মিত বলিয়া মনে হয় না,—মোগল রাজত্বকালের কোন সময়ে নির্মিত বলিয়াই মনে হয়। খাঁ বাহাদুরের দ্বিতীয় কথা, ঐ ঘটনার পূর্বে কোন সময় ঢাকা নামে ঐ স্থানে কোনও নগরী ছিল, সরকারী দলিলে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না; আইন-ই-আকবরীতে

উহার উল্লেখ নাই। প্রথমতঃ, মন্দিরের গঠনভঙ্গি দেখিয়া তাহার প্রতিষ্ঠাকালের অনুমান করা কখনই নিরাপদ হইতে পারে না, বল্লাল সেনের সময় হইতে মোগল রাজত্বের সময় পর্য্যন্ত ঐ অঞ্চলের স্থাপত্য কিরূপ ছিল, তাহার নির্ণয় করা একরূপ অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ, যে সময় ঐ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই সময়েই বর্তমান মন্দির গঠিত হইয়াছিল, কি তাৎকালিক মন্দির জীর্ণ ও ভগ্ন হওয়ায় তাহার স্থানে বর্তমান মন্দির নির্মিত হইয়াছিল, তাহারও নির্ণয় করা সম্ভব নহে। তৃতীয়তঃ, ঢাকা নগরীর বয়স তিন শত বর্ষমাত্র। এই তিন শত বর্ষের মধ্যে ঐ মন্দির নির্মিত হইলে উহার প্রতিষ্ঠাতা প্রভৃতির কথা একেবারেই বিস্মৃতির তলতলে ডুবিয়া যাইত না। খাঁ বাহাদুর যদি বিশ পঁচিশ বৎসর পূর্বে তখনকার কোন অশীতিপর বৃদ্ধকে এই বিগ্রহ ও মন্দির সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন, তাহা হইলেও তিনি “বল্লাল সেনই উক্ত মন্দির ও বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা” ইহাই শুনিতে পাইতেন। একরূপ জনবহুল স্থানে দুই এক শত বৎসরের মধ্যে যে মন্দির ও বিগ্রহ স্থাপিত হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে একরূপ প্রাচীন কিম্বদন্তীর বা জনশ্রুতির প্রচলন অসম্ভব না হউক, অত্যন্ত কঠিন। খাঁ বাহাদুর স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে, কোন বৎসর বা কোন সময়ে এই নগরী নির্মিত হইয়াছে, তাহা জানা যায় নাই। কোন সময়ে বা কাহার রাজত্বকালে উহা নির্মিত হইয়াছে, খাঁ বাহাদুর তাহা বলিতে পারেন কি? তাহা যদি না জানা যায়, তাহা হইলে জনশ্রুতিকে অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। অন্ততঃ নবাব ইসলাম খাঁর প্রতিষ্ঠিত ঢাকা সহর অপেক্ষা ঢাকেশ্বরীর প্রাচীনত্বে বিশ্বাস করিতে যেন সহজেই প্রবৃত্তি জন্মে। আইন-ই-আকবরীতে বা সরকারী কোন প্রাচীন কাগজপত্রে ঢাকা সহরের নামোল্লেখ নাই,—ইহাতে ঐ স্থানে যে কোন ক্ষুদ্র জনপদ ছিল না, এ কথা সপ্রমাণ হয় না। যে সময় আইন-ই-আকবরী লিখিত হয়, সে সময় ঐ অঞ্চল মোগলদিগের অপরিজ্ঞাত ছিল। খাঁ বাহাদুর স্বয়ং বলিয়াছেন যে, নবাব ইসলাম খাঁর পূর্ববর্তী নবাবের আমলে ঐ অঞ্চল মোগলদিগের কবাসত্ব হয়। সুতরাং তৎসময়ে মোগলদিগের দলিলপত্রে সেই ক্ষুদ্র পল্লীর নাম থাকা সম্ভবে না। পাঠানদিগের সময়ের ইতিহাস ও কাগজপত্র অসম্পূর্ণ ছিল। সুতরাং সরকারী কাগজপত্রে ঢাকার নাম না থাকিলেও ঐ স্থানে ঐ নামের কোনও ক্ষুদ্র নগরী ছিল না, ইহা সপ্রমাণ হয় না।

কেহ কেহ বলেন, ঐ স্থানে ঢাক গাছের অঙ্গল ছিল, সেই অঙ্গল উহার নাম ঢাকা হইয়াছে। এখন কিঞ্চিৎ ঐ অঞ্চলে ঐ গাছ আদৌ জন্মে না। সুতরাং ঐ অনু-

মান সত্য বলিয়া মনে হয় না । যাহা হউক, ১৬০৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঢাকা বাঙ্গালার রাজধানী ছিল । এই ঢাকার সান্নিধ্যেই ১৬১২ খৃষ্টাব্দে পাঠান দলপতি যুদ্ধে নিহত হইলেন । পূর্ববঙ্গে পাঠানের দৌরাঙ্গা সেই হইতেই কমিয়া যায় । ইসলাম খাঁর প্রভাবে আরাকানের মগগণ ভয়বিষাণ ও পর্তুগীজ বোম্বেটেগণ ভয়চকিত হইয়া পড়ে । ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে সুলতান সুলজা ঢাকা হইতে উহার রাজধানী রাজমহলে উঠাইয়া লইয়া যান । কিন্তু সে সময় বাঙ্গালার নবাবের অনেক সৈন্যসহায়ে ঢাকায় রহিয়া যায় । তৎপরে ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার নবাব নাজিম মীরজুম্মা পুনরায় ঢাকাতেই রাজধানী স্থাপন করেন । সেই সময় হইতে ১৭০৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঢাকাই বাঙ্গালার রাজধানী ছিল । মুর্শিদকুলি খাঁ ঐ বৎসর মুর্শিদাবাদ সহরে বাঙ্গালার রাজধানী উঠাইয়া লইয়া যান । সেই সময় হইতে মুর্শিদাবাদ নায়েব নাজিমের বাসস্থানে পরিণত হয় । মুর্শিদাবাদেই মুসলমান-দিগের গৌরবভাস্কর চিত্রতরে অন্তর্মিত হয় ।

ঢাকার সহিত মুসলমান ইতিহাসের অনেক স্মরণযোগ্য ইতিহাস জড়িত । এই স্থানেই নবাব সায়েস্তা খাঁ ঢাকায় আট মণ চাউল বিক্রয় করিয়া যান । সৌভাগ্য সমৃদ্ধিতে এক সময় ঢাকা বাঙ্গালার প্রধান স্থান অধিকৃত করিয়াছিল ।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় ।

কীটগু-তত্ত্ব ।

(ইতিহাস)

(৩)

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, পাণ্ডুর এ পর্য্যন্ত পচনক্রিয়া সম্বন্ধে গবেষণা করিতে-
ছিলেন । এখন তিনি গুটিপোকের সংক্রামক ব্যাধির কারণ নির্ণয়ে মনোনিবেশ
করিলেন । বহু পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে কার্য্য করিয়া তিনি শেষে প্রতি-
পন্ন করেন যে, এই ব্যাধি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটগু হইতে উৎপন্ন, এবং এই সকল

কীটাণু এত ক্ষুদ্র যে, কেবল অণুবীক্ষণের সাহায্যেই দৃষ্ট হইতে পারে। কর্ণেলিয়া প্রথমে এই সকল কীটাণু দেখিয়াছিলেন। নসেমা এবং লেবার্ট কর্তৃক ইহারা ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু সকলেই এই ব্যাধির ভেষজনির্ণয়ে ব্যর্থশ্রম হইয়াছেন। পাস্তুর অনেক চেষ্টার পর এই ব্যাধির প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবন করেন। তিনি প্রতিপন্ন করেন যে, যদি কোন ব্যাধিগ্রস্ত গুটিপোকাকে জলের সহিত বাটিয়া ফেলা যায় এবং ঐ মিশ্র পদার্থকে পত্রের উপর তুলি দ্বারা লাগাইয়া সূক্ষ্ম পোকাদিগকে তাহা ভক্ষণ করান যায়, তাহা হইলে তাহার ব্যাধিগ্রস্ত হয়। ইহাতে সপ্রমাণ হয় যে, কীটাণুর বীজসকল গুটিপোকার ডিম্বকেও আক্রমণ করিয়া থাকে। সুতরাং ডিম্বসকলকে বিনষ্ট করিতে পারিলে এই ব্যাধির উৎপত্তি নির্বারণ করা যাইতে পারে। জীজাতীয় গুটিপোকাগুলিকে পৃথক্ করিয়া রেশমী কাপড়ে ডিম্ব পাড়িতে দেওয়া হয়; এবং সেই কীটজননীকে ভবিষ্যতে পরীক্ষার জন্য কাপড়ের এক কোণে আলপিন্ দিয়া রাখিয়া রাখা হয়। কিছুদিন পরে সেই গুটিপোকাকে জলের সহিত বাটিয়া এক এক ফোঁটা করিয়া জল অণুবীক্ষণের সাহায্যে পরীক্ষা করা হয়। এই পরীক্ষায় যদি কোন জীবাত্ম লক্ষিত হয়—তাহা হইলে পূর্বেক্ত ডিম্ব সকলকে পুড়াইয়া ফেলা হয়। কিন্তু জীবাত্ম লক্ষিত না হইলেই তাহাদিগকে ব্যবহার জন্য রাখা হয়।

সংক্রামক ব্যাধির সহিত কীটাণুর সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইলে এক্ষণে প্রশ্ন হইল না যে, কীটাণু হইতেই ব্যাধির উৎপত্তি হয়। কীটাণু সকলকে ব্যাধিগ্রস্ত গুটিপোকার গাত্র হইতে পৃথক্ করিবার কিম্বা তাহাদিগকে কৃত্রিম উপায়ে উৎপাদন করাইবার কোন উপায় লক্ষিত হইল না। ডানেনাকের পরীক্ষার ফলও প্রতিবাদসাপেক্ষ। তিনি বলিয়াছিলেন যে, Spleenic Fever দণ্ডাকৃতি কীটাণুর দ্বারা উৎপাদিত। অনেকে বলিতে লাগিলেন, যদি এই সকল দণ্ডাকৃতি কীটাণু বিশিষ্ট রক্ত দ্বারা কোন সূক্ষ্ম মেঘকে সংক্রামিত করা যায়, তাহা হইলে সেই মেঘের মৃত্যুর পর তাহার রক্তে দণ্ডাকৃতি কীটাণু লক্ষিত হয় না। আবার কোন কোন বৈজ্ঞানিক বলিতে লাগিলেন, উক্ত ব্যাধির দণ্ডাকৃতি-কীটাণু-বর্জিত রক্ত দ্বারা সূক্ষ্ম মেঘকে সংক্রামিত করিলে সেই মেঘের রক্তে দণ্ডাকৃতি কীটাণু লক্ষিত হয়। অনেকেই প্রতিবাদ করেন যে, Anthrax কিম্বা Spleenic Fever এর প্রাদুর্ভাব কোন কোন ঋতুতে বা কোন কোন স্থানে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বালিন্জার প্রমাণ করেন যে, Anthraxএ রক্ত দণ্ডাকৃতি-কীটাণু-বর্জিত হইলেও তাহাদের বীজ সকল বহু দিন পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে। এই

বীজ সকল মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত হইবার পর জন্তুগণ জল ও তৃণ হইতে উক্ত ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হয় ।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক রবার্ট কক্ উক্ত Anthrax ব্যাধির সম্বন্ধে একখানি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন । তাহাতে তিনি উক্ত ব্যাধির কারণ ও নিদান বিশদভাবে বর্ণনা করেন । কি প্রকারে এই সকল কীটগু, প্রাণী-দেহে পরিবর্তিত ও কি প্রকারে বীজ সকলের উদ্ভাবন হয়, এই পুস্তকে সেই সকল বিষয়ের আলোচনা হয় । ইহার এক বৎসর পূর্বে তিনি প্রাণি-দেহ ব্যতিরেকে কীটগুর উৎপত্তির নিমিত্ত “Solid Media” প্রস্তুত করিয়া এই বিজ্ঞান চর্চার পথ অনেক পরিমাণে সুপ্রশস্ত করিয়া দেন । এই সময়ে পাস্তুরও Anthraxএর আলোচনায় নিযুক্ত ছিলেন । এই সময়েই কক্ কীটগু তত্ত্বে চারিটি স্বতঃসিদ্ধ প্রকাশ করেন ।

(১) কীটগু কিম্বা তাহার বীজ প্রাণি-দেহের রক্তে কিম্বা মাংসে বর্তমান থাকিবে ।

(২) এই কীটগুগুলি প্রাণি-দেহের রক্ত মাংস প্রভৃতি হইতে পৃথক্ করিয়া কৃত্রিম Mediaতে উৎপন্ন করিতে হইবে ।

(৩) কৃত্রিম Media তে নব উৎপাদিত কীটগু সকলকে সুস্থ প্রাণিদেহে প্রবেশ করাইলে উক্ত ব্যাধির চিহ্ন লক্ষিত হইবে ।

(৪) উক্ত সংক্রামিত প্রাণিদেহ হইতে কৃত্রিম উপায়ে উক্ত কীটগুসকলকে পৃথক্ করিতে হইবে ।

উপরোক্ত চারিটি স্বতঃসিদ্ধ কীটগু-তত্ত্বে দৃঢ়তর বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপিত করিয়াছে । ইহা প্রকাশের চারি পাঁচ বৎসরের মধ্যে অনেক সংক্রামক ব্যাধির কীটগুর আবিষ্কার হয় ।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে লোএফ্‌লার এবং স্কজ অশ্বজাতির Glanders নামক এক সংক্রামক ব্যাধির কীটগুর আবিষ্কার করেন । পূর্বেই বলিয়াছি ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক কক্ এসিয়াটিক বিস্মৃচিকার কীটগু আবিষ্কৃত করেন ।

রাজ্যস্বত্বা যে সংক্রামক ব্যাধি তাহা ভিলিয়ান প্রকাশ করিয়াছিলেন । কিন্তু ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে কক্ এই ব্যাধি-কীটগুর আবিষ্কার করেন । যে নিবন্ধে ককের উক্ত আলোচনার বিষয় প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা চিরকাল কীটগুতত্ত্ব সাহিত্যে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিবে । আবিষ্কারক অধ্যাপক ককের নামানুসারে এই কীটগুকে সাধারণতঃ “ককের কীটগু” বলা হয় ।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ইবার্থ টাইফয়েডের কীটগু ও ক্লেবস্ ডিপথিরিয়ার কীটগু আবিষ্কৃত করেন । ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে লফ্‌নারের দ্বারা এই আবিষ্কার বিশেষরূপে প্রমাণিত হয় । সেই বৎসর জাপান দেশীয় কীটসাটো ধনুষ্টকাবের ও প্লেগের কীটগুর আবিষ্কার করেন ।

যদিও প্রত্যহই বৈজ্ঞানিক জগতে নূতন নূতন আবিষ্কার হইতেছে—তথাপি বহু চেষ্টা সত্ত্বেও অত্ৰাপি অনেক সংক্রামক ব্যাধির কীটগু আবিষ্কৃত হয় নাই । মানুষের বসন্ত ও গো বসন্তের কীটগু আজিও নিরূপিত হয় নাই ।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মিত্র ।

গঙ্গাবক্ষে ।

(কাশীধামে ।)

ওই বক্ষে কোন শাস্তি স্রুধা নিরমল
বহে যুগযুগান্তর কহ, প্রবাহিনী ?
তোমার বিমল নীর কি দ্বিধা-শীতল,
জুড়ায় জীবন-তাপ দিবস-যামিনী !
তাজি' হিমাদ্রির গেহ ভারত-মণ্ডলে
বহাও অমৃতধারা মেহে নিরন্তর ।
কিন্তু কোন্ পবিত্রতা বারাণসী-জলে,
স্পর্শিতে অধীর কোটি জীবের অন্তর ?
অলক্ষে নিবসে মুক্তি মণিকর্ণিকায়,
কি মহাশ্রমানে সৃষ্টে আনন্দ-কানন ।
উর্দ্ধগতি জীবনের সৈকত-চিতায়
মর্ত্য-ঐশ্বর্যের বৃকে বৈরাগ্য সৃজন ।
বিশ্ব-বৃকে বারাণসী সর্বতীর্থসার,
হরজটা বিলোড়িত উল্লাসে তোমার ।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম ।

বিদায়-চূষন ।

“অদেশে প্রত্যাবর্তন করিলাম বটে ; কিন্তু মন সেই সুদূর ভারতে পড়িয়া আছে । পিতৃ-পুরুষের পুরাতন আবাসে ইংলীল সংবরণ করিবার অভিলাষে বাল্যস্মৃতিবিজড়িত ইংলণ্ডে আসিলাম বটে, কিন্তু ভারতে যদি মগ্নিতে পারিতাম ।—যে দেশে জীবনের অধিকাংশ কাল অতিবাহিত করিয়াছি—সে দেশে দেহভার গ্রস্ত করিতে পারিলে কত সুখ । এ দেশের শীতার্ন্ত-গগনতলে তুষার-শীতল-বাত্যাভিবাতে জীবনের সায়াহ্নকাল অতিবাহিত করার অপেক্ষা ভারতের সেই মধুরমলয়হিল্লোলে রম্য রবিকরতাপে জীবনের যে অংশ যাপন করিয়াছি, তাহার স্মৃতি কত সুখের ।” এই কথা বলিয়া প্রোঢ়া তাঁহার পদমূলে উপবিষ্টা কনককেশী বালিকা এভেলিনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন “আমি যে দেশে বাস করিতাম, সে দেশে প্রীতি, শান্তি, স্নেহ, মমতা, অনুরাগ বিরাজিত । এক্ষণে আমি জীবনের চরম সীমায় উপনীত । এ দেশে সূর্য্য কিরণ বিতরণ করে সত্য, কিন্তু তথায় সূর্য্যের যেকণ তেজ এখানে সেরূপ নাই । সময়ে সময়ে সে তেজ সংহারিণী মূর্ত্তি ধারণ করে বটে”—এই কথা বলিয়া ভারতের গ্রীষ্ম তাঁহার যৌবন-সৌন্দর্য্যের উপর যে কি ভীষণ উপদ্রবই করিয়াছে তাহা স্মরণ করিয়া বিগতযৌবনা বর্ষাষসী অতি বিষমভাবে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন ।

পদতলে উপবিষ্টা বালিকা বলিল, “কিন্তু তথায় ত প্রাবৃটের নিরবচ্ছিন্ন মেঘরাশি নীল আকাশকে আচ্ছন্ন করে ।”

প্রোঢ়া বলিলেন, “হাঁ, তাহা সত্য বটে, কিন্তু বর্ষাঋতু মেঘমুক্ত গগন কি সুন্দর—কি গাঢ় নীলবর্ণে রঞ্জিত হয় ।” বলিয়া প্রোঢ়া গৃহের উন্মুক্ত গবাক্ষ দিয়া ইংলণ্ডের তৎকালীন নিদারুণ শৈত্যপ্রাধর্য্যের প্রতি বালিকার মনোযোগ আকর্ষণ করিলেন ; বলিলেন, “তুমি ভয় পাই । যে স্থানে রজনী দিবাভাগ অপেক্ষা অধিকতর রমণীয়, সেই স্থান তোমার নিকট অতি মনোরম । সেরূপ মধুর জ্যোৎস্না হেথায় দেখিতে পাওয়া যায় না । নাইটেঙ্গেলের গান অপেক্ষা শ্রামার স্ববলহরী অধিক মিষ্ট ।—তুমি সেই স্থানে যাইবার জন্য প্রস্তুত, আর আমি এই শীতপ্রধান দেশে একাকী নীরবে মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছি ।”

এভেলিন্ জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি অদেশে অপেক্ষা ভারতবর্ষকে এত অধিক ভালবাস কেন ? তোমার কথায় আমি বিস্মিত হইতেছি—আমি জানি, আমার প্রবাসী দেশবাসীরা সুদূর ভারতে সারাজীবন পরিশ্রমের পর অদেশে ফিরিবার জন্য ব্যগ্রভাবে প্রতীক্ষা করে ।”

প্রোঢ়া বলিলেন, “কেন আমি ভারতবর্ষকে এত ভালবাসি, তাহা তুমি কি বুঝিবে ?

আমার প্রতি বিশেষ কিছু দয়া প্রকাশ করে নাই—বরং তথায় অধিক দিন হু আমি স্বাস্থ্য ও প্রিয় আত্মীয় স্বজনকে চিরকালের জন্য হারাইয়াছি ।” বালিকার

কুক্কিত কেশরাশির উপর শুভ্র শীর্ণ হস্ত স্থাপিত করিয়া তিনি পুনরায় বলিতে লাগিলেন, “বৎসে! তুমি কি বুঝিবে? যথায় মর্গরায়মান তালকুঞ্জ হইতে বুল্‌বুল আশাহারা হইয়া সাক্ষা সন্মীরণে আপনার স্বরলহরী মিশাইত, যথায় আমাদের স্বামীজীতে প্রথম সাক্ষাৎ, যথায় আমরা একই কার্য্যে আমাদের জীবন উৎসৃষ্ট করিয়াছিলাম—উভয়ে একই সূত্রে আবদ্ধ থাকিয়া জীবনযাপন করিয়াছিলাম, যথায় প্রাণাধিককে চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, যথায় যথার্থই আমি ‘জীবনের’ আশ্বাদ পাইয়াছি—পুনরায় তথায় যাইয়া তাহার শেষ শয্যার অংশ গ্রহণ করিবার জন্য মন বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে—কিন্তু তাহা আর হইবার নহে।”

প্রোঢ়ার ঐদৃশ চিত্তচাক্ষু্য দেখিয়া এভেলিন্ বলিল, “আর বলিতে হইবে না, আমি বেশ বুঝিয়াছি।”

প্রোঢ়া উত্তর করিলেন, “তথায় যাইয়া কিছু দিন অবস্থান করিলে তুমি আরও ভালরূপ বুঝিতে সমর্থ হইবে। সেই এত সুশ্রুতি ভারতবর্ষ—যুবকযুবতীদিগের পক্ষে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা রমণীয় স্থান।” আপনার আনন্দময় যৌবনের স্মৃতিস্মৃতি স্মরণ করিয়া প্রোঢ়া মুহু হাত্ত করিলেন।

এভেলিন্ মুখ ফিরাইয়া বলিল, “না, ভারতবর্ষ তোমার নিকট যেইরূপ মনোরম হইয়াছে, আমার নিকট সেরূপ হইতেই পারে না। আমি বিবাহের নিমিত্ত তথায় যাইতেছি।”

প্রোঢ়া উত্তর করিলেন, “এভেলিন্, তুমি বিবাহ করিও না এবং তথায় যাইও না।”

বালিকা হাত্ত ও জ্ঞানন-বিজড়িত স্বরে বলিল, “আমি তথায় যাইব ও বিবাহ করিব।”

* * * * *

ইংলিশ্ চ্যানেলের উপর দিয়া এক খানি বাম্পীয়পোত গন্তব্যপথে ছুটিতেছিল।—ডেকেই উপর একটি পূর্ণচন্দ্রনিভাননা স্নন্দরী বালিকা দাঁড়াইয়া স্তম্ভ সমুদ্রতীরে স্বদেশের দিকে কোতুহলপূর্ণ নয়নে দেখিতেছিল। নিকটে কেহই ছিল না। নৈরাশ্রব্যঞ্জক অশ্রুভঙ্গি করিয়া নিতান্ত বিষমভাবে বালিকা পরিত্যক্ত জম্বুভূমির দিকে শ্রীয়া হস্তদ্বয় একবার প্রসারিত করিল। চতুর্দিকে সমুদ্রতরঙ্গ উল্লাসে নৃত্য করিতে লাগিল—ফেনরাশি বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের সহিত জাঁড়া করিতে লাগিল, সূর্য্যকিরণ সমুদ্রের উপর পতিত হওয়ায় ঝিকিণ্ড বারিকণা মুক্তার গায় ঝলকিতে লাগিল। বালিকা নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। চিরকালের জন্য পরিত্যক্ত মাতৃভূমির কথা স্মরণ হওয়ায় তাহার নারীস্বলভ কোমল হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল—কণ্ঠ রুদ্ধ হইতে লাগিল। তাহার মনে হইল, যেন ধনীভূত কুজ্‌ঝটিকায় নীল আকাশ ও সমুদ্র বিলীন হইয়া গেল। বালিকা ভাবিতে লাগিল, এই বিশাল পৃথিবীর মধ্যে কেবলমাত্র একজনের জন্য আমি স্বদেশ ছাড়িয়া চলিয়াছি—তিনি আমার জন্য অতি ব্যগ্রভাবে প্রতীক্ষা করিতেছেন।

গম্ভাতে বালিকা কাহার পদশব্দ শুনিতে পাইল ;—কিরিয়া দেখিল, একজন যুবক অনিমেষ নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। যুবক অতি বিনীতভাবে বালিকাকে

জিজ্ঞাসা করিল, “আপনাকে একখানা চেয়ার আনিয়া দিব কি?” বালিকার মুখে প্রসন্ন হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল, তাহার সুকোমল গওস্থল রক্তিমাত্ত হইয়া উঠিল । চঞ্চল নয়নদ্বয় বিক্ষারিত করিয়া সে বিনয়সহকারে সলজ্জভাবে যুবককে বলিল “না । ধন্যবাদ ।” এই বলিয়া সে জাহাজের নিম্নতলে নাশিয়া গেল ।

বালিকাকে লজ্জিত দেখিয়া যুবক ঈষৎ হাস্ত করিল । তাহার মনে হইল, বালিকা বিদ্যালয়ের অবকাশ উপভোগ করিবার জন্য ভারতবর্ষে পিতামাতার নিকটে যাইতেছে । তাহার অতুলনীয় সৌন্দর্য্য ও রমণীয় কাস্তি দর্শনে যুবক একেবারে মোহিত হইল । সে ক্ষিপ্ৰগতিতে ও অশ্রমস্বভাবে ডেকের উপর পদচারণা করিতে লাগিল ;—মুহূর্ত্তের নিমিত্ত বালিকামূর্ত্তি তাহার হৃদয় হইতে অপসারিত হইল না । সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল “আরও এক বৎসর আমি স্বাধীন ; নানা স্থানে ঘুরিয়া নূতন নূতন আমোদে সময়টা কাটাইতে পারিব । তাহার পর ? তাহার পর বিবাহিত জীবনের রীতি অনুসারে আমাকে সম্যকভাবে সংসারধর্ম্ম পালন করিতে হইবে ।” এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে গ্যাস্কনি মেসেঞ্জার একটি চুরুট ধরাইয়া আপনা আপনি বলিতে লাগিল “অড্রি, তুমি আমার নিকট অতি প্রিয়, কিন্তু স্বাধীনতা প্রিয়তর ।” অড্রির নাম করিতেই যুবকের কল্পনানয়নসমক্ষে তাহার নববিকশিত সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিল । কিন্তু সেই সৌন্দর্য্যে তাহার হৃদয়ের একটি তারও বাঁধুত হইয়া উঠিল না । সে সৌন্দর্য্যের স্মৃতিতে তাহার হৃদয়ে এককণা প্রেমও জাগিল না । অড্রি গ্যাস্কনির ভাবী পত্নী ।

এক সপ্তাহের মধ্যেই গ্যাস্কনিতে ও এভেলিনে প্রেমালাপ চলিতে লাগিল ।

* * * * *
রাত্রি অতি মনোরম,—মেঘহীন ও নক্ষত্রপরিশোভিত । এভেলিন্ ডারিং অনুভব করিল যেন গভীর নিশীথের শান্তি ও স্নিগ্ধতা তাহার যুবতী-জীবনের কতকটা অবসাদ অপসারিত করিয়া তাহার হৃদয়কন্দরে প্রবেশ করিয়াছে । কলিকাতার উপকণ্ঠে মেটিয়া বুরুজে পৌছিয়া দীমার নঙ্গর করিল । পরদিন প্রভাত পর্য্যন্ত দীমার এই স্থানেই অবস্থান করিবে । এভেলিন্ জাহাজের রেলিং এর উপর ডর দিয়া দাঁড়াইয়া অত্যন্ত কোতূহলী হইয়া সমুদ্রের নূতন নূতন দৃশ্য দেখিতে লাগিল । পার্শ্ব হইতে গ্যাস্কনি তাহার হস্ত স্পর্শ করিয়া বলিল, “এভেলিন্, আজ রাত্রিতে অশ্রু চিন্তায় কাষ নাই । আইস, আমরা আজ আমাদেরই চিন্তায় মগ্ন থাকি । কারণ, বোধ হয় আমরা আর কখনও মিলিত হইতে পারিব না ।”

সহসা গ্যাস্কনির দিকে ফিরিয়া এভেলিন্ বলিল “আজিকার রাত্রি এতই স্নিগ্ধ, আকাশ এতই সুন্দর, যে আমি সকল জিনিসই—এমন কি আপনাকে পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাইতেছি ।”

উত্তরে গ্যাস্কনি বলিল, “এভেলিন্, অতি সুন্দর রাত্রি, আমার মনে হইতেছে, কোন একখানি পুস্তকে পাঠ করিয়াছিলাম ‘ভারতবর্ষে না আসিলে আমরা মানবহৃদয়ের উপর নক্ষত্ররাজির প্রভাব বুঝিতে পারি না ।’ কিন্তু আমার নিকট এরূপ মধুর রজনী আর কখনও আসিবে না ।”

বালিকা এভেলিন্ গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া অশ্রুট স্বরে বলিল “আমার অদৃষ্টেও তাহাই আছে ।”

গ্যাস্কনি এভেলিনের হস্তধর নিজকরতলে স্থাপন করিয়া বলিল, “এভেলিন্, তুমি কিম্বা আমি যদি সম্পত্তিশালী হইতাম। অর্থাৎ বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী না হইয়া যদি তুমি হইতে, তাহা হইলে তুমি কি এই আমার মত কপর্দকবিহীন সৈনিকের নিকট এত হীনতা স্বীকার করিতে ?”

এভেলিন্ অতি মৃদুস্বরে বলিল, “হাঁ, গ্যাস্কনি, তুমি বোধ হয় জান, তোমার পদতলে আমার সর্বস্ব সমর্পণ করিবার জন্ত আমি ইহা অপেক্ষা অধিক হীনতা স্বীকার করিতাম।” একেবারে এত কথা বলিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া বিশেষ অপ্রতিভ ও আপনার প্রতি জুড় হইয়া গ্যাস্কনির হস্ত হইতে স্বীয় হস্ত ছিনাইয়া লইয়া এভেলিন্ চলিয়া গেল।—গ্যাস্কনি মেসেঞ্জার কোন বাধা না দিয়া তাহার পশ্চদগামী হইল। সে জাহাজের নিয়তলে সোপানের নিকট বালিকাকে অভিমানভরে বলিল, “এভেলিন্, এই আমাদের শেষ রাত্রি—আজ এই বিদায়-সময়ে হতভাগ্য গ্যাস্কনির নিমিত্ত কি একটি কথা, একটি—” গ্যাস্কনি কথা শেষ করিবার পূর্বেই এভেলিন্ হস্ত প্রসারিত করিয়া স্থির স্বরে বলিল “তবে বিদায়।”

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব হইয়া রহিল। পরে উদ্বেলিত হৃদয়ে গ্যাস্কনি কাতর কণ্ঠে বলিতে লাগিল, “খুব সম্ভব, আমাদের পরস্পরের আর মিলন হইবে না। ভারতবর্ষ অতি বৃহৎ দেশ ; আশা করি, এদেশে তোমার জীবন শান্তিময় হইবে। আমি চিরকালই ঘুরিয়া বেড়াইব। ভারতে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবার আর কোনও সম্ভাবনা নাই। এভেলিন্, তুমি কি আমার একটি সামান্য অনুরোধ রাখিবে না ? আমি বার বার তোমার নিকট সেই ভিক্ষা চাহিয়াছি।”

গ্যাস্কনি কথা শেষ করিবার পূর্বেই বুঝিয়াছিল যে, সে জিতিয়াছে। লজ্জাবশতঃ বালিকার কপোল রক্তাভ হইয়া উঠিল। তাহার অকোমল অধরপুটে গ্যাস্কনি স্বীয় ওষ্ঠাধর স্থাপিত করিয়া হৃদয়ে অগাধ তৃপ্তি অনুভব করিল। হায়। তখন কে জানিয়াছিল যে, এই চুম্বনই অষ্টদশ বৎসরের মূল।

পরমুহূর্তেই এভেলিন্ দেখিল, চার্লস্ বেসেট্—যাহাকে সে বিবাহসূত্রে বন্ধ করিতে প্রতিজ্ঞাত হইয়াছিল—জাহাজের সোপানের নিকট দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে লক্ষ্য করিতেছে। সে এই বেসেটের বার্গস্তা পত্নী। বালিকা বুঝিল,—তাহার জীবনের সমস্ত আশার শেষ হইল। এভেলিন্ জানিত, বেসেট্ কঠোর—অতি কঠোর—তাহার হৃদয়ে ক্ষমার স্থান নাই।

* * * * *

ইহার পরে যাহা ঘটয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা বাইতে পারে। বেসেট্ কোন মতে আশ্রয় সম্বরণ করিতে পারিল না ; এই দৃশ্যে একেবারে অস্থির হইয়া পড়িল। সে গ্যাস্কনির স্পর্ধার কথা ভাবিয়া শত বার তাহাকে ধিকার দিতে লাগিল—এভেলিনের প্রতি তাহার ঘৃণা বদ্ধমূল হইল।

সে এভেলিনের নিকট দৌড়াইয়া বাইয়া কঠোর স্বরে বলিল “এভেলিন্, তোমার নিকটে

যে যে বিষয়ে আমি প্রতিশ্রুত আছি সে সবই সম্পন্ন করিব। কিন্তু তুমি অপর একজন পুরুষকে ভালবাস জানিয়া তোমাকে আমি বিবাহ করিতে পারি না।” নক্ষত্র খচিত নীল চন্দ্রাতপতলে ভাগীরথীবক্ষে জাহাঙ্গীর ডেকের উপর সেই প্রণয়িপ্রণয়িনীর আশ্রয়পূর্ণ আলিঙ্গন ও আবেগময় চুম্বনের চিত্র বেসেটের হৃদয়ে চিত্রাঙ্কিত রহিল। সে ছবি বেসেট তাহার প্রস্তরকঠিন হৃদয় হইতে আর মুছিতে পারিল না।

বালিকা এভেলিন্ এই কলঙ্কের কথা ভাবিল। একবার তাহার স্বদেশে ফিরিবার সাধ হইল। বেসেটের নিকট কোনরূপ অসুখের লাভের সম্ভাবনা তাহার হৃদয় হইতে দূর হইল। সে কোনদিকেই একটা বন্ধন খুঁজিয়া পাইল না। তাহাকে ধরিয়া রাখিবার কেহই ছিল না। তবে কেন সে এ কলঙ্ক-পসরা মাথায় লইয়া দীর্ঘ-জীবন অতিবাহিত করিবে? জীবন তাহার পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠিল।

এভেলিন্ অল্পবয়স্কা ও অদূরদর্শিনী। পরদিন প্রভাতের পূর্বেই দেখা গেল, বালিকার ক্ষুদ্র শুভ্র দেহখানি নদীবক্ষে তরঙ্গাভিযাতে ইতস্ততঃ বিতাড়িত হইতেছে। তাহার সকল দুঃখ, সকল কলঙ্ক ভাগীরথীর শীতল জলরাশির স্পর্শমাত্রই শাস্তিতে বিলীন হইয়াছে। এইরূপে এভেলিনের কলঙ্কিত জীবনের অবসান হইল। *

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র।

সমালোচনা।

—•—•—•—•—•—•—

প্রেম ও প্রকৃতি।*

আমেরিকান কবি পো বলিয়াছিলেন, কবিতা দীর্ঘ হয় না—হইতে পারে না। পো স্বয়ং গীতিকবিতার রচনায় প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তাহার উক্তির অর্থ এই যে, কবিতা দীর্ঘ হইলে তাহাতে সর্বত্র সমান উৎকর্ষ থাকে না। আবার দীর্ঘ কবিতা—মহাকাব্য শ্রোতৃবর্গের জন্ত রচিত হইত; অবসরের অভাবে বিপদ পাঠকদিগের পক্ষে—এই পুস্তকবাহুল্যের দিনে মহাকাব্য পাঠ ও তাহার রস উপভোগ ছুড়র কার্য্য। বিশেষ সময় সময় লোক মহাকাব্যের—দীর্ঘ কবিতার বাহুল্যে বিরত হইয়া পড়ে। তখন ক্ষুদ্র কবিতার সমাদর অবশ্যজ্ঞাবী। ইংরাজী সাহিত্যে টেনিসনের অসাধারণ সমাদরের ইহাও অন্ততম কারণ। বাঙ্গালী সাহিত্যেও এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। বৈষ্ণব কবিরিগের পদাবলী একদিন বাঙ্গালীকে মাতাইয়া তুলিয়াছিল। তাহার পর—নব্য বঙ্গে যখন মধুসূদন, হেম-চন্দ্র ও নবীনচন্দ্র দীর্ঘ কবিতায় বাঙ্গালীর জীবনের নূতন ভাব বিকশিত করিতে-ছিলেন—সেই সময় রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়াছিলেন—এখন সজ্জিগু না হইলে সাফল্য-লাভের উপায় নাই। তাই ‘কবি-কাহিনীর’ কবি ‘ভানুসিংহ’ রূপে বাঙ্গালার কবিকুঞ্জে দেখা দিলেন। তাহার পর ‘কড়ি ও কোমল’, ‘মানসী’ ও ‘সোনার তরী’—গীতি-কবিতার রাজ্যে যে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা বাঙ্গালীর নিকট সমাদরলাভে বঞ্চিত হয় নাই।

কিন্তু দীর্ঘ কবিতা যে সর্বত্রই বিরজিকর—দীর্ঘ কবিতার যুগ যে অতীত হইয়াছে—এমনও বলা যায় না। কবিপ্রতিভা যাহাকে সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত করিয়া তুলে, তাহার সমাদর অবশ্যজ্ঞাবী। কবি কিট্‌স্‌ সত্যই বলিয়াছেন,—যাহা সুন্দর, তাহা নিত্য আনন্দের। বাঙ্গালীর ‘রামায়ণ’, হোমরের ‘ইলিয়ড’,

* প্রেম ও প্রকৃতি—জীনগেজনাথ সোম প্রণীত। কলিকাতা, ২০১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট হইতে শ্রীকৃষ্ণদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য বার আনা।

কালিদাসের ‘কুমার-সম্ভব’—চির দিন রসপিপাসু পাঠকদিগকে আকৃষ্ট ও বিমোহিত করিবে ।

আবার দীর্ঘ কবিতারও প্রকারভেদ আছে । একরূপ দীর্ঘ কবিতা বিচিত্র—বিচ্ছিন্ন খণ্ডচিত্রের সমষ্টি ; সকলগুলি একটা কোন মানবীয় ভাবের স্ত্রে সংবদ্ধ । কালিদাসের ‘রঘুবংশ’ ও ‘মেঘদূত’ এইরূপ কাব্যের আদর্শ বলিলেও অত্যাক্তি হয় না । অকালনির্ধািপিতজীবনদীপ প্রতিভাবান সমালোচক বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছিলেন,—“খণ্ড খণ্ড চিত্র রচনার কালিদাসের একটু যেন বিশেষ আনন্দ ছিল । শব্দক যেমন অতি সহজেই আপনার চারিদিকে বিচিত্রচিত্রিত আবরণ নির্মাণ করে, কালিদাসের প্রতিভা তেমনি দেখিতে দেখিতে আপনাকে চিত্রময় শ্লোকে আবৃত করিয়া তোলে । * * * * একটা চিত্রশালা দেখিয়া আসিলে যেমন মনের ভাব হয়, সমস্ত রঘুবংশ পাঠ করিলেও সেইরূপ হয় । অনেকগুলি ক্রেমে বাধানো ভাল ভাল ছবি ।” এইরূপ কাব্য দীর্ঘ হইলেও বিরক্তিকর হয় না । বিশেষ কবির যদি চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা থাকে—তিনি যদি ভাবসম্পদে ধনী ও সেই ভাবকে ভাষায় ব্যক্ত করিবার ক্ষমতার অধিকারী হয়েন, তবে তাঁহার কাব্য দীর্ঘ হইলেও বিরক্তিকর না হইয়া আনন্দদায়ক হয় । গ্রন্থকারের এই সকল গুণ আছে বলিয়াই আমাদের আলোচ্য কাব্যগ্রন্থখানি—নগেন্দ্র বাবুর ‘প্রেম ও প্রকৃতি’ বিরক্তিকর না হইয়া প্রীতিপ্রদ হইয়াছে ।

এই গ্রন্থে গ্রন্থকার সরস—মধুর ভাষায়, অনাহতগতি ছন্দে—ভারতের বিচিত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ও শিল্পকীর্তির চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন । চিত্রগুলি নিপুণ চিত্রকরের অঙ্কিত—বর্ণের বৈচিত্র্য আছে, বাহুল্য নাই ; একটি ও অন্যবস্তুর রেখায় চিত্র ভাঙ্গাফাঙ হয় নাই ; কোনরূপে যাহাতে চিত্রের সৌন্দর্য্য নষ্ট না হয়, চিত্রকর সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক । কবি চিত্রের বিষয় নির্বাচনেও বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন ।

প্রকৃতির অংশ অনিন্দ্য সুন্দর । কিন্তু সে অংশ যেকপ সমুজ্জ্বল ও সুন্দর, প্রেমের অংশ সেরূপ নহে—বরং তুলনায় ম্লান । কালিদাস এই human interest স্ত্রে বিচ্ছিন্ন চিত্রগুলি গ্রথিত করিতেন । রঘুবংশের ত্রয়োদশ সর্গে চিত্রগুলি রাহুমুখমুক্ত চন্দ্রের মত বিরহাবসানে মিলনে সমুজ্জ্বল প্রেমস্ত্রে বদ্ধ :—

তব বিশ্বাধরমুখা-পিপাসী হৃদয় ;

রঞ্জম-বিলম্ব আর সহে না এখন ;

তট-বায়ু যেন তাই বুঝি এ সময়

কেতুকী-পরাগে রঞ্জে ও বিধুবদন ।

বিমান-গবাক্ষ-পথে তুমি যে সময়
পরশিতে মেঘমালা প্রসারিছ কর,
বিজলী-বলয় আনি'—ক্ষণভেজোময়
পরাইছে করে মেঘ—কিবা মনোহর।

ষোড়শ সর্গে চিত্রগুলি প্রোথিতভর্তৃকার বিরহ-ব্যাকুলতা-স্বভে বন্ধ :—

যে পথে প্রমদাকুল চলিত নিশায়—
মুখর নুপুর চার বাজিত চরণে
আপনার পথ হেরি' মুখের উল্কার
সে পথে শৃগাল দিরে আশিষাযেধণে।

ক্ষোদিত পায়াণ-স্তম্ভে মুরতি-নিকর
ধূল্য বিবর্ণ হয়ে রয়েছে এখন ;
ত্যক্ত অহিচর্য পড়ি' আছে বশোপর—
উরস অবরি' যেন রয়েছে বসন।

‘মেঘদূতের’ চিত্রগুলি পবনচালিতমেঘমালার মত কান্তাবিরহকাতর বিরহীর দীর্ঘশ্বাসে ভাসিয়া গিয়াছে। গ্রন্থকার যদি আলোচ্য গ্রন্থের প্রেমের ভাগ প্রকৃতির ভাগের মত সুন্দর ও সমুজ্জ্বল করিতে পারিতেন, তবে তিনি বালালা সাহিত্যে এক অভিনব সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়া অক্ষয় যশে যশস্বী হইতেন। কিন্তু এই পুস্তকে প্রেমের স্মৃতি সর্বত্র সমুজ্জ্বল নহে।

নাহি হৃদি, নাহি আশা, নাহি স্মৃতি, নাহি ভাষা,
কি হুঃখ তাহায় বল প্রেমিক সৃজন ?
তুমি ত ধরায় থাকি' কিছুই রাখ নি বাকি,
তোমার কর্তব্য শেষ—প্রোদ-আরাধন।

আবার

ওই সৃষ্টি, ওই স্মৃতি, ওই আশা, ওই হুঃখ,
ওই স্মৃতি, ওই রূপ, ও জন্ম-সাধনা।
ওই কাম, ওই মোক্ষ. ওই ধর্ম, ওই লক্ষ্য,
ওই তাপ, ওই হর্ষ ও চির-কামনা।

এরূপ উক্তি গ্রন্থমধ্যে অধিক নাই। তাহার কারণ কবি প্রকৃতি-প্রেমে বিভোর, প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ, প্রকৃতির ভাবে ওন্ময়। কবি জায়েন্ট প্রকৃতি-প্রেমের প্রমত্ততা সম্বন্ধে গাহিয়াছিলেন :—

যে জন প্রকৃতি সনে

প্রণয়-প্রফুল্ল মনে

বাহু দৃঢ় রাখে তা'র হয় আত্ম-হারা ;

ওধু তা'রি কর্ণে গশে

সিক্ত শাস্ত হৃদায়সে

প্রকৃতির প্রেমময় বচনের ধারা ।

‘প্রেম ও প্রকৃতির’ কবি প্রকৃতি-প্রেমে আত্মহারা—তাই তাঁহার প্রকৃতি-বর্ণনা সর্বত্র হৃদয়গ্রাহী । ‘পুরুষোত্তমে’ সমুদ্রের বর্ণনায় এ কথা বুঝা যাইবে :—

“হে আদি সৃষ্টির রূপ,

কি মহানু অপরূপ

এ মহা-ভীর্ষের পাশে বারিধি তোমার ।

বিস্ময়ে চৌদিকে চাই,

আদি নাই, অন্ত নাই

কোথা এ ব্যাপ্তির শেষ তব পারাবার ।

“কভাঙ্গে ককুটী-ভরে

হেলায় ইঙ্গিত ক’রে

জানাও কি অধীরতা প্রকৃতি-জীবনে ;

হৃদয়ে কি অভিলাষ

পুরাইতে কোন আশ

এ ভীম তাণ্ডব তব শরনে স্বপনে ।

“আছাড়ি গরজে কূলে

উর্ধ্বমাল্য ফুলে ফুলে

ছুটে আসে লক্ষ ফণী ফণী বিস্তারিয়া ।

কি ভীষণ ! কি কলৌল !

কি উন্নত উত্তরোল ।

প্রলয়-বিষাগ বাজে ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া ।

“ওরফে মিশার কায়,

মিশি শোভে সুবসায়

বালুকা রজতশুভ্র সৈকত সুন্দর ।

পৃথ্বী-উপকূল-রেখা,

যতদূর যায় দেখা,

হিরোলিত ততদূর তরঙ্গ-ভূধর ।”

এরূপ বর্ণনা গ্রন্থমধ্যে বহু স্থানে পাওয়া যায় । পড়িয়া মনে হয়, বায়রণের মত তিনি বলিতে পারেন :—

“There is a pleasure in the pathless woods,
There is a rapture on the lonely shore,
There is society where none intrudes,
By the deep Sea, and music in its roar ;
I love not Man the less, but Nature more.”

কাশীর বর্ণনায় প্রাকৃতিক শোভার সহিত ভক্তির অপূর্ব মিশ্রণ :—

“বিদ্যাকাশে বারিগণী,

পূর্ণিমার হেমশশী

ভুলোকে ছুঃলোকে তার তুলনা কোথায় ;

কি জানে সাধনবলে,

অধিতীর ভ্রমণে

স্বর্গ মর্ত্য চরাচর চরণে লোটায় ।

"জাগে কি চেতনা চিতে বিশ্বব্যথা নিবারিতে,
 শান্তির সাজাজ্য মর্তে অপূর্ব সুন্দর ;
 সাধনার পূর্ণ সৃষ্টি, শোভার সুবর্ণ বৃষ্টি,
 ধূমর ধূজটি-ডালে অর্ধ শশধর ।
 "এ সংসার মহামরা, শান্তি-কাগ-কলতরা,
 ধরেছে বুকের 'পরে কি মিথি ছায়ায় ;
 ভবহঃখে ভাঙ্গা বুক লভে কি সান্ত্বনা সুখ,
 এ তীর্থ-নিবাসে আসি জীবন-সন্ধ্যার ।"

শুধু সীমা-নির্ধারণও কবির কোশলে সুন্দর হইয়াছে। তিনি হিমালয়কে বলিয়াছেন :—

"ভারত উত্তরে থাকি, পশ্চাতে তিক্ত রাখি,
 ললাটে ভূধর গম কাশ্মীর-কান্তার ;
 রহিয়ে পুরবে চুমি, আসামের বনভুমি,
 সজিয়াছে কিবা এক জলধি শোভার ।"

গ্রন্থমধ্যে ভাবের দীপ্ত-দামিনী-স্ফুরণ বিরল নহে। আমরা তিনটিমাত্র দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া ক্ষান্ত হইব :—

"নীহারগতিত হায়, শ্রাম বনরাজী গায়,
 দেখিবে ছায়ার সহ বর্ণের বিকাশ ;
 এক মহীরূহে রতা দেখিবে সহস্র লতা
 জড়প্রেমে বিশ্বপ্রেম অপূর্ব-প্রকাশ ।"

"তটিনী-তরঙ্গ প্রায় এ নরজীবন যায়,
 পরাণে আগিয়া উঠে অনন্ত উচ্ছ্বাস ।
 এত যে ধরার স্মৃতি, অমিয় জীবন-গীতি,
 মরণের মহা স্বপ্নে হয় কি বিকাশ ?"

"ধন্য বিশ্বে বিশ্বনাথ, করি চির প্রণিপাত,
 বিশ্বব্যাপী তব পূজা এ বিশ্ব মন্দিরে ;
 প্রতি দেহে হৃদিস্থল, তুমি তায় সমুদ্ভল,
 উদার কনকালোকে সন্ধ্যার তিমিরে ।"

এইরূপে বর্ণনার বৈচিত্র্য, ভাবের মাধুর্য্য ও ভাষার লালিত্যে আলোচ্য পুস্তকখানি উপাদেয় হইয়াছে।

পুস্তকখানির কয়টি জটিল উল্লেখ করিয়া বর্তমান আলোচনা শেষ করিব। বৈয়াম-চিহ্ন-সংস্থাপন বিষয়ে প্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রম বহু স্থানে দৃষ্ট হইল ; কোথাও অনাবশ্যক বাহুল্য, কোথাও অকারণ কার্পণ্য। উদ্ধৃত অংশগুলিতেই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ বিद्यমান। উদ্ধার-চিহ্ন ও সঙ্কোচ-চিহ্ন সংস্থাপনেও

এইরূপ অমনোযোগ লক্ষিত হইল। এ বিষয়ে গ্রন্থকারের মনোযোগপ্রদান আবশ্যিক।

গ্রন্থকার “বিমান” শব্দ আকাশ অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। রবীন্দ্র বাবুও ‘ছবি ও গানে’ লিখিয়াছিলেন :—

“পশ্চিমে ডুবেছে ইন্দু, সশুখে উদার সিদ্ধ,
শিরোপরি অনন্ত বিমান,
জয়মান জটাজুটে যোগীবর করপুটে
দেখিছেন সূর্য্যের উত্থান।”

কিন্তু “বিমান” অর্থে “আকাশ” হয় না।

গ্রন্থমধ্যে “চক্ষু” শব্দ বহুবার ব্যবহৃত হইয়াছে। “চক্ষু” শুদ্ধ প্রয়োগ নহে। কবিগণ নিরক্ষুশ হইলেও অশুদ্ধ প্রয়োগ যত দূর সম্ভব পরিহার করাই কর্তব্য।

গ্রন্থকার ফল্গুকে “অন্তঃশিলা” বলিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে ফল্গু “অন্তঃনলিলা।” চতুর্থ সর্গে দেখিতে পাই :—

“মসীদ মিনার কত, হর্ষচূড়া শত শত
গল্লবিত তরুচ্ছায়া বজ্রের ছ’ধারে।”

ইহার দুই শ্লোক পরেই :—

“মতি মসজীদে গলে লোলমুক্তাজ্যোতিঃ অলে
নাগিনা মসজিদ-চূড়ে সোণার গাধুরী ;”

“মসীদ”, “মসজীদ” ও মসজিদ” তিন প্রকার প্রয়োগই দেখা গেল।

“দ্যালোকে”র স্থানে “দ্যঃলোক” ব্যবহৃত হইয়াছে। “শাটীর” পরিবর্তে “সাটী”র ব্যবহার বহু স্থানে দৃষ্ট হইল। “বহি”র স্থানে “বাহি”, “উর্দ্ধফণের” স্থানে “উর্দ্ধফণা” ও “ভেঙ্গেছে”র পরিবর্তে “ভেঙেছে”র প্রয়োগ উল্লেখযোগ্য।

লেখকের শব্দসম্পদ যথেষ্ট আছে। তবে তিনি এক স্থানে যে “অগ্নে” ও “যজ্ঞে”—মিল করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় অনবধানতাপ্রযুক্ত।

“খেত তরঙ্গের প্রায়, আবরি প্রান্তর-কায়,
হলে গোঠে বৎসমালা কাতারে কাতারে।”

অতিরিক্তঅতিরঞ্জনদোষদৃষ্ট। এ দোষ গ্রন্থমধ্যে বিরল। কবি ড্রাইডেন বলিয়াছেন “দোষরাশি তৃণসম উপরেই ভাসে—”তাই এ সকল দোষের উল্লেখ করিলাম। আশা করি, ভবিষ্যৎ সংস্করণে এ সকল দোষ সংশোধিত হইয়া এই উপাদেয় কাব্যখানি সর্বাঙ্গসুন্দর হইবে। কবিত্বরসপিপাসী বাঙ্গালী পাঠকের নিকট এই পুস্তকের আদর অবশ্যজ্ঞাবী।

সংগ্রহ ।

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ।

কাশ্মীরের হ্রদ ।

কাশ্মীরের প্রাকৃতিক দৃশ্যের তুলনা নাই। তাই কাশ্মীর ভূস্বর্ণ নামে অভিহিত হইয়াছে। বিশালা-গরীর কথায় কালিদাস যাহা বর্ণিয়াছেন—তাহা কাশ্মীরের সম্বন্ধে সর্বতোভাবে প্রযোজ্য—

স্বল্পীভূত পুণ্যফল স্বর্ণ হ'তে ফিরিতে মরতে

শেষ পুণ্যে সাধু যেন স্বর্ণখণ্ড আনিলা জগতে ।

ভারতের যোগল সম্রাটগণ এই কাশ্মীরের স্নিগ্ধ শোভার মধ্যে নিদাঘ যাপন করিতেন। আজও কাশ্মীর জগতের সৌন্দর্যের সারভাগে সম্ভিজতা স্পন্দরী মত—প্রকৃতির সৌন্দর্য সৃষ্টি তিলোত্তমার মত লোকচক্ষু বিনোদন করিতেছে। তাহার কমকান্তির সৌন্দর্য-বর্ণনায় আকৃষ্ট হইয়া নানাদিদেশ হইতে সৌন্দর্য-পিপাসীরা চুতমুকুলগন্ধাকৃষ্ট ভ্রমণের মত কাশ্মীরে সমাগত হইয়া থাকেন। ইহাদিগেরই একজন সম্প্রতি 'পাইওনিয়ার' পত্র কাশ্মীরের হ্রদের সৌন্দর্য বর্ণনা করিয়াছেন। প্রবন্ধের ভাষা সেই সৌন্দর্য-বর্ণনারই উপযোগী। সে ভাষার স্বরূপ বুঝান অসম্ভব। আমরা নিম্নে সেই প্রবন্ধের সার-সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

জগতের পক্ষে কাশ্মীর যাহা, কাশ্মীরের পক্ষে ডল হ্রদ তাহাই। ডলের ছন্দে কাশ্মীরের

সৌন্দর্য ফুটিয়াছে; ডলের বক্ষে কাশ্মীরের সৌন্দর্য প্রতি-

ডল হ্রদ

বিস্তৃত, ডলের সৌন্দর্যে কাশ্মীরের হৃদয়ের বিকাশ। গ্রীনগরের

শিরোপরি দণ্ডায়মান তক্তগিরি হইতে দৃষ্ট প্রাকৃতিক দৃশ্য অনিম্যস্পন্দন। তিন দিকে নদী-প্রবাহ-খচিত স্বপ্নরাজ্য উপত্যকা, আর দূরে অমল ধবল গিরি, আর এক দিকে ডল হ্রদ। প্রভাত অরুণালোকে ইহার গাঢ় কৃষ্ণ জলরাশি ক্রমে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে—ছায়া চঞ্চল চরণে পূর্বদিকে পর্বতমূলে যাইয়া ক্রমে অদৃশ্য হয়। মধ্যাহ্নকালে নীল আকাশেরই মত নীল জলরাশি ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠে। সন্ধ্যায় যখন বর্ণের বৈচিত্র-বিকাশ হয়, তখন জলের স্নিগ্ধ প্রশান্তি যেন অনন্তের আভাস দেয়। নিশীথে চন্দ্রকর হ্রদবক্ষে যেন আলোক বর্ষা রচিত করে। গাভীরো, রহচে ডলের তুলনা নাই।

ডলের শোভা সকলেরই চিত্তহরণ করে। ইহার ক্ষটিক স্বচ্ছ জল-বিস্তারে কোথাও

গগন প্রতিবিস্তৃত, কোথাও পাহাড়ি বহু জলজ গুল্মাদি স্বচ্ছন্দে

উদ্ভাসন।

বর্জিত। কোথাও বা শরবনের মধ্যে লুকায়িত বিহগের কল গীতি

পবনে ভাসিতেছে; কোথাও বা ক্ষুদ্র দ্বীপের বৃক্ষপত্রাঙ্গুরাল হইতে নিচিহ্নচিহ্নিত মসজিদ দেখা গাইতেছে, উপাসক-দল নৌকায় তথায় যাইতেছে। তীরভূমিতে যোগল শাসনকালে

রচিত উদ্যানমালা—আনন্দভবন—প্রীতিনির্কেতন—কুসুমের বৈচিত্র্য ও বাহুল্য
নয়নরঞ্জন ।

শত বৎসরের অধিক কাল পূর্বে মোগল সম্রাটগণ কাশ্মীরকে ভারত সাম্রাজ্যের অন্ত-
ভুক্ত করিয়াছিলেন। কাশ্মীর স্বীয় সৌন্দর্য্যে তাহাদিগের বীর
তাজমহল।
হৃদয় জয় করিয়াছিল। কাশ্মীর জানিলে—তাজমহলের স্বরূপ
বুঝা যায়। তাজমহল যে কবিত্বপূর্ণ বার্তা বিবোধিত করে—সে বার্তা ডগের, বক্র-
গতি ঝিলাম নদীর, ছায়াশিখ কুঞ্জবনের, রবিকরদীপ্ত গিরিমালার। কাশ্মীরকে অন্তরঙ্গ
রূপে না জানিলে—তাজমহল বুঝিতে পারা অসম্ভব। আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান,
আওরঙ্গজেব—সকলেই কাশ্মীরে নিদাঘবাণন করিতেন। জাহাঙ্গীর বলিয়াছিলেন,
কাশ্মীরই কবিরচিত স্বর্ণ। প্রায় দুই শত বৎসর ধরিয়া মোগল সম্রাটগণ বিপুলবাহিনী
সঙ্গে লইয়া প্রতি বৎসর নিদাঘাগমে ভারতের ধূলিধূসর-তাপতপ্ত রাজধানী পরিত্যাগ
করিয়া কাশ্মীরে আসিতেন। সে কি বিপুল আয়োজন—কি বিরাট ব্যাপার—কি বিস্ময়কর
দৃশ্য। জাহাঙ্গীর এই ভূস্বর্গে চতুর্দশ বা পঞ্চদশ নিদাঘ বাণন করিয়া মরণোত্তর হইয়া
কাশ্মীরভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। কাশ্মীরের শোভার মধ্যে মর জীবনের অবসান
করাই তাহার অভিপ্রেত ছিল। কাশ্মীরের নিকটে আসিয়া তাহার জীবন শেষ হয়।

কাশ্মীরে আর একটি হ্রদ আছে। অন্ধারের সহিত সহিত ডগের কি প্রভেদ। ডল
অন্ধার।
প্রফুল্ল—অন্ধার গভীর। ডল জনকোলাহলমুখরিত—অন্ধারে জন-
সমাগম প্রায় নাই। কেবল ধূসর কুঞ্জ-ঝটিকাবৎ জলবিস্তার—যেন
অসমাপ্ত শিল্পকীর্তি। অন্ধারের শরবনে জলচরবিহঙ্গের বিস্ময়কর বাহুল্য। কোথাও বা
বক একপদে দণ্ডায়মান হইয়া ভেকবহুল জলে ভেকের সন্ধান করিতেছে—ভেক ধরিয়া
আত্মসাৎ করিতেছে। কোথাও বা বক শিরোপরি চক্রাকারে উড়িয়া বেড়াইতেছে—শর-
বনে নাগিয়া আসিতেছে।

হ্রদে মাহুনের মধ্যে কেবল হ্রদবাসী প্রমজীবীরা। তাহারা বিষয়—উদয়াস্ত্র প্রমের ফলে
জীবিকার্জন করে। দীর্ঘ দিনে গৃহপালিত পশুর জঘা খাট
হ্রদবাসী।
সংগ্রহ করিয়া বা ফল উৎপাদনের জঘা ভাসমান উদ্যান রচনা করিয়া
সজ্জায় তাহারা গৃহে প্রত্যগত হয়। তাহাদের নয়নে বিষাদ—মুখে বাক্য নাই। তাহারা
নিদাঘের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার অবসর পায় না;—নিদারুণ শীতের জঘা সঞ্চয়ে
ব্যাপ্ত রহে। এই সৌন্দর্য্যের মধ্যেও বিষাদের অভাব নাই। তবে প্রকৃতির এই কাম্য
কাননে বিষাদ ও এক অভিনব সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

সমাজ-তত্ত্ব।

বঙ্গে সমাজসংস্কার।

গত এপ্রিল মাসের সুবিখ্যাত 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রিকায় প্রযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় "বঙ্গে সমাজসংস্কার" শীর্ষক একটি সম্ভর্ড প্রকাশিত করিয়াছেন। বর্তমান সময়ে হিন্দুসমাজে বিধবাবিবাহ লইয়া যে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে,—তাহাই মুখ্যতঃ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আলোচ্য বিষয়। প্রবন্ধের প্রথমেই লেখক লিখিয়াছেন যে, প্রতি সমাজেরই এক একটি বিশেষত্ব আছে। কোন সমাজে ধর্মভাব প্রবল, কোন সমাজে ঐহিক চিন্তাই সর্ব্বশ্রী। মানবের মধ্যে যেমন আকৃতি ও প্রকৃতিগত পার্থক্য বর্তমান, সমাজমধ্যেও সেইরূপ পার্থক্য বর্তমান। জীবশরীর যে যে নিয়ম অনুসারে বিকাশপ্রাপ্ত হয়, সমাজশরীর ও প্রায় সেই সেই নিয়ম অনুসারেই বিকাশ প্রাপ্ত হয়। ব্যক্তিগত গুণ ও বিশেষত্ব যেমন কতকগুলি নিয়ম অনুসারে বিকশিত হয়, সামাজিক রীতি-নীতি ও সেইরূপ কতকগুলি প্রাকৃতিক নিয়মবশেই অভ্যুদিত হইয়া থাকে। মানব-শরীর যেমন অবস্থাবিশেষে অস্থূল ও পীড়িত হইয়া পড়ে,—সমাজ-শরীর ও সেইরূপ অবস্থা-ভেদে বিকৃত ও অস্থূল হইয়া পড়ে। সেই সামাজিক বিকৃতির ফলে সমাজে নানা কুরীতি ও কদাচার দেখা দেয়। দৈহিক ব্যাধির জায় অনেক সামাজিক ব্যাধিও বহু দিন ধরিয়া সমাজ-শরীরকে আক্রমণ করিয়া থাকে, এবং অল্পে অল্পে সমাজের জীবনী শক্তিকে সংহার করিতে থাকে।

সমাজের প্রচলিত রীতি-নীতিকে হঠকারিতার সহিত বিপর্য্যস্ত করা বিধেয় নহে।

কোন রীতি বা ব্যবহার সমাজের স্বাভাবিক বিবর্তনের ফলে পরিবর্তন।

আবির্ভূত হইয়াছে অথবা তাহা সামাজিক বিকৃতির ফলে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, সর্ব্বাঙ্গে তাহারই বিচার করিয়া দেখা একান্ত আবশ্যক। অথ সমাজের আদর্শ দেখিয়া তাহার অনুকরণ করিতে প্রয়াস পাওয়া উচিত নহে ;—ঐ সমাজের ইতিহাসের ও অবস্থার আলোচনায় সামাজিক সমস্যায় সমাধান করাই কর্তব্য। হঠকারিতার সহিত কোন সামাজিক রীতির মূলোচ্ছেদ করা সম্ভব নহে,—আর যদিই না সম্ভব হয়, তাহা হইলে তাহার ফল যোর অনিষ্টজনকই হইয়া থাকে।

সমাজসংস্কারকগণ তিনটি বিষয়ের সংস্কার করিতে চাহেন। বিধবাবিবাহের প্রচলন,

জাতিভেদের উচ্ছেদ, এবং বিলাতফেরতগণকে সমাজে গ্রহণ তাঁহাদের উদ্দেশ্য।

অভিপ্রের্ত। প্রথম দুইটি বিষয়ে তাঁহারা সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই। তৃতীয় বিষয়ে তাঁহারা অনেকটা সাফল্যের সম্মিহিত হইয়াছেন। ইহার কারণ তৃতীয় বিষয়সম্পর্কে প্রয়োজনের আধিক্য এত অধিক হইয়াছে যে, রক্ষণশীলতার বৃত্তি আর সে চাপ সহিতে পারিতেছে না। সুতরাং এ বিষয়ে সংস্কারকগণের সাফল্যলাভ অনেকটা সহজ হইয়া পড়িয়াছে। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও সমাজে বিধবাবিবাহ চলে নাই ;—তাহার

কারণ, সমাজ উহার প্রয়োজন অনুভব করে নাই। হিন্দুদিগের বিবাহ প্রথা আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে আভ্যন্তরীণ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা-পরিবর্তনের সহিত বিবাহ প্রথার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই হিন্দুসমাজ পুনর্ভূপত্নীকে ধর্মপত্নীর সহিত একাসনে বসায় নাই। পুনর্ভূপত্নী চিরকালই ধর্মপত্নীর অনেক নিম্নে স্থান পাইয়াছেন। পৌনর্ভব পুত্র তাহার পিতার ঔরস পুত্রের সহিত সমানভাবে নৈপজিক সম্পত্তিতে অধিকার পায় নাই। বশিষ্ঠ ও বিষ্ণু দ্বাদশের ক্রমিক তালিকায় পৌনর্ভব পুত্রকে চতুর্থ স্থান, এবং যাজ্ঞবল্ক্য ষষ্ঠ স্থান নির্দিষ্ট করিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্য পৌনর্ভব পুত্রকে কানীন পুত্র অপেক্ষাও নিকৃষ্টতর স্থান দান করিয়াছেন। মত্ন লিখিয়াছেন, বিধবাবিবাহ-কারী ব্রাহ্মণ আত্মাদি কার্যে অপাণ্ডিত্যেয়। ইহাতেই বুঝা যায় যে, অতি প্রাচীনকাল হইতেই হিন্দুসমাজ বিধবাবিবাহের অতিকূল। পরাশর কলিযুগে বিবাহিতা বিধবাকে সন্তৃত বিবাহিতা রমণীর তুল্যাসন দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি তাহাতে কৃতকার্য হইলেন নাই। পরবর্তী মনীষিগণ বিধবাবিবাহ একেবারেই নিষিদ্ধ করিয়া যান। আদিপুরাণই তাহার প্রমাণ। ইহারা নিশ্চয়ই কোন গুরুতর সামাজিক দোষ দেখিয়া বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

কি প্রকার সামাজিক দোষের আবির্ভাব দেখিয়া পরাশরের পরবর্তী মনীষিগণ বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, এখন তাহা জানিবার কোন বর্তমান আন্দোলন। উপায়ই নাই। সম্প্রতি বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে সমাজে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। সামাজিক অবস্থা বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া এই সমস্তই সমাধান করা কর্তব্য। সামাজিকগণের মধ্যে বিধবাবিবাহের অতিকূল ভাব এখনও প্রবল রহিয়াছে। এই প্রসঙ্গে মুখোপাধ্যায় মহাশয় আদম স্মারীর হিসাব হইতে দেখাইয়াছেন যে, বাঙ্গালার ব্রাহ্ম, খ্রষ্টান ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা রমণীর সংখ্যা অনেক অল্প; কিন্তু বিশ্বের বিষয় এই যে, ঐ সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেও বিপত্তীক অপেক্ষা বিধবার সংখ্যা, অনেক অধিক। ইহাতে রমণীসমাজে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তির ন্যূনতাই সূচিত হইতেছে। সুতরাং ঔদাহিক ব্যাপারে পুরুষ ও রমণীর সাম্য স্বীকার করা যায় না। ইহা ভিন্ন খ্রষ্টান ও ব্রাহ্ম সমাজে অনুচ্চা রমণীর সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহাতে একটি গুরুতর সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হইতেছে। এই সকল অনুচ্চা রমণীর মধ্যে অনেকেই বিবাহ করিতে অভিলাষিণী, ইহা সহজেই অনুমেয়। পক্ষান্তরে বাঙ্গালার হিন্দুসমাজে পুরুষ অপেক্ষা রমণীর সংখ্যা সওয়া লক্ষ অধিক। বাঙ্গালার হিন্দু পুরুষদিগের মধ্যে অনেক বিদেশী গণিত হইয়াছে। পশ্চিম অঞ্চল ও ভারতের অন্যান্য স্থান হইতে অনেক ব্রাহ্মণ, রাজপুত প্রভৃতি এ দেশে আসিয়া পৌরহিত্য, কনেষ্টবলী, জমীদারের বরকন্দাশী, প্রভৃতি কার্য করে। ইহাদের মধ্যে অনেকেই অবিবাহিত; যাহারা বিবাহিত তাহারাও প্রায় তাহাদের রমণীদিগকে এ দেশে লইয়া আইসে না। তথাপি বাঙ্গালার ব্রাহ্মগণের মধ্যে সাড়ে এগার লক্ষ পুরুষ ও ১২ লক্ষ স্ত্রীলোক বর্তমান। মোট ব্রাহ্ম পুরুষ অপেক্ষা মোট ব্রাহ্ম মহিলার সংখ্যা প্রায় অর্ধ লক্ষ অধিক। ইহা হইতে

যদি বিদেশ হইতে আগত ব্রাহ্মণ পুরুষদিগকে বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ মহিলার সংখ্যা আবার অধিক হয়। বাঙ্গালার হিন্দুসমাজে উচ্চ বর্ণের মধ্যে জী জাতির সংখ্যাই অধিক। আবার পুরুষদিগের মধ্যে অনেকে বিবাহ করেন না,—কিন্তু জীজাতি-দিগের বিবাহ হিন্দুর অপরিহার্য সংস্কার। সুতরাং বিবাহের বাজারে “বর” অপেক্ষা “ক’নে”র সংখ্যাই অধিক হইতেছে,—ইহা ভুক্তভোগীমাত্রেই বুঝিতেছেন। বিধবা-বিবাহের প্রচলন নাই বলিয়া সকল মহিলাই একবার বিবাহ করিবার সুবিধা পাইতেছেন সত্য, কিন্তু তাহাতেও কতক বিবাহপ্রদান কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। ইহাব উপর যদি আবার বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হয়, তাহা হইলে অনেক রমণীকে চিরকুমারী থাকিতে হইবে। এট্রিটনে ও যুরোপের অন্যান্য অনেক রাজ্যে বহু রমণীর ভাগ্যে বিবাহ হইয়া উঠে না। তথায় শতকরা ৫৯ ৬ জন রমণী অবিবাহিতা ৩২ ৮ জন সধবা আর ৭ ৬ জন বিধবা। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, তথায় শতকরা ১৫ জনেরও অধিক রমণী “বৃদ্ধা কুমারী” অবস্থাতে কালগ্রাসে পতিতা হইয়াছেন। ভারতীয় ধ্রুষ্টান ও ব্রাহ্মসমাজে ও এই অবস্থা ঘটিতেছে। অল্প সমাজের রমণীগণ অবিবাহিতা থাকিয়াও যদি প্রবৃত্তির তাড়নায় পদস্থলিত হইয়া পাপপঙ্কে পতিতা না হইয়া, তাহা হইলে হিন্দু বিধবাগণই কেন উন্নয়নগামিনী হইবেন তাহা আগরা বুঝিতে অসম।

হিন্দু বিধবাগণের মধ্যে দুই একজনের পক্ষে পদস্থলিত হওয়া যে, অসম্ভব এমন নহে। কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প। সধবাদিগের মধ্যেও কেহ কেহ পাপপথে প্রলুপ্ত হইয়াছেন। বিধবাদিগের পদস্থলনের এইরূপ বিরল দৃষ্টান্ত দেখিয়া যদি বিধবাবিবাহ প্রবর্তিত করিতে হয়, তাহা হইলে সধবাদিগের পাতিত্রত্য ধর্ম হইতে বিচ্যুতির দৃষ্টান্ত দেখিয়া বিবাহ প্রথা উঠাইয়া দিতে হয়। মার্কিনের কোন কোন ব্যক্তি এই অজুহাতে বিবাহকে ক্ষণস্থায়ী চুক্তিমাত্রে পরিণত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

প্রত্যেক সামাজিক প্রথা ও অনুষ্ঠান কালসহকারে অবনত ও বিকৃত হইয়া থাকে।

সংস্কার। তাহার সংস্কার আবশ্যক,—সংহার কর্তব্য নহে। মধ্যযুগে যুরোপে অনেক মঠ ছিল। তথায় বহু ধর্মপ্রাণা রমণী ধর্মের সুশীতল ছায়ায়

ব্রহ্মচর্য্যপালনে জীবন অতিবাহিত করিতেন। কালসহকারে ঐ সকল অনুষ্ঠান পাপের পঙ্কিল পঙ্কলে পরিণত হয়। ফলে যুরোপীয় সামাজিকগণ উহার উচ্ছেদ করেন। এখন সামাজিক অবস্থায় বাধ্য হইয়া অনেক রমণীকে চিরকুমারী থাকিতে হইতেছে; কিন্তু তাঁহারা আর ধর্মের সে সুবিমল ছায়ায় আশ্রয় ও অভয় পাইতেছেন না। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে প্রবৃত্তির প্রথম তাপে দগ্ধ হইয়া আজীবন যন্ত্রণাভোগ করিতেছেন এবং বারি-পানের আশায় পাপের পঙ্কিল পঙ্কলে যাইয়া ইহকাল পরকাল হারাইতেছেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে জী জাতিতে ধর্মের স্নিগ্ধছায়ায় রক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য। সেই কর্তব্য হইতে বিচ্যুত হইয়াই আমরা এই বিষম সমস্যায় পতিত হইয়াছি।

শশী বাবু তাঁহার প্রবন্ধের উপসংহারে বলিয়াছেন, যে বাঙ্গালার মুসলমানসমাজে চিরকুমারী নাই, তাহার কারণ তাঁহাদের মধ্যে জী জাতির সংখ্যা অনেক অল্প, দ্বিতীয়তঃ,

তাহাদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত । বর্তমান সময়ে হিন্দুদিগের মধ্যে বহুবিবাহের প্রবর্তনা সম্ভবে না । কেহ কেহ বলেন, বিধবা-বিবাহের প্রচলন নাই বলিয়া হিন্দুজাতির সংখ্যা কমিতেছে । কিন্তু দেখা যায়, যত রমণী আছেন, তাহাদের পঞ্চমাংশ যদি সম্ভ্রান প্রসবিনী হয়েন, তাহা হইলেও লোকসংখ্যা কমিবার কোম সম্ভাবনাই নাই ।

শশী বাবু শেষে বলিয়াছেন যে, আদম স্মারীর বিবরণে দেখা যায় যে, অনেক শিশু এক বৎসর উত্তীর্ণ না হইতে হইতেই বিধবা হয় । তিনি লিখিয়াছেন, এক্ষণে শিশু-বিবাহে সমাজের অতি নিম্নস্তরে প্রচলিত । সে স্তরে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে । দ্বিতীয়তঃ, এক্ষণে শিশু-বিবাহ বিবাহই নহে । তাহার মতে বাল-বিধবার সংখ্যা হ্রাস করিতে হইলে বালিকাগণকে একটু অধিক বয়সে বিবাহিতা করাই কর্তব্য । এ সম্বন্ধে কুলীন ব্রাহ্মণ-সমাজের নজীর ও শাস্ত্রের অনুশাসনই বলবৎ করা বিধেয় ।

বিবিধ ।

ভারতের ভাবী বিপদ ।

গত জুন মাসে বোম্বাই প্রদেশস্থ ব্রিটিশ মেডিকেল এসোসিয়েসনের অধিবেশনে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার পানামা যোজক কাটিয়া খাল নির্মাণ করিলে ভারতের যে বিপদের সম্ভাবনা আছে, সেই সম্বন্ধে ডাক্তার মেজর গর্ডন টকার একটি গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন । এই বিষয় মহামারী—“পীতজ্বর”র ভীষণ আক্রমণ হইতে পরিত্রাণলাভের উপায়-উদ্ভাবন করিয়া তৎসঙ্গে ভারতীয় গভর্ণমেন্ট কি ভাবে এই মহামারীর প্রবল পরাক্রম হইতে ভারত রক্ষা করিবেন, সে বিষয়ে তিনি স্বীয় মন্তব্য প্রকাশিত করিয়াছেন ।

তিনি বলেন, পীতজ্বর আমেরিকার নিম্নভূমি বা জলাভূমি পল্লীতেই বিশেষ প্রবল ।

সেই জন্তই নিকটবর্তী জামেকা দ্বীপকে লোকে খেতকারদিগের

উৎপত্তি ।

সমাধিক্ষেত্র বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকে । আর এই পীতজ্বরের

প্রাদুর্ভাবে এতদিন পানামা যোজক খনিত করা অসম্ভব

বলিয়া মনে হইত । এখন যদি এই যোজক কর্তন করিয়া খালে বা প্রণালীতে পরিণত করা হয়, তাহা হইলে অতি অল্পকালমধ্যেই ভারতে এই পীতজ্বরের আশঙ্কানি হইবে । পরীক্ষাপারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে, এই জ্বরের বীজাণু মশকের দ্বারা লোকশরীরে প্রবিষ্ট হইয়া প্রসারলাভ করিয়া থাকে । অস্বাস্থ্যকর নিম্ন জমীতে যাহাদের বাস, তাহারা এই রোগের করাল কবলে পতিত হয় । অধুনা পৃথিবীর বিষুবরেখার ২২ ডিগ্রীর মধ্যে আমেরিকার যে যে স্থান অবস্থিত, সেই সকল স্থানেই এই পীতজ্বরের সমধিক প্রাদুর্ভাব কিন্তু অত্যাগত স্থানেও এই জ্বর হইয়া থাকে । রেলবিস্তারের ফলে এই রোগ বিভিন্ন দেশে পরিচালিত হইয়া যে ক্রমশঃ বৃদ্ধিলাভ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই ।

ভারতে এই রোগের সূত্রপাতের যে সম্ভাবনা আছে, তাহারও কতিপয় প্রমাণ নির্দেশ করিতে পারা যায়। ভারতের সহিত হংকং, ফিলিপাইন আশঙ্কা। দ্বীপপুঞ্জ, পিনাং, সিঙ্গাপুর এবং অস্ট্রেলিয়ার পূর্বপ্রান্তস্থিত বন্দর হইতে যে বাণিজ্যব্যবসায় আছে, ক্রমশঃ তাহার প্রসার-বৃদ্ধিরও সম্ভাবনা আছে। এই বাণিজ্যপ্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে হনলুলু নামক স্থানটি— একটি বিশিষ্ট বন্দরে উন্নীত হইতে পারে—ইহাতে তখন আমেরিকাবাসীদিগের প্রভুত্ব-বিস্তার ঘটিতে পারে। বাণিজ্য-বিস্তারের সহিত মার্কিনবাসী লোকসমাগমের বৃদ্ধিলাভ ঘটিবে, আর তখন পীতজ্বর-বীজাণু অতি সহজেই উপরিকথিত প্রদেশে ব্যাপ্তিলাভ করিতে পারে। বাণিজ্যপোতে বা যাত্রীর জাহাজে যদি কাহারও শরীরে পীতজ্বরের বীজাণু গুপ্ত ভাবেও নিহিত থাকে, তাহা হইলে পীতজ্বরের আদিস্থান হইতে রোগ অতি সহজেই বিদেশে উপনিবেশ-সংস্থাপন করিতে আসিবে।

পূর্বে কথিত হইয়াছে, মশকের সাহায্যে রোগের প্রচলন ও সংক্রমণ হয়। যে জাতীয় মশক এই বীজ বহন করিয়া মল্লয়া-শরীরে দংশন করিয়া রক্ত দূষিত করিয়া দেয়, সেই জাতীয় মশক পৃথিবীর অনেক স্থানে আছে বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। আমেরিকা ভিন্ন স্পেন, দক্ষিণ ইটালি, জাপান, ফর্মোসা দ্বীপ, চীন, সেলিবেশ দ্বীপপুঞ্জ, নিউ গিনি, শ্রাম, মালয় উপদ্বীপ, ব্রহ্মদেশ, বঙ্গদেশ, মাদ্রাজ, ভারতের দক্ষিণস্থ তীরভূমি, বোম্বাই, পূর্ব অঙ্গেলিয়া, আফ্রিকার পূর্বাংশ এবং মরিশাস প্রভৃতি স্থানে ঐ জাতীয় মশক বিচলমান। এই জাতীয় মশক পৃথিবীর বিষুবরেখার ৪০ ডিগ্রী উত্তরে ও দক্ষিণে অবস্থিত সমস্ত প্রদেশে বিভিন্ন অবস্থায় পাওয়া যাইতে পারে। এখন কথা উঠিতে পারে, কোন কোন জাতির এই রোগ হইবার সম্ভাবনা নাই। চীনবাসীকে যে এই রোগের আক্রমণ হইতে নিরাপদ বলিয়া মনে করা যাইত, তাহা অমূলক। এই পীতজ্বরে অনেক চীনদেশীয় লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, সুতরাং কোন জাতিই নিরাপদ বলিয়া মনে হয় না।

এখন জিজ্ঞাস্য, পীতজ্বরের বীজাণু এ দেশে পর্য্যাপ্ত আসিতে পারে কি না? তাহার উত্তরে মেজর টাকার বলিয়াছেন যে, পীতজ্বরের আকর জামেকা দ্বীপ সম্ভাবনা। হইতে পানামা প্রণালী পর্য্যাপ্ত আসিতে দুই দিবস লাগে। পানামা প্রণালী ধাত হইবার পর উহা পার হইতে যদি বার ঘণ্টা লাগে, আর জ্বরের বীজ শরীর মধ্যে প্রবেশ করিবার পর সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইতে যদি ৩৬ ঘণ্টা হইতে পাঁচ দিন পর্য্যাপ্ত লাগে, তাহা হইলে এই পাঁচ দিনের পর আরও তিন দিনের মধ্যে এই রোগের সমস্ত লক্ষণ বুঝিয়া রোগনির্ণয় করা পোতের চিকিৎসক কিম্বা পোতাধ্যক্ষের পক্ষে নিতান্ত সহজ হইবে না। সুতরাং এই সময়ের মধ্যে মশককুল এই রোগের বীজে আক্রান্ত হইতে পারে। আর বোর্নিও প্রভৃতি মালয় দ্বীপপুঞ্জের সমিধানে যে সমস্ত বন্দর আছে, তাহাতে পীতজ্বরের লক্ষণ সহজে বুঝিতে পারেন এমন বিচক্ষণ চিকিৎসকও নাই। বন্দরে যে প্রকার পরীক্ষা ও অল্পসন্ধান চলিয়া আসি-

তেছে, তাহার দৃষ্টান্তস্বকণ ডাক্তার টকার নির্দেশ করিয়াছেন যে, প্লেগের সময় স্মৃৎজ বন্দরে পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও ইংলণ্ড ও পর্তুগাল পর্য্যন্ত প্লেগ উপস্থিত হইয়া ছিল । মানব-শক্তির আয়ত্তে রোগব্যাপ্তি নিবারণের কোন উপায় নাই ।

ডাক্তার টকার নিম্নলিখিত ব্যবস্থার কথা বলিয়াছেন :—

প্রথমতঃ, বোম্বাই ও কলিকাতায় এই রোগবাহী মশকের উচ্ছেদসাধন করিতে হইবে । কারণ, বাণিজ্য পোত বন্দরে আসিয়া মশকের দ্বারা এই রোগের বীজ দেশমধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দিতে পারে । কিন্তু মশকের উচ্ছেদসাধন কত দূর সম্ভব, উপায় ।

তাহা স্থির করা দুঃসাধ্য । কারণ, সামান্য মশকের উচ্ছেদসাধনে কামান পাতিলে চলিবে না । কলিকাতা ও বোম্বাই সহর যাহাতে আবর্জনাহীন ও পরিষ্কৃত থাকে—তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে । যে ব্যক্তি অপরিষ্কারতার ও অপরিচ্ছন্নতার আশ্রয় লইয়া অস্বাস্থ্যকর মশকের উৎপত্তির সহায়তা করিবে, তাহার শাস্তিবিধান করা সম্ভব নহে । সুতরাং সে প্রকার সম্ভাবজনক ব্যবস্থা করা একপ্রকার অসম্ভব । হাবানা সহরে কিন্তু ইহা সম্ভবপর হইয়াছিল— তাহার কারণ, তথায় শাসনতন্ত্র কঠোর সামরিক বিভাগ দ্বারা পরিচালিত । দ্বিতীয়তঃ, ভারত গবর্ণমেন্ট বাণিজ্যকেন্দ্র-বন্দরস্থ চিকিৎসকগণের মধ্যে কয়েকজনকে যে যে স্থানে অল্প মাত্রায় পীতজ্বর মধ্যে মধ্যে হইয়া থাকে, সেই সেই স্থানে প্রেরণ করিয়া তাঁহাদের এই বিষয়ে শিক্ষা দিবার ব্যয়ভার গ্রহণ করুন । একবার ইটালীয় রণপোতে ২৪৯ জন সৈন্যের মধ্যে প্রথম একজনের পীতজ্বর হয়, ভ্রমবশতঃ চিকিৎসক সেই জ্বর নির্ণয় করিতে না পারায় ২৪২জন জ্বরাক্রান্ত হয় ও তন্মধ্যে ১৩৪ জনের মৃত্যু হয় । তৃতীয়তঃ, ডাক্তার টকার বলিয়াছেন, গবর্ণমেন্ট যেন কতিপয় কীটগুত্তরবিদকে এই রোগের জীবাণু ও বীজাণু সম্বন্ধে অভিজ্ঞতালভ ও তত্ত্বাণুসন্ধান করিবার জন্ত প্রেরণ করেন । তাঁহারা রোগের বীজাণু নষ্ট করিয়া দিবার কোন উপায় উদ্ভাবন করিলে বসন্তের টীকা বা প্লেগ-নিবারক Inoculation এর মত লোক নিরাপদ হইবার কথঞ্চিৎ আশা পায় । উপসংহারে ডাক্তার টকার বলিয়াছেন যে, স্যার প্যাট্রিক মনসন মহোদয় সান্ফ্রানসিস্কোর কর্তৃপক্ষীয়দিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন এবং এই ব্যাপারে এসিয়া ও প্রাচ্য মহাদেশে যে ভীষণ বিভীষিকা ভবিষ্যতের গর্ভে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহার বিষয়ে বিশেষ আতঙ্ক প্রকাশ করিয়াছেন ।

নদীয়া জিলার সিদ্ধ যোগী ।

(বলরামচন্দ্র ।)

বঙ্গদেশের ইতিহাসে নদীয়া জিলার নাম, চিরকাল অগাধরূপে অঙ্কিত থাকিবে । পশ্চিম বঙ্গে নদীয়া জিলা নানা কারণে প্রসিদ্ধ ; নবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ রঘুনন্দন, জ্ঞানেশ্বর বিধানদান করিয়া সমগ্র বঙ্গে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন ; যুগাবতার শ্রীচৈতন্যদেব নবদ্বীপধামে অবতীর্ণ হইয়া ভগবৎপ্রেমের বিপুল তরঙ্গে সমগ্র বঙ্গের পাপ-তাপ ধৌত করিয়াছিলেন । কৃষ্ণনগরাধিপতি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র বঙ্গের ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি । এমন কি, যে দস্যুরাজ বিশ্বনাথের নামে একদিন অর্দ্ধ বঙ্গ কম্পিত হইত, যুরোপে জন্মিলে যে যুরোপের ইতিহাসপ্রণীত দস্যুগণের সমশ্রেণীতে আসনলাভ করিয়া ইতিহাসে ও উপন্যাসে অমর হইয়া থাকিত, সেই বিশ্বনাথও নদীয়া জিলার লোক । ধর্মে, সাহিত্যে রাজনীতিতে, কাব্যে,—যাহা লইয়া মনুষ্যত্ব, তাহার সকল বিষয়েই নদীয়ার প্রভাব পরিলক্ষিত হয় । নদীয়া জিলার ফুলিয়া গ্রামে কুন্তিবাস নামক যে দরিদ্র ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করিয়া, মধুর রামায়ণ-কথায় শতাব্দীর পর শতাব্দী কাল বঙ্গের প্রতিগৃহে কাব্যামৃতস্রোত চির-প্রবাহিত রাখিয়াছেন, যতদিন বঙ্গভাষার অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিন তাঁহার নাম ইতিহাস হইতে বিলুপ্ত হইবে না ।

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর, বহুদিন পর্য্যন্ত নদীয়া জিলার নানা স্থানে নূতন নূতন ধর্ম-সংস্থাপকের আবির্ভাব হইয়াছিল । এই সকল ধর্ম-সংস্থাপকের বা ধর্ম-সম্প্রদায়-প্রবর্তকের জীবন-কথা ও তাঁহাদের প্রবর্তিত সম্প্রদায়ের ইতিহাস, আমাদের জাতীয় ভাষায় সময়ে সংগৃহীত হইবার যোগ্য । কিন্তু এ অল্প এ পর্য্যন্ত প্রায় কোন লেখকই কোনরূপ চেষ্টা করেন নাই ; চেষ্টা করিলেও তাঁহাদের সেই চেষ্টা বিশেষ ফলবতী হয় নাই । কেবল অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় তাঁহার প্রণীত ‘ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়’ নামক অত্যাশ্চর্য্য গ্রন্থে অতি সজ্ঞেপে সেই স্বনামধন্য সিদ্ধ পুরুষগণের কথার উল্লেখ করিয়াছেন ; কিন্তু তত্ত্বলিপ্সু পাঠকগণের তাহাতে তৃপ্তিলাভের সম্ভাবনা নাই । আমরা এই প্রবন্ধে সুপ্রসিদ্ধ ‘বলরাম সম্প্রদায়ের’ প্রবর্তক বলরামচন্দ্রের জীবন-চরিত ও তাঁহার ধর্মমতসম্বন্ধে আলোচনা করিব ।

বাকীলা দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে নদীয়া জিলার অন্ততম উপবিভাগ মেহের-

পুরে বলরামচন্দ্রের আবির্ভাব হয়। তিনি সমাজের অতি নিয়ন্তরের লোক ছিলেন,—জাতিতে হাড়ী ছিলেন। কিন্তু প্রেম ও পবিত্রতার অগ্নিতে জাতিভেদের ক্ষুদ্র গভী দগ্ধ হইয়া যায় ; সুতরাং অতি হীন বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও বলরামচন্দ্র চরিত্রগুণে, ভগবন্তকৃতিতে ও উদার মানব-প্রেমের বলে, সমাজের অনেক উজ্জ্বল আসনলাভ করিয়াছেন, ভগবানের অবতার বোধে সহস্র সহস্র লোক ভক্তিবিশ্লিষ্ট হৃদয়ে তাঁহার পূজার্ত্তনা করিতেছে,—তাঁহার দেবায়তনে দাঁড়াইয়া, গলগলী-কৃতবাসে “মামসা” করিতেছে, তাঁহার আখড়ার ধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া আপনা-দিগকে কৃতার্থ মনে করিতেছে।

বাঙ্গালা ১১৯০ বা ১১৯১ সালে,—কোন মাসেঠিক জানিতে পারা যায় নাই—মেহেরপুরের প্রান্তবাহী ভৈরব নদের অদূরবর্তী মালোপাড়ায় বলরামের জন্ম হয়। পিতা গোবিন্দ হাড়ী স্থানীয় জমিদারের গৃহে বরকন্দাজের কায করিত বলিয়া গ্রাম-বাসিগণের নিকট গোবিন্দ সর্দার নামে পরিচিত ছিল। গোবিন্দ সর্দার সুদক্ষ লাঠিয়াল ও প্রভুভক্ত, বিশ্বাসী বরকন্দাজ বলিয়া প্রভুগৃহে যথেষ্ট প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিল।

বলরামের বালাজীবন কি ভাবে অতিবাহিত হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে বিশেষ কোন সংবাদ সংগ্রহ করা কঠিন ; কারণ, তাঁহার সমসাময়িক লোক, মেহেরপুরে এখন কেহই জীবিত নাই ; যাহারা বলরামকে দেখিয়াছিলেন, বা তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতেন, তাঁহারাও একে একে ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। আমাদের দেশের লোক পূর্বে, স্ব স্ব গ্রামের অনেক প্রাচীন কথা জানিতেন, গ্রাম সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য কিংবদন্তী সম্বন্ধে সংগ্রহ করিতেন, কিন্তু তাঁহাদের তাহা লিখিয়া রাখিবার অভ্যাস ছিল না। বর্ত্তমান কালে আমরা বিদেশের সংবাদ রাখিতেছি, পৃথিবীর কোথায় কি ঘটিতেছে, তাহা লইয়া নিত্য আলোচনা করিতেছি, কিন্তু স্বগ্রামের প্রাচীন ঐতিহাসিক তত্ত্বসংগ্রহে আমাদের রুচি নাই। এখন অল্পে অল্পে স্রোত ফিরিতেছে বটে, প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপ, প্রাচীন তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্ত আমাদের আবার আগ্রহ হইতেছে বটে, কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টাতেও আর ‘খেই’ খুজিয়া পাইতেছি না, যাহা বিশ্বতির অতলগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে, কালমাগরের অনন্ত লহরী ভেদ করিয়া আর তাহা উদ্ধার করিতে পারিতেছি না।

যাহা হউক, বলরামের বালাজীবনসম্বন্ধে এইমাত্র জানিতে পারা যায় যে, বলরাম শৈশব হইতেই চিন্তাশীল ও বুদ্ধিমান ছিলেন। বালাকাল হইতেই ভোগ-সুখে তিনি উদাসীন ছিলেন ; বালকবালিকাগণের মধ্যে এরূপ নিস্পৃহতা প্রায়

দেখিতে পাওয়া যায় না। যে সময়ে ও যে সমাজে বলরাম জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে সেই সমাজে কোন প্রকার সুশিক্ষার প্রভাব যে তাঁহাকে অনুপ্রাণিত করিতে পারে নাই, এ কথা বলাই বাহুল্য; বলরামের বর্ণজ্ঞান ছিল না, কিন্তু আমাদের এই পুণ্যভূমি ভারতে বর্ণজ্ঞানহীন, অসংখ্য “মূর্খের” মধ্যে প্রকৃত ধার্মিকের সংখ্যা অল্প নহে। বলরাম বর্ণজ্ঞানশূন্য হইলেও, তাঁহার হৃদয় ধর্ম-জ্ঞানে পূর্ণ ছিল; ভগবন্ত ও মানবপ্রীতি তাঁহার হৃদয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গকার ছিল।

যাহার পিতা বরকন্দাজের কার্য্যে, আজীবন কাল অতিবাহিত করিয়াছিল, সে যতই গুণবান হউক না কেন, তদপেক্ষা উচ্চতর কার্য্যে তাহার কি অধিকার আছে?—যৌবনকালে বলরাম, মেহেরপুরের বৈষ্ণবংশীয় জমীদার মল্লিক বাবুদিগের বাড়ীতে বরকন্দাজের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন, কিন্তু সে কার্য্য তাঁহার তেমন প্রীতিপ্রদ ছিল না। সেই সময়ে মল্লিক বাবুদিগের বৈয়্যিক অবস্থা অত্যন্ত উন্নত ছিল, কমলার অনুগ্রহে, তাঁহাদের বৈভব ও মানসজ্ঞমও যথেষ্ট ছিল; তখন তাঁহাদিগের গৃহে অনেক ভোজপুরী, ও পুরুষিয়া ব্রাহ্মণ নানা কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। কেহ বরকন্দাজের কায করিত, কেহ গ্রহরীর কায করিত, কেহ কেহ বা জমিদারী-সংক্রান্ত নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত। বলরাম অবসরকালে এই সকল ব্রাহ্মণের নিকটে তুলসীদাসের রামায়ণ, দৌহা ও নানাবিধ ভক্তিবিষয়ক পদাবলী এবং ভজনসঙ্গীত শ্রবণে অত্যন্ত আনন্দলাভ করিতেন; সেই সকল শ্রবণে মধুর ধর্মকথা, পুরাণ-কাহিনী, বলরামের কর্ণে যেন অমৃতবর্ষণ করিত, তিনি স্থানকাল বিস্মৃত হইয়া একাগ্রচিত্তে সেই সকল পুত কথা শ্রবণ করিতেন। তাঁহার একাগ্রতা ও নিষ্ঠার পরিচয় পাইয়া দোবে, চোবে, মিশির ঠাকুরেরা তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিত। ক্রমে বলরামের প্রেমোন্মত্ত ভাব পরিস্ফুট ও বর্জিত হইতে লাগিল।

বলরামচন্দ্র মল্লিক-ভবনে যে কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার দৈহিক সামর্থ্য সেই কার্য্যের উপযোগী হইলেও, তাঁহার প্রকৃতি তাহার উপযোগী ছিল না; তিনি অতি-দীর্ঘ-দেহ, মহাবলবান যুবক ছিলেন; তিনি কিরূপ ভীমকায় ছিলেন, তাহা এখনও তাঁহার আখড়ায় তদীয় শিষ্যগণ কর্তৃক সযত্নে রক্ষিত ও ভক্তিভরে পূজিত তাঁহার ঘটির ও কাষ্ঠপাত্রকার আকার দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়; কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি অত্যন্ত নিরীহ ছিল; ক্রোধ কাহাকে বলে, তাহা তিনি জানিতেন না। ভক্তি ও প্রেমে, শ্রদ্ধা ও বিনয়ে যাহার হৃদয় প্রাণিত, রোদ্র রসের অভিনয়ে তিনি কখন তৎপরতাপ্রদর্শন করিতে পারেন না; সুতরাং বলরামজী বা লাঠিয়ালী

কার্য্যে বলরামচন্দ্র সুনাম অর্জন করিতে পারেন নাই । একাল হইলে তাঁহার ন্যায় অকর্ম্মণ্য লাঠিয়ালের চাকরী বজায় থাকিত কি না সন্দেহ, কিন্তু সে কালে এ দেশের লোকের প্রকৃতি কিছু স্বতন্ত্র ছিল । সে কালে ভৃত্যেরা সাধারণতঃ যেরূপ প্রভুভক্ত হইত, প্রভুরাও সেইরূপ আশ্রিতবৎসল হইতেন । বলরামের প্রভু বলরামকে বরকন্দাজের কার্য্যের অনুরূপ দেখিয়া গৃহবিগ্রহ আনন্দবিহারী দেবের গৃহরক্ষকের পদে নিযুক্ত করিলেন । ভগবন্ত, সাংসারিক কার্য্যে অমনোযোগী বলরামচন্দ্র এই কার্য্যেও তৎপরতা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই ; তিনি আনন্দ-বিহারীর গৃহের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও একদিন রাত্রিকালে বিগ্রহের ঘরে চুরি হইয়া অনেকগুলি বহুমূল্য অলঙ্কার অন্তর্হিত হয় । গৃহস্বামী এই চৌর্য্যব্যাপারে বলরামকেই সন্দেহ করিলেন । বলরামের জ্ঞান নির্লোভ, সংসারাসক্তিবর্জিত, ধর্ম্মভীরু ব্যক্তির দ্বারা যে এরূপ দুর্কার্য্য সাধিত হইতে পারে না, জমীদার মহাশয়ের ইহা প্রত্যয় হইল না । তিনি মনে করিলেন, বলরাম যদি স্বয়ং চুরি না করিয়াও থাকে, তাহা হইলেও, এই চৌর্য্যব্যাপার বলরামের অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হয় নাই । অবশ্য, এজন্ত জমীদার মহাশয়কে দোষী করা যায় না । বলরাম অপরাধী হউন বা না হউন, দেবতার গৃহরক্ষার ভার যখন তাঁহার হস্তে সমর্পিত ছিল, তখন এই ক্ষতির জন্ত তিনিই দায়ী । শুনিতে পাওয়া যায়, এই উপলক্ষে বলরামের উপর যথেষ্ট উৎপীড়ন চলিয়াছিল । বলরাম এই ভাবে অপদস্থ হইয়া কলঙ্কভয়ে ক্ষুণ্ণ হৃদয়ে চাকরী পরিত্যাগপূর্ব্বক উদাসীনবেশে বাসগ্রাম ত্যাগ করিলেন । তাহার পর তিনি বহু তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছিলেন ; কিন্তু তিনি কোন্ কোন্ তীর্থে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই ।

ইহার পর বলরাম বহুদিন পর্য্যন্ত স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন নাই ; গ্রামের লোক তাঁহার কথা বিশ্বত হইয়াছিল, সংসারে তখন তাঁহার আপনার বলিতে কেহই ছিল না, সুতরাং তাঁহার কথা লইয়া কেহ আলোচনাও করিত না । অবশেষে সুদীর্ঘ কাল অজ্ঞাতবাসের পর প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়সে উদাসীনবেশে বলরাম যখন মেহেরপুরে প্রত্যাবর্তন করিলেন, তখন তাঁহার পরিবর্তন দেখিয়া সাধারণের বিশ্বাসের সীমা রহিল না ।

বলরাম সিদ্ধিলাভ করিয়া স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন ও দৈবশক্তির নানা পরিচয় প্রদান করিতেছেন শুনিয়া মেহেরপুরের ও তৎসম্বন্ধিত গ্রামসমূহের নিম্ন-শ্রেণীর বহু লোক তাঁহার নদীতীরবর্তী কুটীরদ্বারে সমবেত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব

গ্রহণ করিতে লাগিল ; এই সকল শিষ্যের মধ্যে হাড়ী, চর্মকার, ধীবর ও চণ্ডাল-জাতীয় লোকই অধিক ছিল। অপেক্ষাকৃত উচ্চশ্রেণীর লোকও তাঁহার মন্ড্রে দীক্ষিত হইয়াছিল। বলরামচন্দ্র কোন অলৌকিক-শক্তি-প্রভাবে যে এই সকল শিষ্যকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন, এ কথা শুনিতে পাওয়া যায় না ; তাঁহার পরমার্থ-জ্ঞান, সমদর্শিতা, সাধুতা, ক্ষমাশীলতা ও হৃদয়ের মাধুর্য্যে এই সকল লোক তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। সংসারে আসিয়া মানবসমাজের নিকট যাহারা ঘৃণা ও অবজ্ঞা ভিন্ন আর কিছুই লাভ করিতে পারে নাই, তাহারা বলরামচন্দ্রের চরণ-প্রান্তে শান্তি ও করুণার প্রসবন উন্মুক্ত দেখিয়াছিল ; তাই তাহারা ভগবানের অবতারজ্ঞানে বলরামচন্দ্রের পূজায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। বলরামচন্দ্র নিম্নশ্রেণীর কত দুর্দান্ত হিংস্রপ্রকৃতি পশুতুল্য নারকীকে শিক্ষা ও সংস্কারগুণে মনুষ্যত্বের পথে লইয়া গিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা নাই ; তাঁহার উপদেশে তন্দর তন্দরতা ছাড়িয়াছিল, অন্তের অনিষ্ট-চেষ্টা যাহাদের জীবনের ব্রত ছিল, তাহারা পরোপ-কার-ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। এইরূপে বলরামের প্রতিপত্তি-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শিষ্যসংখ্যাও বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

বহুদিন পূর্বে বলরামের মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু এখনও বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে তাঁহার শিষ্যরা দেশ-দেশান্তর হইতে মেহেরপুরে সমাগত হইয়া গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করে, “প্রসাদ” গ্রহণ করে। প্রতি বৎসর ফাল্গুন বা চৈত্র মাসে বারুণীর দোলের সময় বলরামের আখড়ায় বার্ষিক প্রধান উৎসব হইয়া থাকে ; এতদ্ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎসব বৎসরের অন্ত্যান্ত সময় আরও দুই তিন বার হয়। ‘মচ্ছব’ অর্থাৎ মহোৎসবের ব্যয় শিষ্যরাই বহন করেন, এবং আখড়ার দৈনন্দিন ব্যয়নির্বাহের ক্ষমতা যে অর্থের আবশ্যক হয়, তাহাও শিষ্যবর্গ যথাশক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। বার্ষিক উৎসবের সময় বিদেশী শিষ্যগণের মধ্যে অনেকেই নগদ টাকা ব্যতীত, চাউল, ডাউল, চিড়া, গুড় প্রভৃতি খাদ্যসামগ্রীও বহন করিয়া আনেন ; আমরা দেখিয়াছি, দূরগ্রামবাসী উপবীতধারী অনেক লোক এই উৎসবে যোগদান করেন এবং তাঁহারা ভ্রাঙ্কণ বলিয়া পরিচয় দেন।

বলরামচন্দ্র আপনার উপর ঈশ্বরত্বের আরোপ করিতেন কি না, তাহা জানা যায় না ; কারণ, তাঁহার সাম্প্রদায়িক মত সম্বন্ধে হস্তলিখিত কোন পুস্তকাদি নাই ; তবে তাঁহার আখড়াধারী শিষ্যবর্গ তাঁহাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন ও বলেন, “বলরাম চন্দ্র যে, ঈশ্বরবতার, তাহা তিনি স্বয়ং স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।” তাঁহার শিষ্যবর্গ ঈশ্বরবোধেই তাঁহার উপাসনা করে, কিন্তু তাঁহার

মূর্তির পূজা করে না। আখড়ায় কোন মূর্তিও নাই। “এত জাতি থাকিতে ঈশ্বর হাড়ীর ঘরে কেন জন্ম গ্রহণ করিলেন ?” এ প্রশ্নের উত্তরে তাহারা বলে, “বলরাম স্বয়ং ইহার উত্তর দিয়া গিয়াছেন ; তিনি বলিয়া গিয়াছেন, তোমরা এ দেশে যে সকল হাড়ী দেখিতে পাও, আমি সে হাড়ী নহি, আমি গড়নদার হাড়ী, হাড়ের সৃষ্টি করি বলিয়াই আমি হাড়ী।” দেখিয়া শুনিয়া বোধ হয়, বলরাম সম্প্রদায়ের ধর্মমত ঘোষপাড়ার কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়েরই অনুরূপ।

বলরাম অত্যন্ত তार्কিক ছিলেন ; তাঁহার আধুনিক নিরক্ষর শিষ্যদল এ বিজ্ঞায় গুরুকেও ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের বিশ্বাস, আদিকালে বলরামচন্দ্র শ্রীয দেহ ক্ষয় করিয়া তাঁহার অস্থি হইতে এই সংসারের সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব পৃথিবীর সকল লোক হাড়ী।

ইতর বংশে জন্ম গ্রহণ করিলেও, অশিক্ষিত বলরাম চন্দ্রের হৃদয়ে ইতরতার লেশমাত্র ছিল না। অনেক স্থলে তিনি যুক্তিতর্কের পরিবর্তে দৃষ্টান্ত দ্বারা কোন কোন সংস্কারের অসারতা প্রতিপাদনের চেষ্টা করিতেন। কথিত আছে, একদিন বলরাম চন্দ্র তাঁহার আখড়ার প্রান্তবর্ত্তী ভৈরবের তীরে দণ্ডায়মান হইয়া নদীর জল অঞ্জলি পুরিয়া লইয়া তাহা তীরে ঢালিয়া দিতেছিলেন। অধিকারী-পাড়ার বাচম্পতি ঠাকুর আখড়ার ঘাটে স্নান করিতে নামিয়া ইহা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “বলাই তুই কি একেবারে ক্ষেপিয়াছিস ? অঞ্জলি ভরিয়া নদীর জল তুলিয়া ওখানে ঢালিতেছিস কেন ?”—বলরাম অম্লানবদনে বলিলেন, “আমি আমার শাকের ক্ষেতে জল দিতেছি।” তখন তর্পণের সময়, বাচম্পতি ঠাকুর তাঁহার কোশা নদীতীরে রাখিয়া জলে নামিতে নামিতে বলিলেন, “এখানে তোমার শাকের ক্ষেত কোথায় যে, তাহাতে জল দিতেছিস ?” বলরাম বলিলেন, “আপনার পিতৃপুরুষেরা অনেক কাল আগে মরিয়া স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন, ঐ কোশায় করিয়া জল তুলিয়া জল ঢালিলে যদি সেই জল তাঁহাদের নিকট পৌঁছে, তাহা হইলে আমার এই জল দুই রশি দূরে আখড়ার শাকের ক্ষেতে না পৌঁছবে কেন ?” বাচম্পতি ঠাকুর বলরামের সহিত আর তর্ক করিলেন না, বলাই সত্যই পাগল হইয়াছে স্থির করিয়া স্নান ও তর্পণাদির শেষে গৃহে প্রস্থান করিলেন।

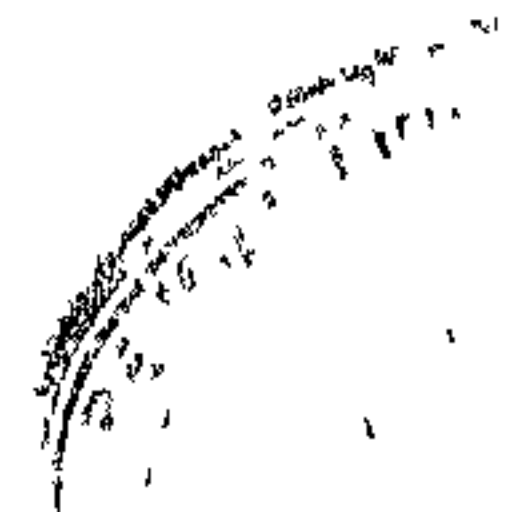
বলরামচন্দ্র বিজ্ঞপত্রিয় ছিলেন ; কিন্তু তাঁহার বিজ্ঞপে ভীততা ছিল না, স্মৃতিরূপে কেহ তাহাতে মনে আঘাত পাইত না। মেহেরপুরের অনতিদূরে ভৈরব নদের পশ্চিম পারে সুবল চৌধুরী নামক একজন চর্মকার বাস করিত। কর্মচারীগণের সহায়তায় সে চর্মের ব্যবসায় করিত। দেব-দ্বিজ তাহার ভক্তি ছিল, এবং তাহার

অবস্থাও বেশ সচ্ছল ছিল। স্নবল চৌধুরী বৎসরান্তে কালীপূজা করিত; এই উপলক্ষে সে তাহার প্রতিবেশী কোন উচ্চ বর্ণের ভজলোকের বাড়ীতে গ্রাম্য ভজলোকদিগের আহ্বানাদির আয়োজন করিত; কিন্তু সে সময় সমাজের বন্ধন এ কাল অপেক্ষা দৃঢ়তর ছিল বলিয়া, ভজলোকের বাড়ীতে ফলাহারের আয়োজন হইলেও, হিন্দুধর্মে নিষ্ঠাবান বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিগণ এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেন না। একদিন বলরামচন্দ্র কালীপূজার পরে একজন ব্রাহ্মণবংশীয় প্রৌঢ়কে কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন, “স্নবল চৌধুরী এবার আপনাদের থাওয়াইল কেমন?” বলরামের কথা শুনিয়া তিনি সরোষে বলিলেন, “বলাই, তুমি কোন্ সাহসে আমাকে এমন জাতিনাশা কথা বলিতেছ? তুমি কি মনে কর, চামারের নিমন্ত্রণ লইয়া আমি তথায় থাইতে যাইব?” বলরামচন্দ্র বলিলেন, “ঠাকুর, এত চটিলে চলিবে কেন? আপনার জাতি নষ্ট হইতে পারে, এমন কথা কি বলিয়াছি? আপনার মা, যাহার বাড়ীতে গিয়া অনায়াসে থাইয়া আসিতে পারেন, তাহার বাড়ীতে পাত পাড়িলে আপনার জাতি যাইবে, এ কিরূপ কথা? জাতি যাইবার ভয় যদি এত অধিক হয়, তাহা হইলে আগে মা কালীকে একঘরে করুন, তিনি যখন স্নবল চৌধুরীর বাড়ীতে গিয়া পূজা থাইয়াছেন, তখন আর তাঁহার পূজা করা আপনার উচিত নহে।”

বলরামের আখড়ায় উৎসবের সময় তাঁহার একজন দূরদেশস্থ ব্রাহ্মণ শিষ্যকে নীচজাতীয় শিষ্যগণের সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া ভাত ও “আমানি” থাইতে দেখিয়া একজন সেই ব্রাহ্মণনন্দনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “বাপ হে, তুমি ব্রাহ্মণের ছেলে হইয়া কিরূপে হাড়ির ভাত থাইতেছ?”—বলরামের সেই শিষ্যটি বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া বলিয়াছিল, “ব্রাহ্মণের ভাত ও হাড়ির ভাত এক স্থানে থাকিলে কোন্ ভাত কাহার, পূর্বে না জানিয়া যদি আপনি তাহা বলিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে আমি স্বীকার করিব, অন্ধ্যায় করিয়াছি।”

ক্রমশঃ

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।



প্রয়াণ ।

ছায়া-সুশীতল দুর্ভাগ্যামল
এই পথখানি দিয়া
শূণ্য করিয়া লতিকা বিভাগ
চলে গেছে মোর প্রিয়া ।

সন্ধ্যা-কিরণ স্বর্ণ বরণ
পড়েছিল তা'র শিরে,
ঝরে পড়েছিল বিবশ বকুল
অরুণ চরণ ঘিরে ।

বহেছিল ধীর সান্ধ্য সমীর
পুষ্পসুবাস মাখি',
পাতার আড়ালে মিলিত কণ্ঠে
গেয়ে উঠেছিল পাখী ।

মোহিনী প্রকৃতি লয়ে শত স্মৃতি
রচি মায়াজাল কত,
ধিবিয়া রাখিতে চেয়েছিল তা'রে ;
ব্যর্থ যতন যত ।

যেতে যেতে ধীরে পথপানে ফিরে
চাহে নি কি একবার,
কাবো লাগি কিগো অশ্রুবিন্দু
ফুটে নি নয়নে তা'র !

শ্রীরমণীমোহন ঘোষা



পরলোকগত চন্দ্রনাথ বসু ।*

অল্পদিনেব মধ্যে মৃত্যু বঙ্গসাহিত্যেব যে ক্ষতি করিয়াছে, তেমন ক্ষতি বোধ হয় বহুদিন হয় নাই। মৃত্যুর নিবিড় ছায়া ধীরে ধীরে প্রসারিত হইয়া বঙ্গ-সাহিত্যসংসার অন্ধকার করিয়া ফেলিয়াছে। 'রৈবতক,' 'কুকক্ষেত্র,' ও 'প্রভাসের' নবীন কৃষ্ণবৈপাশন নবীনচন্দ্র, বঙ্গভাষার অকৃত্রিম ভক্ত শ্রীশচন্দ্র, ভাবতের অতীত গৌরবের সাক্ষিস্বরূপ বমেশচন্দ্র—একে একে অন্তর্গত হইয়াছেন।

হিন্দুধর্মের গৌরব মস্তকে লইয়া, বঙ্গবাসীর জাতীয় চরিত্রের মহামহিমময় আদর্শ ফুটাইয়া তুলিয়া, বঙ্গভাষার উপাসক, চন্দ্রনাথও তাঁহাদিগের অনুগামী হইয়াছেন। আমাদের দরিদ্র-সাহিত্য-ভাণ্ডার হইতে এই সকল রত্নরাজি আহরণ করিয়াও মৃত্যুর লুপ্ত করপুট নিবৃত্ত হইল না। আবও একটি উজ্জল হীরক বঙ্গজননীর মুকুট হইতে অপহৃত হইয়াছে। এমনি করিয়া কালসমুদ্রের এক একটি তবঙ্গ বঙ্গসাহিত্যেব এক একটি স্নন্দব স্তম্ভ ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। সুতরাং বঙ্গবাসীর প্রকৃতই শোক করিবার কারণ আছে—সাহিত্যজীবনের স্নিকোজ্জল প্রভাতে নির্গম কালমেঘ উঠিয়া আমাদের হৃদয় দাক্ষ্য নৈরাশ্রে ও দুঃখে অন্ধকার করিয়া ফেলিয়াছে।

আজ যে মহাত্মার পুণ্য নাম নাইবার জন্ত আমি আপনাদের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছি, তিনি বঙ্গসাহিত্যেব কতখানি স্থান অধিকৃত কবিয়াছিলেন, তাঁহার মোহন স্পর্শে আমাদের সাহিত্য ও জীবন কতখানি উজ্জল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে আমি চেষ্টা করিব। পরলোকগত চন্দ্রনাথ বসু যে বঙ্গভাষার একজন কৃতী লেখক ছিলেন, এবং তিনি যে বাঙালী জাতির সম্মুখে একটি চিরগৌরবমণ্ডিত প্রাচীন আদর্শ ধারণ করিয়াছিলেন, তাহার জন্ত তিনি আমাদের এবং আমাদের উত্তরপুরুষের কৃতজ্ঞতার ও অসীম শ্রদ্ধার পাত্র। এখন যেমন বঙ্গীয় যুবক বঙ্গভাষাকে স্নেহের ও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতে শিখিয়াছেন, চন্দ্রনাথের যৌবনকালে ঠিক এমনটি ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি যাঁহাদিগের নামের পশ্চাতে রহস্যময় বীজমন্ত্রের মত থাকিয়া সে সময়ে পাশ্চাত্য-বিদ্যাকে আরও রহস্যময় করিয়া তুলিত, তাঁহারা প্রায়ই বঙ্গভাষাকে স্নেহ ও গৌরবের দৃষ্টিতে দেখিতেন না। ইংরেজীতে দখল হওয়াই তখন কলেজী শিক্ষার

* বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

আদর্শ ছিল, ইংরেজীতে ভাল প্রবন্ধ লিখিয়া সাধারণের বিশ্বাস উৎপন্ন করিতে পারা বঙ্গীয়যুবকের স্বথের স্বপ্ন ছিল ; যাহারা ইংরেজী শিক্ষার আলোকে ইংরেজী সংবাদপত্রের স্তম্ভে ইংরেজী প্রবন্ধ লিখিয়া বাহাদুরী লইতে পারিতেন, যাহারা ইংরেজীতে অনর্গল বক্তৃতা করিয়া ইংরেজী শুণগ্রাহী শ্রোতার মন মুগ্ধ করিতে পারিতেন, এবং সময়ে সময়ে দুই একজন ইংরেজের নিকট হইতে পিঠচাপড়ানি লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতেন, তাহাদের সৌভাগ্য যে জীর্ঘর বিষয় ছিল, সে সম্বন্ধে কি কোন সন্দেহ থাকিতে পারে ? চন্দ্রনাথ বাবু ইহাদেরই একজন ছিলেন ; Oriental Seminaryতে উপযুক্ত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ইংরেজীতে পারদর্শী ছাত্র, বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়া, ইংরেজীতে প্রবন্ধ লিখিয়া জনসাধারণের রুচির অনুরূপ পবনে তিনি যে অভীষ্ট যশের পরপারে উপনীত হইলেন তাহা আর বিচিত্র কি ? কিন্তু প্রতিভার স্বভাব এই যে, সে চিরভ্রমিত পথে ভ্রমণ করিয়া তৃপ্ত হয় না ; স্বাভাব্য ও স্বায়ংব্যক্তি প্রতিভার প্রাণ । প্রতিভাশালী চন্দ্রনাথ মাতৃভাষার সেবায়—অনাদৃতা কাঙ্গালিনী বঙ্গভাষার উন্নতিসাধনে মনোযোগ করিলেন । প্রাচ্যঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর, চিরস্মরণীয় বঙ্কিমচন্দ্র, মনীষী অক্ষয়কুমার ও ভূদেবচন্দ্র, বাণীকণ্ঠহরের মধ্যমণি মধুসূদন, রসের সাগর দীনবন্ধু প্রভৃতি যে আলোক রশ্মিমালায় বঙ্গভাষার ক্ষুদ্র কুটার আলোকিত করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, চন্দ্রনাথ তাহাদেরই সঙ্গে আর একটি আলোকরেখা নিশাইয়া দিবার জন্ত ব্যগ্র হইলেন । পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রথর কিরণ সে ক্ষীণরশ্মিটি নিবাইয়া দিতে পারিল না । তিনি অতি যত্নের সহিত, একান্ত শ্রদ্ধার সহিত তাহার মাতৃভাষার দিকে ফিরিয়া যাইলেন । বঙ্গসাহিত্যের সেই দীনতা ও অসম্পূর্ণতার দিনে যাহারা ইহাকে আশ্রয় দান করিয়া আদৃত ও গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন, তাহারা যে আমাদের কতখানি কৃতজ্ঞতার পাত্র, তাহা কি বলিয়া শেষ করিতে পারা যায় ? তিনি আমাদের জন্ত, কৌতুহলের জন্ত বা তাহার দুর্লভ অবসর-গুরুভ্রমণ কোনপ্রকারে কাটাইয়া দিবার জন্ত বঙ্গভাষার সেবা করেন নাই । তাহার সাহিত্যানুরাগ ও সাহিত্য-সেবা-ব্রত আলোচনা করিলে মনে হয় যে, তিনি ইহাকে একটি কঠোর সাধনার মত, একটি প্রকৃত তপশ্চর্য্যার মত করিয়া সেবা করিয়াছিলেন । এমন করিয়া বঙ্গসাহিত্যের সেবা অধিক গৌরব করিয়াছেন বলিয়া আমি জানি না । চন্দ্রনাথ বাবু আমাদের জন্ত যে সাহিত্যসম্পদ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান বস্তু তাহার একাগ্রতা ও আন্তরিকতা । তিনি অতীত সাহিত্যভাণ্ডারের দ্বার খুলিয়া

বিদেশীয় কাব্যসাগরে অবগাহন করিয়া যে অমূল্য রত্নরাশি আহরণ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি তাঁহার স্বদেশবাসীদিগকে শ্রদ্ধার সহিত দিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে কিছুই দিতে পারি নাই—বঙ্গসাহিত্যের পক্ষ হইতে বঙ্গীয়সাহিত্য-পরিষৎ তাই তাঁহার জন্ত শোকপ্রকাশ করিয়া সেই ঋণ কিঞ্চিৎপরিমাণে শোধ করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

প্রতিভাবান ব্যক্তির জীবনচরিত আলোচনা করিতে হইলে, তাঁহার বংশের বিবরণ এবং অত্যান্ত বিশেষ ঘটনাবলীর বর্ণনা ইত্যাদির ধারাবাহিক একটি ইতিহাসের মধ্য দিয়া একটা কার্য্যকারণসম্বন্ধ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করা হইয়া থাকে। অসাধারণ ব্যক্তির জীবন-ব্যাপার প্রথম হইতেই অননুসাধারণ ঠিকাই আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়া থাকি। সাধারণতঃ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের মাতা উন্নতমণ্ডল, কর্তব্যপারায়ণা ও সাধারণ জীলোক অপেক্ষা স্বতন্ত্র প্রকৃতির হইয়া থাকেন; প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির পিতা অথবা অন্য কোন পূর্বপুরুষ যে প্রতিভাসম্পন্ন ইহাও আমরা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়া থাকি। “একপ না হইলে সেকপ হইত না,” ইহাই আমরা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া জীবনচরিত লিখার উদ্দেশ্য সফল করিয়া থাকি। একপ চেষ্টাও যে স্বাভাবিক, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। কোন বিষয় ভাল করিয়া বুঝাইতে হইলে, তাহার কার্য্যকারণ-পরম্পরা নির্দেশ করিতে হয়। মহৎ লোকের জীবনী সম্বন্ধেই বা এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে কেন? কার্য্যকারণধারা ক্রমশঃ প্রসারিত হইয়া যখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া ফেলিতেছে, তখন জীবনচরিতের বিষয়েও আমরা এই অবিসংবাদী নিয়মের অধীন। কিন্তু একটি কথা আমার মনে হয় যে, এই রহস্যপূর্ণ বিশ্বের মধ্যে মনুষ্যজীবনই সর্বাপেক্ষা রহস্যময়। আকাশের নক্ষত্ররাজি গণনা করা সহজ হইতে পারে, সমুদ্রের বীচিমাল্য গণনার আশা করা যাইতে পারে, কিন্তু বিচিত্র মনুষ্যজীবনের ঘটনাবলীর ইয়ত্তা করা সাধ্যাত্ত নহে। মনুষ্যচরিত্র দেবতারাও বুঝিয়া উঠিতে পারেন না, ইহা এতই জটিল ও সমস্তাপূর্ণ। মনুষ্যজীবনের সমস্ত ঘটনাগুলি যদি জানিতে পারা যাইত, তাহা হইলে কার্য্যকারণসম্বন্ধ জীবনের কোন অংশ কিরূপে গঠিত হইল, তাহা সূর্য্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণের মত গণিয়া বলা যাইত। কিন্তু ঐ “যদি” লইয়াই ত যত গোলযোগ। আমরা মনুষ্যজীবনের মত কি সহস্রাংশের একাংশ জানি কি না সন্দেহ; সুতরাং এতদে কার্য্যকারণ-পরম্পরা নির্দেশ করিতে যাওয়া অনেক সময়ে বিভ্রমস্রোত। এত বিচিত্র রকমের শক্তি; এত বিচিত্র ঘটনা মানুষের জীবনে ক্রিয়া করে, যে তাহা ভাবিলে

হতবুদ্ধি হইতে হয় । বালক রাক্ষিন তাঁহার পিতার সহিত সৌন্দর্য্যের রম্য কানন স্কটল্যাণ্ডে ঘুরিয়া বেড়াইতেন—সেই পৰ্শ্বভাষাশোভিত, সমুদ্রবিধৌত, সরোবর-খচিত, অরণ্যরাজিত, স্বভাবশোভার প্রমোদভবন—স্কটল্যাণ্ড রাক্ষিনের স্বকুমার চিত্তে স্বপ্নময় বীজবপন করিয়াছিল, তাই তিনি বড় হইয়া সৌন্দর্য্যের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারিয়াছিলেন । জীবনচরিতলেখক এই কথাটি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন, আমরাও বুঝিয়া তৃপ্ত হইলাম । কিন্তু একটি কথার গীমাংস হইল না, বাল্যকালে সৌন্দর্য্যের শ্রী যাহাদের নয়নসমক্ষে উদ্ঘাটিত হয়, তাহাদের মধ্যে কতজন রাক্ষিনের মত হইতে পারে ? অরণ্য জঙ্গলে ঘুরিয়া কতজনে ওয়ার্ডস্ ওয়ার্থের মত বনদেবতার আবির্ভাব অনুভব করিতে পারিয়াছে ? এইজন্ত আমার বোধ হয়, মানবজীবনের আলোচনায় কার্য্যকারণধারা আশাশ্রিতকে বহুদূর লইয়া যাইতে পারে না । বিশ্বব্যাপিনী এই কার্য্যকারণধারা আমি উপেক্ষা করিতেছি না । অনেক চিরন্তন সত্যই আমরা কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখিতে পারি না । মানবজীবন তাহাদেরই মধ্যে একটি । কোন্ অজ্ঞাত প্রদোষে, স্বাভাবিকত্রেব নিশিরবিদু পড়িয়া এই মানবসমাজের শুষ্কিমধ্যে প্রতিভাকপ গুল্লা জন্মগ্রহণ করে, তাহা আমরা অনেক চেষ্টা করিয়াও জানিতে পারি না । আমরা কেবল প্রতিভার বিকাশ দেখিয়া সম্মমে ও বিস্ময়ে মুক ও মৌন হইয়া থাকি ।

প্রতিভার রাসায়নিক বিশ্লেষণ সম্ভব না হইলেও, প্রতিভাসম্পন্ন মহৎ ব্যক্তিদিগের জীবনচরিতের আলোচনায় যে প্রভূত উপকার সাধিত হয়, তাহা সত্য-জগতের সর্বত্রই স্বীকৃত হইতেছে । স্মৃতিসভা করিয়া, জীবনচরিতের ব্যাখ্যা করিয়া, আলোচ্য বা মর্ম্মরে প্রতিকৃতি রক্ষা করিয়া একটি জাতি তাহার উপদেষ্টা বা নেতা'র চরণে যে কৃতজ্ঞতার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করে, তাহা সেই জাতীয়হৃদয়ের স্বাভাবিক স্পন্দনমাত্র । এরূপ না করিলে একটি ওরুতর জাতীয় কর্তব্য হইতে অন্তিত হইতে হয় । চন্দ্রনাথ বাবু নিজের কিন্তু জীবনবৃত্ত অনাবশ্যক মনে করিতেন । তিনি লিখিয়াছেন; “ব্যক্তিবিশেষের স্মৃতিরক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে যদি জীবনচরিত লেখা হয়, তাহা হইলে জীবনচরিত লিখিবার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই । মৃত্যুর পবেও থাকে, কোনও লোকের জীবনে এমন কিছু থাকিলে সে যোফের জীবনচরিত না লিখিলেও ভাল থাকিবে । মানবের প্রাচীন গুরুদিগের জীবনচরিত কেহ কখনও লিখে নাই, কিন্তু তাঁহারা সকলেই জীবিত আছেন । মৃত্যুর পর যাহা থাকিবার নয়, জীবনচরিত লিখিলেও তাহা

থাকে না।.....কাল যাহা ডুবায় তাহা ডুবিবার জিনিস, মানুষ সহস্র চেষ্টায় তাহা ভাসাইয়া রাখিতে পারে না। তাহা ডুবিয়া যাওয়াই উচিত। কালের ছায় সুন্দর চমৎকার বিচক্ষণ জীবনচরিত-লেখক আর নাই।” (জীবনের কথা—ত্রিধারা)। কথাটি একদিক দিয়া দেখিলে ঠিক; স্থায়িত্ব এবং অস্থায়িত্ব সম্বন্ধে কালটি শ্রেষ্ঠ মাপকাঠি। কিন্তু জীবনচরিত লেখার উল্লেখ কেবল তাহাই নহে। যে সকল মহাত্মা ভিন্ন ভিন্ন দেশে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহাদের দেশ, সমাজ বা সমাজের কোন অংশের উপর প্রভাব-বিস্তার করিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনচরিত উপদেশের আকরভূত। তাঁহাদের আশা ও নৈরাশ্য, ক্ষমতা ও অক্ষমতা, সফলতা ও বিফলতার মধ্য দিয়া কেমন করিয়া একটি মহৎ উদ্দেশ্য ধীরে ধীরে মানবসমাজকে উন্নতির আবর্তনশীল পথে লইয়া গিয়াছে, ইহা সব সময়ই কেতুহলজনক এবং শিক্ষা প্রদ। সুতরাং জীবনচরিতের মূল্য সম্বন্ধে চন্দ্রনাথ বাবুর সহিত একমত না হইতে পারিলেও প্রত্যাবার্ত্ত হইতে হইবে না।

বড় বড় লোকের জীবন হইতে অনেক শিক্ষালাভ করা যায়, বিশেষ যখন সেই সকল লোক লোকশিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। সমাজ অথবা সমগ্র মানব জাতির মঙ্গলের জন্ত যখন ইহঁরা গভীর উদাত্ত স্বরে সত্যরস্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তখন মানবগুণী মুগ্ধ বিফারিতনেত্রে তাঁহাদের দিকে সাম্রাগে চাহিয়া রহিয়াছে। চন্দ্রনাথ বাবুর গ্রন্থগুলি পাঠ করিলে এই ধারণাটী মনে আইসে, যেন তিনি একটি গুরুতর কর্তব্যের আহ্বানে, বাঙ্গালী হিন্দুসমাজকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্ত বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। লোকশিক্ষার জন্তই তিনি লেখনী গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইজন্তই তাঁহার গ্রন্থে নিষ্কল রচনা একরূপ বিরল। তিনি দেখিলেন যে, পাশ্চাত্যশিক্ষার বজ্রায় দেশের যাহা কিছু ভাল, বাঙ্গালীর যাহা নিজস্ব, তাহা ভাসাইয়া লইয়া চলিবাছে, সামঞ্জস্য (Homogeneity) বিহীন সমাজ আলোড়িত, বিক্ষুব্ধ, বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে, তাই তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি দিয়া প্রাণীকৃত মত স্থির ও অটলভাবে সেই শাবনের গতিরোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে প্রাণন যে কি ভয়ানক তাহা সেই সময়কার ইতিহাস পাঠ না করিলে বুঝিতে পারা যায় না।

ইংরেজ বনিককোম্পানী যখন ভারতের রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন, তখন তাঁহাদের সংসর্গে আসিয়া, তাঁহাদের ছায়পরতায় ও অত্যাচার কতকগুলি সদৃশ্যে আদেশীয় লোকদিগের মত এই নূতন জাতির আচার ব্যবহারের পক্ষপাতী

হইয়া উঠিতেছিল। তাহার পর ইংরেজ যখন কলিকাতায় মাদ্রাসা, ফোর্ট-উইলিয়াম কলেজ, সংস্কৃত কলেজ, হিন্দুকলেজ খুলিয়া দেশীয় যুবকদিগের বিদ্যা-শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন, তখন বঙ্গদেশে টলমল করিয়া উঠিল। ইংরেজীশিক্ষার বিস্তার করিয়া ইংরেজরাজ যে বিপ্লবের সূচনা করিলেন, তাহাতে সমাজদেহে সজ্জক হইয়া উঠিল। বহুদিন বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক অমূর্খ ও নির্জীব হইয়া পড়িয়াছিল; সংস্কৃতজ্ঞ কতিপয় পণ্ডিত আবহমানকালপ্রচলিত কাব্যের শ্লোক আওড়াইয়া, অথবা ত্রায়েব ফাঁকির চর্চিতচর্ষণ করিয়া পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতেন। অধিকাংশ লোকই অজ্ঞতায জীবন অতিবাহিত করিত। বহুদিন বাঙ্গালী নূতন তত্ত্বের আশ্বাদন হইতে বঞ্চিত ছিল। এখন যেমনি এষ্ট বিদেশীয় বিপুল সভ্যতার দ্বার উদঘাটিত হইল, অগ্নি দল দলে লোক সেই মন্দিরে প্রবেশ করিতে লাগিল। লোকের মনে এই ধারণা হইতে লাগিল যে, বিদেশীয় কাব্য-দর্শন, বিদেশীয় পোষাক-পরিচ্ছদ, বিদেশীয় আচার-ব্যবহার সকলই ভাল। দেশীয় যাহা কিছু, সে সমস্তই অসম্পূর্ণ, অসম্মত, কুৎসিত। এইরূপে দেশীয় আচার-ব্যবহাবকে বন্দিদান করিয়া দেশে স্বাধীন চিন্তার যুগ প্রবর্তিত হইল।

কি প্রকারে এই স্বাধীন চিন্তার উদ্বোধন হইয়াছিল, তাহা এতদ্দেশের ইতিহাসলেখকের পক্ষে একটি অন্বসন্ধানযোগ্য ঘটনা। সেই সময় যে সকল আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য শক্তিনিচয় কার্য্য করিয়াছিল, তাহা সবিশেষ বিবৃত হইলে—জাতীয় ইতিহাসের একটি বিশেষ অধ্যায়ের সৃষ্টি করিবে। ইংরেজী শিক্ষা, ও ইংরেজী সভ্যতা যে এত সহজে এবং এমন গভীরভাবে এ দেশের লোকের মনে প্রতিষ্ঠিত হইল, ইহা কেবল কতকগুলি বাহ্যঘটনাপরম্পরার ক্রিয়া হইতে পারে না। ভারতবর্ষীয়দিগের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি, আশা ও আকাঙ্ক্ষা এই শিক্ষা-বিস্তারের অমুকুল ছিল, নহিলে এমন বিপ্লব কখনও হইতে পারিত না। ফলটি যখন গাছে পাকিয়া উঠে এবং তাহার বোঁটাটি শিথিল হইয়া যায়, তখন তাহা সামান্য একটি পক্ষীর পদভরে খসিয়া পড়ে। এ দেশের আচার, অনুষ্ঠান, রীতি, নীতি এমনই অসম্পূর্ণ, অনাবশ্যক ও বাহ্যপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল যে, লোকের মন শিক্ষার প্রথম বাতাসেই পুৰাতন আশ্রয় ছাড়িয়া দিতে লাগিল।

যে সকল বাহ্য কারণ এই ইংরেজী-সভ্যতা-বিস্তারের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিল, তাহার মধ্যে আমি কেবল কয়েকটির উল্লেখ করিব। সত্য থাকিলেই শুধু হয় না, তাহার প্রচারক চাহি; ধর্ম থাকিলেই লোকে ধার্মিক হয় না, তাহার পুরোহিত চাহি; এ দেশে ইংরেজী-সভ্যতা-বিস্তারেরও তেমনি কয়েকজন প্রধান

পুরোহিত বা প্রচারক জুটিয়া গেলেন। কলিকাতায় ডেভিড হেয়ার ও ডিরোজিও প্রভৃতির মত উন্নতমনা কয়েকজন এই নূতন সভ্যতার বর্ত্তিধাবণ করিলেন। ইহাদের নিঃস্বার্থ পরহিতচেষ্টা, অমায়িক ব্যবহার, সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি দেশীয় যুবক-বৃন্দের মন আকৃষ্ট করিল। সে আকর্ষণ এমন প্রবল যে, অনেক বাঙ্গালী ধর্ম, কুল, আত্মীয়, স্বজন পরিত্যাগ করিয়া এই নূতন মত্রে দীক্ষিত হইতে লাগিল।

স্বাধীন চিন্তার সঙ্গে যুক্তির খুব নিকট সম্বন্ধ। যে দেশে যখন স্বাধীন চিন্তার আরম্ভ হইয়াছে, সে দেশে তাহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে যুক্তির উপর। সত্রেতিস্ যখন গ্রীকদিগের মন স্বাধীন চিন্তার বন্ধে পরিচালিত করিতে চেষ্টা করিলেন, তখন তিনি যুক্তিকেই প্রধান আশ্রয় বলিয়া গ্রহণ করিলেন, এবং যুক্তির দ্বারা প্রাচীন মতের অসারতা দেখাইতে লাগিলেন। যুবোপের নবযুগে বেকন হইতে হিউম পর্য্যন্ত সকলেই যুক্তির উপর জ্ঞানের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অবশ্য যুক্তি যে সকল সময়ে ধর্মের অনুকূল হয়, তাহা নহে। যুক্তির সঙ্গে যখন ধর্মের বিরোধ ঘটে, তখন নাস্তিক দর্শনের উৎপত্তি হয়; এবং তাহারই প্রভাব থর্ব্ব করিবার জন্য আস্তিক দর্শনেরও সৃষ্টি হয়। সেই আস্তিক দর্শনের উদ্দেশ্য ধর্মের মূল সত্যগুলিকে যুক্তির দ্বারা রক্ষা করা। ইংরেজীশিক্ষার ঘাতপ্রতিঘাতে যখন লোকের ধর্ম-বুদ্ধির মূল শিথিল হইয়া উঠিল, তখন যে যুক্তিমুদাক, আস্তিক-দর্শনের সৃষ্টি হইল, তাহাই “ব্রাহ্মধর্ম।” ব্রাহ্মসমাজ যুক্তির উপরে হিন্দুধর্মের সারস্বরূপ উপনিষদের সত্যগুলি প্রতিষ্ঠিত করিলেন। রাজা রামমোহন রায় ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। কিন্তু তিনি হিন্দুধর্মের সার ধর্মকেই প্রকৃত ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন; পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কেবল হিন্দুধর্মের বাহিরের আবরণকে এবং জাকজমকপূর্ণ বহুঈশ্বরপূজাকে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও বেদান্তের প্রতি ভক্তিমান ছিলেন, এবং বেদান্তের ঈশ্বরবাদেব উপরে তিনি ব্রাহ্মধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এইজন্য ব্রাহ্ম-ধর্মকে এখনও অনেকে ধর্মতত্ত্বমাত্র বা Theology বলিয়া মনে করেন। ধর্ম এবং ধর্মতত্ত্বে অনেক প্রভেদ। সে আলোচনা এখানে প্রাসঙ্গিক হইবে না। এস্থলে এইমাত্র বলা আবশ্যিক যে, ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা ইংরেজী-সভ্যতা-বিস্তারের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। এমন কি, এই ব্রাহ্মসমাজে, খৃষ্টানদিগের অনুকরণে সাপ্তাহিক উপাসনা, সঙ্গীত ও পাঠের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

সময় বুঝিয়া খৃষ্টান মিশনারীগণও ধর্মপ্রচার কবিত্তে লাগিলেন। চুঁচুড়া ও

শ্রীরামপুরের যুরোপীয়গণ ধর্মপুস্তক প্রকাশ করিয়া, দেশীয় লোকের আচার-
বান্ধারের প্রতি বিজ্ঞপবর্ষণ করিয়া লোকের মন হইতে পুরাতনের প্রতি
অমুরাগ দূর করিয়া দিতে লাগিলেন । বাঙ্গালা ভাষায় পুস্তক প্রকাশিত করিয়া
সমাজের নিয়ন্তর পর্য্যন্ত ইহারা জ্ঞানের আলোক লইয়া গিয়াছিলেন । বঙ্গ-
ভাষায় পুস্তকপ্রণয়ণ করায় খৃষ্টধর্মের কিছু উপকার হউক না হউক, বঙ্গভাষায়
যে প্রভূত উপকার হইয়াছিল তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হয় । মিশনরীরা
যে কেবল ধর্মপ্রচার করিয়া শিক্ষাবিস্তারের সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন তাহা
নহে । সময়ে সময়ে মিশনরীদের ভবনে যুবকগণের সাক্ষা সমিতিও বসিত ।
নিবিদ্ধ থাকে তাঁহাদের রুচিও সম্ভবতঃ এই স্থানেই অর্জিত হইত ।

শিক্ষাবিস্তারের আর একটি দ্বারস্বরূপ হইল সংবাদপত্র । বিলাতের এবং এই
দেশের কোন কোন যুরোপীয় সংবাদপত্র-পরিচালন করিয়া শিক্ষাবিস্তারের বিশেষ
সুবিধা করিলেন । পরিশেষে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে যখন মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদত্ত
হইল, তখন স্বাধীনচিন্তার প্রকৃত উদ্বোধন হইল । সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এই
নবযুগের একটি বিশেষ অঙ্গণীয় ঘটনা । (ক্রমশঃ)

শ্রীধর্মেন্দ্রনাথ মিত্র ।

জ্ঞানালোক ।

—:০:—

জলদ সঞ্চিত বহ্নি ফেলে উগারিয়া,
বিদ্যমানতা লভে পরকাশ;
মানব গৃহীত সত্য দেয় বিলাইয়া
হয় তাহে জ্ঞানের বিকাশ ।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ।

—:০:—

কুমার রাজার গড়।

—ঃঃ—

১

সে ছই শত বৎসরের অধিক দিনের কথা। শাকখালির রাজেশ্বর মুখো-
পাধ্যায় পার্শ্ববর্তী গ্রামের ব্রাহ্মণ জমীদারের রামনগর পরগণার নায়েব ছিলেন।
জমীদার রামতারণ ভট্টাচার্য্য বৃদ্ধ, ধর্মপরায়ণ ও আশ্রিতবৎসল। তাঁহারা সে
অঞ্চলে পুরাতন জমীদার। প্রজারা সাধারণতঃ তাঁহাকে 'রাজা' বলিত।
তাঁহার আশ্রয়ে তাঁহার দূরসম্পর্কীয় কুটুমপুত্র রাজেশ্বর প্রতিপালিত হইতে-
ছিলেন।

লাভের উপাদান পাইলে লোভ-স্বরূপ অনেকের পক্ষেই হঃসাধ্য; ধনাগমের
স্বযোগে রাজেশ্বরের লোভ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। শেষে তাঁহার অত্যাচারে
প্রজারা পীড়িত হইতে লাগিল। তাহারা জমীদারের নিকট আবেদন করিল।
রামতারণ কর্মচারীকে সতর্ক করিয়া দিলেন। কিন্তু তাহাতে সফল না
হইয়া ক্রমেই ফলিল। রাজেশ্বর প্রজাদিগের প্রতি জুগু হইয়া অত্যাচারের
মাত্রা বাড়াইলেন। প্রজারা 'মরিয়া' হইয়া উঠিল। শেষে তাহারা এক দিন নিকট-
বর্তী গ্রাম হইতে কাছারীতে প্রত্যাবর্তনপর রাজেশ্বরকে রাত্রির অন্ধকারে পাইয়া
প্রহার করিল। তাঁহার সঙ্গীরা পলায়ন করিল। প্রজারা রাজেশ্বরকে একটি
বৃক্ষে বাঁধিয়া রাখিয়া প্রস্থান করিল। প্রভাতে কাছারীর ভৃত্যবর্গ আসিয়া
তাঁহার উদ্ধারসাধন করিল।

রাজেশ্বর আসিয়া রামতারণকে এ কথা জানাইলেন; গ্রামবাসীদিগকে উপযুক্ত
শিক্ষা দিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। রাজেশ্বরকে বলিলেন, যদিও তাঁহারই
দোষে প্রজারা এ অত্যাচার করিয়াছে, তথাপি তিনি দোষীদিগের শাস্তিবিধান
করিতেন। কিন্তু কাহারা এ কার্য্য করিয়াছিল, তাহা যখন জানা যায় না, তখন
অপরাধীদিগের দোষে নিরপরাধদিগকেও দণ্ডিত করিলে অধর্ম্য হইবে।

এই ব্যবস্থায় রাজেশ্বর আপনাকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিলেন। ফলে,
কয়দিন পরে একদিন নিশীথে একখানি গোয়ান রাজেশ্বরকে তাঁহার পত্নী
কাত্যাবনীকে ও তাঁহার শিশুপুত্র কমলেশ্বকে লইয়া গ্রাম হইতে বাহির হইয়া
গেল।

প্রভাতে উঠিয়া গ্রামের লোক দেখিল, রাজেশ্বরের গৃহ শূন্য । কেহ তাঁহার বুদ্ধির, কেহ বা রামতারণের বিচারের নিন্দা করিল । রাজেশ্বর কোথায় গমন করিলেন, তাহা কেহই জানিতে পারিল না ।

২

দীর্ঘ সপ্তদশবর্ষকাল কাটিয়া গেল । রাজেশ্বরের ঘর কয়খানি বছদিনপূর্বেই ভূমিসাৎ হইয়াছিল ; এখন তাঁহার শূন্য ভিটায় যদৃচ্ছাবদ্ধিত তরুলতাগুল্মবন শৃগালের ও ভুজঙ্গের লীলাভূমি হইয়া পড়িল ; তাঁহার পুষ্করিণী মজিয়া উঠিল । কেহ বলিত, তিনি দিগ্বীতে ; কেহ বলিত, তিনি ঢাকায় । গ্রামে কেহই তাঁহার সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ জানিত না । এই সময় রামতারণের পুত্র শ্রামাচরণ সংবাদ পাইলেন, লাট শাঁকখালির জমীদারের জমীদারী ও তাঁহার জমীদারীর সমস্ত জলকর জমা বিক্রীত হইয়া গিয়াছে । তিনি কখনও রাজস্ব দিতে বিলম্ব করেন নাই । তবে, একপ হইল কেন ? তাহার পর তিনি যখন শুনিলেন, জমীদারী ও জলকর জমা রাজেশ্বর মুখোপাধ্যায় ক্রয় করিয়াছেন ; তখন বুঝিলেন, কায়টা সরলভাবে হয় নাই ।

ইহার কয়দিন পরেই অনেকগুলি অপরিচিত লোক শাঁকখালিতে আসিয়া রাজা রাজেশ্বরের নামে জমীদারীর ও জলকর জমার দখল লইল । তাহার পর রাজেশ্বরের ভিটা পরিষ্কৃত হইল, পুষ্করিণীর পক্ষোদ্ধার ও কলেবরবৃদ্ধি হইল । সঙ্গে সঙ্গে ইষ্টক পোড়াইয়া রাজেশ্বরের শূন্য ভিটায় প্রমাদ-নির্মাণ আরম্ভ হইল । গ্রামের লোক বিস্মিতনেত্রে সেই বৃহৎ, কারুকার্যবহুল গৃহের দ্রুত সম্পূর্ণতাপ্রাপ্তি লক্ষ্য করিতে লাগিল ।

গৃহনির্মাণ শেষ হইল ।

তাহার পর একদিন মধ্যাহ্নে রাজা রাজেশ্বর গ্রামে প্রবেশ করিলেন । যাই-বার সময় তিনি রজনীর অন্ধকারে গোয়ানে প্রস্থান করিয়াছিলেন ; আজ তিনি হস্তী, অশ্ব ও অশ্বচরবর্গে পরিবৃত্ত হইয়া নরবাহু যানে গ্রামে প্রবেশ করিলেন । তাঁহার আগমনে গ্রামে অসাধারণ চাঞ্চল্য দেখা গেল ।

রাজেশ্বর এতদিন কোথায় ছিলেন ; কি উপায়ে তিনি “রাজা” হইলেন, কি কৌশলে তিনি জমীদারী ও জলকর জমা হস্তগত করিলেন—সে সব কথা প্রকাশ পাইল না । কাত্যায়নীর দরিদ্রদশার সখীরা রাণী কাত্যায়নীর শুদ্ধান্তে প্রবেশ করিতে সাহস করিল না । রাজেশ্বরের পুত্র কমলেশ “কুমার রাজা” নামে পরিচিত হইল । নবীন রাজা গ্রামে আসিয়া রাজগিরিটা ভাল করিয়াই

করিতে লাগিলেন। তাঁহার ব্যবহারে, বাক্যে, বিলাসে—তাঁহার পূর্বের অবস্থার পরিচয়মাত্র পাইবার উপায় ছিল না।

৩

যেমন কোন কোন সংক্রামক রোগের শক্তি কতকগুলি লোককে আক্রমণ করিয়াই ব্যয়িত হইয়া যায় বা ব্যক্তিবিশেষের দেহে কার্যকরী হয় না—রাজেশ্বরের উক্ত গর্ভ তেমনই কাত্যায়নীতে সংক্রমিত হইয়াই নিঃশেষ হইয়াছিল—কমলেশের সরল, উদার, প্রফুল্ল হৃদয়ে তাহা আপনার দৃষ্ট প্রভাব বিস্তৃত করিতে পারে নাই। কমলেশ গ্রামের ভদ্রলোকদিগের সহিত মিশিত,—যুবকদিগের সহিত ধর্ম্মকাণ্ড-ব্যবহারের প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হইত,—অনেকের গৃহেই যাইত। এরূপ ব্যবহার যে তাহার পক্ষে সম্মন্যনামক রাজেশ্বর তাহা তাহাকে বুঝাইয়া উঠিতে পারিতেন না। তাহার পর যখন একদিন সে শ্রামাচরণের গৃহে গমন করিল, তখন রাজেশ্বরের ধৈর্য্যচ্যুতির উপক্রম হইল। তিনি পুত্রকে ডাকিয়া তাহার এ কার্যের নিন্দা করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দেশত্যাগের কারণ জানাইয়া বলিলেন, “প্রতিশোধ লইব, প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। সে প্রতিজ্ঞাপালন করিয়াছি, কিন্তু আমার বড় ছুঃখ, রামতারণ আজ জীবিত নাই।” পিতার এই কথায় তাঁহার প্রতি পুত্রের শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হইল না, বরং সে যেন হৃদয়ে একটা বেদনা অনুভব করিল।

কাত্যায়নীর সনির্বন্ধ অনুরোধসম্মেও রাজেশ্বর এতদিন একমাত্র পুত্রের বিবাহ দেন নাই। কেন দেন নাই, তাহা কেবল তিনি জানিতেন। এখন তিনি শ্রামাচরণের একমাত্র সন্তান—ছহিতা রাধারানীর সহিত পুত্রের বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন বাঙ্গালার ভদ্রসমাজে অর্থ কোলিগ্র-অধ্যাদার স্থান অধিকৃত করে নাই। তখন লোক “ঘর” দেখিত; অদৃষ্টে বিশ্বাস করিত। রাজেশ্বরের অতীত দারিদ্র্য যেমন শ্রামাচরণের পক্ষে তাঁহার পুত্রকে জামাতা করিবার পক্ষে অন্তরায় ছিল না, তাঁহার বর্তমান সম্পদও তেমনই শ্রামাচরণের পক্ষে বিশেষ আগ্রহের উৎপাদন করে নাই। কিন্তু সম্পত্তি-সংগ্রহে রাজেশ্বরের ব্যবহার ও তাঁহার উক্ত গর্ভ শ্রামাচরণের নিকট নিন্দার্থ বিবেচিত হইয়াছিল। তিনি এ প্রস্তাবে সম্মতিদান করিলেন না। রাজেশ্বর ইহাতে আপনাকে অত্যন্ত অপমানিত মনে করিলেন। তিনি মনে মনে বলিলেন, “তোমার পিতা আমার অপমান করিয়াছিলেন; তাহার ফলে আজ আমি রাজা রাজেশ্বর আমি এ অপমানের প্রতিশোধ লইব। তখন বুঝিবে, আমি কি করিতে পারি।”

৪

তখন ঢাকায় অতি উৎকৃষ্ট নৌকা নির্মিত হইত ; প্রতি বৎসর ঢাকা হইতে দিল্লীতে সয়াটের জন্ত নৌকা প্রেরিত হইত । রাজেশ্বর ঢাকা হইতে দুইখানি সুসজ্জিত ও সুগঠিত নৌকা আনিয়াছিলেন । রাজেশ্বর দুইজন কর্মচারীকে সঙ্গে লইয়া তাহারই একখানি নৌকায় ভ্রমণে বাহির হইলেন । কেহ বলিল, তিনি জমীদারী পরিদর্শনে বাহির হইলেন ; কেহ বলিল, গ্রীষ্মে কাতর হইয়া তিনি জলভ্রমণে চলিলেন । শেষের কথাটি শুনিয়া গ্রামের লোক হাসিল ; কেহ কেহ বিস্মৃতপ্রায় কথা তুলিয়া বলিল, রামনগর পরগণার প্রজারা এইরূপ গরমের অব্যর্থ ঔষধ জানেন ।

রাজেশ্বরের নৌকা তাঁহার জমীদারী ছাড়াইয়া গঙ্গায় আসিয়া পড়িল । রাজেশ্বর মনোযোগসহকারে নদীতীরবর্তী গ্রামগুলি লক্ষ্য করিতেন ; স্থানে স্থানে নৌকা লাগাইয়া তীরে উঠিয়া গ্রামগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিতেন ।

মাসাধিককালপরে রাজেশ্বর স্বগ্রামে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন ।

৫

বর্তমান কলিকাতা হইতে অনতিদূরে অবস্থিত—গঙ্গাতীরবর্তী কোন গ্রামের অধিবাসীরা একদিন প্রভাতে দেখিল, গ্রামের ঘাটে কতকগুলি নৌকা বদ্ধ রহিয়াছে । মহিলারা স্নানের ঘাটে এই সকল নৌকা দেখিয়া অস্মাত অবস্থায় গৃহে ফিরিলেন ; ধীবরগণ মৎস্য ধরিবার জন্ত নৌকা ভাসাইতে আসিয়া এই বিস্ময়কর দৃশ্য দেখিয়া ফিরিয়া গেল ।

ক্রমে গ্রামের লোক শুনিল, শাকখালির নবীন ধনী রাজা রাজেশ্বর অত্যধিক মূল্যে তাহাদিগের জমীদারের নিকট হইতে গ্রামখানি ক্রয় করিয়াছেন । ইহার কারণ কেহই জানিত না, কেহ কল্পনাও করিতে পারিল না ।

ইহার পর গ্রামবাসিগণের বিস্ময় বর্দ্ধিত করিয়া নদীতীরে পরিখাখননের ও সৌধনির্মাণের আয়োজন হইতে লাগিল । কাষটা অত্যন্ত দ্রুত সম্পন্ন হইতে লাগিল । অল্পদিনের মধ্যেই নদীকূলে পরিখাবেষ্টিত—সুসজ্জিত দুর্গ নির্মিত হইল । সহসা এইরূপ স্থানে দুর্গ নির্মাণের কারণ-নির্ণয়-চেষ্টায় গ্রামবাসীদিগের মস্তিষ্ক বিকৃত হইবার হইবার উপক্রম হইল ।

৬

নিদাঘ নিশীথ । সন্ধ্যার পূর্ব হইতে আকাশে মেঘসমাগম হইয়া সন্ধ্যার কিছু পরে মুমলধারে বর্ষণ হইয়া গিয়াছে । কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্র অন্তগত ; চারিদিকে

অন্ধকার। সহসা নৈশ নীরবতা নষ্ট করিয়া শ্রামাচরণের গৃহদ্বারে বহুলোকের কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল, অন্ধকার ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া মণালের আলোক জ্বলিতে লাগিল; সেই বিকট আলোকে দেখা গেল, লাঠি, বর্শা ও তরবারি লইয়া সমজ্ঞ দস্যুদল গৃহ আক্রমণ করিয়াছে।

তখন বাজালায় এরূপ উপদ্রব অজ্ঞাত ছিল না; জমীদারগণই আত্মরক্ষার ও প্রজারক্ষার উপায় করিতেন। সেই জন্ত শ্রামাচরণ একান্ত অসহায় ছিলেন না। তাঁহার গৃহেও কতকগুলি লাঠিয়াল ছিল। ছুই দলে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। শ্রামাচরণের লাঠিয়ালগণ যথাসাধ্য প্রভুর গৃহরক্ষার চেষ্টা করিল। কিন্তু দস্যুরা সংখ্যায় অধিক এবং অস্ত্রবিদ্যায় অধিক নিপুণ। শ্রামাচরণের লাঠিয়ালগণ পরাজিত হইল। নিশাশেষে দস্যুদল শ্রামাচরণের গৃহে প্রবেশ করিল।

দস্যুরা ছদ্মবেশে আসিয়াছিল; কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ যে শ্রামাচরণের গৃহের পথ জানিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহাদিগের অনুসরণ করিয়া কয়জন দস্যু অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। তথায় আত্মীয় কুটুম্বিনীদল ও দাসীরা একস্থানে সমবেত হইয়া কেহ বা দেবতার নাম উচ্চারণ করিতেছিলেন, কেহ বা কেবল রোদন করিতেছিলেন, কেহ বা আশার কথা বলিতেছিলেন। শ্রামাচরণের মাতৃহীনা ছহিতা রাধারানী সেই ভয়শক্তিদাদিগের মধ্যে ছিল। দস্যুদল সেই রোরুণ্যমানা বালিকাকে তাহার পিতৃগৃহ ও পিতৃবক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া গেল। তাহার গৃহের ধনরত্নাদি কিছুই সন্ধান করিল না।

দস্যুরা বালিকাকে লইয়া নদীকূলে আসিল। তথায় নৌকা প্রস্তুত ছিল। বালিকা সেই নৌকায় বন্দী হইল। নৌকা দ্রুতবেগে নদী বাহিয়া অগ্রসর হইল। নৌকার দাঁড়ী, গাঝি সকলেই বলিষ্ঠ; নৌকার বহু সশস্ত্র প্রহরী অবস্থান করিতে ছিল।

গ্রামের লোক এই ব্যাপারে একেবারে স্তম্ভিত হইল। শ্রামাচরণ এই অত্যাচারের কারণ বুঝিলেন, প্রতিশোধ লইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

৭

রাধারানী রাজেশ্বরের নবনির্মিত দুর্গে নীত হইল—বন্দী হইল। সাধারণতঃ যে বয়সে বালিকারা পরিণীতা হইত, রাধারানী সে বয়স অতিক্রম করিয়াছিল। শ্রামাচরণ কিছুতেই মনোমত পাত্র পাইতেছিলেন না; কেবল বাছাই চলিতে ছিল। রাধারানীর আপনার অবস্থা উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা হইয়াছিল। বিশেষ অতর্কিত বিষম বিপদ যেমন সময় সময় মানুষকে একান্ত দুঃখাভিভূত করিয়া

কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে, তেমনই আবার সময় সময় তাহার মানসিক শক্তি বর্দ্ধিত করে—পরিণত করে । রাধারানী আপনার অবস্থা বুঝিল । সে ভাবিল ;—যে কক্ষে সে থাকিত, সে কক্ষ পরীক্ষা করিল । কক্ষের বাতায়ন-পথের দিম্বার্ক কপাট বদ্ধ—উপরার্কের কপাট ইচ্ছামত মুক্ত বা বদ্ধ করিতে পারা যায় ; বাতায়ন-পথে অচ্যুত বাধা নাই । নিয়ে পরিখা—গঙ্গার সহিত সংযুক্ত—গঙ্গাজলে পূর্ণ । রাধারানী দেখিল, যখন ইচ্ছা সে মরিতে পারে—আর সে মৃত্যুও গঙ্গাজলে হইবে । সে নিশ্চিত হইল । “দুকুড়ি সাত” থাকিলে লোক যেমন নিশ্চিত হইয়া খেলার গতি লক্ষ্য করিতে পারে—আবশ্যক বুঝিয়া খেলিতে পারে, সেও তেমনই নিশ্চিত হইয়া ঘটনার স্রোতের গতি লক্ষ্য করিতে লাগিল ।

তবে পিতার জন্ম তাহার হৃদয় সর্বদাই ব্যথিত হইত । সে যখন দেখিত, আকাশে বিহগগণ উড়িয়া বেড়াইতেছে—তখনই সে ভাবিত, বিহগের পক্ষ পাইলে সে কত দ্রুত পিতৃসমীপে উপস্থিত হইত । সে যখন দেখিত, অদূরে জাহ্নবীধক্ষে নৌকা ভাসিয়া যাইতেছে—তখনই সে ভাবিত একবার যদি যুক্তি পাইত, তবে সে স্বরায় পিতৃসমীপে উপনীত হইবার জন্ম নৌকার নাবিকদিগকে তাহার সমস্ত সম্পদ দিতে পারিত । সে পিতার কথা ভাবিত ; ভাবিত, আর কাঁদিত ।

মনোবেদনার উচ্ছ্বাস প্রশমিত হইলে সে দুর্গমধ্যে জনগণের কার্য্য লক্ষ্য করিত । প্রহরীদিগের গতিবিধি, তাহাদের অঙ্গ-ব্যবহার সবই রাধারানী লক্ষ্য করিত ।

রাজেশ্বর দুর্গে ছিলেন না ; তিনি শাকখালির গৃহে সতর্ক, প্রহরীবেষ্টিত হইয়া বাস করিতেছিলেন । কাত্যায়নীও শাকখালিতেই ছিলেন । কিন্তু রাজেশ্বরের একমাত্র পুত্র কমলেশ দুর্গেই ছিল । দুর্গে সে-ই প্রধান ।

৮

রাধারানী দেখিত, কমলেশ মল্লযুদ্ধে কোন ভীমকার প্রহরিকে পরাজিত করিতেছে বা শরে লক্ষ্য বিদ্ধ করিতেছে । সে শুনিত, তাহার সরল উচ্ছ্বসিত হ্রাস্ত দুর্গমধ্যে ধ্বনিত হইতেছে । কমলেশের ব্যবহারে সরলতা ও সহৃদয়তা এমনই সপ্রকাশ ছিল যে, রাধারানী কিছুতেই তাহাকে ঘৃণা করিতে পারিত না । কমলেশ সর্বদাই রাধারানীর সংবাদ লইত এবং তাহার যথাসম্ভব সুখবিধানে সচেষ্টি হইত । তাহার ব্যবহারে বোধ হইত, সে বন্দিণীর দুর্দশায় দুঃখিত ; বন্দিণীর ক্রান্তি দুর্ব্যবহারে লজ্জিত । তাহার এইরূপ ব্যবহারে রাধারানী বিস্মিত হইত ।

ইহার পর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিল। একদিন শাকখালি হইতে আগত পুরোহিত দাসীর সহিত রাধারানীর কক্ষে উপস্থিত হইলেন; বলিলেন, দুইদিন পরে তাহার সহিত কমলেশের বিবাহ দিবার জন্ত তিনি আসিয়াছেন। শুনিয়া রাধারানী বলিল, “আমি বিবাহ করিব না।”

পুরোহিত বিজ্ঞপের হাসি হাসিয়া বলিলেন, “তোমাকে বিবাহ করিতে হইবে। বিবাহ কি তোমার ইচ্ছায় হইবে?”

এই সময় কমলেশ কক্ষদ্বারে উপনীত হইয়া বলিল “কি, ঠাকুর মহাশয়, কি বলিতেছেন।”

পুরোহিত বলিলেন, “বালিকা বলিতেছে, বিবাহ করিবে না; যেন বিবাহ করা না করা ইহার ইচ্ছাধীন।”

রাধারানী দৃঢ়স্বরে পুনরায় বলিল, “আমি বিবাহ করিব না।”

কমলেশ বলিল, “তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমাকে বিবাহ করিতে হইবে না।”

পুরোহিত বিষয়বিস্ফারিত নয়নে কমলেশের দিকে চাহিলেন। কমলেশ হাসিয়া বলিল “শাস্ত্রে আছে—

‘হত্যা ছিদ্ৰা চ ভিদ্ৰা চ ক্রোশস্তীং রুদতীং গৃহাৎ।

প্রসহ কত্মাহরণং রাক্ষসো বিধিকৃত্যতে।’

একে ব্রাহ্মণের পক্ষে রাক্ষসবিবাহ কোন কালেই প্রশস্ত নহে; তাহাতে কলিতে তাহা প্রচলিত নাই।”

পুরোহিত শুদ্ধ হাসি হাসিলেন। তিনি বিবাহে ও শাস্ত্রে সংস্কৃত মন্ত্র পড়াইয়া থাকেন বটে; কিন্তু সংস্কৃতের সহিত তাহার অল্প সূত্রে পরিচয় ছিল না। তিনি কমলেশের কথা বুঝিতে পারিলেন না; কমলেশ তাহা বুঝিল, বুঝিয়া বলিল, “ঠাকুর মহাশয়, একটি কুলবালাকে পাশববলে অপহরণ করিয়া আনিয়া পশুর মত বন্দী করিয়া রাখিয়াছি, ইহাই কি যথেষ্ট নহে যে, আবার তাহাকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ করিব?”

পুরোহিত কিছুক্ষণ নির্বাক রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, “কর্ত্তাকে কি বলিব?”

কমলেশ বলিল, “বলিবেন, বিবাহে বালিকার অসন্মতি জানিয়া আমি বিবাহ করিতে অস্বীকৃত হইয়াছি।”

কমলেশ চলিয়া গেল। পুরোহিত তাহার অনুসরণ করিলেন।

রাধারানী ভাবিতে লাগিল । কমলেশের ব্যবহারে তাহার মনে যে বিষয় উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা অনাবিল শ্রদ্ধায় পরিণত হইল । এ শ্রদ্ধার পরিণতি কিসে বালিকা তাহা জানিত না ।

৯

কোন কাণ নাই ; আছে কেবল ভাবনা । রাধারানী ভাবিত । সে পিতার কথা ভাবিত, পিতৃগৃহের কথা ভাবিত, আপনার কথা ভাবিত । আর সেই ভাবনার মধ্যে তাহারও অজ্ঞাতে কেন যে সে কমলেশের কথা ভাবিত—তাহা সে আপনি জানিত না ।

যত দিন যাইতে লাগিল, সে ভাবনা ততই বাড়িতে লাগিল । মধ্যাহ্নে মুক্ত-বাতায়ন-পথে অদূরে জাহ্নবীর বীচিবিক্ষোভ-চঞ্চল প্রবাহ লক্ষ্য করিতে করিতে, সন্ধ্যাহ্নে সিন্দুরলিপ্ত মেঘমালা দেখিতে দেখিতে সে কমলেশের কথা ভাবিত । ক্রমে এমনই দাঁড়াইল যে, সে কমলেশের আগমনে আনন্দিত হইত, তাহার পদশব্দ শুনিলে বালিকার হৃদয়স্পন্দন দ্রুততর হইত ।

তখনও সে চিন্তায় লজ্জাসঞ্চার হয় নাই ; তখনও বালিকাহৃদয় কমল অমুরাগের অরুণকিরণে বিকশিত হয় নাই । ক্রমে সে চিন্তায় লজ্জা আসিল । তখন কমলেশ তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে আর পূর্বের মত তাহার মুখে চাহিয়া উত্তর দিতে পারিত না ; চেষ্টাসত্ত্বেও তাহার দৃষ্টি হর্ষ্যতলবদ্ধ হইত । তাহার উত্তর আর তেমন স্পষ্ট হইত না ।

বালিকা আপনার এই পরিবর্তনে আপনি বিস্মিত হইত ; কিন্তু ইহার কারণ নির্ণয় করিতে পারিত না ।

১০

মানুষ স্বভাবতঃ আপনাকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান মনে করে । সে মনে করে, তাহার সমস্ত-সম্পাদিত কার্যে কোথাও কোন ত্রুটি থাকিতে পারে না । রাজেশ্বর মনে করিয়াছিলেন, তিনি যেরূপ সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহাতে রাধারানীর কারাগৃহ কিছুতেই শত্রুর হস্তগত হইবে না । এইরূপ মনে করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন । কিন্তু যে বিশ্বাসঘাতকার সহায়তায় তিনি শ্রামাচরণের সর্বনাশ করিয়াছিলেন, সেই বিশ্বাসঘাতকতায় যে তাহারও সর্বনাশ হইতে পারে, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই ।

কত্কার কারাগৃহের সন্ধান পাইতে শ্রামাচরণের অধিক বিলম্ব হইল না । কিন্তু রাজেশ্বরের ব্যবস্থাহেতু তিনি বহু চেষ্টাতেও তাহাতে প্রবেশলাভের উপায়

করিতে পারিলেন না। তাহার পর শ্রামাচরণ দুর্গনির্মাণকার স্থপতির সন্ধান পাইলেন এবং তাহাকে হস্তগত করিয়া দুর্গের নক্সা পাইলেন। তিনি দেখিলেন, পরিখা হইতে দুর্গমধ্যস্থ স্থানাগার জল পূর্ণ করিবার জন্ত প্রাচীরে যে কয়টি রন্ধু বিদ্যমান, সে কয়টি রন্ধু দিয়া এক এক জন-মানুষ অনায়াসে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। রন্ধু পরিখার জলতলে অবস্থিত; সুতরাং, রন্ধু-কপাট বন্ধ না করিলেও তাহা সহজে লক্ষিত হয় না। শ্রামাচরণ বহু অর্থ ব্যয়ে স্থানাগারের তত্ত্বাবধায়ককে হস্তগত করিলেন। সে নির্দিষ্ট দিন রন্ধু-কপাটগুলি মুক্ত রাখিল। বহুদিন কোনরূপ বিপদের সম্ভাবনা পর্য্যন্ত না ঘটায় দুর্গ-রক্ষকের সতর্কতা শিথিল হইয়া আসিয়াছিল। রন্ধু-কপাটের বিষয় দুর্গ মধ্যে আর কেহ জানিতে পারিল না।

এ দিকে কোন্ পথে আসিয়া কিরূপভাবে আক্রমণ করিলে অতর্কিত আক্রমণে দুর্গ-প্রহরীরা সহজে পরাভূত হইতে পারে, শ্রামাচরণ সে বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের সহিত আবশ্যক পরামর্শ করিলেন।

১১

নিশীথের অন্ধকারে শতাদিক অল্পচর লইয়া স্বয়ং শ্রামাচরণ রন্ধুপথে দুর্গে প্রবেশ করিলেন। সকলেই বারিসিক্ত। অল্পচরবর্গকে সমবেত করিয়া শ্রামাচরণ দুর্গ আক্রমণের উপদেশ দিলেন।

অতর্কিত আক্রমণে দুর্গ-প্রহরীদিগের মধ্যে অনেকে বন্দী হইল। অবশিষ্ট প্রহরীরা অস্ত্রসংগ্রহ করিলে দুইদলে বিষম যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

সংখ্যাধিক্য হেতু শ্রামাচরণের অল্পচরবর্গের নিকট দুর্গ-প্রহরীরা পরাভূত হইল। দুর্গপ্রাঙ্গণে হতাহতের দেহ স্তূপীকৃত হইল; নৈশ সঙ্গীরণে বিজ্ঞতার জয়ধ্বনি ও আহতের আর্তনাদ উঠিতে লাগিল।

বিজয়ীরা দুর্গদ্বার মুক্ত করিলে বহু মশালধারী আসিয়া তাহাদিগের সহিত যোগ দিল। তাহারা বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল। সেই মশালের আলোকে দুর্গ-প্রাঙ্গণের ভীষণ দৃশ্য ভীষণতর দেখাইতে লাগিল।

১২

রাধারানী দুর্গপ্রাঙ্গণে এই ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। সোপানে পদধ্বনি শুনা গেল। রাধারানী অলিন্দ হইতে আসিয়া কক্ষের যে বাতায়নের নিম্নে পরিখা অবস্থিত সেই বাতায়নের বন্ধ নিম্নার্কে ভর দিয়া দাঁড়াইল; যদি

আবশ্যক হয়, দেহের সামান্য সঞ্চালনে পরিখায় পড়িয়া আপনার সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবে।

শ্রামাচরণ কক্ষদ্বারে উপনীত হইলেন। তাঁহার পশ্চাতে যে অনুচর ছিল তাহার করধৃত মশালের আলোক রাধারানীর মুখে পতিত হইল। কণ্ঠ্যাকে দেখিয়া শ্রামাচরণ উচ্ছ্বসিত স্নেহে ডাকিলেন—“রাধারানী ! মা !”

রাধারানী পিতাব নিকট আসিবাব উদ্যোগ করিতেছে এমন সময় একজন লোক কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার হস্তে বর্শা—তাহাতে একটি সত্ত্বিচ্ছিন্ন নরমুণ্ড—মুণ্ড হইতে রক্ত ঝরিতেছে। রাধারানী দেখিল, মুণ্ড কমলেশের।

রাধারানীব মুখ যেন রক্তশূন্য হইয়া গেল। সে মূর্ছিত অবস্থায় বাতায়নে পড়িয়া গেল।—নিম্নে পরিখা।

“কি হইল ?”—বলিয়া শ্রামাচরণ উদ্গাদের মত বাতায়নের দিকে অগ্রসর হইলেন। ততক্ষণে রাধারানীর দেহ পরিখার জলে অদৃশ্য হইয়াছে। শ্রামাচরণ সেই বাতায়ন-পথে কণ্ঠ্যর অনুসরণের চেষ্টা করিলেন। অনুচরণ নিবারণ করিল। তাহাব পর বহু সন্ধানেও রাধারানীর দেহ পাওয়া গেল না।

শ্রামাচরণ আর গৃহে ফিরিলেন না। দেওয়ানকে সম্পত্তির ব্যবস্থার বিষয় বুঝাইয়া দিয়া সম্মানহীন জীবনের সায়াহ্ন-যাপনের জন্ত রাধারানীর স্মৃতিপূত মৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন।

১৩

রাজেশ্বর শাঁকখালিতে ছিলেন। যে দিন রাত্রিকালে কমলেশের ও রাধারানীর জীবনের অবসান হইল, তাহার পরদিন তিনি সংবাদ পাইলেন, শ্রামাচরণ বহু অনুচরসহ কোথায় গিয়াছেন। তিনি কিছু উদ্বিগ্ন হইলেন—গড়ের সংবাদের জন্ত লোক পাঠাইলেন।

পরদিন প্রভাতে পুরবাসীদিগের কলরবে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কেহ তাহাকে প্রকৃত কথা বলিতে সাহস করিল না। শেষে তিনি স্বয়ং যাইয়া দেখিলেন, কে তাঁহার সিংহদ্বারের সম্মুখে একটি বর্শা প্রোথিত করিয়া গিয়াছে—বর্শায় কমলেশের ছিন্ন মুণ্ড বিদ্ধ। দেখিয়া রাজেশ্বর মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।

তাহার পর তিনি বর্ষাধিক কাল জীবিত ছিলেন ; জীবিত—কিন্তু জীবমত্ ।

নিদারুণ পক্ষাঘাত তাঁহার শারীরিক শক্তি হরণ করিয়া যেন কেবল যাতনা-ভোগের জন্যই তাঁহার মানসিক শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গেল ।

শ্রীগাচরণের ও রাজেশ্বরের বংশে আর কেহই ছিল না । এখন তাঁহাদের গৃহাদির চিহ্ন ও স্মৃতি বিলুপ্ত । কেবল, কোরগরের গঙ্গাতীরে পরিখার চিহ্ন ও প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ বর্তমান । লোক এখনও সেই ভগ্নাবশেষকে “কুমাব বাজার গড়”—নামে অভিহিত করিয়া থাকে ।

—:O:—

যমুনা-বক্ষে ।

(মথুরায় ।)

যমুনে ! ভারতে তুমি সুর-তরঙ্গিনী ;
সতত জুড়াও প্রাণ সুনীল হিলোলে ;
তুমি এ ব্রজের মাঝে ব্রজ-বিলাসিনী,
হই আত্মহারা তব তরঙ্গের কোলে ।
সন্ধ্যায় তোমার কণ্ঠে দীপমণিহার,
জাগায় নয়নে কোন্‌ ত্রিদিব-স্বপন ।
মধুর উজ্জল মিল্ক সৌন্দর্য্যে তোমার,
কি তৃপ্তি-জড়িত মোর উদ্ভাস্ত জীবন !
সেই দূর অতীতের স্মৃতিমহিমা,
চির মধুময় লীলা, প্রেম-প্রসবণ ;
ভূতলে ত্রিদিব সম দৃশ্য মথুরার,
কোলাহলে সাধনার শাস্ত নিকেতন !—
এ ভবসংসারে গৃহ চির সাধনার,
রচেছে মথুরাবক্ষে প্রবাহ তোমার !

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম ।

বঙ্গ-লক্ষ্মী ।

—ঃঃ—

সুজলাং সুমলাং মনয়জ-শীতলাং

শম্ভু-শ্যামলাং মাতঙ্গ ।

শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীং

কুর-কুসুমিত-কুমদল-শোভিনীং

সুহাসিনীং সুমধুর-ভামিনীং

সুখদাং ববদাং মাতঙ্গ ।

একদিন কমলা নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“পৃথিবীতে আমার ঘর পাতিবার বড়ই বাসনা ; এমন কোন্ দেশ আছে,—যেথায় আমি মনের মত করিয়া ঘর সাজাইতে পারি ?”

নারায়ণ নিম্নলিখিত নেত্রে নিখিলভুবন ভাবিয়াও লক্ষ্মীর মনোমত দেশ পাইলেন না । বলিলেন,—“অগ্নি শোভিনি ! তোমার মনের মত দেশ ত পাইলাম না ; তবে যদি তুমি স্বয়ং দেশ গড়িয়া লইতে পার,—তবেই তোমার বাসনা পূর্ণ হয় ।”

নারায়ণের কথা শুনিয়া কমলা অগাধ সাগর হইতে এক সোণার দেশ তুলিয়া তাহাকে আপনার মনোমত করিয়া গড়িলেন ; তাহার পর কোথায় যে সে দেশ স্থাপন করেন—তাঁহা লইয়া বড়ই বিব্রত হইলেন ; শেষে গিরিরাজ হিমালয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—“গিরিরাজ । আমার এই সাধের খেলাঘর তোমার কাছে রাখিলাম ; তুমি ইহাকে কতদূর দূর জ্ঞান করিও ।” কমলার প্রকৃত—তাঁহার অতি সাধের সৌন্দর্য্য-প্রতিমার রূপ দেখিয়া পাষণ্ড গিরিরাজের উদ্দেশ্য হৃদয়ের তরঙ্গরাশি তরল-ধারায় বেগে প্রধাবিত হইল । তাঁহার সেই মেঘবিগলিত অশ্রুধারা—পীযুষ-পূরিত নীরধারা—জাহ্নবী-যমুনাক্রমে আকুল লহরী তুলিয়া বহিতেছে ।

আমাদের বাঙ্গলাদেশের সহিত এইরূপ একটা প্রবাদ জড়িত আছে । কর্মসাব হাতে-গড়া না হইলে এমন সৌন্দর্য্যময়ী—এমন চলচল, চলচল রূপময়ী—প্রাণময়ী,—শান্তিময়ী ধরনী আর কে গড়িবে ? এ বুঝি এক বিরাট স্বপ্নরাজ্য, এত সৌন্দর্য্য বুঝি কল্পনারও অতীত । বিদেশের ছেলে যাহার কথা শুনিয়া উৎসুক-গুনে মাতাকে জিজ্ঞাসা করে,—“মা । সে দেশ কোথায় where rivers

wander over sands of gold.—তরঙ্গিনী ব'য়ে যায় ধুয়ে সোণার বালি,—সে দেশ কোথায় মা ?”—সে দেশ আমাদেরই জন্মভূমি। এমন কল্পনাময় রাজ্য বুঝি আর নাই।

বাজপার উত্তরে 'অম্বরচূষিত-ভাল হিমাচল' তুষার-ধবল শিরে অরুণ-কিরণ-হিরণ-কিরটি পরিধান করিয়া, সর্বদে সৌন্দর্যের এক বিরাট হাট লইয়া দণ্ডায়মান। সে হাট সৌন্দর্যের সমষ্টি-ক্ষেত্র,—সে হাটে সবই গিলে।—সে হাট নিখরিসীর বরবার-তরতর-রব-মুখরিত, পিক-শ্রামা-কণ্ঠ-সুর-ঝঙ্কত, চামেলী-চম্পক-কুন্দ-কুসুম-সৌরভ-আকুলিত। সে বিরাট উদার হাট প্রকৃতির মাজান হাট, বিশ্বমেলার এক অব্যক্ত কল্পনাময় রাজ্য।—সে কঠোর-কোমল, বিকট-সুন্দর রাজ্যে ভের নাই। “বিশাল ক্ষুদ্রকে আশ্রয় দিয়াছে, আলিঙ্গন করিয়াছে, মাথায় তুলিয়াছে। কত শত বিশাল শাল্মলী-তরুর পাদদেশে সহস্র আয়তচক্ষু মেলিয়া ধুস্তুরা চাহিয়া আছে; আর বহু বেগনোনিয়া রাশি রাশি লাল ফুল বিছাইয়া, শাল্মলীর ঝাঞ্চে চড়িয়া, মাথায় ছাতি ধরিয়া আছে। উৎকটে-কোমলে, বিশালা-সুন্দর—কি অপূর্ণ মাথামাথি! সমুদ্র দেখিলে অনন্তের আভাস পাওয়া যায়; সুনীল আকাশেও অনন্ত,—অনন্ত কোমলতা; নক্ষত্র-পুঞ্জ-খচিত পরিষ্কার আকাশেও অনন্ত—অনন্ত সুন্দর;—মধ্যে মধ্যে বিদ্যদান-ক্ষুরিতা গভীর। মমীময়ী ত্রিষামার যোর বিকটশব্দে শব্দায়মান। নভস্থলীতেও অনন্ত; সে অনন্ত কে যেন আর এক রূপ বিরাটতর অনন্তে মাস্ত করিয়া রাখিয়াছে; হিমালয়প্রদেশের বনভূমি সেইরূপ—যেন মহান অনন্তদেবের বিরাট মায়াগয় খেলাঘর।” সে বিরাটতর অনন্তের মধ্যে গগনচূষী বিরাটতম হিমাচল—মহাযোগী হিমাচল—সৌদামিনী-জটাজাল বিস্তৃত করিয়া, ক্ষেত গেঘরাশির উত্তরায় উড়াইয়া গভীর-ধ্যানমগ্ন। বুঝি অনন্তকাণ্ডেও অনন্তের এই অনন্ত মধ্যা জাগ্রিবে না।

দক্ষিণে নীলসিন্ধুজল রাতুলচরণতল ধৌত করিয়া সগর্বে বুঝি অনন্তের পানে ছুটিয়াছে। বুঝি সাগর বঙ্গজননীর এমন সুন্দর মূর্তি ভুলিতে না পারিয়া মুহূর্হু বিরাট হৃদয়ের অনির্কটনীয় ভাবরাশি জননীর পাদদেশে উৎসর্গ করিতেছে। বুঝি জলধি অনন্ততরঙ্গশীর্ষে অনন্ত-ফেন-নৈবেদ্যরাশি বহন করিয়া জননীর মহাপূজার জন্ত নিয়ত নিরত রহিয়াছে। এত ভক্তির—এত প্রেমের আশীর্বাদ-স্বরূপ বুঝি অনন্ত সমুদ্র বাঙ্গলা-মায়ের 'তমালতালীবনরাজিনীনা' কোমলা বেসার মধুময়ী ছায়া বুকে বহন করিবার অধিকার পাইয়াছে। তাই বুঝি

আনন্দে আত্মহারা হইয়া সে ক্ষীণবক্ষে জননীর পাদমূলে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছে ।

বান্ধলা কমলার আশ্চর্য্য সৃষ্টি । বান্ধলার মাঠে মাঠে, বান্ধলার নির্জন প্রান্তরে, বান্ধলার 'সারাদিন পাখী-ডাকা, ছায়ায় ঢাকা পল্লীবাটে,' বান্ধলার 'শালতালতালসুধুল,' বিহঙ্গকণ্ঠাকুল, ঘন, বিজন, কাননে, 'ধীরগভীর-প্রবাহ-ধার নদনদী'র ঘুমপাড়ানিয়া গানে মুগ্ধরিত বান্ধলার শ্যামল কোমল দুর্লভময় উন্মুক্ত ক্ষেত্রে, বান্ধলার 'আত্মবনঘেরা সহস্রকুটীরে, দোহনমুখর গোষ্ঠে', বান্ধলার ছায়া-বটমূলে যে নিত্যকল্যাণময়ী, সৌন্দর্য্যপূর্ণা মাতৃমূর্তি সতত বিরাজমান,— তাহার উপমা বিশ্বে নাই । এ যে—'ত্রিভুবনে নিরুপমা ; কি দিব উপমা !'

বান্ধলায় যড়ঋতুর খেলা অনন্ত-সৌন্দর্য্যজড়িত । বান্ধলায় বসন্ত কি এক অনবদ্যময় মূর্তিতে আপনার সৌন্দর্য্য-ভরা হৃদয়ের একখানি স্বপ্নময় ছবি বিকাশ করে । সে যেন কোন্ অজানা রাজ্যের মধুর মুচ্ছনাময়ী গীতি,—সে যেন আশার উল্লাসময়ী বাণী,—সে যেন অব্যক্ত ভাষায় প্রেমরাজ্যের দ্বার-উদঘাটন । ধীরে ধীরে মধু আসিল ; সতী প্রকৃতি—জীর্ণ-পত্রসারা ক্ষীণা প্রকৃতি নবীন অতিথিকে সাদরে আবাহন করিয়া, আপনার দীন উপহার অতিথির চরণমূলে অর্পণ করিলেন । অতিথির আশীষে ক্রমে ক্রমে তাঁহার নীরস অঙ্গে কোমল কিশলয় রাজি মুগ্ধরিত হইয়া উঠিল । বৃক্ষে বৃক্ষে, লতায়, গুল্মে নবীন পেলবপল্লবরাশি ধরে ধরে সাজিয়া উঠিল । ক্রমে ক্রমে সেই লোহিত পল্লবরাশি শ্যামল সুন্দর ঘন পত্রাচ্ছাদন হইয়া উঠিল । শাখায় শাখায়, লতায় লতায় আর ফুল ধরে না । সারাদিন তরঙ্গময় পবনে স্নানিত ছায়া কত মনের কথা বলাবলি করিল । মুকুল-আকুল বকুলকুঞ্জভবনে সৌন্দর্য্য বিছাইয়া পড়িল । যখন তমালের কাল পাতাগুলি আরও কাল হইয়া উঠিল । যখন সে সৌন্দর্য্যরাশি শ্যামল নিম্নোজ্জ্বল পল্লবে আর ধরে না ;—পূর্ণঘোষনা সুন্দরীর লাবণ্যের মত হাসিয়া হাসিয়া, ভাসিয়া ভাসিয়া, ভাঙ্গিয়া গলিয়া, ঢলিয়া ঢলিয়া উছলিয়া পড়িতেছে, যখন তাহার কোলের কুসুমের সৌরভে আকাশ মাতিয়া উঠিতেছে,—তখন সেই কাল পাতার ঘন-অন্তরালে কাল কোকিল আপনার কাল শরীর লুকাইয়া, সাধা গলায় গাহিল—কুহ-কুহ-কুহ । আবার যখন শুভ্র-শরীরা নব-মল্লিকা উষার শিশিরে স্নাত হইয়া মলয় বাতাসে মুখখানি খুলি-খুলি খুলিতেছে না—মুখ ফুটি-ফুটি ফুটিতেছে না ;—যখন সেই অমল রূপরাশির লোভে মত্ত ভ্রমর ছুটাছুটি করিতেছে,—যখন লতা নুতন শাখায় নুতন দোলনা টাঙ্গাইয়া ছলিবার উপক্রম করিতেছে,—তখন তাহার সেই

দোলনির সহিত নিজের কাল অঙ্গ দোলাইয়া গন্ধরাজ-বেল-মল্লিকা-শিরীষ-মাল-
তীর মুখে মুখে পিক গাহিল—কুহ-কুহ-কুহ! সে স্বরে, সে গীতের উচ্চ মূর্ছনায়
আশাবধু সরস ত্যাগ করিয়া প্রতিধ্বনি তুলিয়া বলিল,—কুহ-কুহ-কুহ! সে কায়-
হীন ভাষা, কণ্ঠহীন স্বর ধীরে ধীরে হৃদয়ে গাঁথিয়া যায়। সে রহস্যময়ী লীলা
অপূর্ব ভঙ্গীতে ধরণীকে আগোদিত করিয়া তুলে।

বাঙ্গলায় বর্ষা ঝরিতে ঝরিতে, ভিজিতে ভিজিতে আসিয়া উপস্থিত। খাল
বিল, পঞ্চল, পুষ্করিণী, নদী, নালা সবই ভরিয়া উঠিল। নূতন জলে ভেকের মক-
মকি প্রতিধ্বনিকে ক্লান্ত করিয়া তুলিল। নূতন জলে-ভরা নদী ভরা-ঘোবনে
বিধবা গৈরিক বাস পরিহিতা রমণীর স্থায় চলিতে লাগিল। অত ভরা জলেও
যেন কি এক অভাবের ক্রন্দন বার বার রবে জগতকে জানাইয়া গেল। তরু,
লতা, পাতা সকলেই বর্ষাজলে ভিজিয়া মল্লুচিত হইয়া পড়িল। বাঙ্গলায় যেন
কি এক ভরা সৌন্দর্যের ভরা গান গীত হইল।

তাহার পর শরতে বিমল সুনীল আকাশে টাঁদিনী রাত্রিতে বিকীর্ণ শ্বেত
মেঘরাশির ক্ষুদ্ররাজ্যে অসংখ্য তারকালোকের মধ্যে রাকাশশী হাসিয়া উঠিল।
জ্যোৎস্নার উচ্ছ্বাসময়ী লীলা লতায় পাতায়, তরুশিরে, কুসুমকোলে, শ্যামল
কোমল দুর্বা ক্ষেত্রের উপর, নদীর জলে, শ্যামল সৈকতে হাসিয়া হাসিয়া, ফুটিয়া
ফুটিয়া হাসিয়া উঠিল। মাঠে মাঠে শ্যামলতা ফুটিল; উপরে নৈশ নীলিমার
নীচে অনন্ত শ্যামলতার উপর পূর্ণিমা রাকাপতির হস্তশ্রোত হিল্লোলিত হইয়া
উঠিল। সে হিল্লোল প্রকাশের, সে আবেগ প্রকাশের, ভাষা নাই;—তাহা
“অনির্বচনীয়—যেন আনন্দের অব্যক্ত আবেগ।” বর্ষার পর আর যেন নদী নীর-
ধার বহিতে পারে না। অমল শোভায় শ্যামল অঙ্গ ঝলসিয়া উঠিতেছে। আর
মাঠে মাঠে ধান ধরে না; কাননকুঞ্জে দোয়েলা-কোয়েলা কূজন করিয়া উঠি-
তেছে। শ্যামল অঙ্গ শিশির-নিষিক্ত হইয়া যেন আরও শ্যামল হইয়া উঠিয়াছে।
হরিতে নীল আকাশ আসিয়া মিলিয়াছে; সে মিলনে সৌন্দর্যের সৌন্দর্য বিক-
শিত হইয়া উঠিয়াছে।

তাহার পর সোণার হেমন্ত। মাঠে মাঠে সোণার ছড়াছড়ি—গড়গড়।
শ্যামল শরতের আশাময়ী বাণী হেমন্তে কর্ণময়ী, প্রত্যক্ষরূপিণী। শ্যামলা ধরণী
হিরণ্ময়ীতরঙ্গায়িত হইতে লাগিল। সূদূর বিস্তৃত মাঠখানির প্রান্তে আকাশ
আসিয়া মিলিয়াছে,—সোণার স্পর্শে সোণা হইয়া গিয়াছে। সোণার আকাশে
সোণার ক্ষেত্রে এক হইয়া গিয়াছে। ‘স্থলে জলে আর গগনে গগনে’ মধুর লগ্নে

বাঁশী বাজিয়া উঠিল। কৃষকের বুকভরা ধন—বর্ষার জলে-ভেজা-ধন গ্রীষ্মের প্রথররৌদ্রতাপে তাপিতের ধন—তাহার কত নব আশার সৃষ্টি করিল। প্রথম শিশির-সমীর তাহার ক্লান্ত, শ্রান্ত, অবসন্ন দেহ জুড়াইবার জন্য বুক বুক বহিয়া গেল। হাসিভরা মুখের সরল ছবি দিগ্দিগন্তে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তখন—

‘মাতার কণ্ঠে শেফালি মালা

গন্ধে ভরিছে অবনী ।

জলহারা মেঘ অঁচলে ধচিত,

শুভ্র যেন সে নবনী ।

পরেছে কিরীট কনক-কিরণে,

মধুর মহিমা হরিতে হিরণে,

কুসুম-ভূষণ জড়িত-চরণে

দাঁড়ায়েছে মোর জননী ।

আলোকে, শিশিরে, কুসুমে, ধাত্রে

হাসিছে নিখিল অবনী ।’

উষাকালে যখন দিগ্ধ অরুণ-চুম্বনচিহ্ন কপোলদেশে কুতূহলে মাখিয়া, লাজরক্তিম অঙ্গে ধীরে ধীরে গলিয়া যায়; যখন তুমার-আসার-কপোলে অরুণচুম্বনচিহ্ন ফুটে ফুটে ফুটে না,—যেন কোন্ অব্যক্ত স্বপ্নরাজ্যের স্নেহের সংবাদ বহিয়া ক্ষীণালোকে ভাসিতে থাকে, যখন উষার শিশির-শীকর-সিক্ত বায়ু চুপি চুপি আসিয়া চলিয়া যায়, যখন ঘুম-ঘোরা প্রকৃতির আদর-কলিকাগুলি স্বর্ণ-অঁখি মেলিয়া চাহিয়া উঠে, তখন—সেই ব্রাহ্মগৃহে—সৌন্দর্য্যের এক বিরাট উদার অভিনয় হইয়া যায়। সে অভিনয়ে সকলেই গোগ দিয়া এক মহান অভিনয়ের সৃষ্টি করে।

বাঙ্গলার এ সৌন্দর্য্যসেবার অধিকারী সকলেই। যে যেমনভাবে লইবে—সে তেমনি পাইবে। এ স্নেহলা, স্নেহলা, মলয়জ-শীতলা, কোমলা, বঙ্গজননীর কোলে সকল সন্তানেরই সমান অধিকার। নিত্যকল্যাণী বঙ্গজননী সারাবেলা সন্তানের জন্ত ব্যস্ত। প্রত্যয়ে পূজার ফুল ফুটাইতেছেন, মধ্যাহ্নে শীতল পল্লবাঞ্চল প্রসারিত করিয়া রৌদ্র নিবারণ করিতেছেন, নিশাগমে চারিদিক হইতে যত নদনদী একত্র করিয়া, ক্লান্ত গ্রামগুলি ঘেরিয়া ঘুম পাড়ানিয়া গান গাওয়াইতেছেন;—বিজলীমুখরিত দিগ্ধ যেন প্রতিধ্বনিতে ক্লান্ত হইয়া চলিয়া পড়িতেছে!—আর হেমন্ত-মধ্যাহ্নে গৃহকাষে বিরাম দিয়া হিলোলিত হৈমন্তিক

মঞ্জরীর মাঝে, 'কপোত কুজনাকুল নিস্তরু' গ্রহরে' সন্তানের জন্ম হাসিমুখে
জাগিয়া বসিয়া আছেন। স্নিগ্ধ আঁখিদয় বৈধাশাস্ত দৃষ্টিপাতে চতুর্দিকে ক্ষেম-পূর্ণ
আশীর্বাদ বিকীরণ করিতেছে। সেই মেহাগ্নুত আত্মবিস্মরণের মূর্তি,—
সেই মোন আশীর্বাদপূর্ণ মধুর মঙ্গল ছবি—সৌন্দর্যের অনন্ত নিগম সেই
মূর্তি দেখিয়া যদি প্রাণে ভক্তির উদয় হয়,—তবেই বলিতে পারিব—
“অগ্নি শম্পাশ্যামলা, কুম্ভধবলা, অম্মুমেথলা জননি। পল্লীশোভনা, মল্লীভরণা,
জননি। নিত্যনবীনা, চিত্তদ্রাবিণা, অজ্জবিলোললোচনী, জননি। আমি যেন জন্মে
জন্মে তোমার কোলে স্থান পাই; তোমার এ প্রাণভোলা, নিত্যসরসা মূর্তি
ছাড়িয়া আমি আর কোথাও থাকিতে পারিব না; তুমি আমার তোমার এ
মূর্তি—এ চন্দ্রকিরণোজ্জ্বল চরণ হইতে বঞ্চিত করিও না। নিত্যকুশলা, চিত্ত-
বহুলা, চিত্তবেদনহারিণী, জননি। সন্তান-সুখদায়িনী, জ্যোৎস্নামধুরহাসিনী,
জন্মচামরধারিণী, জননি। আমার তোমার কোল হইতে বিছাত করিও না।
আমি জানি না, মা। জপ,—তপ, ধ্যান, আরাধনা;—আমার কাছে তুমি ত
দেবতা নও। তুমি যে আমার মেহময়ী জননী। তোমার মেহ-বিগলিত অশ্রুধার
দেখিয়া আমি আর নয়ন ফিরাইতে পারি না; তোমার ছায়ার আসিয়া আর
ফিরিয়া যাইতে পারি না; তোমার পল্লীশোভা দেখিয়া মন স্থির রাখিতে পারি
না; তোমার ধান-ভরা মাঠে গিয়া আর ফিরিতে পারি না; তোমার অমলা,
অতুলা, সুজলা, সুফলা, সুস্বিতা, ভূগিতা মূর্তি আমি আর ভুলিতে পারি না।
তাই তুমি আজ জগৎপ্রাণদায়িনী, ধরণী ভরণী জননী। আমি হৃদয় খুলিয়া আজ
এক কাস্ত, অভিনব মূর্তি দেখিতেছি;—যেন বিশ্বদেব তোমার প্রতি অণুতে
মিশিয়া গিয়াছেন”—

“হে বিশ্বদেব। মোর কাছে তুমি

দেখা দিলে আজি কি বেণে।

দেখিছু তোমারে পূর্ব গগনে,

দেখিছু তোমারে স্বদেশে।

ললাট তোমার নীল নজতল,

বিমল আলোকে চির উজ্জল,

নীরব আশীষ-সম হিমাচল

তব বরা-ভয় কর;—

মাগর তোমার পরশি চরণ

পদধূলি তব করিছে হরণ;

আহুৰী তব হার-আভরণ

ছলিছে বক্ষ'পব ।

হৃদয় খুলিয়া চাহিছু বাহিরে,

হেরিছু আজিকে মিসেয়ে—

মিলে গেছ ওগো বিশ্বদেবতা,

মোব সনাতন স্বদেশে ।”

হিন্দুসমিতি,

চু'চড়া ।

}

শ্রীযোগেশ্বর চট্টোপাধ্যায় ।

রামায়ণী সভ্যতা ।

—ঃঃ—

রামায়ণী যুগের ভাষা ।

—০—

রামায়ণী যুগের পূর্বে আর্য্যসমাজে দেবভাষা ও মনুষ্যভাষা প্রচলিত ছিল । বেদগুণি ছকহ দেবভাষায় রচিত ছিল । এই দেবভাষাও চারি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল । বেদের টীকাকার সামনাচার্য্য দীর্ঘতমা ঋষির মন্ত্র * উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, তৎকালে চারি প্রকারের ভাষা ব্যবহৃত হইত । ইহার তিন প্রকার ভাষা সাধাবণের অবোধ্য দেব-ভাষা এবং চতুর্থ প্রচলিত মানুষ-ভাষা । সামনের এই মন্তব্যের উপর নির্ভর করিয়া যাজ্ঞিকেরা বলেন যে, ত্রিবিধ ছকহ ভাষায় বেদ রচিত হইয়াছিল, তাহার প্রথম মন্ত্রের ভাষা, দ্বিতীয় কল্পের ভাষা ও তৃতীয় ব্রাহ্মণের ভাষা । চতুর্থ ভাষা প্রচলিত লৌকিক ভাষা । নৈরুক্তেরা বলেন, ঋক্ যজু ও সামের ভাষা পৃথক্ পৃথক্ তিন প্রকার, চতুর্থ ভাষা লৌকিক ভাষা । নৈরুক্তেরা যাজ্ঞিক-প্রদর্শিত কল্প ও ব্রাহ্মণকে বেদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া বিচার করিয়াছেন ।

* চত্বারি বাক্ পবিত্রতা পদানি তানি বিদু ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ ।

নিরুক্ত-পরিশিষ্ট-ভাণ্ডে লিখিত হইয়াছে :—

ব্রাহ্মণা উভয়ীং বদন্তী যাচ দেবানাং যাচ মনুষ্যানাং । ১ ।৯

অর্থাৎ ব্রাহ্মণেরা দেবভাষা ও মনুষ্যভাষা উভয় ভাষাতেই কথোপকথন করিতেন ।

এই উক্তি বেদের ব্রাহ্মণভাগ রচিত হইবার সময়ে প্রযোজ্য । ব্রাহ্মণ বাগায়ণের পূর্বে রচিত হইয়াছিল । কেন না বাগায়ণে ব্রাহ্মণের উল্লেখ দৃষ্ট হয় ।।

বাগায়ণের সময় ছকহ দেবভাষার প্রচলন উঠিয়া গিয়া রামায়ণী বিশুদ্ধ ও সহজ সংস্কৃতের প্রচলন হয় এবং এই বিশুদ্ধ সরল ভাষায় বাগায়ণের শ্লোকবচনা হয় । এই সময় ব্রাহ্মণ ও উচ্চশ্রেণীর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিব্যক্তিরা বিশুদ্ধ সংস্কৃত ও নাগরিক এবং স্ত্রীলোকেরা মিশ্রভাষায় কথোপকথন করিতেন । আমরা বাগায়ণের আলোচনার দ্বারা এই বাক্যের সত্যতা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব ।

আবগ্যাকাণ্ডের ১১শ সর্গে ইন্ডল-বাতাপি উপাখ্যানে লিখিত হইয়াছে :—

ধাবয়ন্ ব্রাহ্মণং কপমিষলঃ সংস্কৃতং বদন্ ।

আমন্ত্রয়তি বিপ্রান্ স শ্রাদ্ধমুদ্दिशु निर्व্বणঃ ॥

ইন্ডল ব্রাহ্মণকপ ধাবণপূর্ব্বক সংস্কৃতে কথা বলিয়া শ্রাদ্ধের ছলনা করিয়া ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রিত করিত ।

তখন অনার্য্যদিগের মধ্যে পৈশাচী ভাষা ব্যবহৃত হইত । এই পৈশাচী ভাষা অনার্য্যভাষা নামে অভিহিত হইত ।* এই পৈশাচী বা অনার্য্যভাষার লক্ষণ

† আহোহবমেধ সজাতঃ কল্পমুজ্ঞেণ বাস্কণৈঃ ।

চতুষ্টোম স মহন্তস্য প্রথমং পদিকল্পিতম্ ॥ আদি । ১৪।৪০

* ডাক্তার মুইর তাঁহার Original Sanskrit Texts &c. নামক গ্রন্থে যে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে কোন্ কোন্ স্থান পিশাচ-দেশ-অন্তর্গত ছিল তাহা অবগত হওয়া যায় । শ্লোকাংশ এইরূপঃ—

পাণ্ড-কেকয়-বাল্মীক-মহা নেপাল-কণ্ডলা ।

হুধেশ-ভোটনাঙ্গার-হৈব-কনোজনা শুখা ॥

এতে পিশাচ দেশাঃ চতুর্দশ শুদ্-গুণৌ ভবেৎ ॥ Vol. II. p. 48

Dr. W. W. Hunter বলেন "Paishachi loosely applied to out-lying Non-Aryan dialects from Nepal to Cape Comorin—(*Indian Empire*, P. 337)

যে সকল স্থানে অনার্য্যবসতি ছিল এই উভয় উক্তি সাদাৰণতঃ ঐ সকল স্থানকেই বক্ষা করিতেছে ।

কি রামায়ণে তাহার আভাস পাওয়া যায় না । সে যাহাই হউক, অনার্য্যগণের এই পৈশাচী ভাষার ব্যবহার করিলে ইন্দ্র অনার্য্য প্রতিপন্ন হইবে এবং অনার্য্য ভাষানভিজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা তাহার কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিবে না, ইহা চিন্তা করিয়াই সে ব্রাহ্মণ সাজিয়া সংস্কৃত কথা বলিয়া ব্রাহ্মণদিগকে মোহিত ও স্বকার্য্য সাধিত করিত ।

অন্যত্র হনুমান্ অশোকবনে সীতাকে দর্শন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতেছেন “এখন কি ভাষায় সীতার সহিত আলাপ করিতে হইবে ।” তাঁহার চিন্তা হইল :—

যদি বাচং বদিস্যামি দ্বিজাতিরিব সংস্কৃতাম্ ।

রাবণং মনুমানা মাং সীতা ভীতা ভবিষ্যতি ॥ স্তন্দরা । ৩০।১৮

যদি ব্রাহ্মণের স্থায় সংস্কৃতে কথা বলি, তবে আমাকে নিশ্চয় মায়াক্রপী রাবণ বলিয়া সীতা ভীতা হইবেন । সুতরাং অনেক চিন্তার পর হনুমান্ স্থির করিলেন :—

বাচক্ষেপাদাবিস্যামি মানুষীমিহ সংস্কৃতাং ॥ স্তন্দরা । ৩০।১৭

মানুষী সংস্কৃতে সীতার সহিত কথোপকথন করিতে হইবে ।

উপরি উদ্ধৃত অংশ হইতে পূর্ব্বোদ্ধৃত নিরুক্ত-পরিশিষ্ট ভাষ্যের সমর্থন দ্বারা যে আমরা দেবভাষা ও মনুষ্য ভাষার উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি, তাহার অস্তিত্ব স্পষ্ট সপ্রমাণ হইতেছে । নিরুক্ত-পরিশিষ্ট ভাষ্যে যাহাকে দেবভাষা বলা হইয়াছে রামায়ণে তাহাকেই ব্রাহ্মণ কথিত সংস্কৃত ভাষা বলা হইয়াছে । নিরুক্তের মানুষ্যভাষা রামায়ণেও মানুষ্যভাষা নামেই পরিচিত রহিয়াছে দেখা যাইতেছে ।

এখন এই মানুষ্য ভাষা কি এবং তাহার প্রকৃতি কিরূপ ছিল, তাহার সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাউক ।

যাঁহারা হনুমানকে লাম্বুলধারী মর্কট বলিয়া কল্পনা করেন তাঁহারা বলিবেন, সীতা বানরের কথা বুঝিতে পারিবেন না বলিয়া হনুমান্ মানুষের ভাষায় কথা বলিতে সক্ষম করিয়াছিল । এইরূপ কল্পনা তাঁহাদের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক বলিয়া আমরা প্রথমেই নিরুক্ত পরিশিষ্ট ভাষ্যের মত উদ্ধৃত করিয়া দেবভাষার ও মনুষ্যভাষার প্রচলন দেখাইয়া আসিয়াছি ।

সাধারণের কথিত ভাষাই মানুষ্যভাষা । এই মানুষ্যভাষা ও প্রাকৃত ভাষা এক । অনেক প্রাকৃত ভাষাকে বৌদ্ধ পালি ভাষার সহিত অভিন্ন মনে করেন ।

কেহ বা মহারাষ্ট্রী, শূরসেনী প্রভৃতি ভাষাকেও প্রাকৃত বলেন। রামায়ণে মিশ্র-ভাষার উল্লেখ আছে। রামায়ণের টীকাকার রামানুজ সংস্কৃত ও প্রাকৃত মিশ্রিত ভাষাকেই সেই মিশ্রভাষা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জগৎ পণ্ডিত বেবার প্রাকৃত ভাষাকে বৈদিক ভাষার সমসাময়িক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।*

মহারাষ্ট্রী ও পালী প্রভৃতি ভাষা যে প্রাকৃত ভাষারই রূপান্তর তাহা বলাই বাহুল্য।

রামের বিজ্ঞাবত্তা সম্বন্ধে অযোধ্যাকাণ্ডের প্রথম সর্গে লিখিত হইয়াছে :—

“শ্রেষ্ঠং শাস্ত্রসমূহেষু প্রাপ্তো বামিশ্রকেযু চ।” ২৭

অর্থাৎ মিশ্রভাষায় রচিত শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রসমূহে তিনি পারদর্শী ছিলেন।

মিশ্র-ভাষায় নাটক বাতীত অত্ৰ কোন শাস্ত্র রচিত হইতে পারে না। কেন না, নাটকে যে প্রকৃতির লোক যে ভাষায় বাক্যালাপ করিয়া থাকে তাহাকে সেই ভাষাতেই কথা বলাইতে হইবে—“রাম প্রাকৃতাদি ভাষা সমন্বিত নাট্ট শাস্ত্রাদিতে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন + আমাদের বিশ্বাস এই মিশ্র ভাষাই আৰ্য্য ভারতে সাধারণ কথিত ভাষা বলিয়া পরিচিত ছিল এবং এই কথিত ভাষাকেই হনুমান্ মানুয়া বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। আৰ্য্যভাষা সম্বন্ধে রামায়ণে অত্ৰ কোনও উল্লেখ দেখা যায় না।

বানর, নাগ, পক্ষী, রাক্ষস প্রভৃতি অনার্য্যজাতি পৈশাচীভাষা ব্যবহার করিত। রাম এই পৈশাচীভাষাও যে শিক্ষা করিয়াছিলেন তাহাও উপর্যুক্ত শ্লোক হইতে অনুমান করা যাইতে পারে। নতুবা রামের পক্ষে বিরোধ ও শূর্ণনথার সহিত কণোপকথন সম্ভবপর হইত না।

রাবণ উত্তম সংস্কৃত ভাষায় বাক্যালাপ করিতেন। সীতাহরণের পূর্বভাগে তিনি বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সীতার সহিত বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।†

লঙ্কায় আৰ্য্য ভারতের মানুষী ভাষা অপ্ৰচলিত ছিল, তাই হনুমান্ সীতার সহিত মানুষী ভাষায় বাক্যালাপ করাই নিরাপদ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।

* ‘উপাসক সম্প্রদায়,’ দ্বিতীয় ভাগ পরিশিষ্ট।

† বামিশ্রকেযু—প্রাকৃতাদি ভাষা মিশ্রিত নাটকাদীষু।—রামানুজ।

বামিশ্রকেযু—অর্থে প্রাকৃতের সহিত তাদৃশবর্ধন সকল ভাষাই গননা করা যাইতে পারে।

৭ আৰ্য্য কাণ্ড ৪৬ সর্গ ১৩ শ্লোক।

নদীয়া জিলার সিদ্ধ যোগী ।

—:~:—

(বলরামচন্দ্র ।)

—:~:—

(২)

বর্ণজ্ঞানহীন, শিক্ষিত সমাজের সংস্পর্শবর্জিত বলরামচন্দ্রের হৃদয় অতি উচ্চ ছিল । এ সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনিতে পাওয়া যায় । ভগবানদত্ত কোন বিশেষ শক্তির অধিকারী না হইলে কেহ একটি ধর্মসম্প্রদায় সংস্থাপিত করিতে পারে না । মানুষের আত্মাভিমান, অহঙ্কার, ও ভেদবুদ্ধি এত প্রবল যে, পাঁচজন লোককেও একমতাবলম্বী করা অতি কঠিন ; অথচ বলরামের ন্যায় একজন সহায়সম্পদ-হীন নীচ জাতীয় অনিমিত্ত লোক সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে এক বিশ্বাস-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া যে ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করিলেন,—সেই সম্প্রদায়ভুক্ত সহস্র সহস্র ব্যক্তি লৌকিক মান সম্রম বিসর্জন দিয়া, জাতিভেদ অগ্রাহ্য করিয়া, মতভেদ বিস্মৃত হইয়া এখনও বৎসরান্তে তাঁহার আখড়ায় সমাগত হয়, পরিজ্ঞাতা বোধে তাঁহার অর্চনা করে, নীচ জাতীয় ব্যক্তিগণের সহিত একত্র বসিয়া অনাহার করে । ইহা সমগ্র শক্তি বা অল্প সাধনার ফল নহে ।

মেহেরপুরের মাঝো পাড়ার নদীতীরবর্ত্তী নির্জন ক্ষুদ্র কুটীরে বসিয়া বলরামচন্দ্র যে সময় পরমার্থচিন্তায় রত ছিলেন, সেই সময় মেহেরপুরের কোন জমীদারের অত্যন্ত প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল । শুনিতে পাওয়া যায়, সে সময় তাঁহার সদর দেউড়ীর সম্মুখস্থ রাজপথ দিয়া কোন ব্যক্তি অশ্বারোহণে বা পাল্কী চড়িয়া যাইতে সাহস করিত না । কথিত আছে, তিনি একে ব্রাহ্মণ তাহাতে জমীদার ; সুতরাং কেহ তাঁহার সম্মুখে পড়িলে, সে অবনত মস্তকে তাঁহাকে প্রণাম না করিয়া গন্তব্য স্থানে যাইত না । তিনি প্রত্যহ প্রভাতে ও অপরাহ্নে তাঁহার অট্টালিকা-দেউড়ীর বাহিরে কাষ্ঠাসনে বসিয়া বায়ুসেবন করেতে করিতে পারিষদবর্গের সহিত নানাবিধ গল্প করিতেন । এক দিন প্রভাতে তিনি পারিষদবৃন্দে পরিবৃত হইয়া মথাস্থানে বসিয়াছিলেন, সেই সময় বল্লাই নামক বলবাসের একজন শিষ্য আখড়া হইতে বাহির হইয়া দেউড়ীর সম্মুখ দিয়া কার্যোপলক্ষে বাজারে যাইতে ছিল । বল্লাই জমীদার মহাশয়কে প্রণাম না করায় তাঁহার একজন পারিষদ তাঁহাকে বলিয়া

“হুজুর, বলা হাড়ীর চেলাদের আশ্পর্ক বড় বাড়িয়া গিয়াছে। ঐ দেখুন, তা’র একটা চেলা, আপনার সম্মুখ দিয়া গেল, অথচ আপনাকে দেখিয়া মাথাটা পর্যন্ত নোয়াইল না; ঘোর কলি উপহিত।” জমীদার বাবুর আদেশে তাঁহার দুইজন বলবান পাইক বলাইকে ধরিল, এবং তাহার দুই কর্ণ ধরিয়া তাহাকে বাবুর নিকট উপস্থিত করিল। বলাই অত্যন্ত বলবান ছিল; কিন্তু সে বিন্দুমাত্র বলপ্রয়োগ করিল না। সে পূর্ববৎ উন্নত মস্তকে জমীদার বাবুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। সে কেন জমীদার বাবুকে প্রণাম করে নাই এই প্রশ্নের উত্তরে সে অত্যন্ত সংযত ভাবে বলিল “আপনি জমীদার, অত্রে আপনাকে প্রণাম করিতে পারে, কিন্তু আমি বলরামচন্দ্রের দাসানুদাস, তাঁহার পায়ে আমি মাথা বাথিয়াছি, তাঁহাকে ভিন্ন আব কাহাকেও আমি প্রণাম করি না, আর কাহারও চরণে এ মাথা নোয়াইব না।” বলরামের অনুচরের এই কথা শুনিয়া জমীদারবাবু ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইলেন, তাঁহার ইচ্ছিতে ভৃত্যগণ বলাইকে ধরাশায়ী করিয়া বংশবধ দ্বারা তাহাকে এমন প্রহার করিল যে, তাহার সর্কাজ ফুলিয়া উঠিল। তথাপি সে জমীদারবাবুকে প্রণাম করিল না। অনেক ক্ষণ পরে কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া বলাই অতি কষ্টে বলরামের আশ্রয় ফিবিয়া গেল।

বলরামচন্দ্র তাঁহার প্রিয় শিষ্যের ছুরবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন; ব্যথিত হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বলাই তোর কি হইয়াছে? সর্কাজে ধুলা, শরীর ফুলিয়া উঠিয়াছে, তুই চলিতে পারিতেছিস না, এমন অবস্থা তোর কে করিল?”

বলাই বলরামের পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল; কাঁদিয়া সকল কথা বলিল। বলরামের বিষয় সমধিক বর্ধিত হইল; তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুই কি করিয়াছিস, যে তাহাৰা তোর প্রতি এমন অত্যাচার করিল?”

বলাই বলিল, “অন্যায় কিছু করি নাই, আমাকে সম্মুখ দিয়া যাইতে দেখিয়া আমাকে প্রণাম করিতে বলিয়াছিল, আমি প্রণাম করি নাই। আমি ইচ্ছা করিলে তাহার মুণ্ড ছিঁড়িয়া আনিতে পারিতাম, কিন্তু আপনার আদেশ ভিন্ন আমি কিছুই করিতে পারি না। এখনও আপনার আদেশ পাইলে দলবল লইয়া তাহার বাড়ী লুট করিতে পারি। আপনার কি আদেশ বলুন; আপনি প্রভু, আপনাকে ইহার বিচার করিতে হইবে।”

বলরামচন্দ্র বলাইকে শান্ত করিবার জন্য মধুর বাক্যে বলিলেন, “বলাই, তুমি আজ বড় যাতনা পাইয়াছ, তাই তোমার মনে কষ্ট হইয়াছে। জমীদার বড়ই

কুকর্ম করিয়াছে । তুমি আমার কাছে এই অন্ত্যায়ের বিচার প্রার্থনা করিতেছ ; কিন্তু আমি কি বিচার করিব ? মানুষ কি মানুষকে এমন করিয়া মারিতে পারে ? এমন অত্যাচার কি মানুষের কাষ ? আমি ত তোমাদের অনেকবার বগিয়াছি, মানুষ মানুষকে ভালবাসে, অস্ত্রের ছুংখ কষ্ট দূব করে, মদ্যবহাবে অস্ত্রের হৃদয় জয় করে । অস্ত্রের ছুংখমোচন, অস্ত্রের উপকারসাধন মানুষের ধর্ম ; মানুষের দেহ লইয়া যে সেই ধর্ম পালন না করে, সে মানুষ নহে । তাহার বিচার কি করিব ? আজ যদি তুমি কোন বনে গিয়া বাঘের হাতে পড়িতে, সেই বাঘ যদি তোমাকে কামড়াইয়া আঁচড়াইয়া তোমার সর্কাদে ক্ষতবিক্ষত করিত, তাহা হইলে কি তুমি, আমার কাছে সেই বাঘের নামে নালিশ করিতে আসিতে ? তুমিও মনে কর, তোমাকে বাঘে ধরিয়াছিল । তুমিও সকল ক্ষোভ ত্যাগ কর, কখনও তাহার কোন ক্ষতি করিবার চেষ্টা করিও না । অস্ত্রের ক্ষতি করা মানুষের ধর্ম নহে । আমি তাহাকে ক্ষমা করিলাম, তুমিও তাহাকে ক্ষমা কর ।”

বলরামচন্দ্র সম্মুখে বলাইকে আলিঙ্গন করিলেন, এবং তাহার সর্কাদে হাত বুলাইয়া দিলেন ; বলাই মনঃক্ষোভ ত্যাগ করিল ।

এই একটিমাত্র ঘটনায় বলরামচন্দ্রের হৃদয়ের মহত্ত্ব উপলব্ধ হয় ; দুর্বলের ক্ষমাশীলতার কোন মূল্য নাই, এ কথা আমরা স্বীকার করি, কিন্তু সহস্র সহস্র নির্য্যাতন গুক্তিদাতা বলরামচন্দ্র দুর্বল ছিলেন না, তাঁহার মাগো, টাঙাল, হাড়ী, বাগ্‌দী প্রভৃতি নির্য্যাতন তাঁহার উপদেশে ও চরিত্রগুণে মেঘবৎ শাস্তভাবে কাগ-
গাপন করিলেও বলরামচন্দ্র যদি তাহাদিগকে একটু ইঙ্গিত করিতেন, তাহা হইলে তাহারা জমীদারবাবুকে বিপর্য্য করিতে পারিত, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই । বলরাম-
চন্দ্রের হৃদয় এই প্রকার বিনয়ে ও ক্ষমাশীলতায় পূর্ণ হইলেও তাঁহার সঙ্গলের দৃঢ়তার ও তেজস্বিতার পরিচয় পাইলে বিস্মিত হইতে হয় । মেহেরপুরের মাগোপাড়া বলরাম আশ্রম নির্মাণপূর্বক বাস করিতে আরম্ভ করিলে, মেহেরপুর মিউনিসিপালিটির ক্ষুধাতুর দৃষ্টি তাঁহার আশ্রয়ের উপর নিপতিত হইয়াছিল । মিউনিসিপালিটির কর্তৃপক্ষ আদেশ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে ট্যাক্স দিতে হইবে । বলরাম বলেন, তাঁহার আখড়া দেবতার স্থান, তিনি ট্যাক্স দিবেন না ।—অনেকে তাঁহাকে বুঝাইয়া বগিল, মিউনিসিপালিটির আইন বড় কড়া ; ট্যাক্স না দিলে, মিউনিসিপালিটির পেয়াদা তাঁহার ঘাটী, বাটী, লেপ, কাঁথা কাড়িয়া লইয়া যাইবে, তাহা বিক্রয় করিয়া ট্যাক্স আদায় করিবে । বলরামচন্দ্র বলিলেন, “তাঁহারা যাহা করিতে পারে করুক ।”

যথাসময়ে কর অনাদায় হেতু মিউনিসিপালিটি বলরামের আখড়ায় জিনিস পত্র—ঘটী, বাটী প্রভৃতি তৈজসপত্র এমন কি বলরামের খাটখানি পর্য্যন্ত ক্রোক করিয়া লইয়া গেল কিন্তু বলরামের একজন ধনাঢ্য শিষ্য তাহা নীলামে ক্রয় করিয়া পুনর্বার আখড়ায় পাঠাইয়া দিলেন। এইপ্রকার ঘটনা দুই তিনবার ঘটে। অবশেষে মিঃ উইলিয়মস্ নামক মেহেরপুরের একজন সিভিলিয়ান অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিউনিপালিটির চেয়াবম্যান হইলেন, তিনি আনুপূর্ব্বিক সকল ঘটনা শুনিয়া বলরামের আখড়াটিকে করের দায় হইতে মুক্তিদান করেন। মিঃ উইলিয়মস্ একাধিকবার বলরামের আখড়ায় পদার্পণ করিয়াছিলেন; তিনি বলরামকে অসাধারণ মনুষ্য বলিয়াই মনে করিতেন।

মেহেরপুর অঞ্চলে বলরাম সম্বন্ধে নানাপ্রকার অলৌকিক কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়; সেই সকল কথা সত্য কি না তাহার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ বর্ত্তমান নাই।

বাঙ্গলা ১২৫৭ সালের ৩০শে অগ্রহায়ণ বলরামচন্দ্র বহুসংখ্যক শিষ্যসেবক রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন। বলরামের শিষ্যেরা তাঁহার মৃতদেহের সংকার না করিয়া আখড়ার প্রায় এক মাইল দক্ষিণে ভৈরব নদীর তীরে বংশ-মঞ্চের উপর শয্যা-রচনা করিয়া সেই শয্যায় রাখিয়া আইসে। কথিত আছে, তাঁহার মৃত দেহ তিন দিন পর্য্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় ছিল, তাহার পর তাঁহার শব কেহ দেখিতে পায় নাই। বলরামের মৃত্যুকালে তাঁহার ক্ষুদ্র আশ্রমটি নানা জাতীয় বৃক্ষপরিবেষ্টিত কয়েকখানি পর্ণ কুটারের সমষ্টিমাত্র ছিল, অল্পদিন পূর্বে বলরামের শিষ্যমণ্ডলী সেই স্থানে একটি অট্টালিকা ও একটি মন্দির নির্মাণ করাইয়াছে; এই অট্টালিকায় এখনও বলরামের শয্যা, কাষ্ঠ পাছকা ও স্তব্ধ বংশদণ্ড সংরক্ষিত আছে; কিন্তু খট্টাঙ্গ-সংস্থাপিত স্মৃতিকণ শুভ্র মশারিবেষ্টিত ছন্ধফেন-নিভ স্নেকোমল শয্যাটি দেখিলে তাহা সন্ন্যাসীর শয্যা বলিয়া কখনই মনে হয় না। বলরামের ভক্তবৃন্দ দেশ বিদেশ হইতে এই আখড়ায় সমাগত হইয়া সেই অট্টালিকার দ্বারে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে, ও বলরামের উদ্দেশে ভোগ প্রদান করিয়া থাকে। বঙ্গের অনেক জিলায় বলরামের নানা জাতীয় শিষ্য আছে; তাহারা স্ব স্ব সমাজভুক্ত থাকিলেও উৎসব উপলক্ষে বলরামের আশ্রমে আসিয়া স্থান-মাহাত্ম্যে জাতিভেদ ভুলিয়া যায়; এবং শ্রীক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া আব্রাহ্মণ-চণ্ডাল আহাাঁরাদি সম্বন্ধে ষেরূপ আচরণ করে, তাহারাও সেইরূপ করিয়া থাকে। বৎসরান্তে বারুণীর যোগের সময় বলরামের আখড়ায় যে মহোৎসব হয়, সেই

মহোৎসব উপলক্ষে ভক্তবৃন্দ কয়েকদিন ধরিয়া মৃদঙ্গাদিযন্ত্রসহযোগে মহোৎসাহে বলরামের নাম সংকীর্তন করিয়া থাকে । এই উপলক্ষে আথড়ায় তিনদিন “মচ্ছব” হইয়া থাকে, প্রথম দিন অন্ন মচ্ছব, দ্বিতীয়দিন চিড়ে মচ্ছব, শেষদিন বুছি মচ্ছবে মধুরেন সমাপয়েৎ হয় । এই আথড়ায় বহুকালের পুরাতন আমানি সঞ্চিত আছে, এই আমানি বলরামের প্রসাদ বলিয়া খ্যাত ; নিম্ন শ্রেণীর অনেক লোক, দুশ্চিকিৎস্য রোগে আক্রান্ত হইয়া এই আমানি পানে নিরাময় হইয়াছে, এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায় ।

বাঙ্গলা ভাষায় প্রবচন আছে, “গেঁয়ে জুগী ভিক্ পায় না ।”—স্থানীয় ভদ্রলোকের মধ্যে বলরামের প্রতিপত্তি নাই ; তথাপি ভদ্রমহিলাসমাজ বলরামচন্দ্রকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করেন ; মৃতবৎসা প্রস্থতিগণ বলরামেব “মানত” করিয়া থাকেন । অনেকেই বলরামের নামানুসারে স্ব স্ব পুত্রের নামকরণ করিয়া থাকেন । বলরামের মানত কবিয়া যাঁহারা সন্তান লাভ করেন, সন্তানের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে তাঁহারা পাঁচ সিকা বলরামের ভোগের জন্য আথড়ায় পাঠাইয়া দেন, অন্নপ্রাশনের সময় আথড়ার মৃত্তিকা শিশুর মুখে দেওয়া হয় ।

বলরামের শিষ্যগণ দরবেশ নামে খ্যাত, এই সকল শিষ্যের মধ্যে উদাসীন ও গৃহী এই উভয় শ্রেণীর লোকই বর্ত্তমান, আশ্রমে হীন জাতীয়া অনেক বর্ষায়সী স্ত্রীলোকও দেখা যায় ; ভিক্ষাই তাহাদের উপজীবিকা, এই সম্প্রদায়ে পরিচ্ছদগত কোন বিশেষত্ব নাই, তবে বলরামি দরবেশগণ মস্তকে দীর্ঘকেশ ও দাড়ী গোঁপ রাখে, ভিক্ষা করে ; এবং গৃহস্থের দ্বারে উপস্থিত হইয়া “জয় বলরামচন্দ্র” বলিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিয়া থাকে ।

বলরাম চিরকুমার ছিলেন, কিন্তু তাঁহার একটি সেবাদাসী ছিল । এই সেবাদাসীর নাম ব্রহ্ম মালোনী । বলরামের মৃত্যুর পর সে আশ্রমের কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করিয়াছিল । নীচ জাতীয়া স্ত্রীলোক হইলেও, তাহার মুখে অনেক জ্ঞানগর্ভ কথা শুনিতে পাওয়া যাইত ; বোধ হয়, দীর্ঘকাল বলরামের সহবাসে তাহার প্রজ্ঞা-নেত্র প্রস্ফুটিত হইয়াছিল । অনেকদিন পূর্বে ব্রহ্ম মালোনীর মৃত্যু হইয়াছে ; এখন জীবন দরবেশ নামক এক ব্যক্তি বলরামের আশ্রমের পরিচালক । কিন্তু এখন এই সম্প্রদায়ের প্রকৃত পরিচালক কেহ আছে বলিয়া বোধ হয় না । বলরামি সম্প্রদায়ের মধ্যেও মতভেদ প্রবেশ করিয়াছে ; কতকগুলি ভক্ত আথড়ার সংস্রব ত্যাগ করিয়া আথড়ায় প্রায় এক মাইল দক্ষিণে নদীর পশ্চিম পারে কুটার নির্মাণ করিয়া বাস করিতেছে । এই নূতন আশ্রমটি বলরামের সমাধি-

ক্ষেত্রের অদূরে সংস্থাপিত। তাহাদের মতভেদের কারণ তেমন গুরুতর নহে, বলরামের কুটীর ভাঙ্গিয়া তথায় অট্টালিকা নিৰ্ম্মাণ করাই তাহাদের মতভেদের প্রধান কারণ। যে কুটীরে বলরাম শেষ জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তাহা ভগ্ন করা তাহাদের মতে গুরুতর অপরাধ।

বলরামি সম্প্রদায়ের কোন ধৰ্ম্মগ্রন্থ নাই বটে, কিন্তু তাহাদের অনেক সঙ্গীত আছে, এই সকল সঙ্গীত প্রধানতঃ বলরামচন্দ্রের মহিমা বিয়মক, অবশিষ্টগুলি দেহতত্ত্ব সম্বন্ধীয়। আমরা এই স্থানে এই সম্প্রদায়ের একটি মাত্র সঙ্গীত উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম,—

“যেয়েও আছে, থেকেও নাই,
তেমনি তুমি আগ আগি রে ভাই।
আমরা মরে বাঁচি, বেঁচে মরি,
বলাইয়ের একি বিষয় চাতুরী।
এমন চাতুরীকে বলিহাবি।

শ্রীদীনেশকুমার রায়।

—:~:—

নিরবচ্ছিন্নতা।

কৰ্ম্মহীন দিবানিশি করিলে যাপন,
অবসাদে সব অঙ্গ পড়ে আলসিয়া।
রাত্রি দিন জলে যদি আকাশে তপন
আলোকে নয়নযুগ যায় বলসিয়া।
মধুপান করি শুধু, মধু-সরোবরে,
সন্তরণ নিরন্তর সে বড় যাতনা।
অধিমিশ্র-ভোগ-সুখ-প্রবাহ-প্রহারে
ক্লান্তিতে ইন্দ্রিয়কুল হাবায় চেতনা।

শ্রীকালিদাস রায়।

পাষাণের কথা ।

(৪)

উৎসবের পূর্বদিন হইতে নবনির্মিত স্তূপ পত্রপুষ্পে সজ্জিত হইতে লাগিল । তোরণ, স্তম্ভ, আলম্বন হরিদ্বর্ণ পত্রে ও নানা বর্ণের পুষ্পে মণ্ডিত হইয়া গেল । তৎপূর্বে সে ভাবে আমাদিগকে কেহ সজ্জিত কবে নাই । পবে সন্ধ্যের প্রভাববুদ্ধি হইয়া যখন স্তূপের বশ বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল তখনও এবম্বিধ উৎসব আমি কখনও দেখি নাই ; সন্ধ্যানুবাগী শক রাজগণের আগমনে হেমরজতখচিত আবরণে স্তূপের চতুর্দিকস্থ বিশাল প্রান্তর পর্য্যন্ত আবৃত হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু গ্রামের পল্লব ও শ্বেতপুষ্পমণ্ডিত হইয়া স্তূপের যে শোভা হইয়াছিল তাহা আব কখনই দেখি নাই । স্তূপের পূর্ব তোবণ নগবাভিমুখে স্থাপিত হইয়াছিল । ইহার আবরণে চাবিটি স্তম্ভ ছিল, প্রথম স্তম্ভে তিনটি দেব-মূর্তি ক্ষোদিত হইয়াছিল । প্রথম স্তম্ভের উত্তরদিকে নাগরাজ চক্রবাকের মূর্তি । নাগরাজ পর্বতশিখরে দণ্ডায়মান, তাঁহার পদতলে কন্দরে কন্দরে সিংহ, বৃক প্রভৃতি স্বাপদগণ লক্ষিত হইতেছে । নাগরাজের মস্তকে পঞ্চশীর্ষ সর্প তাঁহার নাগদ্ব জ্ঞাপন করিতেছে । কেয়ুর, বদায়, হাব প্রভৃতি রত্নালঙ্কারে শোভিত হইয়া নাগরাজ পূর্বদ্বার বক্ষা করিতেছেন । নাগরাজের উপরে এবং স্তম্ভের শীর্ষদেশে যে অর্ধবৃত্তের চিহ্ন অদ্যাপি বর্তমান আছে, তাহা নানাবিধ পত্রের চিত্রে পূর্ণ ছিল । ধর্ম্মরক্ষিত নামক জনৈক প্রকৃত বিশ্বাসী এই স্তম্ভের বায়তীর বহন করিয়াছিলেন । প্রথম স্তম্ভের অপর দুই পার্শ্বে গঞ্জিত ও হয়গ্রীব নামক যক্ষদ্বয়ের মূর্তি অঙ্কিত হইয়াছিল, কেবল চতুর্থ পার্শ্বে স্থচীত্রয়ের ভেদেব জন্ত কোন চিত্র অঙ্কিত হয় নাই । গঞ্জিত কবিপৃষ্ঠে ও অজকালক শিলাসঞ্চয়ের উপরে কুতাজ্জলিপূটে দণ্ডায়মান । গঞ্জিতের মস্তকের উপরে অর্ধবৃত্তে পতাকাশোভিত একটি স্তূপ ও অজকালকের মস্তকের উপরে অর্ধবৃত্তে পত্র অঙ্কিত হইয়াছিল । উৎসবের পূর্বে সজ্জার দিন আলম্বন হইতে যক্ষত্রয়ের শীর্ষদেশ পর্য্যন্ত শ্বেত পুষ্পমালায় জড়িত হইয়াছিল, কেবল অর্ধবৃত্তগুলি দৃশ্যমান ছিল । প্রত্যেক যক্ষের মস্তক ও বক্ষ বিবিধবর্ণের পুষ্পমালায় সজ্জিত হইয়াছিল, নবজাত পল্লবে মূর্তি-ত্রয়ের বাহুমূল হইতে পাদদেশ পর্য্যন্ত আচ্ছাদিত হইয়াছিল । এইরূপে আবরণ ও বেষ্টিনের প্রত্যেক স্তম্ভ অঙ্কিত স্থান ব্যতীত পত্রপুষ্পে মণ্ডিত হইয়া গিয়াছিল,

আলম্বনের শীর্ষদেশ আত্রপল্লবে ও পার্শ্বদেশ রক্তবর্ণ পুষ্পে আচ্ছাদিত হইয়াছিল। আলম্বন হইতে প্রথম সূচী পর্য্যন্ত ফলের স্তবক লম্বিত হইয়াছিল। তোরণস্তম্ভদ্বয়ের আকার পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছিল, পাদদেশ হইতে প্রথম তোরণ পর্য্যন্ত স্তম্ভদ্বয় শ্বেত, রক্ত, নীল ও হরিত্রাত পুষ্পের মালায় জড়িত হইয়া গোলাকার ধারণ করিয়াছিল। স্তম্ভশীর্ষের শীর্ষচতুষ্টয় নাগকেশর পুষ্পে ও ভোবণত্রয় নানাবিধ চম্পকমালায় ভূষিত হইয়াছিল। সর্ব নিম্নের তোরণ হইতে বহু আয়াসলক সহস্রদল শ্বেত পদ্মশ্রেণী লম্বিত হইয়াছিল। সর্বোপরি ছত্রবাহী অম্বদ্বয় ও ধর্ম-চক্র ত্রিরত্নের মধ্যাদা জ্ঞাপনার্থ তিনবর্ণের পুষ্পে মণ্ডিত হইয়াছিল।

ভোগরা স্তম্ভগাত্রে ঘেরূপ স্তূপের চিত্র দেখিয়া থাক, নবনির্মিত স্তূপও আকারে তদনুরূপ ছিল। অর্দ্ধগোলকাকার স্তূপশীর্ষে একটি চতুষ্কোণ স্তম্ভ স্থাপিত ছিল। স্তম্ভের উপরিভাগে মধ্যদেশে আদ্যশোভিত ছত্র ও চারিকোণে পতাকাবাহী দণ্ডচতুষ্টয় স্থাপিত হইয়াছিল। উৎসবসজ্জার দিনে পতাকাব দণ্ড হইতে তোরণশীর্ষ পর্য্যন্ত ও চতুষ্কোণ স্তম্ভ হইতে বৃত্তাকার আলম্বনশ্রেণী পর্য্যন্ত স্রবুহং মালা লম্বিত হইয়াছিল। স্তূপের উর্দ্ধদেশ মালায় আবৃত হওয়ায় বোধ হইতেছিল যেন, শ্বেতচন্দ্রাতপের পরিবর্তে শ্বেতবর্ণ পুষ্পের আতপত্র আনিয়া স্তূপশীর্ষে স্থাপন করা হইয়াছে। পত্রপুষ্পমাণ্ডলের উপরে উপাসক উপাসিকা ও দর্শকগণ আসিয়া যাহা দেখিল তাহা বলিতেছি। কোন স্থানে পুষ্পমালাব মধ্য হইতে বৃত্তমধ্যে অঙ্কিত চিত্র যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে। বৃত্তের মধ্যভাগে উচ্চ আসনের উপরে সপুষ্প পাটলী বৃক্ষ, শাখায় ও কাণ্ডে স্তবকে স্তবকে পাটলীপুষ্প প্রাশুটিত হইয়া রহিয়াছে। চারিপার্শ্বে নতজানু হইয়া বা দণ্ডায়মান থাকিয়া উপাসক ও উপাসিকাগণ পুষ্প ও মালাদ্বারা বৃক্ষের অর্চনা করিতেছে, কারণ ইহা বুদ্ধ ও বিপশ্বীর বোধিজ্ঞম। অন্য স্থানে অজশোভিত চতুষ্কোণ উচ্চাসনের উপরে দীর্ঘাকার শালবৃক্ষ, পার্শ্বে উপাসক ও উপাসিকাগণ অর্চনায় ব্যাপ্ত, কাবণ ইহা বুদ্ধ বিশ্বভূর বোধিজ্ঞম। অপর স্থানে স্তম্ভ চতুষ্টয়ের উপরে স্থাপিত চতুষ্কোণ আসনে সফল উদ্ভূত বৃক্ষ, ইহার শাখাসমূহ হইতে মালাসমূহ লম্বমান; উভয় পার্শ্বে উপাসক ও উপাসিকাগণ, কারণ ইহা বুদ্ধ কনকমুনির বোধিজ্ঞম। ভোগরা যে স্তম্ভটিকে অসম্পূর্ণ বলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়াছে, তাহার মধ্যভাগে বৃত্তের মধ্যে গোলাকার আসনে স্থাপিত শিরীষবৃক্ষ আছে, উৎসবের দিন উহা অপরাজিতার মালায় বেষ্টিত ছিল। ইহার উভয় পার্শ্বে উপাসক ও উপাসিকাগণ বিচক্ষমান, কারণ ইহা বুদ্ধ ক্রকুচ্ছন্দের বোধিজ্ঞম। অপর স্থানে দ্বাদশ স্তম্ভের উপর স্থাপিত

চতুর্কোণ আসনে অশ্বখবৃক্ষ ; ইহার চতুর্পার্শ্বে স্তম্ভশ্রেণী বিস্তৃত । বৃক্ষকাণ্ডের উভয় পার্শ্বে স্তম্ভশীর্ষে ধর্মচক্র ও তদুপরি ত্রিরঙ্গ । বৃক্ষের শাখায় শাখায় অসংখ্য মালায় লব্ধিত । আকাণে গম্বীরগণ বংশীনিবাদ করিতেছে ও সুপর্ণাগণ ইতস্ততঃ পুষ্পবৃষ্টি করিতেছে । বৃক্ষকাণ্ডের চারিপার্শ্বে উপাসক ও উপাসিকাগণ ও মজ্জারামের গবাক্ষে অসংখ্য দর্শক চিত্রিত রহিয়াছে । স্তম্ভ-বেষ্টনের বহির্দেশে একটি বৃহদাকার স্তম্ভ ও তদ্বীর্ষে শুভে মালায় লইয়া দণ্ডায়মান একটি হস্তীর মূর্তি । ইহাই ভগবান শাক্য-মুনির বোধিজ্ঞান । স্তম্ভ-বেষ্টন ও বহির্দেশস্থ স্তম্ভ মহারাজ ধর্ম্মাশোক-বিনির্ম্মিত । অপর স্থানে স্তম্ভশ্রেণীর উপর বিস্তৃত দ্বিতলগৃহ । স্তম্ভশ্রেণী-বিভাগেব মধ্যে বেদী, উহার উপরিভাগে পুষ্পাদি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে ও একপার্শ্বে ঘোড়শিপি মানবহস্তাক্ষ । মহাবোধি জ্ঞানের পার্শ্বে ভগবান শাক্যমুনি সন্মোখিতাবস্থায় পর যে স্থানে সপ্তদিবসকাল মনুষ্যের হিতচিন্তায় মগ্ন হইয়া পরিক্রমণ করিয়াছিলেন, পবে ধর্ম্মাশোক সেই স্থানে এই বিহার নির্মাণ করিয়া-ছিলেন, ইহাই ভগবানের সংক্রমণের স্থান । একটি সূচীগাত্রে এই চিত্রটি অঙ্কিত আছে । অপরস্থানে চারিটি স্তম্ভশীর্ষে সংলগ্ন বিহারের মধ্যে, বহুখচিত আসনে ভগবানের ধর্ম্মচক্র, চক্রের উপরে ছত্র ও মালা, পার্শ্বে উপাসক ও উপাসিকাগণ । বিহারের দক্ষিণ পার্শ্বে বিশাল তোবণদ্বার, ইহা এত উচ্চ যে হস্তিপক আরোহী লইয়া ইহার অভ্যন্তরে আবোহীকে প্রবেশ করাইতেছে । তোরণের পশ্চাতে দ্বিতীয় হস্তিপক হস্তীস্ব আহারের জন্য একটি বৃক্ষকে পদ্যবশূষ্ঠ করিতেছে ; বাম-পার্শ্বে অশ্বচতুষ্টয়-বাহিত রথ দুইটি আরোহী লইয়া দ্রুতবেগে বিহারভিমুখে আগমন করিতেছে, ইহার পশ্চাতে একটি বৃক্ষে একটি ছত্র রহিয়াছে,—কোন দরিদ্র উপাসক স্থানান্তরে চক্ররাজের উদ্দিষ্টছত্র বৃক্ষে নিবিষ্ট করিয়া গিয়াছে । অপর স্তম্ভে বৃত্তমধ্যে মায়াদেবীর গর্ভধাবণের চিত্র । খট্টায় মায়াদেবী স্রবুষ্ঠা, খট্টানিয়ে ভূঙ্গার ও পাদদেশে প্রদীপ, নিয়ে আসনদ্বয়ে উপবিষ্ট পরিচারিকাদ্বয় বাজনে ও সেবায় নিযুক্তা, একজন সখী করযোড়ে মায়াদেবীর মস্তকের নিকটে উপবিষ্ট রহিয়াছেন । উর্ধ্বে শ্বেতহস্তী । ভগবান শ্বেত হস্তীর আকার ধারণ করিয়া মায়াদেবীর গর্ভে আশ্রয় লইতেছেন । অপর স্তম্ভে বৃত্তমধ্যে পর্বতশ্রেণী অঙ্কিত রহিয়াছে, পর্বতের মধ্যদেশে বিশাল গুহা ও তন্মধ্যে বহুখচিত আসন । আসনের উর্ধ্বে ছত্র । চতুর্পার্শ্বে উপাসকগণ উপবিষ্ট রহিয়াছেন । গুহার বহির্দেশে সিংহ, শৃগাল, ময়ূর, বানর প্রভৃতি নানা জীব অঙ্কিত রহিয়াছে । গুহাদ্বারের সাম্মিখ্যে সপ্ততন্ত্রী বীণা হস্তে লইয়া গম্বীর পঞ্চশিখ দণ্ডায়মান । ইহা ইন্দ্রশিলা গুহা । একদা

বর্ষাকালে ভগবান শাক্যমুনি যখন রাজগৃহ শৈলমালার সঙ্গিহীন শৈলশিখরে পর্বতগুহায় বাস করিতেছিলেন তখন বাসব জ্ঞানলিপ্সা-প্রণোদিত হইয়া গুহা-দ্বারে উপস্থিত হইয়াছিলেন ও বুদ্ধদেবকে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ভূমিতে অক্ষরপাত করিয়া বুদ্ধদেব দেবরাজের প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন। প্রকৃত বিশ্বাসীরা কহিয়া থাকেন যে, অশ্বখণ্ডের উপরে ভগবানের অঙ্গুলী-চালনেব চিহ্ন অद्याপি বর্তমান আছে, বৌদ্ধ জগতে ইহারই নাম ইজ্জাশিলাগুহা। যতক্ষণ পর্যন্ত ভগবান প্রণেব মীমাংসা করিতেছিলেন ততক্ষণ পঞ্চশিখ বীণাসংযোগে সঙ্গীত-ধ্বনি করিতেছিলেন। অপর স্তম্ভে মৃগজাতকীয় চিত্র। বৃত্তমধ্যে তিনটি বৃক্ষ; দক্ষিণপার্শ্বে পলায়নপর মৃগযুথ, মধ্যদেশে গর্ভমধ্যে পতিত একটি বৃহৎ মৃগ ও গর্ভের পার্শ্বে স্ততিশীল মনুষ্যত্রয়, বামপার্শ্বে জনৈক মনুষ্য মৃগযুথের প্রতি শরত্যাগ করিতেছে। কথিত আছে, কোন এক পূর্বজন্মে ভগবান শাক্যমুনি মৃগযুথপতি ছিলেন। একদা জনৈক ব্যাধ মৃগকুলতাড়না করিলে একটি গর্ভবতী মৃগী পলায়নে অক্ষম হইয়া যুথপতিকে সন্ধান করিয়া কহে “আমি পলায়নে অক্ষম ও আমি নিহত হইলে, আমার গর্ভস্থ ভ্রূণ পর্যন্ত নিহত হইবে।” ইতিমধ্যে ধাবমান যুথের সন্মুখে একটি গর্ভ দেখিয়া হরিণী পলায়নে বিরত হইল। যুথপতি গর্ভের মধ্যে লক্ষ প্রদান করিয়া হরিণীকে কহিলেন “তুমি আমার পৃষ্ঠে পান্ননিবেশ করিয়া গর্ভ পার হইয়া যাও।” তখন অপর সকলে লক্ষ প্রদানে গর্ভ পার হইয়া গিয়াছে। পরক্ষণেই ব্যাধ-নিষ্কিপ্ত শরে আহত হইয়া যুথপতি প্রাণত্যাগ করিলেন।

অপর স্তম্ভে নাগজাতক, একটি সরোবরতীরে তিনটি হস্তী দণ্ডায়মান। তন্মধ্যে একটি কুলীরক কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে। কথিত আছে, বনমধ্যে এক বিশাল সরোবরে একটি অতি বৃহৎ কুলীরক বাস করিত। হস্তিগণ জলপানের জন্ত সরোবরে আসিলে দশরথরাজ কোন একটির পদ দৃঢ়রূপে আশ্রয়কাল পর্যন্ত ধারণ করিয়া থাকিতেন। হস্তীর মৃত্যু হইলে কিয়ৎ কাল পর্যন্ত তিনি আহাৰ পাইতেন। পরে বোধিসত্ত্ব হস্তিনীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া কুলীরকের ব্যবহার গুনিলেন। একদা তিনি পিতার অনুমতি লইয়া সরোবরে গমন করিলেন। কুলীরক তাঁহাকে আক্রমণ করিল ও পরে তাঁহার পতীর অনুরোধে দয়ার্দ্ৰ হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবামাত্র তাঁহার পাদপেষণে কুলীরক বিনষ্ট হইল। অপর স্থানে ছদ্মজাতক অঙ্কিত আছে। কথিত আছে, হিমালয়ের নিকটবর্তী ছদ্মজাতকদের মাঝিধ্যে অষ্ট সহস্র ষড়দন্ত হস্তী বাস করিত। বোধিসত্ত্ব এক

সময়ে এই হস্তিযুগের অধিপতি ছিলেন ও তাঁহার মহাসুভদ্রা ও বুল্লসুভদ্রা নামী দুইটি পত্নী ছিল। একদা যুথপতি একটি বৃক্ষ উৎপাটন করায় মহাসুভদ্রার নিকটে পত্রপুষ্প ও বুল্লসুভদ্রার নিকটে শুষ্ক পত্র ও শাখামাত্র পতিত হইল। এই সময় হইতে বুল্লসুভদ্রা যুথপতির প্রতি বিরক্ত হইল ও বিগত পঞ্চশত বুদ্ধদিগের নিকটে প্রার্থনা করিতে লাগিল যে, সে যেন পরজন্মে রাজকন্যা হইয়া জন্ম গ্রহণ করে ও ব্যাধ প্রেরণ করিয়া যুথপতিকে বিনষ্ট করিতে পারে। বুদ্ধগণ তাহার আশা সফল করিলেন। বুল্লসুভদ্রা অল্পদিন পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হইল ও কোন এক রাজার কন্যা রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া কাশীরাজের সহিত বিবাহিতা হইল। সে পূর্বপ্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া পূর্বস্বামীর নিধনের জন্ত কৃতসঙ্কল্প হইল। তৎপ্রেরিত ব্যাধ তাহার নির্দেশানুসারে ছদন্তদ্বন্দ্বীয়ে আসিয়া হস্তিযুগের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিল। ব্যাধ দেখিল, হস্তিযুথপতি হ্রদের একই স্থানে প্রতিদিন স্নান করিয়া থাকেন। সে সেই স্থানে একটি গর্ত খনন করিয়া উপরে শরনিষ্ক্ষেপের স্থান মাত্র রাখিয়া কাষ্ঠ ও মৃত্তিকার দ্বারা উপরিভাগ আচ্ছাদিত করিয়া স্বয়ং গর্তমধ্যে লুকায়িত রহিল। পরদিবস যুথপতি স্নানার্থ আসিয়া শরাহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার আর্তনাদে অপর হস্তিগণ আসিয়া ব্যাধের অনুসন্ধান করিতে করিতে ভূগর্ভে কামায় পরিহিত ব্যাধকে দেখিতে পাইল। ব্যাধের মুখে সকল কথা অবগত হইয়া যুথপতি তাহাকে হত্যা করিতে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন “বুল্লসুভদ্রা সামান্য কারণে আমার প্রাণহরণে কৃতসঙ্কল্প হইয়া আমার দন্তগুলির জন্ত তোমাকে প্রেরণ করিয়াছে। কিন্তু আমার দন্ত লইয়া তাহার কোন উপকার হইবে না। তবে তুমি সচ্ছন্দে আমার দন্ত কর্তন করিতে পার।” ব্যাধ দন্তগুলি স্পর্শ করিতে অক্ষম হওয়ায় যুথপতি তাহাকে শুণ্ডে উত্তোলন করিয়া ধারণ করিলে সে দন্ত ছেদন করিল; ইহার পর যুথপতির মৃত্যু হইল। চিত্রে বৃত্ত মধ্যে বৃক্ষতলে চারিটি হস্তী দণ্ডায়মান। ব্যাধ ধনুর্ধ্বাণ ভূমিতে নিষ্ক্ষেপ করিয়া দন্ত কর্তন করিতেছে। কোন স্থানে স্তম্ভের মধ্যভাগে চতুষ্কোণ বেষ্টনের মধ্যে স্বর্গের বৈজয়ন্তপ্রাসাদ অঙ্কিত আছে। প্রাসাদ ত্রিতল, দ্বিতলে ও ত্রিতলে বাতায়নপথে অগ্ননাগণের মুখ লক্ষিত হইতেছে, নিম্নতলে একটি গৃহে কতকগুলি দেব দেবী রহিয়াছেন। পার্শ্বে বিহারমধ্যে ভগবান শাক্যমুনির উদ্যম রক্ষিত। মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বে একজন পুরুষ চাগর-ব্যজন করিতেছে ও বামপার্শ্বে একজন উপাসক করযোড়ে

দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বিহার ও প্রাসাদের সম্মুখে অপ্সরোগণ নৃত্য করিতেছে ও ভূমিতে উপবিষ্ট পুরুষগণ বীণা প্রভৃতি যন্ত্র বাদন করিতেছে। শাক্যমুনির মহাপরিনির্বাণের পর দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার উষ্মীষ লইয়া স্বর্গে গমন করেন ও তথায় সদাসর্বদা দেবগণ তাহার উপাসনা করিয়া থাকেন, অপ্সরোগণ নৃত্যগীত করিয়া থাকে। তিস্তু ঋষিপালিত এই স্তূপনিৰ্মাণকালে এই স্তূপটি দান করিয়াছিলেন। ইহার দুই পার্শ্বে চতুষ্কোণ বেঠনীৰ মধ্যে ছয়টি চিত্র আছে ও ইহাতে বৃত্ত বা অর্ধবৃত্ত নাই। অপর পার্শ্বদ্বয়ে সূচী স্থাপনের জন্ত ছয়টি ছিদ্র আছে। ইহার একপার্শ্বে উপরিভাগে বৈজয়ন্ত প্রসাদ ও উষ্মীষ-বিহাবের চিত্র অঙ্কিত আছে। এই পার্শ্বে সর্বনিম্নের চিত্রে মগধরাজ অজাতশত্রুর বুদ্ধ-বন্দনার চিত্র অঙ্কিত আছে। চিত্রটি দুইভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে। নিম্নে চারিটি হস্তী ও তৎপৃষ্ঠে দুইটি পুরুষ ও তিনটি স্ত্রীলোক। ইহার পরে বৃক্ষদ্বয়ব্যবধানে একটি চতুষ্কোণ বেদী ও তাহার সম্মুখে করযোড়ে নতজানু জনৈক পুরুষ। পশ্চাতে একজন পুরুষ ও চারিজন স্ত্রীলোক। কথিত আছে, রাজা অজাতশত্রু পিতৃহত্যা করিয়া বহুকাল যাবত অনায়াসে নিদ্রালাভ করিতে পারেন নাই। শেষে তিনি তাঁহার ভ্রাতা ও চিকিৎসক জীবকের উপদেশানুসারে বুদ্ধদর্শনে গমন করিয়াছিলেন। রাজা পঞ্চশত স্ত্রী সমভিব্যাহারে হস্তিপৃষ্ঠে রাজগৃহনগরদ্বার হইতে নির্গত হইতেছেন। চিত্রের নিম্নদেশে হস্তিপৃষ্ঠে পুরুষদ্বয়ের মধ্যে একজন রাজা অজাতশত্রু ও অপরজন হস্তিপক। চিত্রের উর্দ্ধদেশে নতজানু পুরুষ রাজা অজাতশত্রু। অপরস্থানে বৃত্তের মধ্যে অনাথপিণ্ডদের জেতবনদানের চিত্র। বৃত্তের মধ্যে বামপার্শ্বে তিনটি বৃক্ষ, তিনটি গুরুষ্য ভূমিতে চতুষ্কোণ স্তূপগুম্ভা বিস্তৃত করিতেছে, চতুর্থ ব্যক্তি শকট হইতে স্তূপগুম্ভা বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। একব্যক্তি একটি বৃক্ষের পার্শ্বে শকটের সম্মুখে দণ্ডায়মান। বৃত্তের দক্ষিণ পার্শ্বে দুইটি স্বতন্ত্র গৃহ আছে। তাহাদিগের ব্যবধানে পূর্ণভূঙ্গাব হস্তে এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া আছেন, তিনি শ্রাবস্তীনগরের প্রধান শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডদ। অনাথপিণ্ডদের সম্মুখে কতকগুলি পুরুষ দণ্ডায়মান। কথিত আছে, ভগবান শাক্যমুনির জীবনকালে শ্রেষ্ঠী অনাদপিণ্ডদ বুদ্ধদেবের জন্ত একটি বিহাব নিৰ্মাণে কৃতসঙ্কল্প হইয়া শ্রাবস্তীনগরোপকণ্ঠে উপযুক্ত স্থানের সন্ধান করিতেছিলেন। নগরোপকণ্ঠে কুমারপাদ জেতের উদ্যানবাটিকা তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করায় তিনি জেতের নিকট উহার মূল্য জিজ্ঞাসা করেন। জেত বলিয়াছিলেন যে, স্তূপগুম্ভা কর্তৃক ভূখণ্ড আচ্ছাদন করিয়া দিলে তিনি উদ্যান বিক্রয়ে প্রস্তুত আছেন।

তদনুসারে অনাথপিণ্ড কোটী স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করিয়া অধিকাংশ ভূমি আচ্ছাদন করিলে জেত অবশিষ্ট ভূমি বিনামূল্যে প্রদান করেন । অনাথপিণ্ড জনধারা ভূমিতে নিষ্ক্ষেপ করিয়া উদ্ভান বুদ্ধ সজ্জের নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন । চিনে যে দুইটি গ্রহ আছে তাহা গন্ধকুটি ও কোশম্বকুটি নামে আখ্যাত । যতদিন সঙ্কর্মের মহিমা অগ্নান থাকিবে ততদিন জেতবানের নাম, অনাথপিণ্ডের নাম ও কুটিদ্বয়ের নাম চিরস্মরণীয় থাকিবে । শুনিয়াছি, কালে শ্রাবস্তীনগরী মৃৎস্তূপে পরিণত হইয়াছে ; জেতবনবিহার ও গন্ধকুটি ধুলিরাশিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে । কিন্তু তীর্থযাত্রিগণের পথপ্রদর্শক ভিক্ষু ও শ্রমণগণ অতাপি জেতবন ও কোশম্বকুটির নাম গ্রহণ করিয়া থাকেন । কি দেখিয়া আসিয়াছ ? রাণ্ডীনদীতীরে কোশলরাজ প্রাসেনজিতের উচ্চচূড় প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ চূর্ণীকৃত হইয়া রাজপথের ধুলির সহিত মিশ্রিত হইয়াছে । শ্রাবস্তী নগরীর সেই মহাশয়ান দেখিতে গিয়াছিলে কি ? যাহারা পর্বতবাসী পরাক্রান্ত শাক্যজাতির ধ্বংস সাধন করিয়াছিল, তাহাদিগের বংশধরদিগকে দেখিয়াছ কি ? শকরাজদিগের গুরু ত্রৈপিটক উপাধ্যায় ভিক্ষুবল ও পুষ্যবুদ্ধি যে মহাবিহার নির্মিত করিয়াছিলেন শিলামল্ল, উদ্ভিদসমাবৃত তাহার ধ্বংসাবশেষও বোধ হয় দেখিয়াছ । গহডবাল বংশীয় কান্তকুজরাজ গোবিন্দচন্দ্র জেতবনে যে সজ্জারাম নির্মিত করিয়াছিলেন, যে সজ্জারামের ব্যয় নির্বাহার্থ শ্রাবস্তীগণে শ্রাবস্তীবিশেষে শ্রাবস্তীভূক্তিতে অষ্টসংখ্যক গ্রামদান করিয়াছিলেন, শুনিয়াছি তাহার ধ্বংসাবশেষ লইয়া নবরাজ্যের হিমকাণ্ড রাজপুরুষগণ রাজবন্দ্য নির্মাণ করিয়াছেন । মহাচীন হইতে কুরুবর্ষ পর্য্যন্ত সমগ্র মহাদেশের প্রকৃত বিশ্বাসিগণ যে নগরের পথের ধুলিখুটি পবিত্র জ্ঞানে মহাযজ্ঞে স্বদূর পিতৃভূমিতে লইয়া যাইতেন, যে বিহার দর্শনে সহস্র সহস্র ত্রোণ-ধ্যাপী পণাতিক্রমজনিত শ্রম বিস্মৃত হইতেন, সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া প্রকৃত বিশ্বাসিগণ যেখানে কোটী কোটী স্বর্ণমুদ্রা মন্দিরবিহারাদির শোভনার্থ ব্যয়িত করিয়াছিলেন, সেখানে শ্রাবস্তীনগরের অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দিবার কিছুই নাই ।

কোন স্তম্ভে মধ্যদেশে অর্দ্ধবৃত্ত নাই । পূর্ববর্ণিত আবরণে প্রথমস্তম্ভের চ্যায় নাগ বা যক্ষমূর্তি, কোন স্তম্ভে বা অধারক পতাকাবাহী পুরুষ বা স্ত্রীমূর্তি দেখা যাইত । এইরূপে চুলকোকদেবতা, সুদর্শনা যক্ষিণী, সিরিমাদেবতা, চন্দা যক্ষিণী, হুটীলোগ যক্ষ, কুবের যক্ষ প্রভৃতি নানাবিধ মূর্তি দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল । কোন স্তম্ভে বৃত্ত বা অর্দ্ধবৃত্তের মধ্যে নানাবিধ কোতুকাবহ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল । কোনস্থানে চারিটি বানর একটি হস্তীকে বন্ধন করিয়া লইয়া যাইতেছে । হস্তীর

আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য শুণ্ডে কাষ্ঠখণ্ড বন্ধন করিয়া দিয়াছে । একটি বানর বন্ধনরজ্জু ধরিয়া অন্ধুশ হস্তে হস্তীকে পথপ্রদর্শন করিয়া চলিয়াছে ও অপর তিনটি নোকাগুণবাহীদিগের দ্বারা রজ্জুবাবা বিশাল জীবটিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে । দ্বিতীয় দৃশ্যে বানরগণ হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়াছে, পূর্ববর্ণিত পথ-প্রদর্শক হস্তীর স্কন্ধে আরোহণ করিয়াছে, একটি বানর দন্তে দণ্ডায়মান হইয়া চালককে কি বলিতেছে, নিয়ে তিনটি বানর বংশী, ঢকা ও ডমরু নিনাদিত করিতেছে । দৃষ্টান্তে একটি রাক্ষস আসনে বসিয়া আছে—একটি বানর তাহার নাসিকারন্ধ্রে বক্র লৌহনিবেশ পূর্বক লৌহের শেষভাগ ধরিয়া আছে, নিয়ে একটি ক্ষুদ্র বানর ক্ষুদ্র আসনে উপবিষ্ট হইয়া রাক্ষসের দক্ষিণহস্ত ধারণ করিয়া আছে । নাসারন্ধ্র-সংলগ্ন বক্রলৌহ রজ্জুখণ্ড আবদ্ধ করিয়া একটি হস্তীর গলদেশে বন্ধন করা হইয়াছে । হস্তী প্রাণপণ শক্তিতে টানিতেছে, হস্তিপক অন্ধুশাঘাত করিতেছে, পশ্চাতে অপর বানর হস্তীর পদে দণ্ডাঘাত করিতেছে, উর্দ্ধে ও নিয়ে বানরদ্বয় শঙ্খ ও ঢকা নিনাদ করিয়া ভীতিপ্রদর্শনপূর্বক হস্তীকে চালনা করিবার চেষ্টা করিতেছে । চিত্র দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হইতেছে, এত চেষ্টা সত্ত্বেও রাক্ষসের নাসারন্ধ্রের লোম উৎপাটিত হইতেছে না । কোন স্তম্ভে অশ্বপৃষ্ঠে আরুঢ় স্ত্রী বা পুরুষ গরুড় বা কিম্বদন্ত হস্তে লইয়া দীর পাদক্ষেপে গমন করিতেছে । গরুড় বা কিম্বদন্ত বিষয়ের বিষয় নহে । এখন যেমন কিরাতদেশের প্রান্তে বৌদ্ধতীর্থে অসংখ্য বংশদণ্ডাগ্রে শ্বেত, কৃষ্ণ, নীল, পীত, রক্ত নানাবর্ণের কেতন দেখিতে পাও, তেমনই প্রাচীন যুগে মন্দিরে বা বিহারে হিন্দ, বৌদ্ধ বা জৈন নির্বিশেষে নানাবিধ পতাকাশোভিত ধ্বজ সমূহ পূণ্যার্থীগণ কর্তৃক স্থাপিত হইত । সমগ্র আর্য্যাবর্তে মহারাজ ধর্ম্মাশোকস্থাপিত সিংহ, হস্তী, বৃষধারী শিলাস্তম্ভ দেখিয়াছ ; উহাও ধ্বজমাত্র । সমগ্র তীর্থযাত্রীর বংশদণ্ডের পরিবর্তে আসমুদ্রক্ষিতীশ স্মৃচিকণ, সমুদ্রল, মন্থণ শিলাস্তম্ভ প্রোথিত করিয়া পূণ্যস্থানে কাষায় কেতন উদ্ভূত করিয়াছিলেন । ধর্ম্মলিপি খোদিত হইবার পূর্বে উপদ্বীপের দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া অশোক আর্য্যাবর্তে যে পূণ্যযাত্রা করিয়াছিলেন সেই সময়ে পূণ্যস্থানমাত্রই ধর্ম্মাশোকের সিংহ, হস্তী বা বৃষধ্বজ স্থাপিত হইয়াছিল । কবে কোন্ যবন আসিয়া ব্রাহ্মণগণের উপাশ্র কোন্ দেবতার পদপ্রান্তে, আর্য্যাবর্তের কোন্ প্রান্তে গরুড়ধ্বজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল সহস্র সহস্র বর্ষ পরে তাঁহার পূণ্যকর্ণের লেখ সিন্দুরলেপনমুক্ত হইয়া পুনরায় নরমোচনের গোচরীভূত হইয়াছে ! তাহা দেখিয়া বা শুনিয়া - বিস্মিত হইও না । যদি বাঙ্গালার উপাদ

বাসুদেবের উদ্দেশ্যে যবনতীর্থযাত্রী কর্তৃক একটি অশ্বনির্মিত গরুড়ধ্বজ নির্মিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আর্য্যাবর্তে সর্দ্ধর্মের সপ্তদশশতাব্দীব্যাপী জীবনে যে লক্ষ লক্ষ কেতনবাহী ধ্বজা স্থাপিত হইয়াছিল তাহাও দেখিতে পাইবে । পুণ্যস্থানে অনুসন্ধান কর, দেখিতে পাইবে রাজগৃহে, পাটলীপুত্রে, মহাবোধিতে বৈশালীতে, বারাণসীতে, শ্রাবস্তিতে, কুশীনগরীতে, কৌশাধীতে, সঙ্কশ্চে, উজ্জ-য়িনীতে, মথুরায়, পৃথুদকে স্থায়ীশ্বরে, জালন্ধরে, তক্ষশিলায় নগরহারে, পুরুষপুরে, বাহুলীকে, কপিণায়, কত সহস্র ধ্বজ স্থাপিত হইয়াছিল । সর্দ্ধর্মের গৌরবের তুলনায় ব্রাহ্মণ্যধর্মের গৌরবও ক্ষীণ । সম্ভবে সর্দ্ধর্মের সহিত ব্রাহ্মণ্যধর্মের নামোচ্চারণ করা উচিত নহে ।

প্রভাতে উৎসব । নববিবাহিতের আকাজ্জব ছায় ছুর্দমনীয় মনোবেগ লইয়া উষাগমের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, যাহা দেখিলাম, তাহা আর কখন দেখি নাই, আর কখনও দেখিব না । তাহার প্রত্যেক ঘটনা আমার মনে কে যেন ক্ষোদিত করিয়া রাখিয়'ছে । তাহার কিছুই বিস্মৃত হই নাই ।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ।

শরৎ ।

—:০০:—

সৌম্য শুভ্র শরৎ আবার

হরষে এসেছে ফিরে',

নির্মলতর নব স্ন্যমায়

ধরণী-অঙ্গ ঘিবে' ।

রক্তত শুভ্র লঘু মেঘদল

ভাসে নীলাকাশে চিরচঞ্চল,

রাশি রাশি ফেনপুঞ্জ যেমন

সুনীল সাগরনীরে ।

শান্ত শুভ্র শরৎ আবার

হরষে এসেছে ফিরে' ।

সরসে ফুটিয়া উঠেছে গরবে

শত শত শতদল,

শিশিরলিপ্ত শেফালিপুষ্পে

আস্থিত তরুতল ।

প্রান্তর প'রে নবকাশবন

ছেয়ে ফুলরাশি শুভ্রবরণ ;

চঞ্চলা নদী কল্লোল রবে

বহে যায় অবিরল ।

সরসে ফুটিয়া উঠেছে গরবে

অমল কমল দল ।

স্বর্ণশীর্ষ ধাত্ত-ক্ষেত্র

হেরিলে জুড়ায় আঁখি,

নিশীথে ইন্দু সিত করধারা

বরষে অগ্নি মাখি ।

উজ্জল মৃৎ রবির কিরণ,

সিঞ্চ মধুর ধীর সমীরণ,

পুলক পরশে আকুল গাহিছে

মধুর কণ্ঠে পাখী ।

স্বর্ণশীর্ষ ধাত্ত-ক্ষেত্র

নিমেষে জুড়ায় আঁখি ।

কিরণে, বরণে, সৌরভে, গীতে,

পুলকে পূর্ণ ধরা,

আসিছে ভুবনে শারদ লক্ষ্মী

হুঃখদৈন্তর্য ;

তাই দিকে দিকে এত আয়োজন ।

কে আছে প্রবাসে, কে সহে বেদন ?

আজিকে মিলন-উৎসব ভবে,

আয় ছুটে আয় স্বরা ।

কিরণে, বরণে, সৌরভে, গীতে

পূর্ণ আজি এ ধরা ।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ ।

সমালোচনা ।

—ঃঃ—

ভক্তের জয় ।*

—০—

সাধক গাহিয়াছেন—“আমি ভক্তি দিতে পারি না হে মোক্ষ মুক্তি দিতে কাতর নই ।” যে ভক্ত,—যে সংসারবন্ধন ছিন্ন করিয়া ব্রজবল্লভের মুরলীরবে আহুতা গোপিকার লায় আপনার স্বতন্ত্র মত্তা ভুলিয়া ভগবানকে পাইবার জন্ত প্রধাবিত, সেই সাধককে মোক্ষ বা মুক্তি দিতে ভগবান কখনই কাতর নহেন । সে নিজ কর্মবলেই মোক্ষ বা মুক্তি লাভ করিয়া থাকে, সাগরে যেমন বারিবিন্দু মিশিয়া যায়, ভক্তের মুক্ত, পুত আত্মা তেমনই পরমাত্মায় দীন হয় । গীতা বলিয়াছেন—

ভক্ত্যা জনন্য শক্যঃ অহমেবং বিধোহর্জুন ।

জাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তদ্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ॥” (গীতা ১১।৫৪)

হে পরন্তপ ! আমি বিধক্লপ,—অনন্ত ভক্তির দ্বারা আমাকে (আমার বিশ্ব-
রূপকে) জানা যায়, দেখা যায় এবং আমাতে প্রবেশ করা যায় । অপিত

“ভক্ত্যা সামভিজানাতি যাবান যশ্চাস্মি তদ্বতঃ ।

ততো মাং তদ্বতো জাত্বা বিশতে তদনন্তরং ॥” (গীতা ১৮।৫৫)

লোক ভক্তির দ্বারা আমি কে এবং কিরূপ তাহা জানিতে পারে ; তাহার পর আমাকে প্রকৃতরূপে জানিতে পারিয়া আমাতেই প্রবেশ করে । সুতরাং সাধক যদি প্রকৃত ভক্তি বা পরাভক্তি লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে মোক্ষমুক্তি লাভ করা কঠিন নহে । কিন্তু ভক্তিলাভ সহজ নহে । ভক্তি-লাভ করিতে হইলে জন্মজন্মান্তরের সাধনা আবশ্যিক । সাধনা কর্মসাপেক্ষ । শাস্ত্র বলেন, “চিত্তশ্চ শুদ্ধয়ে কস্য ।” চিত্তশুদ্ধির জন্তই কর্ম করিতে হয় । একা-দশ ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা নিষ্কার করা যায়, তাহাই কর্ম । কিন্তু সকল কর্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয় না । ঈশ্বরের উদ্দেশে যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহার দ্বারাই চিত্ত শুদ্ধ হয় । গীতা বলিয়াছেন,—

* ভক্তের জয়—শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী প্রণীত ; কবিকাতা, ৪০, মহেন্দ্র গোস্বামীর স্নেহ হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত । মূল্য ১৫ এক টাকা ।

“যজ্ঞার্থাৎ কৰ্মণোহনৃত্র লোকোহয়ং কৰ্মবন্ধনঃ।” (গীতা ৩।৯)

যজ্ঞার্থ অর্থাৎ ঈশ্বরের আরাধনার্থ যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, সেই কর্ম ভিন্ন আর সকল কর্মই বন্ধনের কারণ অর্থাৎ সেইসকল কর্মের দ্বারা লোক সংসারের মায়াজালে বদ্ধ হইয়া পড়ে। অপিচ

“মাঞ্চ যোহব্যভিচারেণ ভক্তিয়োগেন সেবতে

সগুণান্ সমতীত্যেতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।” (গীতা ১৪।২৬)

যিনি একান্ত ভক্তিয়োগে (ভক্তি-সহকারে) আমার সেবা করেন, তিনি সমস্ত গুণের অতীত হইয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইবেন।

সহজে এ ভক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে ১৩শ্ হইতে ২০শ শ্লোক পর্যন্ত ভক্তির ও ভক্তের স্বরূপ বর্ণিত। যে ব্যক্তি অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ পরিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া ভগবানকে মন, বুদ্ধি সমর্পণ করিয়াছে,—যে ব্যক্তি আপনার পৃথক সত্তা হারাইয়া, আপনার আদিত্ব বা ব্যক্তিত্ব পরিহার করিয়া, আমি ও আমার ইত্যাকার জ্ঞান পাশরিয়া, জ্ঞানাগ্নিতে লোভ মোহ প্রভৃতি ভস্মীভূত করিয়া ভগবানকে বিভোর হইয়া পড়িয়াছেন তিনিই প্রকৃত ভক্ত। তাঁহারই ভক্তি পরাভক্তি। যে ভক্তির বলে প্রহ্লাদ জলে স্থলে অনলে অনিলে, আব্রহ্ম তৃণ পর্যন্ত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে হরিকে দেখিয়াছিলেন,—যে ভক্তির প্রভাবে বালক ঐব দুর্দান্ত বনচর শার্দূলকে ‘এই আমার পদ্যপলাসলোচন হরি’ বলিয়া আলিঙ্গন করিতে গিয়াছিলেন, সে ভক্তি সহজপ্রাপ্য নহে। সে ভক্তি কেবল ভাবপ্রবণতা নহে, তাহা সত্যজ্ঞান হইতে সমুদ্ভূত। যাহারা ভক্তিকে কেবল Sick Sentimentality বুঝেন, তাঁহারা ভক্তিতত্ত্বের কিছুই বুঝেন না। সেই জন্য ভক্ত কবি গাহিয়াছেন—

“যে ভক্তিতে আমার রাণী বন্ধন করে

সে ভক্তি কি দিতে পারি যা’রে তা’রে

ভক্তির কারণে মধুর বৃন্দাবনে

আহ্লাদিনী রাইয়ের ধ্বনি বন্ধ রই ॥”

ভক্তির সঙ্ক্ৰামক শক্তি আছে। ভক্তির কথা, ভক্তের চরিত্র আলোচনা করিলে হৃদয়ে ক্রমশঃ ভক্তিরস সঙ্ক্ৰমিত হয়। সেই জন্য ভগবানই বলিয়াছেন,— ‘মদ্বক্ত পূজাভ্যধিকা’ আমার ভক্তের পূজা আমার পূজা অপেক্ষা অধিক। বৃন্দাবন দাম বাসগা ভাবাতে ঐ ভগবদাক্যের অনুবাদ করিয়া বলিয়াছেন,—

“আমার ভক্তের পূজা আশা হইতে বড় ।

সেই প্রভু বেদে ভাগবতে কৈলা দৃঢ় ॥”

কিন্তু খাঁটি বাঙ্গলার ভক্তের জীবনচরিত লিপিবদ্ধ নাই । বাঙ্গালা পণ্ডে যে ভক্তমাল গ্রন্থ প্রচলিত আছে, তাহা মৌলিক গ্রন্থ নহে—নাভাজী প্রণীত হিন্দী ভক্তমাল ও প্রিয়দাসের হিন্দী টীকার ভাবানুবাদমাত্র । এ দেশের ভক্তগণ উহাই পাঠ করিয়া থাকেন । ভক্তের চরিতপাঠ ভক্তি-উন্মেষের প্রধান সাধন । সেই জন্ত সর্ব ধর্মাবলম্বীরাই তাঁহাদের আপন আপন ধর্মপাঙ্গ পাঠের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তচরিত পাঠ করিয়া থাকেন । বাইবেল পাঠ করার পৰ Book of Martyrs পাঠ না করিলে খৃষ্টানগণের ধর্মশাস্ত্র পাঠ সাঙ্গ হয় না । ইহুদী, বৌদ্ধ প্রভৃতিরও এরূপ নিয়ম । উৎকল ভাষায় ‘দার্ঢ্যভক্তি রসামৃত’ নামে একখানি সুন্দর ভক্তমাল গ্রন্থ প্রচলিত আছে । এ পর্য্যন্ত উহা বঙ্গভাষায় অনূদিত হয় নাই, ইহাই বিষয়ের বিষয় । ঐ গ্রন্থখানিতে যে সমস্ত ভক্তচরিত্র কীর্তিত আছে, সাধারণ লোকের মনে ভক্তিরসের উন্মেষণে তাহা সম্পূর্ণ উপযোগী । সম্প্রতি বৈষ্ণব-চুড়ামণি প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ঐ গ্রন্থ হইতে আটটি ভক্তচরিত্র সুন্দর ও সুললিত ভাষায় প্রকাশিত করিয়া বাঙ্গলা সাহিত্যের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন । পুস্তকখানিতে আটটি সন্দর্ভ আছে ! এক একটি সন্দর্ভে এক এক জন ভক্তের চরিত্র কীর্তিত । এই আটটি আখ্যায়িকা ‘দার্ঢ্য ভক্তি

রসামৃতের’ যথার্থ অনুবাদ নহে । গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়া-
ন,—“আমি উৎকল ভক্তচরিত্রের আক্ষরিক অনুবাদ করি নাই । আমাদের দেশের রীতিনীতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া—আমাদের ছাঁচে সে গুলিকে ঢালিয়া ইয়াছি । তজ্জন্ত উৎকল চরিত্রের কিছু কিছু কাট ছাঁট অদল বদল করিতে ইয়াছে । চরিত্র-চিত্রের স্বাভাবিক বিকাশ-সাধন এবং ভক্তিরসের পরিপোষণের ।ও স্থানে স্থানে অনেক কথা জোড়া তাড়া দিতে হইয়াছে ।”

হ হইতে বুঝা যাইতেছে যে, মূলগ্রন্থবর্ণিত চরিত্র হইতে তাঁহার বর্ণিত চরিত্র টু বিভিন্ন । মূল চরিত্র বজায় রাখিয়া যদি কেবল ভক্তিরসের পরিপোষণ ও র্ণ ভাগের পূর্ণতাসাধনের জন্তই গোস্বামী মহাশয় মূল কাহিনী সাজাইয়া ইয়া লইয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি বাস্তবিকই এই গ্রন্থখানি বাঙ্গালী ভক্ত জের অধিকতর আদরের জিনিষ করিয়া তুলিয়াছেন । ছুর্ভাগ্যক্রমে আমরা গ্রন্থখানি দেখি নাই । সুতরাং পরিবর্তনের ভাল মন্দ বিচার করিবার অধি-
আমাদের নাই । আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, পুস্তকখানি পাঠ করিলে

ভক্তের হৃদয়ে ভক্তিগন্ধাকিনী স্বতঃ তর তর তরঙ্গে প্রবাহিত হইবেই হইবে, ভক্তের নয়ন প্রেমশ্রোতে ভাসিয়া যাইবে, ভক্তের শরীর প্রেমপুলকে কণ্টকিত হইবে। পুস্তকখানির লিখনভঙ্গী বড়ই মধুর। একপ গ্রন্থের বহুল প্রচারে সমাজের যথেষ্ট উপকার আছে। সকলেই কিছু তার ইহকাল পরকাল, জীবাত্মার সহিত পরমাঙ্গার সম্বন্ধ, কর্মফল প্রভৃতি জটিল তত্ত্বের দার্শনিক বিচার করিতে সমর্থ নহেন। কেবলমাত্র শুক জ্ঞানের সাহায্যে সাধারণ লোক নাস্তিক্যবুদ্ধির ঘূর্ণাবর্ত হইতে নিস্তার পায় না। শুক, সনাতন, কণাদ, গৌতম, ব্যাস, পতঞ্জলি প্রভৃতির শ্রায় মনস্বী লোক জগতে দুর্লভ। সুতরাং সাধারণ লোক সহজেই পাপের পথে প্রলুদ্ধ হইয়া থাকে। ভক্তিই সাধারণ মানুষকে,—প্রবৃত্তি-তাড়িত অজ্ঞানতা-পীড়িত মানবকে—সেই পাপের পিচ্ছিল পথ হইতে সহজে দূরে রক্ষা করে। ভক্তচরিত্রই মানব-হৃদয়ে সহজে ভক্তির উৎস উৎসারিত করিয়া দেয়। ভক্তের চরিত সাধারণ লোকের আদর্শ। সেই আদর্শ অতি উচ্চ হইলে সাধারণ মানুষ সে আদর্শের সন্নিহিত হইতে পারে না, অনেকে সে আদর্শের সন্নিহিত হইতে চেষ্টা করিলেও নৈরাশ্রাশ্রনি-প্রহত হইয়া পাপপঙ্কে প্রোথিত হইয়া যায়। সেইজন্য সাধারণ মানবকে পাপের হস্ত হইতে নিস্তার করিবার জন্য গণপতি ভট্ট, বলরাম দাস, বিশ্বম্ভর দাস, দীনবন্ধু দাস, বন্ধু মহান্তি প্রভৃতির শ্রায় ভক্তচরিত পাঠ করিতে দেওয়া কর্তব্য। বলরাম দাস পাপী হইয়াও ভগবদ্ভক্তির বলে ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিল, বন্ধু মহান্তি বন্ধুভাবেই জগন্নাথকে ডাকিয়া ভগবানের শ্রীপদে স্থান পাইল, গণপতি ভট্ট গজেন্দ্রবদন গণেশরূপী ভগবানকে আরাধনা করিয়াছিল বলিয়া ভগবান জগন্নাথ সেই রূপেই তাহাকে দেখা দিলেন, এই সকল দেখিলে সাধারণ লোক ভক্তির গণ্ডে অগ্রসর হইতে উৎসাহিত হয়। ভক্তির পথে কিছু দূর অগ্রসর হইলেই কামনা, বাসনা প্রভৃতি কাটিয়া যায়, মানব-হৃদয় বিমলানন্দে বিভোর হইয়া উঠে, জ্ঞানের আলোক স্বতঃই হৃদয়ে সহস্র সূর্যের তেজে উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। সুতরাং সামাজিক পাপদমনের উদ্দেশ্যে একপ গ্রন্থের প্রচার নিতান্ত আবশ্যিক। জানা করি, গোস্বামী মহাশয়ের এই ‘ভক্তের জয়’ বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে বিরাজ করিবে।

গ্রন্থের ভাষা অতি সুন্দর, সরল ও ভাবময়। ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই অতি উত্তম। গ্রন্থকাব একজন পরম ভক্ত; সুতরাং তাহার লেখনীমুখে ভক্তির পুতপ্রবাহ ছুটিয়াছে, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই।

সংগ্রহ ।

—:~:—

সাহিত্য ।

মীরাবাই ।

বৈশাখ মাসের 'আর্য্যাবর্তে' চিতোর-ভ্রমণ বৃত্তান্তের লেখক লিখিয়াছেন, "মীরা ও পদ্মিনী বাজহানের দুইটি অতুলনীয় রমণী রত্ন । একজন বাজরাণী হইয়াও সম্রাসিনী মহাবীর কুস্তুর মৈথুকোলাহলের প্রতি কর্ণপাতমাত্র না করিয়া হরিনামামৃত পানে বিভোবা ।" মীরার ভক্তি সম্বন্ধে কত কিম্বদন্তীই প্রচলিত আছে । তাঁহার কবিতায় সেই ভক্তির স্বরূপ বুদ্ধিতে পাবা যায় । সংগ্রহ 'ইষ্টে আও ওয়েষ্টে' পক্ষে গ্রীষ্ম কানাইলাল মুন্সী মীরাবাই সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন । বর্তমান প্রবন্ধ তাহাবই মারসঙ্গম ।

গুজরাটী কবিকুলে মীরাব আসন স্বতন্ত্র । তিনি কুস্তুর পত্নী, আদর্শ মানবদেবের প্রেমার্থিনী ; তাঁহার কবিতার তুলনা নাই । কিন্তু তাহাব সম্বন্ধে প্রায় মীরাবাই । কিছুই জানা যায় না । ভাবতবাসী স্বভাবসিদ্ধ আত্মবিসর্জনবশে তিনি যেন আপনাকে বিলুপ্ত করিয়াছিলেন । যাহাই হউক, তাঁহার স্বামী বাণাকুন্ড অসাধারণ বীর ছিলেন ; তাঁহার রাজত্বকালও নিশীত হইয়াছে । তাঁহার সম্বন্ধে প্রচলিত কিম্বদন্তী ও তাঁহার কবিতা হইতে তাঁহাকে বুঝিবাব চেষ্টা করায় লাভ আছে ।

মীরার কবিতার সংখ্যা অধিক নহে । হয়ত তিনি অধিক কবিতা লিখেন নাই । তাঁহার জীবনই কবিতা । তিনি কবিশঃপ্রার্থী হইয়া—সমালোচনার অগ্নিপরীক্ষায় কবিতা উত্তীর্ণ হইবার আশায় কবিতা রচনা করেন নাই । তাঁহার কবিতা নিম্ন-বের বারির মত স্বতঃ প্রবাহিত । তিনি চেষ্টা করিয়া ভাবকে কবিতার ছন্দে প্রকাশ করি-
ছেন না ; তাঁহার কবিতা অনাম্যানজাত । তাঁহার কবিতা ভাবের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি । এইরূপ কবির কথায় টেমিসন বলিয়াছেন :—

আমি গাহি, গান মোর আপনি বিকাশে ;

বিহগের গীত যথা আপমা প্রকাশে ।

কিন্তু যে কবিতা পাঁচশত বৎসরের পনও মহত্ব কণ্ঠে উচ্চারিত, সে কবিতা সমালোচনার অগ্নি-পরীক্ষায় নষ্ট হইবার নহে । আজও রাজপুতানার উষ্ম প্রান্তরে বা গুজ্জরের উর্বর ভূমিতে কৃষিকার্য্যরত জ্ঞানহীন কৃষক মীরার ভজন গাহিতে গাহিতে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে । সে অব কোন গান জানে না ; মীরাব ভজনেই তাঁহার প্রশান্তি । যতদিন মানব হৃদয়ে প্রেমের প্রভাব থাকিবে, যতদিন কিশোরের বিরহে কিশোরীর হৃদয় বাণিত হইবে, যতদিন যুবককে দেখিয়া যুবতীর গণ্ড লজ্জারক্তরাগরঞ্জিত, হইবে ততদিন মীরার কবিতার আদর থাকিবে । মীরার কবিতায় প্রেম যেন সধুসতম বোধ হয় ।

মীরা ভক্ত কবি। কবিচিত্ত ভাবপ্রবণ; তাহাতে অতি সাধারণ অনুভূতি প্রবল হইয়া উঠে। ওয়াডনওয়ার্থ প্রকৃতির তুচ্ছ সম্পদে মুগ্ধ হইতেন; শেলী বাহ্যিক ভক্তি। কেশবচন্দ্র কাব্যপাঠ করিতেন, হাফেজ প্রিয়তমার বরবপুর ছিলেব রক্ত সর্বস্ব দিতে পারিতেন। কবির ইহাই বিশেষত্ব। কবির কল্পনা বস্তু হইতে সবার উপলব্ধি করিতে পারে—সাধারণকে অসাধারণে পরিণত করিতে পারে। কবির এই অনুভূতি কবিতায় অভিব্যক্ত হয়। তাহা পাঠকের বা শ্রোতার হৃদয় স্পর্শ করিয়া তাহাকেও কবির ভাবে অনুপ্রাণিত করে। কোন কবি স্বভাবের মৌল্যর্থে, পর্বতের বিরাটত্বে, মিকুর অসীমত্বে, কাননের গাঙ্গীযো মুগ্ধ হইয়া কবিতার উৎস মুক্ত করেন, বেদনা, ঘৃণা, প্রেম প্রভৃতি কাহারও কবিতার উৎস মুক্ত করে। প্রেমই অধিকাংশ কবির কবিতার মূল। যে সকল কবি সংসার-জ্ঞান প্রবল, যাহাদের প্রতিভার 'গৃহীণীপনা' আছে, তাহারা ব্যক্তিবিশেষের প্রেমে মত্ত। আর যাহাদের উদ্দাম কল্পনা ধরার ধূলা ত্যাগ করিয়া বিহ্বল মত্ত আকাশে উড়্‌ডীয়মান, তাহারা কল্পনাস্রষ্ট আদর্শের প্রেমে মুগ্ধ। তাহাদিগের নিকট সে আদর্শ বাস্তবরূপে উপনীত। তাহাদিগের কর্ণ সেই আদর্শের কথা শুনিতে পায়, তাহাদিগের নয়ন সেই আদর্শের দর্শনলাভে চবিতার্থতালাভ করে। ভারতের ভক্তগণ এই সম্প্রদায়ভুক্ত। ভারতের বলিলাম, কেন না—যুরোপে ভক্ত উপাসনা, ধর্মপ্রচার প্রভৃতিই যথেষ্ট বিবেচনা করেন, তিনি জগতের জীব। ভারতে ভক্ত দেবতার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া আপনাকে ভগবানের অংশ বলিয়া বিবেচনা করেন, তিনি জগতের নহেন—বাহ্যিকের। ভারত এই ভক্তের লীলাভূমি। আমাদের কল্পনা মহজেই বাহ্যিক আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করিয়া থাকে। তাহাদিগের কবিতায় যে প্রেম সপ্রকাশ তাহার তুলনা নাই।

মীরা ভক্ত কবি। তাহার কবিকল্পনা ভারতের পুরাণ-বর্ণিত চিত্র সজীব করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি পুরাণ-বর্ণিত দেবতাদিগের মধ্যে আদর্শপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের চরণে ভক্তকবি। আত্মসমর্পণ করিলেন। ভারতবর্ষে শ্রীকৃষ্ণের মত লোকপ্রিয় দেবতা আর নাই। ভারতবাসীর ভক্ত হৃদয় তাহাকে সর্ববিধ মানবীয় ও দৈব গুণেব আধার করিয়াছে। তাহার বাঁশরীর স্ববে জড় জগতেও চেতনার সঞ্চার হইত—ঘনুনার জলধা বা উজান বহিত। সেই বাঁশরীর আস্থানে গোপাঙ্গনা আত্মবিস্মৃতিহেতু লৌকিক ধর্মাদর্শ পরিত্যক্ত বিস্মৃতা হইয়া তাহার সঙ্গস্থলান্তকামনায় মত্ত হইত, তাহার বাহু জ্ঞান দূর হইত—নে রুধেব সহিত আপনার একত্ব অনুভব করিত। সেই প্রেমেব পূর্ণ বিকাশ শ্রীরাধায়। শ্রীকৃষ্ণের লীলামৃত ঘহ কবিকে গীতরত করিয়াছে। তন্মধ্যে জয়দেবের কোমল—কান্ত পদাবলী ব তুলনা নাই। জয়দেব বর্ণিত সেই—

“দিনমণিমণ্ডলমণ্ডন ভবখণ্ডন

মুনিজনমানসহংস

কালিগবিষধরগঞ্জন জনরঞ্জন

বহুকুলনগিনদিশ

মধুসূদনরকবিনাশন গকড়ামন

স্বনকুলকলিনিদান

অমলকমলদললোচন ভবমোচন

ত্রিভুবনভবননিধান ।”

তাঁহাকেই মীরা আত্মসমর্পণ করিলেন। তিনি আপনাকে কৃষ্ণের প্রণয়িনী মনে করিলেন। তাঁহার পিতা এবিষয়ে কন্যার কাছের সমর্থন করিলেন। ক্রমে মীরা সংসারবিরাগিনী হই-
যেন—কৃষ্ণপ্রেমলালগাই তাঁহার সমগ্র হৃদয় অধিকৃত করিল। চিত্তোত্তরের সিংহাসনে তাঁহার
কোন আকর্ষণ রহিল না, বীবোত্তমের আকৃষ্টিতে তাঁহার হৃদয়ে ভীতিসংঘাতসম্ভাবনা থাকিল
না, লোকের উপহাস তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিল না। তিনি যে সংসারবিরাগিনী—
“কৃষ্ণ কলঙ্ক মাযবে” ভুবিলে এমনই হয়। প্রেমোন্মাদের—দিব্যোন্মাদের ইহাই লক্ষণ।
কীনাধাও বলিয়াছিলেন—

“কায কি বাসে, কায কি বাসে

আণ দেয় যে পীতবাসে ?

সে যার হৃদয়ে বাসে

সে কি বাসে বাস করে ?

কায কি গো কুল, কায কি গো কুল,

ব্রজবাসী হ'ক প্রতিকুল ;

আগ্নি ত গ'পেছি, সেই, কুল

অকুলের কাণ্ডারী করি ।”

ক্রমে মীরার দিব্যোন্মাদ হইল। তিনি “অকুলের কাণ্ডারী করি” আপনাকে সমর্পণ
করিলেন।

এই দিব্য প্রেম মীরার কবিতার কারণ। সে সকল কবিতার মনোভা ও মনোমতা,
তথ্যতা ও গভীরতা, পবিত্রতা ও কোমলতা—সত্য মতাই অভুলনীয়। কাষেই সে সকল
কবিতা যে এতদিন সমান আদরলাভ করিয়া আসিতেছে, তাহাতে
কবিতা।

বিশ্বের কারণমাত্র নাই। সে সকল কবিতার অমরতা অবশ্যপাণী।

আজও সেই সকল কবিতা সংগৃহীত ও সম্পাদিত হয় নাই, ইহা একান্তই দুঃখের বিষয়।
ভারতবাসী বহুসংখ্যক বৎসর ধরিয়া মরাদি কেবল শ্রুতির সাহায্যেই রক্ষা করিয়া আসিয়াছে
মতা ; কিন্তু সাহিত্যের সংরক্ষণে শ্রুতি যে সর্বদা ও সর্বত্র সর্বোৎকৃষ্ট উপায় নহে, তাহাতে
সন্দেহমাত্র নাই। মীরার কবিতার সংগ্রহ ও সম্পাদন ভারতবাসীর অবশ্য কর্তব্য।

বাণিজ্য।

—:O:—

বাণিজ্য শিক্ষা।

“বাণিজ্যে লক্ষীর বাস” ইহা ভারতের চিরস্তনী কথা। বর্তমান সময়ে যুরোপে এই কথা সম্পূর্ণ সার্থক হইয়াছে। বাণিজ্য-সেবাতেই এখন সমগ্র সভ্য জগত আজনিয়োগ করিয়াছে। বাণিজ্য ক্রী, সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্যের নিদান, ইহা এখন সজীব জাতিমাত্রই বুঝিয়াছে। সেই জন্ত যুরোপে বাণিজ্যসম্পর্কিত ব্যাপার শিক্ষা দিবার জন্ত বহু অর্থ ব্যয়িত করিয়া বিদ্যাগার প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। বাণিজ্যবিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিয়া সম্প্রতি অধ্যাপক ক্রীযুত সোরাব আর ডাবার এফ, এন্স, এস, মহাশয় একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধটি লাহোরের শিল্প সমিতির জন্ত লিখিত হয়। গত জুলাই মাসের ‘ইণ্ডিয়ান রিভিউ’ নামক পত্র উহা প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক তাঁহার নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধে অনেক আবশ্যক ও আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন।

বাণিজ্য-শিক্ষার ফলে বর্তমান সময়ের অনেক সুসভ্য জাতি উন্নতির পথে দ্রুতবেগে প্রধাবিত। কিন্তু বিশ্বায়ের বিষয় এই যে, যে ইংলও বাণিজ্য ব্যাপারে জগতের অন্যান্য জাতিব ইংলওর অনবধানতা। অগ্রণী, সেই ইংলওই অনতিপূর্বে বাণিজ্য শিক্ষা বিশেষ অনাদৃত ও উপেক্ষিত ছিল। আন্টওয়ার্প সহরেই ১৮৫২ খৃঃ অব্দে বাণিজ্য শিক্ষার উন্নত বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বাণিজ্যসম্পর্কিত বিষয়ের আবশ্যক শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যেই ঐ বিদ্যাগার প্রথম পরিকল্পিত ও প্রতিষ্ঠিত। তাহার পর উহাবই অনুকরণে ক্রসেন্স, বালিন, সুইজারল্যান্ড; লুভে, লিজমন্স, প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্য-বিদ্যাগারের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। মার্কিন ও জাপান এই আবশ্যক শিক্ষামন্দির প্রতিষ্ঠিত করিতে কালব্যাজ করে নাই। উন্নতিপ্রয়াসী সজীব জাতিমাত্রই এই অত্যাবশ্যক বিষয়ে মনঃসংযোগ করিল, কেবল বাণিজ্যগর্বে গরীয়ান্ ইংলওই কিছুদিন এই বিষয়ে কতকটা অনবহিত রহিল।

বহু শতাব্দী ধরিয়া ইংলও বাণিজ্যজগতের অগ্রণী ছিলেন; ইংরেজগণ বহুপুরুষ ধরিয়া পণ্যশালায় ও পণ্যবীথিকায় বাণিজ্যসম্পর্কিত আবশ্যক জানানুর্জন করিতেন। ইংরেজগণ বহু

পুরুষ ধরিয়া পণ্যাজীব ছিলেন, সুতরাং পণ্যাজীবের কার্যে তাঁহাদের চৈতন্য সম্পাদন।

একটা কোলিক দক্ষতা জন্মিয়াছিল। ইংরেজ বণিকগণ তখন মনে করিতেন, ব্যবসায়-বুদ্ধি তাঁহাদের অনন্যোপভোগ্য নিজস্ব সম্পত্তি; প্রকৃতি দেবী উহাতে তাঁহাদিগকে একাধিপত্য প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু কিছুদিন পূর্বে তাঁহারা সবিস্ময়ে দেখিলেন, যে সকল দেশে কেবল তাঁহাদিগেরই পণ্যবীথিকা সজ্জিত ছিল, যে সকল দেশে অল্প কেহ তাঁহাদের সহিত বাণিজ্যক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রসর হইতে পারিলে

এ কথা তাঁহারা কখন কল্পনাও করেন নাই—সেই সকল দেশে জর্মন দেশীয় বণিকগণ শনৈঃ শনৈঃ প্রবেশলাভ করিতেছেন এবং অল্পে অল্পে তাঁহাদিগকে স্থানচ্যুত করিতেছে। নবাগত বণিকদিগের কার্য্যতৎপত্তা ও বাণিজ্য-কৌশল দর্শনে ইংরেজ চমৎকৃত হইলেন। তাঁহারা ক্রমে এ বিষয়েব অনুসন্ধান করিতে আবশ্য করিলেন। বাণিজ্যসম্পর্কিত বাণ্যপারে উন্নত বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রদানই যে আগন্তুকদিগের অভ্যুদয়ের কারণ, তাঁহাদিগের তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তাঁহারা দেখিলেন এবং বুঝিলেন যে, বেলজিয়ামে, ফ্রান্সে, জার্মানিতে, অষ্ট্রিয়ায় ও মার্কিণে জনসাধারণকে বাণিজ্য শিক্ষার বিশেষ সুবন্দোবস্ত কবিয়া দেওয়া হইয়াছে। অগত্যা ইংরেজগণ বাণিজ্য শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে বিশেষ মনোযোগী হইলেন। আজ পঞ্চাশ বৎসর কালের মধ্যে মার্কিন মূল্যে নগবে নগবে বাণিজ্য-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। লক্ষ মার্কিন ছাত্র এই সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতেছে।

ইংরেজগণ বুঝিলেন, বাণিজ্য-শিক্ষার সুব্যবস্থা না করিলে অশ্রান্ত জাতিব সহিত প্রতি-
 কার্য্যাবস্ত ও
 সাফল্যলাভ ।
 ঋদ্ধিতা করা অসম্ভব হইবে। সে আজ পঞ্চদশ বর্ষের কথা। তখন লণ্ডন চেষ্টাব অব ব'মাস'এ বিষয়ে তদানুসন্ধানকরে ও বাণিজ্য-শিক্ষার ব্যবস্থানির্ধারণোদ্দেশ্যে একটি 'স্পেশাল কমিটি' নিযুক্ত করিলেন। সেই হইতে ইংলণ্ড এবিষয়ে বিশেষ অগ্রসর হইয়াছেন। এখন ম্যানচেষ্টার ও বার্মিংহাম বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বাণিজ্য-শিক্ষার্থী কৃতী ছাত্রদিগকে “ডিপ্লোমা” ও পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছে।

ভারতে শিল্প-শিক্ষার স্থায় বাণিজ্য-শিক্ষাও অনাদৃত ও উপেক্ষিত। আমাদের যে যৎ-
 ভাবতের সুবিধা ও
 অভাব ।
 কিস্কিৎ শিল্প অবশিষ্ট আছে, তাহাও সাহচর্য্য ও ব্যবসায়্যভিজ্ঞতার অভাবে নষ্ট হইতে বসিয়াছে। আমাদের দেশেব লোকের স্বাভাবিক বাণিজ্য-বুদ্ধির অভাব নাই। বাণিজ্য ও অর্থসম্পৃক্ত ব্যাপারে আমাদের দেশের কতকগুলি প্রাকৃতিক সুবিধাও আছে। কিন্তু তথাপি আমরা বাণিজ্যনিযায় অশ্রান্ত জাতির ন্যায় উন্নতি লাভ করিতে পারি নাই। ইহার কারণ, প্রথমতঃ আমাদের দেশেব বণিকেরা চক্রবক্ষ হইয়া কায় কবিত্তে জানে না, দ্বিতীয়তঃ কেবলমাত্র ব্যবসায়-শিক্ষার দাব্য যে আজনির্ভর করিবার শক্তি আছে, আমাদের তাহাবও অভাব।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতের শিল্পোন্নতির ও বাণিজ্যোন্নতির যে সমস্ত পরিপন্থী কারণ দৃষ্ট হইতেছে, যুরোপেব ব্যবসায়োন্নতির প্রারম্ভকালেও ঠিক সেই সমস্ত পরিপন্থী কারণই বর্ত্তমান ছিল। কারণগুলি এই :—একজন বণিক আমরণ পরিশ্রম করিয়া একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত করিলেন ; কিন্তু তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চউপাধিভূষিত পুত্র সে কার-
 উন্নতির অন্তরায় ।
 বারের প্রতি আদৌ মনোযোগী হইলেন না। অনেক সময় শিক্ষিত বণিক-

পুত্রের পিতৃব্যবসাতে ঘৃণা ও বিদ্বেষ জন্মে। শিক্ষিতের বৃত্তির প্রতি পূর্বেই তাঁহার আসক্তি আছে, অথবা তিনি স্বাধীন ভ্রমলোকের মত জীবন-যাপন করিতে চাহেন। বণিকপুত্র যদি অশিক্ষিত হয়েন তাহা হইলে তিনি অনেক স্থলে পিতার জীবনব্যাপী পরিশ্রমেব ফল সেই ব্যবসায়টি নষ্ট করিয়া ফেলেন। অনেক সময় পুত্র যদি পিতার কার্য্যে মনোযোগী হয়েন, তাহা হইলেও

অতিদক্ষিতা-ক্ষেত্রে সে কারবার বিশেষ উন্নতিলাভ করিতে পাবে না ; অনেক সময় তাহার উন্নতি অতি সঙ্কীর্ণ গভীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে ।

একপ ঘটনা স্বাভাবিক । বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা যে সমস্ত মনোবৃত্তির উদ্যোগ করিয়া দেয়, ব্যবসায়-ক্ষেত্রে তাহা কোনও প্রয়োজনেই আইসে না । অশিক্ষিত ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশই হয় না । যদি বণিকপুত্রগণ বিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ব্যবসায় শিক্ষার উন্নত বিদ্যামন্দিরে শিক্ষালাভ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সাধারণ নিদান কথা ।

বুদ্ধি পরিমার্জিত এবং ব্যবসায়-বুদ্ধি বিকশিত হয় । একপ ক্ষেত্রে তাঁহারা নৈতিক কারবারের বিশেষ উন্নতিসাধন করিতেও সমর্থ হইবেন । ইহাতে কারবারের উন্নতির গতি ভঙ্গ হয় না ; পরন্তু উন্নতি-চেষ্টার আবশ্যক পারস্পর্য্য বন্ধিত হয় । ইংবেচ্ছ-জাতির ব্যবসায়ের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে জানা যায় যে, তাহাদের অতি বিস্তীর্ণ ও বিরাট কারবারগুলি শতবর্ষমাত্র পূর্বে অতি সামান্য ছিল । পুরুষপম্পরার চেষ্টায় তাহারা একপ বিরাট আকার ধারণ করিয়াছে । পক্ষান্তরে ভারতে কোন ব্যক্তি যদি জীবনব্যাপী শ্রমের ও অসামান্য প্রতিভার ফলে কোন কারবার স্থাপিত করিয়া যান, তাহা হইলে সে কারবার আর অধিক দিন স্থায়ী হয় না । বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিগণের ব্যবসায়ের প্রতি অবজ্ঞা ও অশিক্ষিত ও স্বশিক্ষিত ব্যক্তিগণের অকর্মণ্যতাই তাহার কারণ ।

প্রতীচ্য ব্যবসায় ব্যাপার কিরূপ বিরাট হইয়া দাড়াইয়াছে তাহারা কেবল গৃহে বসিয়া থাকেন, তাহারা তাহা বুঝিতে একান্ত অক্ষম । তাহারা বিদেশে যাইয়া কর্তব্য নির্ণয় কেবল উপর উপর ঐ সকল ব্যবসায় দেখিয়া আইসেন, তাহারাও উহা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না । যুরোপেব এক একটি বড় কারবারে লক্ষ লক্ষ লোক কায করিতেছে কলের সাহায্যে শত জনের কায এক জনে করিতেছে ; এক একটি কারখানায় এইরূপ শত শত কল অবিশ্রাম চলিতেছে, শত দিকে শত প্রকারের কায হইতেছে, ইহা দেখিলে ঐ কারবারের প্রধান কার্য্যাধ্যক্ষ কি উপায়ে তাহার বুদ্ধি স্থির রাখিয়াছেন, তাহা ভাবিয়াই অবাক হইতে হয় । ব্যবসায়-সম্পর্কে উচ্চশিক্ষালাভ না করিলে একপ কার্য্য পরিচালন করা সম্ভবে না ; কেবল কারবারে “শিক্ষানবিশী” করিলে উহার শিক্ষা হয় না । আমাদের দেশের বড় বড় ব্যবসায়গুলি যুরোপীয় মানেজারের পরিদর্শনাধীন । যুরোপীয় কারবারের তুলনায় দেশীয় অতি বৃহৎ কারখানাও অতি সামান্য, তুচ্ছ, নগণ্য । আর কতকগুলি দেশীয় আড়তে বা কারবারে দেশীয় পুরাতন ধরণের কার্য্যাধ্যক্ষ বা কর্তা আছেন । এই কর্তাকে সকল কাযই করিতে হয় । তিনি একাধারে খরিদদার, যাচনদার, বিক্রেতা, ধনবক্ষক, হিসাবরক্ষক, ওদার সরকার ও প্রভুর খাস মুন্সি । জুই তিন জন মুখ সরকার লইয়া তাঁহাকে কায চালাইতে হয় । একপ লোকের পরিদর্শনাধীনে কিছু দিন বেশ কায চলে, কিন্তু হিসাবপত্রের গণারীতি পরিদর্শন হয় না । সুতরাং কিছু দিন কায চলিয়া কুলনাশা কুলঙ্কযাব সিকতাময় তীরে নিশ্চিত সৌধের মত, ভোজবাজীর তাসের ঘরের মত, আকাশে আতস বাজীর আসমান তারার মত সে ক্ষণস্থায়ী কারবার কোথায় চলিয়া যায়, পনে তাহার চিহ্ন পর্য্যন্তও পাওয়া যায় না । লেখক বলেন, এইরূপ ভাবে ব্যবসায় চালাইলে ভারতের বাণিজ্য কখনও সমৃদ্ধিত হইতে পারিবে না । এখন প্রতিদ্বন্দ্বির সমতুল্য গ্রহণ লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতার আসরে নামিতে হইবে । সুতরাং বাণিজ্য শিক্ষার স্বব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যিক ।

বিবিধ ।

তাম্বুল ।

আমাদের দেশে কোন্ সময় হইতে তাম্বুলের ব্যবহার আনক হইয়াছে, তাহার স্থির নির্ণয় করা অসম্ভব । অতি প্রাচীনকালে হিন্দু নৃপতিগণ তাঁহাদের প্রাসাদে তাম্বুল প্রস্তুতব জন্ত একটি বিভাগ রাখিতেন, বর্মীগণই সেই বিভাগের কর্মচারিণী নিযুক্ত হইতেন । এই সকল কর্মচারিণীগণের নাম ছিল তাম্বুলকরকবাহিনী । সংস্কৃত সাহিত্যে বহুস্থানে ইহাদের উল্লেখ আছে । এই বিভাগটি বোধ হয় পাটনাগরই কল্পরাধীনে ছিল । বাঙ্গালার তাম্বুলের বহুল প্রচলন । কবিকঙ্কন খুলনাকে বাস-গ্রহে গমনকালে “হাতে তাম্বুলের বাটা” দিয়া পাঠাইয়াছিলেন । ভারত রাজবাড়ীর কবি ; তাঁহান মিঠা হাত । তাই তিনি “মিঠা পান মিঠা গুণা”র কথা বলিয়াছেন । আর হেমচন্দ্র ‘বাঙ্গালীর মেয়ের’ বর্ণনায় “তাম্বুলে তামাকুবস—রাঙা রাঙা চৌচৌর” কথা বলিয়াছেন । যাহা হউক, পান কি একাবে জনসমাজে চর্য্যাক্রমে ব্যবহৃত হইতে আনন্ত হয় সে সময়ে প্রাপ্ত এ, ই, আদুল আলি সাহেব ‘আর্গাল অব দি মস্লেম ইনস্টিটিউট’ নামক পত্রে একটি আতি কোতুলোদ্যোগক কিম্বদন্তী প্রকাশিত করিয়াছেন । সে কিম্বদন্তীটি এই :—

অতি প্রাচীনকালে ভারতের অনেক রাজরাজেশ্বর চণ্ডবর্তী জ্বররোগ্য অজীর্ণরোগে শয্যা-শায়ী হইয়া পড়িয়াছিলেন । রাজাকে নিরাময় করিবার জন্য রাজবৈদ্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহান সমস্ত চেষ্টাই বিফল হইল । তখন পাতনামা প্রণিতযশা ভিক্ষুদিগকে গান্ধীব জন্ম নানা দিগ্দেশে দূত ধাইল । দূত দূত চিকিৎসক সম্রাটের প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন । সকলেই বচন আওড়াইলেন, আপনাত চিকিৎসানৈপুণ্যের কথা আপনিই গাহিলেন, ঔষধ, অনুপান মহাপান প্রভৃতির কন্দ করিলেন,—সকলেই বলিলেন “আমি এইরূপ মহত্ব মহত্ব রোগীকে নিরাময় করিয়াছি” ক্রমে একে একে সকলেই সম্রাটকে চিকিৎসা করিলেন, কিন্তু কেহই সম্রাটের বোগগ্রাসনে সমর্থ হইলেন না । সম্রাটের অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ-মন্দ হইয়া উঠিল । মরিগণ উদ্ভিগ ও চিন্তিত হইলেন । রাজপরিবারের ব্যক্তিগণ হতাশ হইয়া পড়িলেন । তখন সকলে পরামর্শ করিয়া এই মর্মে ঘোষণা প্রচার করিলেন যে, যে বৈদ্য সম্রাটকে আরোগ্য করিতে পারিবেন, তাঁহাকে বিপুল ধনের অধিকারী করা হইবে ।

ঘোষণা-প্রচারের পর অনেক আতি সামান্য পরিচ্ছন্ন পরিহিত চিকিৎসক রাজাকে চিকিৎসা করিবার জন্য রাজসভায় সম্মত হইলেন । এই নবগত ভিক্ষকের নামও অনেক আনন নাই । অন্য চিকিৎসকগণ তাঁহাকে অবজ্ঞার ও সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন । মরিগণ এখনেই এইরূপ একজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির হস্তে রাজার চিকিৎসাতার ন্যস্ত করিতে অসম্মত হইলেন । কিন্তু তখন সকলেই চেষ্টাই বিফল হইয়াছে ; সুতরাং অগত্যা তাঁহান এই নবগত চিকিৎসকের হস্তে সম্রাটের চিকিৎসাতার ন্যস্ত করিতে সীকার করিলেন । চিকিৎসক তখন একটি লতার পাতা, শুপারী চূর্ণ ও খদিরের সহিত রাজাকে

ভোজনাশ্বে চর্ষণ করিতে দিলেন। প্রবাল, মতি, চূণিভস্ম সংবলিত ঔষধে বাঁহার রোগ আরোগ্য হয় নাই, তাঁহাকে এই সামান্য ঔষধ ব্যবস্থা করা হইল দেখিয়া অন্যান্য চিকিৎসক-গণ হাসিলেন। কিন্তু বিশ্বাসের বিষয় এই যে, মাত্রাটি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নিরাময় হইয়া উঠিলেন। অচিরে সেই রাজ্যমধ্যে পানের ব্যবহার প্রচলিত হইল। ক্রমে সমগ্র ভারত, লক্ষা, মালয়দ্বীপপুঞ্জ, ব্রহ্ম, পূর্ব উপদ্বীপ সর্বত্রই তাবুলের ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই এদেশে তাবুলের ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। কেবল ওষ্ঠাধর রঞ্জনের জন্য পান ব্যবহৃত হয় না, ইহা ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাকের সহায়তা করে বলিয়াও সমধিক আদৃত হইয়া থাকে। ‘হিতোপদেশে’ বিষ্ণু শর্মা তাবুলের বহু গুণ বর্ণিত করিয়াছেন। দিল্লীর আমীর খসরু তাবুলের পঞ্চচক্রাংশু গুণের বর্ণনা করিয়াছেন। আইন ই-আকবরীতেও আবুল ফজল নাগবন্দী পর্ণের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন।

তাবুলের ব্যবসায় বিশেষ লাভজনক। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বহুদিন ধরিয়া তাবুল ও ওপারীর ব্যবসা করিতেন। ইহা লতাবিশেষের পত্র, ঐ লতার সংস্কৃত নাম নাগবন্দী। উষ্ণ-প্রধান দেশেই পান জন্মে। পানের চাষ অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। ইহাতে জনসেকও অতি সাব-ধানে করিতে হয়। আবুল ফজল লিখিয়াছেন যে, তাঁহার সময় তাবুল-লতায় ছুঁক ও তিল-তৈল সেচন করা হইত। এখন যুগোপীয়গণ তাবুল ব্যবহার করেন না সত্য, কিন্তু তাঁহাদের দরবারে আতর ও পান বিতরণের ব্যবস্থা আছে। ভারতীয় সমাজে পান সন্ত্যক্তার অঙ্গ ও লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

রজনীকান্ত সেন।

—:~:~:~:—

শান্ত গীত শান্ত কণ্ঠে—নির্ঝাণ বেদনা ;

বঙ্গে শুধু ভাসে তব সঙ্গীত-মুচ্ছনা।

মৃত্যু আনিয়াছে মুক্তি, লভেছ বিশ্রাম।

তোমার সঙ্গীতে তব মৃত্যুজয়ী নাম।

—:~:~:~:—

গ্রন্থ-পরিচয় ।

—:—

বসন্তে যেমন কুসুমের প্রাচুর্য্য—কোন কোন বিশেষ ঋতুতে তেমনই পুস্তকের প্রাচুর্য্য লক্ষিত হয় । ভিন্ন ভিন্ন দেশে—অবস্থানভেদে এই সময়ের বিভিন্নতা দেখা যায় । বঙ্গদেশে শারদীয়া পূজার পূর্বেই বহু পুস্তক প্রকাশিত হয় ।

“শাবদ-পার্কণে,

হর্ষে মগ্ন বঙ্গ যবে পাঠিয়া মায়েরে

চিব-বাঁজা”—

তখনই বাঙ্গালার উৎসব । নিদাঘের পব বর্ষার বর্ষণে স্নিগ্ধ ধরাবক্ষে শস্ত-সম্পদসম্ভার বাঙ্গালীর হৃদয়ে অসীম আশার ও আনন্দের সঞ্চার করে । তখন নদী জলভারে পূর্ণ, প্রান্তর পক্ষ ধাত্তে শোভাময়, ভূমি কাণপুষ্পে শুক্লীকৃত, জলাশয় বিকশিত শতদলে সুন্দর, আকাশ বর্ষণলবু সঞ্চরণশীল শুভ্র অস্ত্রে খচিত, প্রকৃতি শোভাময়ী । এই সময় বাঙ্গালী বর্ষব্যাপী শ্রমের পর উৎসবানন্দে শ্রমশ্রাস্তি অপনোদিত করে । শরতে তাহার কর্মকান্ত জীবনে বিশ্রাম—আনন্দ—সুখ ।

এই শরতে বাঙ্গালী সাহিত্যের সাহচর্য্যে সুখসম্ভোগ করে । তাই এই সময় বাঙ্গালায় বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয় । কেহ নূতন,—কেহ পুরাতন—পরিচিত—প্রিয় নূতন পরিচ্ছেদে উপনীত । যে সকল গ্রন্থ আগাদিগের হস্তগত হইয়াছে, সে সকলের সমালোচনার স্থান ‘আর্য্যাবর্ত্তে’ নাই । তাই আমরা প্রাপ্ত গ্রন্থগুলির পরিচয় দিয়াই নিরস্ত হইলাম ।

নবীনা ।*

জীবনব্যাপী সাহিত্য-সেবার পর পরিণত বয়সে গ্রন্থকার পরলোকগত হইয়াছেন । এই পুস্তক তাঁহার মৃত্যুর পর প্রকাশিত । তিনি প্রবীণ ও নবীন সাহিত্যসেবীদিগের মধ্যে বন্ধন ছিলেন—দুই সম্প্রদায়েরই অঙ্কা আকৃষ্ট করিয়া ছিলেন ; তাহার প্রধান কারণ, তাঁহার অনলস সাহিত্য-সেবা । তাঁহার রচনায়

* নবীনা—দামোদর মুখোপাধ্যায় প্রণীত ; কলিকাতা, ১১০৪, এ প্রকৃতি হইতে প্রীতগোপনাথ মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত । মূল্য দুই টাকা ।

অসাধারণ প্রতিভার প্রদীপ্ত আনোকবিকাশ না থাকিতে পারে; কিন্তু তিনি সাহিত্য-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া বঙ্গসাহিত্যে যে বহু রচনা-সম্পদ দান করিয়াছেন তাহা সাহিত্যাত্মকভাবে স্বীকৃত সৌন্দর্য্যে সুন্দর। এ অবস্থায় তাঁহার মৃত্যুর পর প্রকাশিত তৃতীয় গ্রন্থের সমালোচনা করিতে স্বতঃই সঙ্কোচ বোধ হয়।

গ্রন্থের নায়ক জ্ঞানেন্দ্রনাথ দেবোপমচরিত্র; রসিকা, সুন্দরী, পতিগতপ্রাণা ভাৰ্য্যা পাইয়া সুখী। গ্রামের কুলবাণী বিধবা—সুন্দরী নবীনা কুলোকেব প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষার্থ জ্ঞানেন্দ্রনাথের সাহায্যপ্রার্থী হইল; তাঁহাকে দেখিয়া উদ্ভ্রান্ত হইল ও বহু কৌশলে মুহূর্তের জন্য তাঁহাকে পাপপথের পথিক বরিল। জ্ঞানেন্দ্রনাথ এই ক্ষণিক অধঃপতনের জন্য আত্মানির তুষানলে প্রায়শ্চিত্ত করিলেন, নবীনা তাঁহাকে না পাইয়া অত্যন্ত শূথের সন্ধান করিল; কারণ, “যে মজিয়াছে, সে ফোথাও স্থির থাকিতে পারে না।” কিন্তু পাপে সুখ নাই। সে শেষে ইহা বুঝিল, বুঝিয়া “ধর্ম্মাশ্রুতানে রত থাকিয়া এবং হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া অতি দীনভাবে” কানীতে বাস করিতে লাগিল। জ্ঞানেন্দ্রনাথের “স্বর্ণ-হৃদয় অশ্রুতাপে দগ্ধ হইয়া ‘বিশুদ্ধ শ্রামিকারূপে’ পরিণত” হইল। তিনি পুনরায় পত্নীপ্রেমে সুখী হইলেন।

এই গ্রন্থে গ্রন্থকার বুঝাইয়াছেন, মানুষ পুরুষের নৈতিক শিথিলতা “উপেক্ষার বিষয় বলিয়া মনে করে, কিন্তু নারীচরিত্রে তাহার শতাংশের একাংশ অপূর্ণতা দাঁটলে মানবসমাজ সেই নারীকে চিরকলঙ্কিত জ্ঞান করিয়া ঘৃণা করিতে থাকে।” তিনি বুঝাইয়াছেন, “যাহাদিগের নিকটে আমাদিগের পরম সমাদরের বস্তু সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছে, যাহাদিগের হস্তে আমাদিগের সমাজ-সংস্থিতির সার পদার্থ-স্বরূপ সত্যবর্ণনা রক্ষা করিবার ভার অর্পিত রাখিয়াছে, তাহাদিগেব চরিত্রগঠন ও বিহিত শিক্ষা প্রদান বিষয়ে আমরা যথেষ্ট মনোযোগ দিই না। * * * * * শৈশবকাল হইতে বালিকার হৃদয়ে সুনীতি সঞ্চার করিবান্ন যথাবিহিত যত্ন করিলে, চরিত্র-সংগঠনের নিমিত্ত যেকোন শক্তির প্রয়োজন, ততাবৎ কিশোরের হৃদয়ে বক্তৃতা কবিতা দিলে, ত্যাগ-ধীকার, ধর্ম্মাশ্রুতান, জ্ঞানপরতা প্রভৃতির বীজ সেই কোমল ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত করিয়া দিলে, বোধ হই, তাহার আন্তরিক বল আরও সংবদ্ধিত হয় এবং অতি ক্ষুদ্র কারণে বা অতি তুচ্ছ ঘটনায় আলোড়িত হইয়া, তাহাকে অধঃপতিত হইতে হয় না।” তিনি আরও বুঝাইয়াছেন,—

দুতকুন্ত সগা নারী তপ্তাঙ্গারমঃ পুমান্।

তস্মাদ্ দ্বতকং বহিষ্ক নৈকত্র স্থাপয়েন্ বুধঃ।

কিন্তু তিনি যে বলিয়াছেন, “শিথিলতা ও ভঙ্গুরতা জী-চরিত্রের এক প্রদান নিদর্শন” তাহা যে পুরুষচরিত্র সম্বন্ধেও প্রযোজ্য গ্রন্থে তাহা দেখা যায় । নারকের ক্ষণস্থায়ী দৌর্ব্বল্যের কথায় তিনি বলিয়াছেন, “তখন জ্ঞানেন্দ্রনাথ উদ্গাদ, তখন রূপের অনল তাঁহার সকল পবিত্রতা ভস্ম করিয়াছে, তখন ভোগ-বাসনার প্রবাহ তাঁহার বিবেক ও জ্ঞানকে ভাসাইয়া দিয়াছে, তখন পাশব আকাজক্ষা তাঁহার সকল সতর্কতা উন্মূলিত করিয়া দিয়াছে ।” আবার লাবণ্যের চরিত্রে তিনি রমণীর স্বভাবজ দেবীভাবই দেখাইয়াছেন ।

গ্রন্থমধ্যে গ্রন্থকার বহুবিধ বিষয়ী মানবের চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, তিনি দেখাইয়াছেন, ইন্দ্রিয়দমনে চিত্তসংযমে, প্রলোভন পরিহারে মনুষ্য । তিনি দেখাইয়াছেন, স্বার্থ মানুষ্যকে পশু করে । তিনি দেখাইয়াছেন, আপনার মানসিক শক্তিতে অত্যধিক বিশ্বাস অনেক সময় মানুষের সতর্কতা শিথিল করাইয়া তাহাকে অধঃপতিত করে । বক্ষিমচন্দ্রের প্রতাপ নৈবলিনীর বিয়ের ভয়ে বেদ-গ্রাম ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাই তিনি আদর্শ মানব ; আর দামোদর বাবুর জ্ঞানেন্দ্রনাথ আত্মশক্তিতে অতিরিক্ত বিশ্বাস করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার অধঃপতন ।

গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনার গতি অতি দ্রুত—স্থানে স্থানে অনাবশ্যক দ্রুত । দ্রুতগামী বাষ্পীয়যানে যাত্রীর পক্ষে যেমন প্রকৃতির শোভা সমাক্ষ উপভোগের সুযোগ হয় না, পরন্তু প্রাকৃতিক দৃশ্যের ক্রমাগত পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে না পারায় দীর্ঘ পথ অতিক্রমণের পর প্রভূত পরিবর্ত্তনে বিম্মিত হইতে হয়—এ গ্রন্থেও তেমনই চরিত্রের বিশ্লেষণ ও ঘটনার বিকাশ লক্ষ্য করা যায় না, পরন্তু লক্ষিত পরিবর্ত্তন অদাধারণ বলিয়াই বোধ হয় । পশ্চিমমধ্যে নবীনার নিকট রত্ননাথের মনোভাব বিজ্ঞাপন, নবীনার লক্ষ্মীনগরে আগমন প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত । ধর্ম্মরক্ষার জন্য ব্যাকুল ও জ্ঞানেন্দ্রনাথের শরণাগতা নবীনার পক্ষে সহসা জ্ঞানেন্দ্রলাভলাভসাম্য সর্কস্বপন ও প্রশংসাপ্রফুল্ল নোত্রে প্রেমময়ী পত্নীকে দেখিয়া ফিরিতে না ফিরিতে জ্ঞানেন্দ্রনাথের পক্ষে নবীনার মোহে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিস্মরণও উল্লেখযোগ্য । ‘কণ্ঠ-মালা’র নাগিতানীর সহিত ‘নবীনার’ নাপিত বোর তুলনায় এ কথা বুঝা যাইবে । বোধ হয়, গ্রন্থকার গ্রন্থখানির সংশোধন ও প্রসাদন সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারেন নাই । তাঁহার অনাহতগতি—স্বচ্ছ ভাষায় দুই এক স্থানে ক্রটিও বোধ হইতে পারে। তাই কারণেই লক্ষিত হইল । ১৩৮ পৃষ্ঠায় “কাশী”—“প্রয়াগ” হইবে কি ?

গ্রন্থকার গ্রন্থমধ্যে বর্ণিত যথাসম্ভব পরিহার করিয়াছেন ; কিন্তু তিনি যে বর্ণনাকুশল গ্রন্থ মধ্যে তাহার বহু প্রমাণ আছে ।

গ্রন্থের দুইটি ভ্রূটের উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না। গ্রন্থকার “কচিবাগীশ-দিগের” প্রতি বক্র কটাক্ষপাত করিয়া বলিয়াছেন, তাঁহাদের জন্ত অনেক কথা পরিত্যাগ করিয়াছেন। তথাপি ঠাকুরদাসের সহিত জ্ঞানেন্দ্রনাথের কথোপকথনের, লাবণ্যের সহিত জ্ঞানেন্দ্রনাথের কথোপকথনের, বিপলা নবীনাকে লইয়া লাবণ্যের রহস্যলিপির ও ভজহরির সহিত কৈবর্তের কথোপকথনের দুই এক অংশ পরিত্যাগ করিলে যে গ্রন্থখানি আরও সুন্দর হইত তাহাতে সন্দেহ নাই। দ্বিতীয় ভ্রূটের জন্ত দায়ী প্রকাশক। ২০০ পৃষ্ঠার পুস্তকের মূল্য দুই টাকা কিছু অধিক বোধ হয়।

গ্রন্থের কাগজ ও ছাপা—বাহিরের মৌল্য সর্বতোভাবে গ্রন্থের উপবৃত্ত।

কাশ্মীরে বাঙ্গালী যুবক।*

মানবচরিত্রে অপরিমিত অভিজ্ঞতার অধীশ্বর সেক্সপীয়ারের মানসপুত্র কুমার-কায় ওথেলো সুন্দরী ডেস্‌ডিমোনা নিকট—

“—Spoke of most disastrous chances,
Of moving accidents by flood and field;
Of hair-breadth 'scapes i' the imminent deadly
breach ”

তাহাতে ডেস্‌ডিমোনা মুগ্ধা ও ওথেলোর প্রতি আকৃষ্ট হইতেন। সর্বদেশে—সর্বকালে একশ্রেণীর পাঠক এইরূপ বিষ্ময়কর ঘটনাবলি,—বিষম-বিপদ-বিজ-ড়িত, আশ্চর্য্য উদ্ধারকথায় পূর্ণ গল্প পাঠ করিতে ভালবাসেন। এইজন্য সকল দেশেই এইরূপ গল্প রচিত ও প্রকাশিত হয়। এই সকল উপন্যাসে চরিত্রবিবেচনা বা চিত্রাঙ্কনে বিশেষত্ব না থাকিতে পারে, উপন্যাসের উচ্চ আদর্শ অক্ষুণ্ণ না থাকিতে পারে—উপন্যাসের লোকহিতকর উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ না হইতে পারে; কিন্তু লোকচিত্তরঞ্জন হইয়া থাকে। এই লোকচিত্তরঞ্জনও উপন্যাস-রচনার অত্যন্ত উদ্দেশ্য। ইংলণ্ডে উইল্কিন কলিন্স প্রভৃতি বহু প্রতিভাবান লেখক এইরূপ উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। আবার তাঁহাদিগের মধ্যেই সমাদর হয় নাই বলিয়া সুইনবর্নের মত প্রসিদ্ধ সাহিত্য সমীক্ষক পাঠক-সম্প্রদায়কে অকৃতজ্ঞ বলিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই।

* কাশ্মীরে বাঙ্গালী যুবক—শ্রীস্বরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, বি. এল, প্রণীত। প্রকাশক শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী, বি. এল, আমলমঠ বাজার, কটক। মূল্য ১ টাকা।

বাঙ্গালার একপ উপজাতি নাই, এমন নহে ; তবে সংখ্যায় অল্প । বর্ধমান পুস্তকখানি এই শ্রেণীর উপজাতি । ইহাতে বাঙ্গালী যুবকের জীবনের বিচিত্র ঘটনাবলী বর্ণিত হইয়াছে ; বনমধ্যে ব্যাঘ্রের সহিত হস্তীৰ যুদ্ধ, পর্বতপথে পতনশীল অশ্বের গতিরোধ, সন্মুখসংগ্রাম, বিস্মাঘাতকের করে বন্দিদশাপ্রাপ্তি, স্তম্ভপথে পলায়ন, দস্যুহস্তে পতন প্রভৃতি বহু বিস্ময়কর ও কোমলহৃদয়াদীপক ঘটনার সমাবেশ আছে । লেখক যে এই সকল ঘটনাকে সম্ভবতঃ স্বপ্নে বদ্ধ করিতে পারিয়াছেন, ইহা তাঁহার কৃতিত্বের পরিচায়ক সন্দেহ নাই । বিশেষ সমস্ত গল্পের উপর প্রেমের সমুজ্জল আনোকপাতে গদ্যটি স্নেহব হইয়াছে । প্রেম অঘটনঘটনক্ষম—তাই গল্পের অসম্ভব ভাগও সম্ভব বর্ণিত বোধ হয় ।

এই পুস্তক যে বাঙ্গালার এক শ্রেণীর পাঠকের নিকট আদৃত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই ।

গ্রন্থের ভাষাব প্রশংসা করা অসম্ভব । ইহা লেখকের প্রথম বাঙ্গালী রচনা কি না, আমরা অবগত নহি । কিন্তু তিনি সুস্বাদু ও বর্ণনাকুশল । অথচ তাঁহার ভাষা একান্ত অসংস্কৃত, স্থানে স্থানে ভাষার দোষে বক্তব্য বিষয় ছর্কোদ হইয়াছে । “রাজে”, “চক্ষে” “হাঁস” প্রভৃতি বহুস্থানেই ব্যবহৃত হইয়াছে । “যে বিচ্ছেদ মৃত্যুর ছায়াস্বরূপ তাহার গভীরতা অভয় থাকে,”—“স্বপ্নের ছায় সুগিষ্ঠ নুপুরের শব্দ,”—প্রভৃতি পদও প্রচুর । লেখক সংস্কৃত শব্দের সহিত প্রচলিত কথোপকথনে ব্যবহৃত শব্দ যেরূপে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা প্রশংসনীয় নহে । ভাষার নমুনা এইরূপ—“তাঁহার পব চয়মাস, ঘটনাপূর্ণকাল, যাহা কি একটী জীবনের পক্ষে যথেষ্ট হইতে পারে, গত হইয়াছে ।” (২০ পৃষ্ঠা)—“পথ এত দীর্ঘ এবং যাইতে এত দীর্ঘ সময় লাগিবে, আমি কল্পনা করিতে পারিলাম না আগরা এক সময়ে আমাদের গন্তব্য স্থানে উপনীত হইতে পারিব । (১৩ পৃষ্ঠা)

পুস্তকের কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট ।

রামদাসগ্রন্থাবলী ।*

যখন ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা, সাহিত্য ও শিল্প সম্বন্ধে যুরোপীয়দিগের, ও সঙ্গে সঙ্গে যুরোপীয় শিক্ষার শিক্ষিত ও যুরোপীয় দীক্ষার দীক্ষিত ভারতবাসী-

* রামদাস-গ্রন্থাবলী—প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ—১ রামদাস সেন প্রণীত । বঙ্গমঙ্গল হইতে জীবনমোহন সেন কর্তৃক প্রকাশিত । মূল্য চারি টাকা ।

দিগের ভ্রান্তধারণার অবধি ছিল না, তখন ছুইজন বাঙ্গালী সেই ভ্রান্তধারণার অপনোদন করিয়া ভারতবর্ষে প্রাচীন সভ্যতার, সাহিত্যের ও শিল্পের স্বরূপ-প্রকাশে বন্ধপরিকর হইয়াছিলেন। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও শ্রীযুত রামদাস সেন এই দুইজন বাঙ্গালী প্রবৃত্তির আলোচনার পথপ্রদর্শক। এমিয়াটিক সোসাইটীর পুস্তকাগারে সম্বিত উপাদানের কেন্দ্রস্থলে বসিয়া রাজেন্দ্রলাল যখন ভারতের প্রাচীন সভ্যতা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা দূর করিতেছিলেন—বিদেশী পণ্ডিতদিগকে যুক্তি তর্কে পরাজিত করিয়া বিজয়শ্রী প্রণামে দেশবাসীর হৃদয়ে স্পষ্ট ইতিহাস চর্চার বাসনা জাগরিত করিতেছিলেন, সেই সময় বাঙ্গালার মফঃ-স্বলে বহরমপুরে আপনার পুস্তকাগারে বসিয়া রামদাসও সেই কার্যে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। রাজেন্দ্রলাল ইংরাজীতে স্বীয় গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া সমগ্র সভ্য জগতকে যাহা জানাইয়াছিলেন, রামদাসেব বাঙ্গলা রচনায় তাহা বাঙ্গালীর অন্তঃ-পুরেও ঘোষিত হইয়াছিল। এস্থলে তুলনার সমালোচনা ধৃষ্টতামাত্র। উভয়েই কোবিদ, উভয়েই কর্মী, উভয়েই বাঙ্গালীর অসীম শ্রদ্ধাভাজন। রামদাস বাবু বহুপ্রবন্ধ বঙ্গিমচন্দ্রের ‘বঙ্গদর্শনের’ শোভাসংবর্ধন করিয়াছিল।

রামদাস বাবুর ‘ঐতিহাসিক রহস্য,’ ‘ভারত রহস্য’ ও ‘রত্নরহস্য’ বহু উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের সমষ্টি। এই সকল প্রবন্ধে রামদাস বাবু সংস্কৃত-সাহিত্য-সাগর হইতে সমস্ত সংগৃহীত রত্নবাজি বাঙ্গালীকে উপহার দিয়াছেন। তাঁহার ‘বুদ্ধদেব’ গ্রন্থ গ্রন্থরচনাকাল পর্যন্ত উপহৃত উপাদানের সাহায্যে তিনি শাক্য-সিংহের জীবনী ও ধর্মনীতি সম্বন্ধে যে সকল মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির, বিশ্লেষণ ও সংযোজন শক্তির ও মহাদয়তার পরিচায়ক। প্রবৃত্তিতে শেখ সিদ্ধান্ত নির্ণয় অসাধ্যসাধন। নূতন নূতন উপাদানের আবিষ্কারের ফলে পুরাতন মত পরিত্যক্ত হয়; সুতরাং পরবর্তী আবিষ্কারের ফলে যদি রামদাস বাবুর কোন সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হইয়া থাকে, তাহাতে তাঁহার গৌরব ক্ষুণ্ণ হইবে না। যত দিন বাঙ্গলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হইবে ততদিন রামদাস বাবু গ্রন্থের আদর অবশ্যস্তাবী। তদীয় পুত্রগণ পিতৃদেবের গ্রন্থগুলির এই নূতন সংস্করণ করিয়া বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞাভাজন হইয়াছেন।

সৃষ্টি-রহস্য।*

এই গ্রন্থে প্রথম অধ্যায়ে—প্রাথমিক ত্রিতত্ত্ব :—আত্মা, আত্মজ, আত্মানন্দ ;

* সৃষ্টি-রহস্য—শ্রীমতী ফুলকুমারী গুপ্ত প্রণীত। কলিকাতা, ৯২, কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট হইতে এ.সি.সি. গুপ্ত কতৃক প্রকাশিত মূল্য এক টাকা।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে মৌলিক ত্রিতত্ত্ব :—সৎ-চিত্ত-আনন্দ বা শব্দ-গতি-জ্যোতি ;
তৃতীয় অধ্যায়ে—জগতেব দ্বিতীয়াবস্থা :—সত্ত্ব, রজ, তম ; চতুর্থ অধ্যায়ে—
জগতেব তৃতীয়াবস্থা :—সত্ত্বা, শক্তি, বস্তু ও পঞ্চম অধ্যায়ে জগতেব চতুর্থ-
বস্থা :—কারণ, কর্ম ও আধার আলোচিত হইয়াছে ।

বিষয় যে অত্যন্ত জটিল তাহা বলাই বাহুল্য । হিন্দুদর্শনে এই সকল বিষয়
লইয়া যে আলোচনা আছে, তাহার অধ্যয়নই সময়সাপেক্ষ । বিশেষ এই সম্বন্ধে
বহুবিধ মত ও মিশ্রাংশও বর্তমান । এ অবস্থায় লেখিকা যেকোন সন্ন্য-
ভাবে এই জটিল বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বিশেষ প্রশংসা
করিতে হয় । অশ্রদ্ধে পূর্বকালে বহু জ্ঞানার্জুবাগিনী মহিলা বিজ্ঞানসুশীলনফলে
অক্ষয় যশ অর্জন করিয়া গিয়াছেন । বর্তমান কালেও যে মহিলাবা জ্ঞানতৃষ্ণা
তৃপ্তির জন্য একপ আপাতত নীদস ও জটিল বিষয়ের আলোচনার প্রবৃত্ত হইয়া-
ছেন, ইহা অত্যন্ত সুখের বিষয় । গ্রন্থশেষে লেখিকা বলিয়াছেন—“যাহা শ্রুতি,
তাহাই স্মৃতি, তাহাই পুরাণ, তাহাই তন্ত্র । কাহাকেও উপেক্ষা করিবার উপায়
নাই । সমুদায়ই মহাবিজ্ঞানের মহান তত্ত্ব । কেবল দেশ, কাল, পাত্র, অবস্থায়
উহা রূপান্তরিত ।” গ্রন্থে ইহা প্রমাণেব চেষ্টা হইয়াছে ।

নূতন ।

— ০: —

(১)

কি সুন্দর ধরা—
অগণিত তরুলতা পত্রপুষ্প ভরা ।
কি সুন্দর নীলাকাশ ।
দিবালোকে সপ্রকাশ ;
নিশায় জ্যোৎস্নালোক, তারা হৃদিহরা ।
বিহগের সুধাগানে
আনন্দ-হিল্লোল আনে ;
শাথে শাথে ফুল কুল গাছ আলোকরা ;
বিকশিত ফুলবাসে
মলয়ে মদিরা ভাসে ;
বসন্তে শোভায় ঘুচে ধরণীর জরা ।
চারিদিকে কি সৌন্দর্য্য—কি সুন্দর ধরা !

(২)

এরি মাঝখানে—
তৃপ্ত হৃদয় টানে হৃদয়ের পানে ;
সুখতৃষ্ণা, শত আশা,
সীমাহীন ভালবাসা
পুলক-হিল্লোল আনে সুখালস প্রাণে ;
কঠিন কঠোরে টুটি'
শোভারামি উঠে ফুটি'
হৃদয় বিকশি' উঠে সুখে হৃদি-দানে ;
আকুল আস্থানস্বর
প্লাবে দিগ্‌দিগন্তর,
সুখের আস্থান ভাসে বিহগের গানে ।
কি আনন্দ, সুখরামি—এরি মাঝখানে ।

(৩)

ধরা শোভা ঘর ;
 অনন্ত সুষমা হেথা ফুটে নিরন্তর ।
 নব শ্যাম ছর্ব্বাদলে
 নিশার শিশির ঝালে—
 নিশা-শেষে ফুটে যবে নব রবিকর ;
 দিবালোকে শত শোভা
 মানস লোচন লোভা,
 দীপ্ত ববিকরে শোভে স্ননীল অম্বর ;
 ফুটে ফুল, গাহে পাখী,
 শোভাময় শোভে শাখী ;
 সূর্য্যাস্তে বর্ণের খেলা মেঘমালা'পর ।
 অনন্তসুষমাসয় ধরা শোভাঘর ।

(৪)

তাজিতে কে চায়,
 বিপুলপুলকভরা সূখের ধরায় ?
 হেথা সূখ হৃদি ভরে,
 সূখে সূখ নাহি ধরে ;
 আশার উজল আলো হৃদি উজলায়
 বিরহে ব্যাকুল ব্যথা
 মিলনের আকুলতা !
 জীবনে অঁধার কোথা ? সূখালোক ভায় ।
 হেথা অগণিত সূখ,
 প্রেমে সূখে ভরা বুক ;
 জীবনে আনন্দস্রোতঃ উছলিয়া যায় ।
 এমন সূখের ধরা তাজিতে কে চায় ?

মৃত্যু-মিলন।

—ঃঃ—

দশম পরিচ্ছেদ।

—ঃঃ—

শুভ যাত্রা।

—০—

সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে। রজনীর গাট ছায়ায় প্রাসাদ আবৃত। এক পার্শ্বে একটি কক্ষে রাজা ও শঙ্কর সিংহ পরামর্শ করিতেছেন। রাজার আদেশে সে কক্ষের পার্শ্ববর্তী সকল কক্ষে আলোক নির্বাপিত। কক্ষদ্বার অর্গলবদ্ধ। প্রহরীর প্রতি আদেশ আছে,—সে বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত কাহাকেও রাজার সন্ধান না দেয়; আব কেহ কোন বিশেষ প্রয়োজনে আসিলে প্রহরী আগন্তুককে সোপানগুথে অপেক্ষা করিতে বলিয়া আসিয়া সংবাদ দেয়। এত সতর্কতাতেও যেন উভয়ের আশঙ্কা দূর হয় নাই; উভয়ে অতি যত্নস্বরে পরামর্শ করিতেছিলেন।

পর দিন প্রত্যুষে শঙ্কর সিংহ দূতরূপে যাত্রা করিবেন। তিনি ভিন্ন ভিন্ন রাজসভায় উপস্থিত হইয়া রাজপুত-সত্ব-সংগঠনের প্রস্তাব করিবেন, উদ্দেশ্য—রাজপুতের বিপদে সাহায্য দান করা, বিপন্ন রাজপুত রাজ্যের সহায়তা করা, রাজপুতগৌরবের সমুজ্জ্বলতা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা।

শঙ্করসিংহ কয়দিন পূর্বেই যাত্রা করিতেন। কিন্তু রাজধানীতে বিস্মৃতির ব্যাপ্তি-নিবারণ-চেষ্টায় বাজার অবকাশ ছিল না; তাই তাঁহার গমন ঘটে নাই। আজ কয় দিন ব্যাধির প্রকোপ প্রশমিত হইয়াছে। আর এই কয় দিন উভয়ে পরামর্শ করিতেছেন। গমন-পথ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রস্তাব-প্রণালী পর্য্যন্ত সকল বিষয়েই বিশেষ বিবেচনা ও বিচার চলিতেছিল। যদি কেহ মোগল-শক্তির বিরোধী হইতে ভয় করেন,—কেহ নব-সংস্থাপিত কুটুম্বিতার বন্ধন শিথিল হইবে, আশঙ্কা করেন—সেইজন্য রাজা শঙ্কর সিংহকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন, সকলকে বুঝাইতে হইবে,—মোগল-শক্তির বিরোধী হওয়া এ মিলনের উদ্দেশ্য নহে; রাজপুত-গৌরব, রাজপুত-রাজশক্তি অনাহত ও সমুজ্জ্বল রাখাই সম্মিলনের মুখ্য উদ্দেশ্য। রাজা বুঝিয়াছিলেন, কোনরূপে সম্মিলন—রাজপুত-সত্বগঠন

স্বসিদ্ধ করিতে পারিলে, ক্রমে প্রয়োজনানুসারে কার্য্যসিদ্ধি সম্ভব হইবে ।
প্রথম প্রবর্ত্তনই দুঃসাধ্য ।

• উভয়ে এই বিষয়ে কথা হইতেছিল । উভয়েরই মুখে চিন্তার প্রগাঢ় ছায়া ;
উভয়েরই হৃদয়ে আশায় ও আশঙ্কায় দ্বন্দ্ব চলিতেছিল ।

সহসা দ্বারে করাঘাতশব্দ শ্রুত হইল ।

উভয়েই চমকিয়া উঠিলেন ।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে ?

উত্তর আসিল, “আমি প্রহরী ।”

বিশেষ প্রজোজন ব্যতীত প্রহরী আসিবে না, বুঝিয়া রাজা শঙ্কর সিংহকে
বলিলেন, “শঙ্করসিংহ, দেখ প্রহরী কি চাহে ।”

শঙ্কর সিংহ দ্বার মুক্ত করিয়া প্রহরীকে তাহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা
করিলেন ।

প্রহরী বলিল, “মন্দিরের বৃদ্ধ পুরোহিত মহাশয় রাজদর্শনপ্রার্থী । তিনি সোপান-
মূলে অপেক্ষা করিতেছেন । তিনি বিশেষ আবশ্যক কার্য্যে রাজদর্শন করিতে
চাহেন ।”

শুনিয়া শঙ্কর সিংহ রাজার দিকে চাহিলেন ।

রাজা বৃদ্ধ পুরোহিতের সহসা আগমনের সংবাদে বিস্মিত হইলেন,
প্রহরীকে বলিলেন, “তঁাহাকে লইয়া আইস ।”

প্রহরী চলিয়া গেল ।

শঙ্কর সিংহ ও রাজা অপেক্ষা করিতে লাগিলেন ।

অল্পক্ষণ পরেই বৃদ্ধপুরোহিত কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন । উভয়ে তঁাহাকে
প্রণাম করিলেন ।

বৃদ্ধ স্থির স্ববে রাজাকে বলিলেন, “আমি তোমাকে আশীর্বাদ করিতে
আসিয়াছি ।”

রাজা বলিলেন, “আপনার আগমন-বিষয় আমরা পূর্বে কিছুই জানিতে
পারি নাই ।

“আমার এখন আসিবার ইচ্ছা ছিল না । কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অনুরূপ ।
তাই আপাকে আসিতে হইয়াছে ।”

পুরোহিত পুনরায় বলিলেন, “আমি কয়টি তীর্থ পর্য্যটন করিয়া অত্র তীর্থে
যাইতেছিলাম । মীমান্ত-মধ্যবর্তী গণে যাইতে শুনিলাম, তুগি প্রজাপালনে সচেষ্ট

হইয়াছে। প্রজারা সে কথা বলিতে আনন্দে ও কৃতজ্ঞতার অনেক ছুঃখ ভুলিতেছে। কিন্তু সে কথা শুনিয়া আমার মনে যে আনন্দের উদয় হইল, তাহার তুলনায় তাহাদের আনন্দ প্রভাকর-কিরণের নিকট থলোত্তের ক্ষণবিধবংসী দীপ্তি-মাত্র। আমি তোমার জন্মের পর দিন তোমাকে আশীর্বাদ করিতে আসিয়াছিলাম। সে দিন মনে করিতে পারি নাই, এক দিন মনের ছুঃখে তোমাকে অপ্রিয় কথা বলিতে হইবে।”

রাজা বলিলেন, “কঠিন ব্যাধির জন্ত তীব্র ভেষজ আবশ্যক। সে ভেষজের জন্ত রোগীর চিকিৎসকের নিকট কৃতজ্ঞ হওয়াই উচিত। আপনি আমার জন্ত সেইরূপ ভেষজ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; তাহাতে আমি যদি ব্যাধিমুক্ত হইতে পারি, তবে আপনার আনন্দ যেরূপ স্বাভাবিক—আমার কৃতজ্ঞতাও সেইরূপ স্বাভাবিক।”

“আমি মনের কষ্টে সে সকল কথা বলিয়াছিলাম। আমি তোমার পুরো-হিত; তোমার হিত-সাধনই আমার কর্তব্য। আমি সেই কর্তব্যপালন করিয়াছিলাম। কিন্তু আমি সে কষ্ট ভুলিতে পারি নাই; এখন তোমার প্রজারাজনের কথা শুনিয়া সে ব্যথা অপনীত হইল; তাহালাগ, তোমাকে আশীর্বাদ করিয়া পুনরায় তীর্থ-পর্যটনে বাহির হইব। তাহার পর রাজধানী অভিমুখে যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই তোমার নব নব কীর্তিকথায় চিত্ত পুলকিত হইতে লাগিল। আজ নগরে নগরে—গ্রামে গ্রামে—প্রান্তরে প্রান্তরে তোমার কীর্তিকথার আলোচনা। আজ প্রজা উৎফুল্লচিত্তে তোমাব জয়গান করিতেছে। বৎস, আজ এ রাজ্য তোমার পুণ্যে পুণ্যময় হইয়াছে।” বলিতে বলিতে বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর উচ্ছ্বসিত আবেগে কোমল হইয়া আসিতে লাগিল।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, “তবে কি আপনি পুনরায় তীর্থ-পর্যটনে বাহির হইবেন।”

বৃদ্ধ বলিলেন, “সেই সঙ্কল্প করিয়া বাহির হইয়াছিলাম। যদি ভগবান কোন বিঘ্ন না ঘটান, তবে আবার বাহির হইব।”

“শীঘ্রই কি যাত্রার সস্তাবনা?”

“অতি শীঘ্র।”

তিনি কি প্রকারে পার্বতীর কথায় উত্থাপন করিবেন, রাজা তাহা ভাবিলেন। তিনি মনে করিলেন, বৃদ্ধ যাত্রার পূর্বে অবশ্যই তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া যাইবেন। তথাপি তিনি বলিলেন, “কিছু বিশেষ কি অন্তবিধা হইবে?”

“কেন ?”

“গৃহে শোকাতুরা কণ্ঠা বোধ হয় আপনাকে নিকটে পাইলে অনেক সাঙ্ঘনা পাইবে ।”

“সে শাস্ত হইয়াছে । জোয়ার সাগ্রহ দয়ার কথা আমি এ জীবনে ভুলিতে পারিব না । তুমি দেখিয়া আসিয়াছ, শোকের প্রথম উচ্ছ্বাসের পর সে শাস্ত হইয়াছে । আমি তাহার শিক্ষার ও সংযমের সার্থকতার সুখী হইয়াছি । শোকের প্রথম প্রবল আঘাত কেবলতাহাকে বিচলিত করিয়াছিল ।”

“তাহাকে কি একাকিনী রাখিয়া যাইবেন ?”

“বৎস, কে কাহাকে রাখে ? সে যে কত যত্নহীন ভ্রাতাকে নিকটে রাখিয়াছিল ! রাখিতে পাবিল কি ? আমি তাহাকে স্বাবলদ্বনই শিখাইয়াছি ।”

রাজা আর কিছু বলিলেন না ;

বৃদ্ধ পুনরায় বলিলেন, “বিশেষ সে দুষ্কর কার্য্যে ব্রতী হইতেছে । ব্যাধিত-দিগের জন্ত আশ্রম-সংস্থাপন তাহার বহুদিনের স্বপ্ন । শুনিলাম, জোয়ারা অল্প-এহে সে স্বপ্ন সফল হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে । সে সেই আশ্রমে সেবাত্রত গ্রহণ করিতে চাহিতেছে । যে একা থাকিতে পারে না, সে কিরূপে সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন ?”

“পার্কীতি কি স্বয়ং সে আশ্রমের ভার বহিতে চাহিতেছে ?”

“হঁ। আমি ভাবিয়াছিলাম, ফিরিয়া তাহার বিবাহ দিব । আমি পাত্রের সম্মান করিতেছিলাম । এখন সে ব্যাপার আরও জটিল হইয়া উঠিল । পার্কীতি যদি এই কার্য্যে ব্রতী হয়, তবে এই কার্য্যে তাহাকে উৎসাহিত করবে, সাহায্য করিবে—এমন পাত্রের সম্মান কবিতো হইবে ।”

“এ ব্রত কি রমণীর উপযোগী হইবে ?

“এ ব্রত রমণীরই উপযোগী ।”

“কিন্তু রমণীর ক্ষুদ্র শক্তি কি এ কার্য্য সাধনে সমর্থ হইবে ?”

“তোমার কণায় আমি বিশ্বিত হইলাম । রমণী শক্তিরূপিনী—শক্তির আধার । কিন্তু যেমন জল যত গভীর তত স্থির—তত শিথল, তেমনই সে শক্তি প্রাচুর্য্য-হেতু সহসা বিচলিত হয় না ; তাই সাধারণ লোক—নরচরিত্রানভিজ্ঞগণ সহসা তাহার চরিত্র অনুভব করিতে পারে না । লোকশিক্ষক হিন্দু শাস্ত্রকারগণ সে কথা বুঝাইয়াছেন । অমরনাথ যখন দেবতার দ্বারা সৃষ্ট হয় নাই, তখন দেবীদ

দ্বারা সংসাধিত হইয়াছে। অমঙ্গল-মিবারণ যখন পুরুষের পক্ষে দুঃসাধ্য, তখনও রমণীর পক্ষে সহজসাধ্য।”

রাজা মুগ্ধনেত্রে পুরোহিতের দিকে চাহিয়া রহিলেন। পুরোহিত বলিতে লাগিলেন, “রমণীর শক্তি হইতে স্নেহ—প্রেম—ভালবাসা এ সকলের উৎস উৎসাবিত হয়—জগত মঙ্গলময় হয়। প্রকৃতি শক্তিময়ী; রমণী তাহারই অংশ। প্রকৃতি যখন তাণ্ডব নৃত্যে গাতিয়া উঠে তখনই জগতের ধ্বংসের বিঘাণ বাজিয়া উঠে। কিন্তু চাহিয়া দেখ, প্রকৃতি স্নেহময়ী, কোমলা, সরলা, স্নেহীলা, সর্ব-সৌন্দর্য্য-বিভূষিতা। কোন্‌ ছন্দর কার্য্য রমণীব সাধ্যায়ত্ত নহে? মা জগজ্জননী—জগদ্ধাত্রীরূপে সংসারপালন করেন, আবার ছিন্নমস্তারূপে আপনি আপনাকে ধ্বংস কবেন—সে ধ্বংস কেবল নূতন সৃষ্টির সূচনা। আজ রাজপুত্রগৌরব ধূল্যব-লুপ্তিত—কাবণ, রাজপুত্ররমণী মোগলের বিলাসের বশীভূতা হইয়া শক্তি হারাইতে বসিয়াছে। যতদিন সে শক্তি অনাহত ছিল, ততদিন বাজপুত্রের হৃদশা ঘটে নাই। যদি সে শক্তি আবার জাগিয়া উঠে, তবেই এ দুঃখনিশা পোহাইবে। সে দিন মঙ্গলময়ী—স্বর্ণরঙ্গিনী মূর্তিতে অমঙ্গল বিনষ্ট করিয়া মঙ্গলের পুনঃপ্রতিষ্ঠা কবিবেন। মা, সে দিন আসিবে কি?”

পুরোহিতের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। তিনি যুক্তকরে ভক্তিরূপে উদ্দেশে শক্তিকে প্রণাম করিলেন।

পুরোহিতের কথা শুনিয়া রাজার শিরায় শিরায় রক্ত-স্রোতঃ প্রবলবেগে বহিতে লাগিল; আর—সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনে হইল, রাজপুত্ররমণীর শক্তির সহায়তা পাইলে তিনি কি না করিতে পারিতেন? তিনি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

পুরোহিত বলিলেন, “বৎসগণ, আমি তোমাদের কার্য্যে বাধা দিয়াছি। আমি চলিলাম।”

রাজা বলিলেন, “আপনি আমার কর্তব্যের দিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট করাইয়াছেন। আপনার রোপিত বৃক্ষের ফলে আপনার আনন্দ হইবার কথা। আপনি আগাদের প্রস্তাব শ্রবণ করুন।”

পুরোহিত উঠিয়াছিলেন, পুনরায় আসন গ্রহণ করিলেন।

রাজা তখন তাঁহার প্রস্তাবের কথা, শঙ্কর সিংহের সঙ্কল্পিত দৌত্যের কথা—সব পুরোহিতকে বলিলেন।

বৃদ্ধ রাজার কার্য্য-প্রণালীর সমালোচনা করিয়া কোন কোন বিষয়ে কিছু কিছু পরিবর্তন করিতে বলিলেন। যে সকল সম্ভাবনার কথা রাজার মনে হয়

নাই, বৃদ্ধ সেই সকলের আলোচনা করিলেন ।

তাহার পর পুরোহিত, রাজা ও শঙ্কর সিংহ—তিন জনে পরামর্শ করিয়া ভবিষ্যৎ কার্য্যপ্রণালী স্থির করিলেন ।

বৃদ্ধ গমনোন্মোদী হইলেন । রাজা ও শঙ্কর সিংহ তাঁহাকে প্রণাম করিলেন । তিনি রাজাকে বলিলেন, “বৎস, তুমি দুষ্করকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে । বিধাতা তোমার সহায় হউন ; আমি নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া বুঝিয়াছি, এখন ভয়ই রাজপুত্রের প্রধান শত্রু ; তাহাকে জয় করিতে পারিলে আর কিছুই অজয়ের রহিবে না, তাহার স্পর্শ বিঘ্নে কার্য্য করে ; তাহাতে মানুষের মনুষ্যত্ব নষ্ট হয় । রাজপুত্রের তাহাই হইতেছে ।”

তিনি শঙ্কর সিংহকে বলিলেন, “আগি আশীর্বাদ করিতেছি, তোমার যাত্রা শুভযাত্রা হউক ।”

বিচ্ছেদে ।

—:::—

হে আমার জীবনের আরাধ্য দেবতা !

বুঝি নাই এতদিন কত ভালবাসি,—

আজি তব অদর্শনে চিনেছি হৃদয়

তাই ফুরিয়েছে সাধ ফুরিয়েছে হাসি ।

স্বতি আসি লুটাইছে মনের ছদ্মারে ।

আমার এ প্রেমব্রত হবে কি বিফল ?

অধীর উন্মাদ আমি তীব্র যাতনায়

মদল করেছি স্রুধু নয়নের জল ।

শ্রীদেবীরাণী ঘোষ ।

